জাতিস্মর

পঞ্চবর্ষী

এতে আছে—

জাতিস্মরের শিল্পলোক

জাতিস্মরের পান্থশালা

জাতিস্মরের চিত্রলোক

"জাতিস্মরের শিল্পলোকে"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৭০ সালে, পুস্তকাকারে। এর আগে প্রায় দেড় বছর ধরে নব কল্লোল পত্রিকায় রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

"পঞ্চবর্ষী" লিখিত "জাতিস্মর" শিরোনামার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। সেইটুকু জানানই এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। নব কল্লোলের সহ-সম্পাদক, প্রয়াত মধুসূদন মজুমদার (দৃষ্টিহীন) ছিলেন আমার একান্ত প্রিয়জন ও গানের ছাত্র। বহু বছর ব্যবধানের পর একদিন হঠাৎ ঝামাপুকুরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এবং তিনি আমাকে অনুরোধ জানান আমার ভবঘুরে জীবন নিয়ে লিখতে। আমি মৃদু হেসে শুধু জানিয়েছিলাম যে কে এমন ধৈর্যশীল পাঠক আছেন যিনি আমার মত একজনের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস পড়ায় আগ্রহী? মধুসূদন বলেছিলেন—না না আপনার জীবন এতই বৈচিত্র্যময় যে তা একটি অসাধারণ উপন্যাস পড়ার মতই উপভোগ্য হবে বলে আমি মনে করি। সুতরাং ওটা আমার চাই-ই-চাই। আমি বলেছিলাম—লিখে আমি দেব, তবে আমায় ভাবতে দাও কি ভাবে বা কি রূপে তা আমি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করব।

এরপর আমি আমার লেখা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলাম—অনেক ভেবে আমি এর নাম দিয়েছি "জাতিস্মরের শিল্পলোক"—এবং আমার প্রচ্ছন্ন নাম রেখেছি "পঞ্চবর্ষী।" ভাবো—আমাদের শিল্পজীবন অতীতের অন্তরালে হারিয়ে গেছে আর তার স্মৃতিচারণ যেন এক বিগত জীবনের ইতিহাস। আর সেই কাহিনী পাঁচ বছরের এক জাতিস্মর বলছে পাঠকদের। এইভাবে রূপ দিলাম। এতে পাঠকের ঔৎসুক্যও বজায় থাকে আর আমার আমিত্বও থাকে গতজীবনের অন্তরালে।

তারপর নব কল্লোলে ট্রিলজির মত ধারাবাহিক বার হল "জাতিস্মরের শিল্পলোক—চিত্রলোক ও পান্থশালা"। অবশ্য আমার বিস্তারিত চিত্রজীবন পরে "কিন্নর-কিন্নরী" নামে অমৃত পত্রিকায় বার হয়েছিল। এবারের সংস্করণ তাই ট্রিলজির পর্যায়। নামকরণ করেছি "জাতিস্মর"। "পঞ্চবর্ষীর" জাতিস্মরের সিরিজ পাঠকদের প্রশংসায় ধন্য হয়েছে। ছদ্মনামেরও আর প্রয়োজন নেই।

ইতি—

বিনীত

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু (পঞ্চবর্ষী)

এক

মৃত্যু আনে নশ্বর দেহটার জীবনান্ত। এর কি এইখানেই সমাপ্তি? শুনি নাকি জন্ম হতে জন্মান্তর, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের মতোই ঘুরে চলেছি —কল্প থেকে কল্পান্তরে।

পৃথিবীতে এসেছি আজ পাঁচ বছর। দেড় বছর বয়সে, যখন বুলি ফুট্‌লো—সবাই অবাক হয়ে যায় আমার অসংলগ্ন বাক্য স্ফুটে, গত জীবনের হিসাব-করা কথার পুনরাবৃত্তিতে। হ্যাঁ, পূর্বজন্মের দিন্‌-নামচা আমার যেন কণ্ঠস্থ! সারাদিন আপনমনে কত কি যে কপচাই! সবাই বলে ছেলেটা পাগল! ডাক্তারবাবু এসে চিকিৎসা শুরু করলেন, কিন্তু কোন সূত্র ধরতে না পেরে বলে যান,—বড় হলে সেরে যাবে।

ক্রমে বছর গড়িয়ে দু বছর, তিন বছর, চার বছর। তবু সেই একই ধরনের কথা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। বাবার কেমন ঝোঁক চাপলো এর তথ্য আবিষ্কার করতে।

আমার মুখের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনে হদিস পেলেন যে, চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার দণ্ডীর হাট গ্রামে বসু বংশে আমার জন্ম হয়েছিল—বিগত জীবনে। পূর্ব জন্মের ঘটনাগুলো যে এমনভাবে সুস্পষ্ট হয়ে এই জীবনে মনে পড়তে পারে তা তিনি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তাই আমার কথায় তাঁর ঔৎসুক্য দিনের পর দিন এমনিই বেড়ে চললো যে, সত্যই এ-কদিন এই অজানা গ্রামে তিনি আমায় নিয়ে পাড়ি জমালেন।

বেলগাছিয়া বাস স্ট্যাণ্ড। ইটিণ্ডেঘাট, ইটিণ্ডেঘাট, বলে চীৎকার করছে বাস কণ্ডাক্টার। বাবা আমার হাতটি ধরে উঠে বসলেন সেই বাসে।

বাসে উঠেই আমি উচ্চারণ করলাম,—একি! বাসে কেন? শ্যামবাজার থেকে একটা ছোট্ট ট্রেনে করে যে বরাবর আমরা দেশে গেছি। এ তুমি ভুল করেছো বাবা! —বাবা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন আমার মুখের পানে।

পাশের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন,—কোথায় যাবেন? বাবা বলেন,—দণ্ডীর হাট গ্রামে।

ভদ্রলোক বলেন,—খোকা ঠিকই বলেছে। আগে মার্টিন বার্ন কোম্পানীর ন্যারো গেজ্ রেল লাইন ছিল—প্রথম পাতিপুকুর পরে শ্যামবাজার থেকে। সে ট্রেন হাসনাবাদ পর্যন্ত যেতো। এ বিষয় আপনি অবগত নন অথচ খোকা কি করে জানলো?

বাবা, আসল কথাটা চেপে গিয়ে বলেন,—হয়ত ওর ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে থাকবে।

ভদ্রলোক বলেন,—বসিরহাট পর্যন্ত এই বাসে গিয়ে—পরে পায়ে হাঁটা পথে বা বাস বদলি করে দণ্ডীর হাট পৌঁছতে হবে।

বাস ছেড়েছে। আমি জানলার পাশটিতে বসে পাশের গাছপালা, দোকান-পসারের দিকে চেয়ে থাকি। বাবা নিঃশব্দে ভাবতে বসেন।

ঘণ্টা দুয়েক গাড়ি চলেছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঢুল এসে মাঝে মাঝে আমায় যেন শুইয়ে দিতে চাইছে দেখে বাবা কোলের মধ্যে আমার মাথাটা টেনে নিলেন। ঠিক সেই সময় গাড়িটা থেমে গেল। আমি দু'হাতে চোখ রগড়ে নিয়ে চারপাশ দেখে নিলাম।

—একি! জায়গাটা বড় চেনা চেনা মনে হয়। বাবাকে বললাম, এটা কি স্বরূপনগর? এখানকার সিঙাড়া খুব ভাল খেতে।

বাবা বলেন,—জানি না।

পাশের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দৃষ্টি আমার উপর আবার নিবদ্ধ হলো। একটু হেসে বললেন,—খোকা ঠিকই বলেছে। ট্রেনের স্টেশন যখন ছিল তখন এর নাম ছিল স্বরূপনগর। তখন এখানে সত্যই উপাদেয় সিঙাড়া পাওয়া যেতো।

আমি বললাম,—ওই দূরে ওখানে একটা রথকে সারা বছর বাঁশ দিয়ে ঘিরে রাখা হতো, মাথায় থাকতো খড়ের ছাউনি—পাছে বৃষ্টিতে ভিজে যায়।

ভদ্রলোক আশ্চর্যান্বিত হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন,—এ কি করে সম্ভব যে আপনার ছেলে সব জানে অথচ আপনি কিছুই জানেন না!

বাবা যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলেন,—ও যে ক'দিন আগে ওর ঠাকুমার সঙ্গে এদিকে এসেছিল।

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ চোখে বাবার দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁর দেখে বোঝা যায় যে তিনি যেন এ উত্তরটায় সন্তুষ্ট নন।

ইতিমধ্যে বাস ছেড়েছে,—আবার সব অন্যমনস্ক। বাস একবার যাত্রী নামাতে থামলো। কণ্ডাক্টার বলে,—আড়বেলের যাত্রীরা নেমে যান।

আমি ভাবি—আড়বেলে? নামটি বড় জানা, জানা!

বাবাকে বলি,—আড়বেলের আগে না পরে, গাইন গার্ডেন—ঠিক মনে হচ্ছে না। গাইনদের দুর্গের মতো একটা বাগানবাড়ি আছে—এটা মনে আছে। সেইখানে ম্যাডান কোম্পানী একবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র নির্বাক ছবি তুলতে এসেছিল আমার বেশ মনে পড়ে। সঙ্গে ডিরেকটার ছিলেন প্রিয় গাঙ্গুলী মশায়, আর ক্যামেরাম্যান ছিলেন মার্কনি সাহেব।

বৃদ্ধ বলেন,—আমার তা মনে নেই বটে, তবে সত্যিই ওখানে গাইনদের দুর্গের মতো বাগানবাড়ি, পুকুর আছে।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে গাইন গার্ডেনে থামলো। বাবা মুখ ঝুঁকিয়ে গাইনদের বাগানবাড়িটা দেখে নেন।

কৌতুহল আর চাপতে না পেরে বৃদ্ধ বাবাকে বলেন,—আপনার ছেলের বয়স কত?

বাবা বলেন,—এই পাঁচ বছরে পড়লো।

বৃদ্ধ তাঁর কোটরগত দুটি চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলেন,—আপনার ছেলে নিশ্চয়ই জাতিস্মর!

বাবা সে কথাটা আমার সামনে পাড়তে চান না। তাই, একটুকু সতর্ক হয়ে চোখ টিপলেন।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি এসে দাঁড়ায় একটি জায়গায়। পথের ধারে বা পাশে ইট-বেরকরা একটি দোতালা বাড়ি। আমি বলে উঠি—এটা বুঝি মৈত্র বাগান! এর পাশেই হচ্ছে কুলীন গ্রাম। এই কুলীন গ্রামে স্বামী ব্রহ্মানন্দের বাড়ি। স্বামী বহ্মানন্দের আর এক নাম রাখাল মহারাজ। তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। আমি একদিন তাঁর বাড়িতে এসেছিলাম।

বাবা নিরুত্তর।

বৃদ্ধ বলেন,—আর কি তোমার মনে পড়ে খোকা?

আমি উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিই,—জান বাবা ঐ যে দূরে ইট্ বেরকরা দোতালা বাড়ি—ঐটা হচ্ছে সত্যেনবাবুর বাড়ি। অদ্ভুত ধ্রুপদী। ভারী মিষ্টি গলা। বাবা প্রায়ই ওঁর গান শুনতে আসতেন। তখন আমি কলকাতায় গড়পার নিবাসী শ্রীযুত রাজেন ঘোষ মশাই এর কাছে ধ্রুপদ শিখি। লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর ঘরওয়ানা। আমার গান শুনে সত্যেনবাবুর সে কী আনন্দ! আমায় নিয়ে নিজের বাড়িতে আসর করেছিলেন।

আর একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলি,—ঐ যে বাড়িটা রাস্তার ডান পাশে, ওটা হরি মজুমদার মশাই-এর বাগানবাড়ি।

তখন আমাদের বসিরহাটে প্রতি বছর থিয়েটার হতো। আমি ছিলাম নাচগান শেখাবার মাস্টারমশাই। মৈত্র বাগানের পানের বরজের ছেলেগুলো সেজেছিল সীতা নাটকের সখী। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি শিখিয়েছিলাম —'মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে···।' ওরা গাইত—'মুঞ্জুল মুঞ্জুরী নব সাগে···' উঃ, সে কি হাসি! আমার আজও মনে পড়ে।

হ্যা—হ্যা—, আরও মনে পড়ে, তারা সব বুট জুতো পরে স্টেজের উপর নেচেছিল। পূজার সময় নতুন জুতো কিনেছে সকলে, তাই তার মায়া ছাড়তে পারে নি।

আর একবার, জানো বাবা, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভায় নীরবালা একটি ছেলে পার্ট করেছিল! তাকে যত শেখাই—'যেতে দাও গেল যারা, তুমি যেও না—যেও না, আমার বাদলের গান হয়নি সারা'; সে তত গায়—'Zাতি দাও গেল Zারা, তুমি জেউনি, আমার বাদ্‌লার গান হইনি সারা'।

বাবা বলেন,—চুপ কর খোকা—।

হাসিতে ফেটে পড়েছি আমি। হঠাৎ বাধা পেয়ে লজ্জায় বাবার কোলে মুখ লুকোই।

গাড়ি এসে থেমেছে বসিরহাট স্টেশনে। পাশেই বসিরহাট বাজার। সবই আমার চেনা! সেই গিরিশ জামাইবাবুর বাড়ি। স্টেশনে নেমে আমরা জল খাবার নাম করে কুসুমদির কাছ থেকে এক পেট মিষ্টি খেয়ে আসতাম।

পথের দুধারে বাজার। সবই যেন চেনা। সব কথাই ছবির মতো মনে ভেসে উঠছে। বলার জন্যে মনটা ছটফট করে উঠছে। তবু বলা হচ্ছে না, পাছে বাবা বকেন।

কিন্তু বসিরহাট টাউন হলটা চোখে পড়তে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারি না। সোৎসাহে বলে উঠি,—এইটা বসিরহাট টাউন হল! এখানে আমরা একজিবিশনে মনোহরী স্টল করেছিলাম। সঙ্গে ছিলেন ছোড়দাদা। আমি অবশ্য এই হলে অনেকবার অভিনয় করে গেছি। চন্দ্রগুপ্ত, সীতা, রঘুবীর, আলিবাবা—এমনি অনেক।

বাবা বড় বড় চোখ করে, ধমক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টির পাহারায় আবার বন্দী হলাম। চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু কথাগুলো বেরুবার জন্যে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

তাই নদীটার দিকে হাত দেখিয়ে বললাম,—এটা কী নদী ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হেসে বলেন,—কী নদী বলো তো বাবা ?

আমি লজ্জায় বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে বললাম,—ইচ্ছামতী।

বৃদ্ধ কিন্তু আমাদের সঙ্গে বসিরহাটেই নেমে পড়লেন। বাবার কাছে থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর কাছে হঠাৎ বলে ফেলেন, যদি কিছু মনে না করেন, তা'হলে আপনার সঙ্গে যাই চলুন দণ্ডীর হাটে।

বাবা কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন,—আপনি কেন যাবেন সেখানে ?

বৃদ্ধ জানান, শুধু একটা ঔৎসুক্য মাত্র। তবে, আমি সঙ্গে থাকলে আপনার উপকারই হবে। কারণ, আপনি এ দেশে নবাগত। দণ্ডীর হাটে হচ্ছে আমার শ্বশুরবাড়ি। কাজেই সঙ্গে থাকলে আপনাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করতে পারবো বলে মনে করি।

কেন জানি না বাবা হঠাৎ তাঁর কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ বলেন,—তবে একটু সবুর করুন। পাশেই আমার বাসাবাড়ি। সেখানে কিছু জলযোগ করে রওনা হওয়া যাবে।

বাবা আমার মুখের পানে চেয়ে, কি যেন ভেবে, তাঁর কথা অনুমোদন করলেন।

দণ্ডীর হাটে পা দিয়েই আমার পূর্ব-স্মৃতি যেন শতফণায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ঐ তো সেই আম বাগান, ঐ তো মন্দিরহাটার রাস্তা। ডাইনে স্টেশনের রাস্তাটা ফেলে আসল পথ সোজা গিয়ে ঢুকেছে গ্রামে।

বা পাশে সরকার বাড়ি, ডাইনে বাঁশ ঝাড় তারপর রাস্তা ঘুরে বকুলতলায় গিয়ে মিশেছে। ও পথটা পালকি বা গরুর গাড়ি যাবার পাকা-পথ। আমরা বরাবর সোজা পায়ে-হাঁটা পথ ধরেই আসা-যাওয়া করতাম।

সেই পথ দেখিয়ে বাবাকে নিয়ে চললাম। বামুন পাড়া পার হয়ে পশ্চিম বাড়ির সীমানায় পা দিয়ে বললাম,—বাবা, এই বাড়িটার নাম 'পশ্চিম বাড়ি'। জানো বাবা, আমাদের দণ্ডীর হাটে অনেক বাড়ি। আমরা হলুম—মাঝের বাড়ি। এটা তারই পশ্চিমে বলে—বলা হয় পশ্চিম বাড়ি। ও দিকে পূবের

বাড়িও আছে আর আছে নতুন বাড়ি। মাঝের বাড়িতেই পূজা মণ্ডপ, বকুলতলা, বৈঠকখানা বাড়ি, আর ভিয়ান বাড়ি।

ঠাকুর দালানের সামনেই আশুকাকাদের ভূতের বাড়ি। সত্যি সত্যি ওখানে ভূত আছে। কোন্ বউ যেন গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সে ওখানে নিত্যি ঘোরাফেরা করে আশুকাকার মা ন'গিন্নী ঝ্যাঁটা হাতে তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেন,—খোকা সব ঠিক বলেছে। আমি হলাম পশ্চিম বাড়ির জামাই।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন,—হ্যাঁ খোকা তোমার বিজয়কাকাকে মনে পড়ে?

আমি দ্বিধা না করে বলি,—হ্যাঁ, বিজয়কাকা আর ললিতকাকা দুজনকেই মনে পড়ে। ওঁদের জ্ঞাতি শচীনকাকা খুব ভাল তবলা বাজাতেন। আমার সঙ্গে তবলার সঙ্গত করতেন আর সবাইকে বলতেন, ভারী লয়দা'র গাইয়ে।

চলতে চলতে ডান পাশে সুর ঘোষের বাগানটা ছেড়ে কালী ঘরের দেওয়াল। যথাযথ মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললাম—এখানে প্রণাম করো বাবা!

বাবা একটু ইতস্তত করতেই বৃদ্ধ বলেন,—হ্যাঁ—মায়ের ঘর এটা। ডাঃ জগবন্ধু বসুর ভাই ৺কুঞ্জ বসুর বড় মেয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। মাঝের বাড়ি ঢোকবার তোরণদ্বার।

বাবা প্রণাম করে মাথা তুলতেই বললাম,—ঐ আমাদের তেতলা বাড়ি। তেতলার ঘর দুটি আমাদের। খুব ভালো পঙ্কের কাজ করা। আমাদের বাড়ির দক্ষিণে ভিয়ান বাড়ি—তার সামনে বৈঠকখানা। ওর ওধারের ঘরে ডিসপেনসারী আর ছেলেদের স্কুল হতো। ওর সামনেই ঠাকুরদালান।

দেখতে দেখতে আমরা ঠাকুরদালানের মাঠে এসে পড়লাম। বললাম, —পূজার সময় এইখানেই স্টেজ বেঁধে আমাদের অভিনয় হতো। দণ্ডীর হাট বান্ধব-নাট্যসমাজ। বলি,—জানো বাবা! পাশের গাঁ ধলচিতা—ওখানেই শ্রীঅমৃতলাল বসুর বাড়ি। তিনিও এখানে অভিনয় করতেন; আর কলকাতা থেকে আসতেন—অমৃত মিত্র, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফি এই সব গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমি অবশ্য তখন জন্মাই নি—বাবার কাছে গল্প শুনেছিলাম। বাবার বড় ভাই ডাঃ জগবন্ধু বসু আর বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন বসু (আমাদের ছোড়দা) খুব ভালো নাচতে জানতেন।

পরবর্তী যুগে আমি 'কুঞ্জদরজী'র অভিনয়ে নেচেছি এখানে। ভালো গাইতে পারতাম বলে প্রতিটি অভিনয়ে আমায় থাকতে হতো।

কত গল্পই বললাম। বৃদ্ধ প্রতিটি সমর্থন করলেন।

ক্রমে ক্রমে গাঁয়ে ভিড় বেড়েছে। নেড়ামুদির দোকানে বসেছে নতুন লোক। গাঁয়ে বাসা বেঁধেছে সব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারার দল।

গাঁয়ে যাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতাম, সাঁতার দিতাম, চু-বুড়ী খেলতাম —তাদের কারও দেখা পেলাম না।

হঠাৎ ভিড়ের মাঝে শশীদার ছেলেকে দেখলাম। দেখলাম, ছেলেবেলার মতোই দেখতে রয়েছে, শুধু চুলটা পেকে গেছে।

ওকে দেখে বললাম,—খোকা, এরা সব গেল কোথায়? বৈঠকখানার গানের জলসায় কাতারে কাতারে যে লোক ভেঙে পড়তো তারা সব গেল কোথায়?

তিনি তো অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

আমি বলি—জটেদা—ছ্যানাদা এরা সব?

আধবুড়ো খোকা এগিয়ে এসে বলেন,—ছ্যানাখুড়ো মারা গেছেন, তবে জটেখুড়ো, বুলিকাকা আজও বেঁচে আছেন।

সবাই অবাক!

প্রৌঢ় খোকা বলেন,—তুমি কে?

বাবা সামলে নিয়ে বলেন,—উনি—উনি—মানে—

তারপর তাঁকে সঙ্গোপনে কি সব বলেন।

তিনি আমায় কোলে তুলে নিয়ে তাঁদের বাড়ি গেলেন। সে বাড়ি আমার চেনা।

এটা হচ্ছে পুবের বাড়ি। এই বাড়িতে খোকার মা—আমাদের সরোজিনী বউদির উপরে কত আবদার কত উৎপাত করেছি। আমার গান শুনতে তিনি বড়ো ভালবাসতেন। এই আমার সব আবদার তিনি হাসি মুখে সয়ে গেছেন।

খোকাবাবু বলেন, যে তিনিও নাকি গত হয়েছেন।

এমনি করে সারা দুপুরটা ফুরিয়ে গেল—

নতুন ডাক্তারখানায় গ্রামের মুষ্টিমেয় ভিড় এসে আমায় ঘিরে দাঁড়ালো। হঠাৎ, ভিড়ের মাঝে দেখি, বৃদ্ধ বিজয় ঠাকুর পুরুতমশাইও এসেছেন। তাঁকে দেখে বললাম, বিজয় ঠাকুরমশাই না?

তিনি বললেন—হ্যাঁ—, অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে থাকেন !

এরপর বাবা আমায় নিয়ে রওনা হতে চাইলেন। কিন্তু, শত অনুরোধের দায়ে সে রাতে দণ্ডীর হাটেই থাকতে হলো।

রাত্রে ব্যবস্থা হলো সুরেনকাকার বাড়িতে। সুরেনকাকাকে আমরা সুরকাকাই বলতাম। তিনিও গত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছেলেরা আমাদের ছাড়লেন না। বলেন,—ওঁর বাবা বেচে থাকতে গাঁয়ে এলেই আমাদের বাড়িতেই খেতেন। কাজেই এ যাত্রায়ও তাই হবে।

সুরকাকার বড় ছেলে পেঁচো আমার বন্ধু ছিল—সে নাকি গত হয়েছে। আছে কালো আর টেনু। মাকী আমার গত হবার আগেই মারা গিয়েছিল।

সুরকাকার মেয়ে চড়ি ছিল আমার আবাল্য সাথী। তার সঙ্গে আমি ছেলেবেলায় অভিনয় করতাম। আমি রাজা, তো সে রাণী, বা এই রকম। আমার হিরোইন তাকে হতেই হবে।

চড়ি এখন বুড়ী। সে-ই রেঁধে বেড়ে দিলে।

আমি বললাম,—চড়ি, তোমার এ ছিরি কেন হলো ?

সে ফোকলা দাঁতে হেসে আমায় জড়িয়ে চুমু খেয়ে আমার মুখে গরম ভাতের গরোস পুরে দেয় !

খেতে খেতে কখন তারই কোলে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আমার মনে নেই।

দুই

কলকাতায় এসে নিরালায় বাবা আর মা কি সব কথাবার্তা করে আমার পূর্বস্মৃতিটুকু নিয়ে আর আলোচনা করবার অবকাশ দিলেন না। চিরদিনের মতো এ বাড়ি থেকে আমার জাতিস্মরের কাহিনী বিলুপ্ত হবার উপক্রম হল।

কিন্তু, আমার বিক্ষুব্ধ স্মৃতিটুকু তবুও ক্ষণে ক্ষণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। গত জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এ জীবনে জ্যাঠামিতে পরিণত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় বাবার এক বন্ধু বাড়িতে পদার্পণ করলেন। তিনি নাকি চিত্র জগতের বহু পুরাতন প্রচার সচীব। বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল চিত্র স্টুডিওতে। বাবা নাকি একবার নিমন্ত্রিত হয়ে টেকনিসিয়ন স্টুডিওতে সুটিং

দেখতে গিয়েছিলেন। এই প্রবীণ ঐতিহাসিক বন্ধুটি বুঝি সেই সময় বাবার মন হরণ করেছিলেন। বাবা নাকি কথায় কথায় বলেছিলেন তাঁকে—যদি চিত্রজগতের বা শিল্প জগতের পুরাতনী শুনতে চান তো আসবেন আমার বাড়িতে—তাই, আজ তাঁর পদার্পণ। তিনি পুরাতনী তথ্য সংগ্রহ করে চিত্র আলোচনার মাসিক পত্রিকায় তা বার করবেন।

বাবা আমায় ডেকে এনে তাঁরই সামনে একটি চেয়ারে বসিয়ে বলেন,—ওকে জিজ্ঞাসা করুন আপনাদের শিল্প জগতের কথা—ওই আপনাকে সব বিষয়ে সাহায্য করতে পারবে বলে আমার মনে হয়।

তিনি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ বাবার মুখের দিকে, কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলেন,—ঠাট্টা করছেন ?

বাবা অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে বললেন,—ঠাট্টা নয়। পরে বুঝবেন,—আপনি ওর সঙ্গে আলোচনা করুন না। আচ্ছা বসুন ! আপনার চা পাঠিয়ে দি।

বাবা চলে গেলে তিনি কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে বললেন,—বলো কি বলবে।

আমি বললাম,—আমার বয়স তখন চোদ্দ বছর। আমি রাণী ভবানী স্কুলের ছাত্র। রাণী ভবানী স্কুলের গণ্যমান্যেরা খুব নামজাদা বংশের সন্তান। তাই, ইস্তক ঠাকুরবাড়ি অর্থাৎ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত আমার অবাধ গতিবিধি। আমি সংস্কৃত থেকে ইংরাজি পর্যন্ত সমস্ত গান গাইতে পারতাম। রেসাইটেশনও অদ্ভুত করতাম। ফলে রাণী ভবানী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা নাটোরের মহারাজা শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়ের বিশেষ নজরে পড়লাম।

জগদিন্দ্রনাথ সুন্দর পাখওয়াজ বাজাতেন। ঠাকুরবাড়িতে তাঁর অবাধ গতিবিধি। তাঁর সঙ্গেই প্রতি মাঘোৎসবে সেখানে গান গাইতে যেতাম।—শ্রীব্রজেন গাঙ্গুলী মশাই রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখাতেন এবং তা ঠিক হলো কিনা দেখে দিতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দীনু ঠাকুর মহাশয়।

মাঘোৎসবে যখন ফাংশন হতো, মনে হতো যে বৈদিক যুগেই বুঝি বসে আছি। কারণ এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে এই সঙ্গীত আয়োজন হতো যে তার রেশ দিকে দিকে প্রধাবিত হয়ে এক অনবদ্য সুরের মায়াজাল ছড়িয়ে দিতো। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা সে আসরে যেন ধ্যানমগ্ন মহাঋষির রূপ নিয়ে সমাধিস্থ থাকতেন।

ইত্যবসরে, সুন্দরীরা আমাদের নিয়ে একটু রঙ্গ রস !—একটু গা টিপুনি,

একটু ফিকে হাসি দিয়ে অন্যমনস্ক করে তুলতেন। তিন দিনের ফাংশনের এক মাস থাকতে চলতো মহলা। এই সময়টুকুতে তাঁদের হালকা হাসিতে, —গায়েপড়া চালচলনে আমাদের প্রায় প্রগল্‌ভ করে তুলতো।

তবু উপর ওয়ালাদের ভয়ে বা এঁদেরই মোহে আমরা নীরব থাকতাম। ফাংশনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে হতো। —রেশ থাকতো তার সারা বছর ধরে, পরবৎসরের আশাপথ চেয়ে!

শুনেছিলাম বৈদিক স্তোত্র পাঠ করতে করতেই এমনিতর গর্গ আর গার্গীর প্রেম হয়েছিল, সেই স্মরণটুকু এই দিনের অনুভূতি গুলিকে প্রগাঢ় করে তুলতো। জানি না, সে গার্গী বা মৈত্রেয়ীরা কার অঙ্ক-শায়িনী হয়ে আজ পুত্র পৌত্রদের জননী বা পিতামহী হয়েছেন।

এর পরের অধ্যায়—

ঐতিহাসিক বন্ধু হতবাক হয়ে আমার কথা শুনছিলেন। বললেন,— খোকা, তুমি নিজে এসব বলছো না, অতীতের পুরাতনী পাতা থেকে— কোনো লেখনী মুখস্থ করে আবৃত্তি করছো?

আমি বলি,—আবৃত্তি যদি মনে করেন তা-ই। তবু তো পুরাতনীর পাতা থেকে—

ঐতিহাসিক বন্ধু বলেন,—বেশ বলে যাও।

হ্যাঁ, দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো শ্রীযুক্ত চাঁদবাবুকে কেন্দ্র করে। ইনি কোনো এক প্রখ্যাত গায়কের বংশধর। এঁর বাড়িতে প্রতি বৎসর স্মৃতিবাসর সঙ্গীত সম্মিলনী বসতো তাঁর পিতার জন্মদিনে। সারা ভারতের সঙ্গীত গুণীরা নিমন্ত্রিত হতেন। তার সঙ্গে নিমন্ত্রিত হতেন সারা ভারতবর্ষের বাঈজী মহল।

শ্রীচাঁদবাবু আমার সহপাঠী ছিলেন। স্কুল ফাংশনে তিনি সুন্দর পিয়ানো বাজাতেন। কার্তিকের মতো রূপ ছিল তাঁর। বসনে ভূষণে সুরুচির পরিচয় দিতেন। আমাদের সঙ্গে পাঠ্যাবস্থাতেই তবলায় দিগ্বিজয়ী হয়ে উঠলেন। আমার সঙ্গে হরিহর আত্মা কারণ আমিও সঙ্গীতবেত্তা।

তাঁর বাড়িতেই আমার আড্ডা। তা ছাড়া স্মৃতিবাসর সঙ্গীত সম্মিলনীতে —যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ওঁর বাড়িতে মৌরসীপাট্টা করতেন। অবশ্য তাঁদের থাকার, থাওয়ার সুব্যবস্থা করতে ওঁরা

কার্পণ্য করতেন না। তাই, তাঁর বাড়িতে, আসবাগ হোসেন, মশিদ খাঁ, মীরজা আলি, গোকুল শ্রীচন্দন, হরিশ্চন্দ্র বালি প্রভৃতি বড় গুণীদের দিবারাত্র সমাবেশ ছিল। এ'দের পাশেপাশে কিছু শেখবারও প্রগাঢ় ইচ্ছা আমায় ওঁর ওখানে টেনে নিয়ে যেতো।

সেবারের আসরে এসেছেন তবলিয়া দরশন সিং—কাশী থেকে আর কলকাতার কুকুব খাঁ—স্বরোদী। এছাড়া আছেন বিশিষ্ট গুণী জ্ঞানী সঙ্গীতবিদ্‌রা। কদিন ধরে জদ্দান বাঈ, সরস্বতী বাঈ, প্রমুখ সুন্দরীশ্রেষ্ঠারা গান করেছেন। কিন্তু জমজমাট হলো সেদিন যেদিন স্বরোদ বাদ্যকর কুকুব খাঁ সাহেব আর পণ্ডিত দরশন সিং সভা জাঁকিয়ে বসলেন রাত দুটোয়।

কুকুব সাহেব আলাপ ধরলেন—শিউরঞ্জনীতে। ঘণ্টা খানেক আলাপের পর সুরে এসে পড়ার সময় শোনা গেল দরশন সিং-এর—"ধা"।

তারপর শুরু হলো গৎ তোড়া। কুকুব খাঁ সাহেবের গৎখানি একবার দুবার, তিনবার ঘুরে ঘুরে দেখান মুখড়া, কিন্তু দরশন সিং নিশ্চল বসে। সমের খেই খুঁজে পান না।

সভাস্থ সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ী করছেন। কুকুব খাঁর মুখে বিজেতার হাসি।

হঠাৎ, দরশন সিং ফেটে পড়লেন তবলার লহরা-তরঙ্গে। তার পর, ঘুরতে ঘুরতে এসে দিলেন ধা। কিন্তু, কুকুব খাঁ তখনও বাজিয়ে চলেছেন। তাই সেই ধা-এর উপর থেকে চক্রধার গতের গতিতে ছন্দ তুলে দরশন সিং দিলেন সাতাশটি ধা। বাজনাও শেষ—চক্রধার তেহাইও শেষ—দুইটির সমন্বয় থেমে যায় বাজনা। সভা সচকিত হলো। শ্রোতারা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো—বহুত আচ্ছা—বাহবা!

কুকুব খাঁ পর্যন্ত দরশন সিং-এর তারিফ না করে পারলেন না।

আবার খাঁ সাহেব স্বরোদ বাগিয়ে ধরেন। কিন্তু পণ্ডিত দরশন সিং স্তব্ধ হয়ে নিশ্চুপ বসে। মুখে তাঁর তখনও ফুটে আছে বিজেতার স্মিত গৌরবের হাসি। হাত দুটি শেষ ধা-এর ভঙ্গীটুকু রক্ষা করে নিশ্চল। কুকুব খাঁ সাহেব পণ্ডিতজীর গায়ে একটি ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বলেন,—বাজাইয়ে না পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজীর দেহ সেই ধাক্কায় আসরে লুটিয়ে পড়লো। সভায় সবাই ত্রস্ত ভীত। সঙ্গে সঙ্গে—জল, জল জল—চীৎকার।

চক্রধার ধা-এর সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিতজীর প্রাণবায়ু যে নিঃশেষিত হয়েছে তা কেউ বুঝলেন না।

কিন্তু, পণ্ডিতজীর কোনই সাড়া শব্দ নেই। সঙ্গত যখন সমসঙ্গতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যোগ সূত্র রচনা করে তখনই—বাইরের সমস্ত সম্বন্ধ যে বিয়োগের পর্যায় পর্যবসিত হয় তা প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা কঠিন।

এর পর কি হলো জানেন?—পুলিস হাঙ্গামা। সেটা অবশ্য চাঁদবাবুর বাড়ির কর্তারাই মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু এবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—আমিও ঐ রকম কথাই শুনেছিলাম। যাক্—তাহলে কাগজ কলম নিয়ে বসি, তুমি যতদূর পারো বলে চলো।

আমি বললাম,—তারপরের বছরও হলো এই স্মৃতিবাসর সম্মিলনীর। এবার স্বরোদ বাজাতে এসেছেন গোয়ালিয়র থেকে হাফেজ আলি খাঁ—তাঁর সঙ্গে নিমন্ত্রিত হয়েছেন বিখ্যাত তবলিয়া আবেদ হোসেন। কাশীর প্রখ্যাত বীরু মিশ্রও এসেছেন গানের সঙ্গে সঙ্গত করবেন বলে। এছাড়া যন্ত্রী হিসাবে হারমনিয়ম বাজিয়ে রফিক এসেছেন। আর এসেছেন গায়িকার দল—সরস্বতী বাঈ, জদ্দান বাঈ, আখতারি বাঈ ওয়াহিদন্‌বেগম প্রভৃতি। বিশেষভাবে আনা হয়েছে আগ্রউলি মুস্তরী বাঈকে। ইনি নাকি আজমীঢ় সরীফের দরগায় 'সিধ' লাভ করেছেন। 'সিধ'-লাভ অর্থে—সঙ্গীতে সিদ্ধি লাভ করা। তারকেশ্বরে যেমন অনেকে হত্যা দেয়—তেমনি সরীফের দরগায় গানের জন্যে হত্যা দিয়ে সিদ্ধি লাভ করতে হয়। কেউ করে ২১ দিন, কেউ করে ২৭ দিন, কেউ ৪৫ দিন,—আবার কেউ করে বাৎসরিক—অর্থাৎ যতক্ষণ না আজমীঢ়ের পীরের স্বপ্নাদেশ হচ্ছে যে তুই 'সিধ'।

মুস্তরী যে সিদ্ধিলাভ করেছেন তা তাঁর গানে, ভাবে, চলাফেরায় সম্পূর্ণ বোঝা যাচ্ছে। মুস্তরী চাঁদবাবুর বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছেন। বাইরের একটি খাস কামরায় ওকে রাখা হয়েছে।

তাঁর আসরের কসরতি দেখার পূর্বে আমরা তাঁর চারিদিক ঘিরে বৈঠকখানায় জলসা রচনা করেছি। সত্যিই কোকিলকণ্ঠী—গাইতে গাইতে মহিলা নিজে যত কাঁদেন শ্রোতাদেরও তত কাঁদান। অথচ কেন কাঁদছেন আর যাঁরা শুনছেন তাঁরাই বা কেন কাঁদছেন কেউ বলতে পারে না সে কারণ। সুরের বিকাশে যেমন তাঁর নিজের চোখ থেকে জলের ধারা বেয়ে পড়তো তেমনি শুনতে শুনতে শ্রোতাদের দুচোখেও অশ্রু বন্যা বয়ে যেতো!

আসরে তাঁর গান শুনে গুণগ্রাহী শ্রোতাদের মনও সুরের মূর্ছনায় দিব্যভাবে

এমনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে সে বছর আর কারো গানে তাঁরা আনন্দ পাননি। সে বছর হরিশ্চন্দ্র বলি সাহেবও তেমনি সুরেলা গেয়েছিলেন। স্ত্রী পুরুষের দুজনেই সুন্দর ও সুশ্রী দর্শন। কণ্ঠ দুজনেরই অপূর্ব মধুর—যেন দুটি বস্‌রাই বুল্‌বুল্।

মুস্তরী বাঈ-এর এ সম্মান সমস্ত বাঈজী মহলেব কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো। প্রতিহিংসাপরায়ণা বাঈজী মহল জানতেন যদি একবার এই মহিলার দেবকৃপা হতে পদস্খলন না হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে সমকক্ষ হওয়া বাতুলতা মাত্র। তাই, একটি প্রাইভেট জলসা বসল চাঁদবাবুব এক অনুগতার বাড়িতে। বিশিষ্ট মাইফিলকারিণীর দল নিমন্ত্রিত হলেন। সে রাতে পারিপার্শ্বিকে দাঁড়িয়ে দেখলাম ভগবানের দরজায় আত্মসমর্পিতা এই মুস্তরীর দেবত্বটুকু ঘোচাতেই এই মাইফিলের একমাত্র প্রয়াস। যথাসময় আমরা মুস্তবীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রায় রাত তিনটা পর্যন্ত গান হলো। তারপব চাঁদবাবুর গাড়িতেই আমরা তাঁর বাড়ি ফিরে এলাম কিন্তু ফিরলেন না চাঁদবাবু আব মুস্তরী বাঈ। কোথাব তাঁরা গেলেন জানি না।

তার পরদিন সভায় মুস্তরী বাঈএর গান শুনে এইটুকু বুঝলাম যে শেষ হয়েছে মুস্তরীর দেবত্ব। গতকালের মুস্তরী বাঈ মৃতা—তাঁর সে অশ্রুবন্যাবাহী কণ্ঠ কোথায় গেল? আজ শ্রোতাদেব চোখেব জলই বা কোথায় শুকিয়ে গেল? বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম এক রাত্রে এত পরিবর্তন। যাঁব কৃপাধারায় গায়িকা আর শ্রোতা মহলে উঠেছিল প্রেমাশ্রুর অন্তরস্পর্শী ঢেউ সে তরঙ্গ আজ যেন চাঁদবাবুব কামাগ্নি স্পর্শে কর্পূরের মতো ধক্ কবে জ্বলে গিয়ে শূন্যাকাশে মিলিয়ে গেল।

আজ, হরিশ্চন্দ্র বালি মুস্তরীর গত-দিনের জলসার সমস্তটুকু নিঙড়ে ঢেলে দিলেন। তাঁর কণ্ঠ সুধায় বার বাব গতদিনের দেবকৃপা-সাধিকা মুস্তরীর কথাই স্মরণ করিয়ে দিলো—কিন্তু—

সজল হয়েছে আজও শ্রোতাদের চোখের পাতা কিন্তু সে কি হরিশ্চন্দ্র বালির গানে? না, সর্বহারা মুস্তরীর সঙ্গীত বিলাপে? আজ মুস্তরীর শেষ গান হলো শুধু বিলাপ!

তাঁর শেষ গান বোধহয় সেই বছরই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা পর বৎসর মুস্তরীকে নিমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে শোনা গেল যে মুস্তরী আর ইহলোকে নেই।

তিন

হাঁপিয়ে গেছি বলতে বলতে। ইতিমধ্যে চাকরকে দিয়ে কিছু জলখাবার ও চা নিয়ে বাবা ঘরে ঢুকলেন। মৃদু হেসে ঐতিহাসিক বন্ধুকে বললেন,—নিন, ততক্ষণ চা টা খেয়ে নিন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—যা খোকা, তোর মা তোকে ডাকছে।

আমি উঠলাম।

বাবা তাঁর বন্ধুর কাছে ততক্ষণ বলছেন,—**Is he not interesting?**

উত্তর শুনতে পেলাম,—**Very much.**

বুঝলাম আমার সম্বন্ধেই কথা হচ্ছে। পা পা করে এগিয়ে গেলাম মায়ের সন্ধানে।

মা ডাকছিলেন দুধ খেতে।

এক চুমুকে বাটিটা খালি করে দিয়ে ছুটে এসে বাবার ঘরে ঢুকলাম।

তখন তাঁর ঐতিহাসিক বন্ধু বলছেন,—দুধ খাওয়া হয়েছে?

আমি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম।

তিনি বললেন,—খোকা তাহলে আপনার কাছেই থাক। আমি একটু গিন্নীকে নিয়ে ঘুরে আসি, Say, আধ ঘণ্টাটাক।

তিনি সম্মতি জানালেন। বাবা চলে গেলেন।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু এবার আমায় কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—তুমি খুব সুন্দর গল্প বলো তো।

অবাক হয়ে বলি,—গল্প কি গো? এযে সব সত্যি ঘটনা!

সেবার পুজোর সময় গিয়েছিলাম বেনারসে। কাশীর চৌখাম্বার মিত্র বংশের জামাই শ্রীযুত এস বসু ছিলেন মিত্তির বাড়ির জামাই। কাশীতে মিত্তির বাড়িতেই তিনি থাকতেন। তাঁর মহল ছিল আলাদা। তাঁর বড় ছেলে অজিত ছিল আমার বন্ধু।

মিঃ বোস ছিলেন সেকালের নাম করা বীণ্‌কার। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক

কনফারেন্সের অধিবেশন যেবার লক্ষ্ণৌতে হয়েছিল, তিনি হয়েছিলেন তার অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী।

কাশী পৌঁছে অজিতের বাড়িতেই উঠেছি। অজিতের মহলটা যেন একটা আলাদা বাড়ি। বৈঠকবাড়ি, অন্দর মহল—সবই আলাদা।

চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ির দুর্গাপূজা ছিল কাশীর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সারা বাংলাদেশের চেঞ্জাররা যেতেন ঐ পূজা দেখতে।

ভোরে ঘুম ভেঙে শুনতে পেলাম সানাই। এত সুন্দর সানাই যেন ত্রিভুবনে শুনিনি। অজিত আর আমি এক বিছানায় শুয়ে। শুয়ে শুয়েই নহবত শুনছিলাম। সানাইয়ে 'আহীর-ভৈরব' বাজছিল। যেন সুরে সুরে চারিদিকে মায়াজাল ছড়িয়ে দিচ্ছিলো।

অজিত বললে,—বিসমিল্লা বাজাচ্ছেন।

আমি বললাম,—বিসমিল্লা ? পূজা বাড়িতে ?

অজিত বলল,—পূজা বাড়ি বা বিয়ে বাড়িতে বাজাবার জন্যে বিসমিল্লা সানাইএ ফুঁ দেয় না। এ শুধু বাবার অনুরোধে।

বিছানা ছেড়ে দুজনেই উঠে পড়লাম। শুনলাম, আজ নাকি সমস্তদিনের প্রোগ্রাম সেট্ হয়ে আছে। নহবতের পরই শ্রীবসু বাজাবেন বীণ্—রুদ্রবীণা।

পূজার দালানের সামনে মস্ত আসর করা। স্নান করে সেইখানে উপস্থিত হলাম। তখন শ্রীবসু বীণের আলাপ শুরু করেছেন। পাশে বসে আছেন 'থরকুয়া'—সঙ্গত করবেন বলে।

টোড়ীর পর্দায় ঘা পড়েছে। সারা পূজাঙ্গনে যেন আবাহনীর মূর্ছনা ঘুরে ঘুরে পাক খাচ্ছে। ক্রমে দ্রুত লয়ে শুরু হলো গৎতোড়া। থরকুয়ার হাতে তবলা বাঁয়া সত্যিই থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠলো। ধা তি নাড়া যে অত মধুর হতে পারে তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। বাঁয়ার অস্ফুট 'বুম্‌বুম্' যেন বীণার পর্দাকে অনুকরণ করে সপ্ত সুরেই প্রকাশ পাচ্ছে অনবদ্য ভাবে।

আসর জমজমাট—

এমন সময় দূরে একটি অসামান্য সুন্দরী আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকলেন আমি উঠে পাশের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘরের মধ্য থেকে স্ত্রীকণ্ঠে শোনা গেল,—অন্দর আইয়ে না।

ভিতরে গিয়ে দেখি, ওয়াহিদন বেগম। ওয়াহিদন বাঈ হচ্ছেন চিত্র-শিল্পী নিম্মির মা। নিম্মি তখন জন্মেছিল কিনা মনে পড়ছে না।

চাঁদবাবুর বাড়িতেই আমার সঙ্গে ওয়াহিদনের প্রথম পরিচয়। ওয়াহিদন আমার এখানে আগমনের কারণ জেনে নিলেন।

আমি বললাম,—তুমি এবার গাইবে নাকি?

পাশের এক প্রৌঢ়া নারীকে দেখিয়ে তিনি বললেন,—না আমি না। ইনি গাইবেন।

প্রৌঢ়া এককালে সুন্দরী ছিলেন। আজ বিগতযৌবনা। তবু তাঁর ডাগর চোখের কোলে সুরমা টানতে ব্যস্ত।

ওয়াহিদনের কথায় ফিরে চাইলেন।

ওয়াহিদন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন,—বড়া গুণী আদমী হ্যাঁয়।

পরিচয় জানলাম, উনি কাশীর বিখ্যাত বাঈজী শ্রীমতী বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধরী আমার পানে চেয়ে রইলেন—ওয়াহিদান বললেন,—উন্‌হোনে বাংলা গানা ভি লিখতে হ্যাঁয়?

জোড়হাত করে নমস্কার জানাই।

বিদ্যাধরী বলেন,—তব্ তো বুঢ়ামঙ্গল-মে, ইস্ বরষ ম্যায় বাংলা গানা হি পেশ করুঙ্গী। কিউঁ বাবুজী, শিখায়েঙ্গে না?

আমি সম্মতি জানালাম।

বীণের ঝঙ্কার থামলো। এবার আসরে গিয়ে বসলেন বিদ্যাধরী।

এই প্রৌঢ়া বয়সেও তাঁর গলার জুয়ারী যেন সারা বৈঠক-বাড়ির শার্সির কাঁচ-গুলিকে রণিত করে তুললো। হ্যাঁ, গলা বটে! যেমন চড়া তেমনি সুরেলা।

গান শেষ হলো প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে। গান হলো খেয়াল, টপ্ খেয়াল আর ঠুংরী।

প্রায় দেড়টা বাজে। এবার খাবারদাবার পালা। ভিতর থেকে ডাক এসেছে—এমন সময় বিদ্যাধরী ডাক পাঠালেন।

অজিতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ঘরে পৌছলাম।

বিদ্যাধরী বলেন,—অজিত সাহেব, আপকা দোস্ত কো লে কর্ মেরা ঘরপর্ আতে—ইয়ে নহি? শুনা, আপকো দোস্ত্ বাংলা গানামে বহুত ওস্তাদ।

অজিত বলল,—ওস্তাদ-টোস্তাদ নয়, তবে বড় ভালো গান রচনা করে আর, সঙ্গে সঙ্গে সুর যোজনাও করে।

বিদ্যাধরী বললেন,—কুছ রাগকা উপর—ইয়ানে আগর ম্যায় কুছ ধুন জিগর্ করু তো—উসপর্ গানা বানা সেক্‌তা হ্যাঁয়?

অজিত বলে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তা করে দেবেখন।

বিদ্যাধরী বলেন,—তব্ সামকো মেরি গরীবখানামে জেরা কদম আগর পড়ে তো—

অজিত বলে,—কাল সকালে বরং নিয়ে যাবো। আজ রাতে হুস্নে বাঈ আর ওয়াহিদন বেগমের গান আছে তো!

বিদ্যাধরী জবাব দেন,—ঠিক্। তবে উহি বাত রহ্‌গয়ী।

রাত্রে আশী বছরের হুস্নে বাঈ-এর গান শুনলাম। দেখতে যেন কাল-কোকিল। কণ্ঠও তাই। তবে মাঝে মাঝে বার্ধক্যের ছাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো।

ওয়াহিদন গাইলেন ঠুংরী। তাঁর রূপে গুণে আসর জমজমাট।

পরদিন সকালে উঠেই অজিত তাড়া দিয়ে আমায় নিয়ে চললো কবীর চৌরাতে। ওখানেই থাকতেন বিদ্যাধরী।

বিদ্যাধরীর বাড়িতে আদব কায়দা শেষ করে গানের মজলিসে বসা গেল।

বিদ্যাধরী জয়জয়ন্তীর উপর একটি গজল গাইলেন—'দামুগেসুঁ দিল ফাঁসাদে'। এই ধুনটির উপর আমায় গান লিখতে হবে। বুঢ়ামঙ্গলে এই গানে বিদ্যাধরী সবাইকে হতচকিত করে দেবেন।

বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। ওঁর মুখের সুর শুনে শুনে লিখলাম—

'বাজে না—বাজে না আর শ্যাম বেণু মধু-রাতে।
তোলে না—তোলে না সে গান, আজ ঘুমায়ে অতীতপাতে॥

অজিত বাংলার মানেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিলে। তারপরই আমারই সামনে আমার রচিত গান এমনি এক শ্রুতিসুখকর সম্পদ হয়ে উঠলো যে ভাষায় তা আমি বলতে পারি না।

সর্বশেষে বিদ্যাধরী আমায় বললেন,—বুঢ়ামঙ্গলমে মেরে কিস্তি পর্ আপকো হামারি সাথ রহেনে পড়েগা।

অজিত সম্মত হলো।

বিদায় নিয়ে, সাথে আসতে আসতে বুঢ়ামঙ্গলটা যে কি অজিত আমায় বুঝিয়ে দিলে।

বুঢ়ামঙ্গলটা নাকি গঙ্গাবক্ষে নৌবিহারে নটী সম্মিলনী। উত্তর ভারতের

প্রায় সমস্ত নামজাদা বাঈজীরাই বজরা ভাড়া করে—একমাস গঙ্গাবক্ষে নৌবিহার করেন, এবং প্রতি দণ্ডে এক একটি সময়োপযোগী রাগ শোনান। একটি রাগের শেষে অপর নৌকা থেকে আর একজন তার জবাবী রাগ শোনাবেন। এমনি করে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দিনরাত গানের রাগ-চক্র ঘুরে বেড়াবে মাসাবধি। একটি রাগ এই উৎসবে দুবার শোনাবার রীতি নেই।

এই অপূর্ব, অনাস্বাদিত, অচিন্ত্যনীয় সঙ্গীত জলসা আমার জীবনে শুনিনি। তাই অস্থির হয়ে অজিতকে বললাম,—কবে শুরু হবে?

অজিত বললে,—কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে। এটা বন্ধ হবার কথা হয়েছিল। কিন্তু এবারটা নাকি সমস্ত বাঈদের মিলিত আর্জিতেই এটা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর আর হবে কিনা সন্দেহ।

আমি বললাম,—এমন একটা সঙ্গীত-সম্মিলন বন্ধ হবার কারণ?

অজিত বললে,—বড্ড ভিড় হয় শ্রোতাদের। কাশীর দুই পাড়ে লোকে লোকারণ্য হয়। এ ছাড়া বোট নিয়ে সব আমীর ওমরাওরা এই নৌ-বিহারের পিছে দৌড়ায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিবারই গুণ্ডামি, রাহাজানি, মারামারি, লোকক্ষয়—সবই ঘটে যায়। তাই, পুলিস থেকে এটা বন্ধ করার আয়োজন চলেছে আজ পাঁচ বছর। কিন্তু, রামনগরের রাজা ও কাশীর রাজার প্রচেষ্টায় শুনছি এবারও পারমিশন পেয়েছে।

পূর্বকালে বড় বড় ধনী শেঠীরা, এই নৌ-বিহারে স্ব স্ব নটীদের দিয়ে গান আর নাচের কম্পিটিশন দিতেন। এখন রয়ে গেছে বাঈজীদের নিজের খরচায় নৌ-বিহার সঙ্গীত সম্মিলন। অবশ্য এর পিছনে বহু ধনীরই অর্থসাহায্য আছে।

আমার মনে হলো এই সঙ্গীত সম্মিলন বুঝি শুধু আমারই জন্য তার শেষ অভিযান করবে এই বৎসর।

যে রাত্রে আমরা বজরায় উঠলাম, রাত্রের অন্ধকারে যতদুর চোখ যায় গঙ্গার জলের অংশমাত্রও চোখে পড়লো না! এ যেন এক বিরাট নৌবিহারের স্রোতযাত্রা।

নিঝুম রাত্রি। শুক্লা চতুর্দশীর রাত্রি। আকাশ পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন সাদা মেঘ আকাশ যেমন ভরিয়েছে, নীচে নদীবক্ষে তেমনি সব সুসজ্জিত বজরার দল পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম না করে শুধু স্থান নির্বাচনে সারা জলের বুক ভরিয়ে তুলেছে।

জল নেই, অথচ দোদুল্যমান বজরা—শুধু নীচের জলের অস্তিত্বটুকুকে সজাগ রেখেছে।

রাত দশটার পরই দলে দলে বুঢ়ামঙ্গলের মাইফিলকারিণীরা যে যার বজরায় পদার্পণ করেছেন। অদূরে দশাশ্বমেধ ঘাটের চত্বরে বাজছে—সানাই। বুঢ়ামঙ্গলের দরবারী আড়ম্বরের প্রতীক্ষায় দরবারী কানাড়াতে কোমল গান্ধার আর নীচের কোমল ধৈবতে মোচড় দিচ্ছে।

উপরে আবছায়া চাঁদনীর আলো, তার সঙ্গে রাগিনীর প্রতি মূর্ছনাটুকু যেন, স্বপ্ন রচনা করছে! এক নিরালম্বপুরীতে মন তখন ঝুলছে।

পরদিন ঊষালোকেই শুরু হবে বুঢ়ামঙ্গলের মহা-সম্মিলনী-সভা। প্রধান বজরাকে কেন্দ্র করে সব বজরাই পরিক্রমা করছে।

প্রধান বজরায় অবস্থান করছেন এলাহাবাদের বৃদ্ধা প্রখ্যাতা 'ছাপ্পানছুরী'—যার দেহের উপর দিয়ে তাঁর রূপমুগ্ধজনদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বাক্ষরস্বরূপ ছাপান্নবার ছুরিকা-ঘাত দুর্জয় বিক্রমে চলে গিয়েছে—তবুও তাঁকে ঘায়েল করতে পারেনি। তাই, সৌন্দর্যে ও গলার কসরতিতে তাঁর সমকক্ষা আজও এই নটীমহলে কেউ নেই। তিনি অপরাজিতা হয়েই রয়েছেন। খালি "কা-ল" তাঁকে বৃদ্ধা করেছে, তাই তাঁর অমিতবিক্রমেও ভাঁটা পড়েছে।

কাল ঊষালোকে রামনগরের রাজভবন থেকে তোপের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ছাপ্পানছুরী জানকী বাঈএর উদ্বোধনী—ললিত রাগিণীতে আলাপ,—তাঁকে অনুসরণ করবেন কলকাতার তৎকালীন বিখ্যাত সুন্দরী ও গায়িকাশ্রেষ্ঠা গহরজান বাঈ—খেয়াল ও ঠুংরিতে। এইটুকু প্রোগ্রাম সংগ্রহ করেই আমরা বুঢ়ামঙ্গলের যাত্রা শুরু করেছিলাম।

আলোকমালা সজ্জিত বজরাগুলি চাঁদের আলোয় গা ভাসিয়ে নীরবে রাতের ময়ূরের মতো, শবরীর প্রতিক্ষায় ক্ষণ যাপন করছে।

রামনগর রাজবাড়ির রাত বারটার প্রহর-ঘণ্টা শোনা গেল।

পাশের নৌকাগুলির মতো বজরার ছাতের মাথায় মাথায় আশ্রয় নিয়েছেন সারেঙ্গী ও তবলা বাদ্যকাররা—আর, নীচে বসার ঘরে আমরা। তারই অন্দরের কাঁচকাঠি ও পুঁতির লম্বা পর্দা ঠেলে বিদ্যাধরীর খাস-কামরা। তিনি ও তাঁর চারজন পারদর্শিনী সঙ্গিনী তারই মধ্যে এবার আশ্রয় নেবেন।

বজরার ছাতে বসেই, বিদ্যাধরী এতক্ষণ ধীরে ধীরে আলোচনা করছিলেন—

উত্তর ভারতের কার কার আসার কথা। তাঁর আলোচনার মাধ্যমে খবর পেলাম কলকাতা থেকে—গহর, নূরজাহান, মালকাজান, নূরজাহানের বোন মকবুমান বাঈ, আসবেন। রামপুরের নবাবের কিস্তিতে মকবুমান ও নূরজাহান বাঈ থাকবেন। জদ্দান বাঈও এসেছেন কলকাতা থেকে। ইনি গিট্‌কিরির কাজে মুক্তা ছড়িয়ে দেন! এরই কন্যা পরবর্তীকালে নার্গিস নাম নিয়ে বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী হয়েছিলেন।

শুনলাম জদ্দান বাঈএর বজরায় আমার বন্ধু চাঁদবাবুর বড় ভাই মেজভাই এবং জদ্দান বাঈএর শোওহর মোহনবাবুও এসেছেন। এঁরা সবাই আমার জানাশোনা। তাই, ভাবলাম, বুঢ়ামঙ্গলে থাকাকালীন আরও একটা ঘাঁটি আমার জুটেছে।

লক্ষ্ণৌ থেকে এবার আসছেন আখতারি ছোট, ওয়াহিদন বেগম, আমীনা বাঈ প্রভৃতি। পুণা থেকে সরস্বতী বাঈ প্রমুখ তৎকালীন যশস্বিনীরা।

তবে সমঝদার গায়কের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন কেবলমাত্র আবদুল করিম খাঁ সাহেব। ইনি এঁর বড় মেয়েকে নিয়ে এই সম্মিলনীতে গান শোনাতেই এসেছেন। নাম তাঁর হীরা বাঈ—পরে 'বরোদকার' হয়েছেন।

যাক, বহু আলোচনার পর যবনিকা পড়লো এই রামনগরের প্রহর-ঘণ্টায়। সভা ভঙ্গ করে যে যার জায়গায় শোবার যোগাড় করা হলো।

ঊষার আলোক ফোটার আগেই রামনগরের রাজার তোপ গঙ্গার দু'কিনার প্রতিধ্বনিত করে কেঁপে উঠলো। যারা জাগবার তারা তার আগেই প্রস্তুত। আর বাকি যারা, তারা কেবল সজাগ হয়ে ওঠে—ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করার চেষ্টা করে।

ইতিমধ্যে তানপুরার ধ্বনি দূর হতে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। কিস্তিগুলা হাওয়ার গতি অনুসরণে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সবারই মাঝিমাল্লারা হাওয়ার গতি অনুসরণে ব্যস্ত। তাই, নৌকায় নৌকায় মাঝে মাঝে মৃদু ঘর্ষণও শুরু হয়েছে। হাওয়ার গতি অনুযায়ী নৌকা জায়গামতো না রাখতে পারলে গায়কী-নৌকার সংগীত, হাওয়ায় অন্যত্র ভেসে যাবে। তাই জলস্রোতে কিছু হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে।

ক্রমেই স্বর শোনা গেল। ছাপ্পানছুরী জানকী বাঈএর কণ্ঠে 'ললিত আলাপ' ক্রমেই শ্রুতিগোচর হলো। হোক বৃদ্ধা, তবু তাঁর কণ্ঠের সুরমাধুরীতে গঙ্গাবক্ষে

উষালোকের যেন জাগরণ এনে দিচ্ছে! সঙ্গে তাঁর দু'তিনজন শিষ্যা দোয়েলের মতোই সে আলাপনের গীতানুসরণ করে চলেছে। মাঝে মাঝে পাখ্ওয়াজের ধা যেন উষার স্বপ্নভঙ্গ করে দূরের তিমিরাবরণ ছিন্ন করে দিচ্ছে। সে অনুভূতি গঙ্গাবক্ষে শীতল শরতের বাতাসে ঘন ঘন শিহরণেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সম্বিতে ফিরে দেখি যেন গঙ্গাবক্ষের এই সহস্র নৌ-বাসিনীরা সবাই স্তব্ধ—এমন কি মাঝিমাল্লারা পর্যন্ত কিসের আকর্ষণে সুরময় হয়ে মৃদু মৃদু দুলছে। সবাই আত্মহারা। আমার মনে হলো আমি শুধু আত্মহারা নই, চিত্ত-হারা।

হঠাৎ দক্ষিণ পাশের বড় বজরা হতে 'ভাঁয়রোর' তান উঠতে লাগলো—যেন শত ফোয়ার-উৎসের মতো।

অজিত বললো,—গহরজান শুরু করেছেন।

তখন কিন্তু অরুণোদয় শেষ হয়ে বালসূর্যের প্রথম কিরণ দূর গঙ্গার জলে প্রতিভাত হয়ে সব কটা বজরাকেই রঙিন করে তুলেছে।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। স্বপ্ন-ভঙ্গে তিনি বলে ওঠেন,—Wonderful! এ তুমি আমায় কোন্ স্বর্ণযুগে নিয়ে গেছো খোকা? বল, বল, থেমো না।

আমি বললাম,—স্বর্ণযুগই বটে। স্বর্ণ-যুগের সংস্কৃতির আলোকরশ্মি জন-সাধারণের সূক্ষ্মতম অনুভূতির সূত্রগুলোকে তার কিরণছটায় মেজে ঘষে এমনি উজ্জ্বল করতো যে, তাতে কোনদিনই কালের পঙ্কিল আবরণ পড়তে পারেনি। তা সততই সমুজ্জ্বল—যেন নিকষিত হেম, যেন হীরকের স্বর্তঃ স্ফূর্ত উজ্জ্বল প্রভা।

আপনাকে আজ সেই পুরোনো যুগের বুঢ়ামঙ্গল-সম্মিলনীর কথা বলছি। আপনি স্তম্ভিত—হতবাক। অথচ, শুনেছিলাম যে পূর্বতন আয়োজনের কাছে শেষের এই সম্মিলনী নিতান্তই তুচ্ছ!

তবু তার নির্মল আনন্দটুকু উপভোগ করবার জন্যে কাশীর গঙ্গার দুই পারে অগণিত জনমণ্ডলী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের আসনাদি জপতপ ছেড়ে এই সংগীত-পূত জাহ্নবী-সলিলে অবগাহনে ব্যস্ত। সত্যি স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে আজ যেন তা মূর্ত হয়ে মর্তে নেমে এসেছে—এই কাশীধামে। তাই, লক্ষ লক্ষ পূজারী হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কুতূহলী কর্ণের তৃপ্তি সাধনে।

চারদিন ধরে ক্রমান্বয়ে সংগীতের কূট তানে তানে গঙ্গার উন্মত্ত লহরী হয়েছে মাতাল, তবু যেন তৃপ্তি নেই, আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই—উন্মাদনার অবলেশটুকু মনের দেউলে অস্ফুট আবেদনে আছাড় খেয়ে বলছে—এ যেন ফুরিয়ে না যায়—ফুরিয়ে না যায়।

পাঁচ দিনের দিন সকালে আমি জদ্দান বাঈএর কিস্তিতে গিয়ে হাজির হই।

সেদিনের সন্ধ্যার পর হঠাৎ বিদ্যাধরীর নৌকা হতে অনবদ্য কণ্ঠে বাংলা রচনার 'জয়-জয়ন্তী' গজল কে যেন আনমনে গেয়ে উঠলো। পারের লোক সজল চোখে চেয়ে দেখলো ঐ নৌকার পানে। যেন প্রাণের আবেগ নিঙড়ে নিঙড়ে সারা বৃন্দাবন-মথুরার অলিগলি, কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজে ফিরছে সেই কণ্ঠ, বেদনার মূক বাণী সংঘাতে—

বাজেনা বাজেনা আর শ্যাম বেণু মধু-রাতে।
তোলে না তোলে না সে গান, আজ ঘুমায় অতীত পাতে॥

আমারই রচনা—অথচ সেই ললিত কণ্ঠের আবেদন শুনে মন বলছে—যে সে গান আজও জাগ্রত—কৈ ঘুমায় নি ত? প্রাণের সুরে সে জেগে রয়েছে বর্তমানের প্রতিটি শ্রোতার অন্তরে।

এই মর্মস্পর্শী আবেদন শেষ না হতেই আকাশ হতে ঝির্ ঝির্ ধারে বৃষ্টি নামলো। 'নান্থী, নান্থী বুঁদো কি ফুয়ার'—এ যেন তৃষিতের বুকের আক্ষেপিত তৃষ্ণার প্রাণ জুড়ানো বারি;বিন্দু!

অবসর বুঝে, আমাদের নৌকা থেকে জদ্দান বাঈ হঠাৎ তার জবাব দিয়ে বাংলায় গেয়ে ওঠেন—

এলোরে—এলোরে বাদল!

এলোনাত' শ্যামরায়
পুবালীর দোলনায়!

সর্বজন বিদিত 'নাহি আওয়ে ঘনশ্যাম' ঠুংরিটির বাংলা সংস্করণ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে জদ্দান বাঈয়ের গান যেন শেষ হয় না। যত তাঁর গানের প্রতিছত্র, প্রতি অক্ষর, প্রতি অনুভাবের বিশ্লেষণ ততই তাঁর তানের 'নান্থী নান্থী ফুয়ার'। শ্রোতার চোখে মুখে যেন তানের স্ফটিকবিন্দু ছিটিয়ে ছিটিয়ে ছুঁড়ে মারছেন।

আমার বুকের মাঝখানটায় আজ কিসের স্পর্শে যেন উন্মত্ত ময়ূরের মতো

নাচতে থাকে। এ যে আমারই লেখা গান কলকাতায় জদ্দানকে লিখে দিয়েছিলাম এমনি এক বাদল সন্ধ্যায় !

বৃষ্টির মৃদু ধারা এই বিরাট সম্মিলনীর দর্শক ও শ্রোতাদের যেন কিছু ত্রস্ত করেছিল। তাই সময়োপযোগী এই ছন্দভঙ্গের মাঝে নতুন ছন্দোক্ষেপ তার ভয় দূর করে শ্রোতাদের যেন আরও সজীব করতে লাগলো। বিরাট সম্মিলনীর এ যেন বিরাম ক্ষণ-! এরই মাঝে বাংলা ভাষায় রচনা করা এ দুটি গান যেন নতুন ছন্দ তোলার আয়োজনে সহায়তাই করলো।

শুরু হোলো পূর্ব অধিবেশনের পুনারম্ভ-লক্ষ্ণৌ-ওয়ালী আখতারির পূর্ণ-খেয়াল রাগ নটনারায়ণ গানের বিলম্বিত বিস্তারে।

বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। স্মিত হেসে বললেন,—রাত অনেক হলো। আজ ওঠা যাক্, আবার একদিন হবে।

বাবার কথায় তাঁর ঐতিহাসিক বন্ধু লজ্জায় পড়েন। সত্যি ত, শুনতে শুনতে রাত অনেক হয়েছে। বেচারী ছোট ছেলে। তাকে এভাবে বকানো উচিত হয়নি—এই সব বোধকরি ভেবে তিনি বলে ওঠেন,—সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। এবার উঠে পড়ি। কিন্তু সত্যিই **interesting** ! এত **interesting** যে বাহ্য জগৎ যেন ভুলে বসেছিলাম। **Any away**, আবার আসতে হবে কিন্তু।

বাবা বললেন,—নিশ্চয়ই আসবেন।

আমি বলি,—বুঢ়ামঙ্গলে কিন্তু আমি মাত্র আর সাতদিন থাকতে পেয়েছিলাম। কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে আমায় চলে আসতে হয়েছিল। কাজেই ও অধ্যায়ের ওইখানেই শেষ।

তিনি হেসে বিদায় নিলেন।

চার

আর একদিন !

১৯২৩ সালেই আমার বাবা মারা গেলেন—

এরপর আমার স্বাধীনতার মাত্রাটা কিছু বেড়ে গেল। অর্থাৎ যে সঙ্গীত শিক্ষা ছিল এ পর্যন্ত পাপের খাতায় লিপিবদ্ধ, সেটা কিছুটা মুক্তি পেলো এই স্বাধীনতার নতুন হাওয়ায়।

ঐতিহাসিক ভদ্রলোক বললেন,—কেন, সে সময় কি গান বাজনা শিখলে পাপ মনে করতেন তোমার বাড়ি ?

আমি বললাম,—শুধু আমার বাড়ি কেন, সবাই তখন ছিল এই সংস্কারগ্রস্ত। ছেলেরা লেখাপড়া ছেড়ে গানবাজনা নিয়ে মেতে উঠলে মনে করতেন, ছেলে জাহান্নমের পথে পা দিয়েছে। কাজেই আমরা গান শিখেছিলাম অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে লুকিয়ে।

আমার বেশ মনে পড়ে, শ্রীযুত রাজেন ঘোষের বাড়িতে প্রতি শনিবার গান শিখতাম এবং তিনি যা যা আমাদের বাড়িতে রেওয়াজ করতে দিতেন তা পড়ার বইয়ের পাতার মধ্যে রেখে পড়ার সময়ই গুনগুন করে অভ্যাস করতাম, পাছে কেউ জেনে ফেলেন। কেউ হঠাৎ এসে পড়লে পড়া মুখস্থ করতে আরম্ভ করতাম—এমনি দুর্দৈব।

আমাদের বাড়িটা ভাগ্যিস তিন মহলা ছিল তাই, বাঁচোয়া—নইলে গানবাজনা হয়তো শেখাই হতো না। বাবা বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করতেন। সপ্তাহের শেষে শনিবার রাত্রে কলকাতায় আসতেন এবং সোমবার ভোরে ফিরে যেতেন।

এতকথা বললাম এই জন্যে যে, বাবার মৃত্যুর পর আমি একটু বেশী করেই চাঁদবাবুর বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছিলাম এবং তাঁরই দৌলতে কলকাতার বাইজী বাড়িগুলিতে হলো আমার অবাধ যাতায়াত।

এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হয়েছিলাম বুঢ়ামঙ্গলে। এখন কেবল যাওয়ার সুযোগ মাত্র।

বেশ জমে উঠলো।

তাঁদের গানের ধুনে গান লিখি, আবার সেই লিখিত গানের জলসা শেষ করে নিত্যই ঘরে ফিরি। এর মাঝে ছিল সৃষ্টির অনুপ্রেরণা আর ছিল স্বীয় সৃষ্টির এক অপরূপ অভিব্যক্তিকে স্বকর্ণে শ্রবণ সুখ। এই মাদকতায় আমি তখন মাতাল।

নিজের লেখা গান শুনে নিয়ে মনে মনে তা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে গানের শিক্ষাও এগিয়ে যেতে লাগলো।

কাশী শীলের বৈঠকে আমাদের নৈশ-আসর বসতো। সে আসর প্রায় আমিই জমিয়ে রাখতাম—যদিও কেউ না কেউ সঙ্গীত কর্মী সেখানে উপস্থিত থাকতেনই।

সেবার হঠাৎ জদ্দান বাঈএর বাড়িতে সাতদিন ধরে জলসা চলেছে। প্রথম' দিনের আসরে নাচবেন 'আচ্ছান মহারাজ'। সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবেন পর্বৎ সিং। জলসায় জমায়েত হয়েছেন সব মস্ত মস্ত বাঈজীর দল।

আমার ও চাঁদবাবুর পাশেই এসে বসলেন শ্রীমতী গহরজান। তাঁর রূপের জলুসে তাঁর দিকে চোখ ফেরানো যায় না।

চাঁদবাবু আমায় ধাক্কা দিয়ে বললেন,—কত বয়স বল্ তো?

আমি বলি,—খুব বেশী হলে ত্রিশ-বত্রিশ।

চাঁদবাবু হেসে বলেন,—পঁয়ষট্টি পার হয়ে গেছে।

মনে হলো মিথ্যা কথা বলছেন চাঁদবাবু। এত কাছে আমি ইতিপূর্বে গহরজানকে পাইনি। খুব করে দেখে নিলাম।

বললাম,—অসম্ভব।

গহরজান আমার দৃষ্টিটুকু লক্ষ্য করে বললেন,—চাঁদবাবু, ইনি কে?

চাঁদবাবু বলেন,—ইনি আমার পরম বন্ধু এবং সংগীত গুণী।

তখন তিনি হেসে বললেন,—মেয়েদের বয়স দেবতারাও ঠিক করে উঠতে পারেন না, আপনার দোস্তের আর দোষ কি?

পরে আমার দিকে চেয়ে বলেন,—আপনার চোখে আমি যে বয়সের বলে মনে হচ্ছি—আমি সেই বয়সী।

আমি লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম।

তিনি আবার হেসে বলেন,—আমার বাড়িতে আপনি আসবেন?

আমি সম্মতি জানালাম।

ইতিমধ্যে সাজসজ্জা করে আচ্ছান মহারাজ আসরে এসে দাঁড়ালেন। ইয়া মোটা লাশ, ভুঁড়িটি শরীরের আগে আগেই এসে পৌছলো। মনে হলো ইনি আবার কি নাচ দেখাবেন। মনে মনে এতো হাসি পেলো।

যাই হোক, সেলামতি ইত্যাদি অন্তে সুরুয়াৎ। তারপর ঐ বৃহদবপু আচ্ছান মহারাজ নাচ শুরু করলেন।

সমস্ত বাঈজীদের বাহবা কেয়াবাৎ ধ্বনিতে হলটি পরিপুরিত। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম যে, তাঁর সারা দেহটি যতই নিশ্চল হয়ে আসছে ততই দ্রুত উঠছে পায়ের মঞ্জীরেতে অনবদ্য ছন্দরোল। ক্রমে সারা দেহ স্থির —খালি অতি দ্রুত লয়ে পায়ের মঞ্জীর বেজে চলেছে—যত দ্রুত তত অনবদ্য। ধা তি নাড়া বোল্‌টি চক্রধার ছন্দ তুলে সারা শ্রোতার কানে যেন এক

ঘূর্ণিস্রোতের আবর্ত স্বষ্টি করছিল। মানুষের কল্পনাকে ছাড়িয়ে বহু উর্দ্ধে তাঁর ঘুঙুরের সেই অভিব্যক্তি। সারা অঙ্গের মাংসপেশীগুলো যেন সেই ছন্দাবর্তে প্রতিরণিত হয়ে চলেছে।

সমস্ত নটীবৃন্দ হতবাক।

আমি সেই বিপুলকায় পুরুষকে পুরুষোত্তম না বলে থাকতে পারলাম না। সবাই নিস্তব্ধ—বাঈজী মহল নির্বাক হয়ে আচ্ছান মহারাজের পায়ে শির নত করলেন।

বাবার বন্ধুটি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর মুখের দিকে বার বার চাইতে লাগলেন। পরে বহু সঙ্কোচে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তুমি গহরজান বাঈএর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রেখেছিলে?

আমি বললাম,—না।

ইচ্ছা থাকলেও বাবার বন্ধু সে কথা এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু আমি বলি, —যেতাম নূরজাহান বাঈএর বোন মকতুমান বাঈএর বাড়িতে। এখানে যেতাম গান অপেক্ষা রূপের নেশায়। অমন সুন্দরী আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত খুব কমই দেখেছি। মকতুমান যেমন রসিকা তেমনি অমায়িকা। কাশী শীলের বৈঠকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। রঙ্গরসের মধ্যে লিখে দিতাম তাঁকে বাংলা গানের কলি। ক্রমে ক্রমে বাসা বেঁধে উঠেছিল চাওয়া-পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাঁকে নিরালায় পাবার আকাঙ্ক্ষায় দিন গুণছিলাম।

কদিন ধরেই তিনি আমার কাছে শিখেছেন ভীমপলশ্রীর উপর রচিত একটি বাংলা গান। 'সে কোন রাতে, আঁখির পাতে, উঠবে ফুটে—তোমার মুরতী'—

শেষ হয়ে গেছে গান শেখার তালিম দেওয়া। এবার পরীক্ষার পালা। Engagement হলো তার পরদিন সকালে পূর্ণভাবে আমায় সেটি শোনাবার জন্যে।

মনের মণিকোঠায় মন বসে বসে যেন এই অবসরটুকুর প্রতীক্ষিত অপেক্ষায় দিন গুণছিল।

সকালে এসব জায়গায় ভিড় নেই। নিরালায় বসে শুধু গান শোনা। নিভৃতে বসে আলাপ-আলোচনা, আদান-প্রদানের অবকাশের শুভক্ষণ বুঝিবা এতদিনে মিলবে! এই আশা-নিরাশার সংশয় দোলায় সারারাত দুলতে থাকি —কখন আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন প্রভাতে উঠেই প্রসাধন করে বেরিয়ে পড়লাম বাঈজীর উদ্দেশে। বেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় গিয়ে পৌঁছালাম মকতুমান বাঈএর বৈঠক-খানায়।

আমায় দরজা খুলে দিয়ে, চাকরটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরটাকে সাফ করার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মখমলের জাজিমখানা তুলে নিয়ে বারান্দায় ঝাড়তে বেরিয়ে গেলো। চেয়ে দেখলাম গতরাত্রের মাইফিলের বাসি বাসটুকু যেন ফুলশয্যার প্রভাতেই শেষ শয্যার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে। তাকিয়াগুলোতে কুনুইয়ের চাপ এখনও প্রাঞ্জল ভাবে রেখা রক্ষা করছে। বাকী সব এলোমেলো ভাবে বিন্যস্ত। খালি ডিকেণ্টার—গেলাস—সোডার বোতলগুলো যদিও রুপার ট্রে-তে গুছিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু মত্ত হাতে তার নিশানা খুঁজে না পেয়ে এধার ওধার ছড়িয়ে পড়েছে। বাসি মালা এক ছড়া সূতার বন্ধনীর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে অদূরে মখমলের তাকিয়ার তলে পড়ে বিধ্বস্ত। আমার সোফাটার পিছনে একরাশ প্লেটে গত রাত্রের খাদ্যাবশেষ—এক বিকট গন্ধ বিতরণ করছে। ওদিকে সুরাদির উদ্গার—বাঈজীর বড় পিকদানীও তাকে ধরে রাখতে না পারায় চারিপাশের চাদরটিকে সিক্ত রঞ্জিত করেছে!

সমস্ত দেখে, স্মরণে এলো হঠাৎ, কবীর সাহেবের একটি দোঁহা। নাকে রুমাল রেখে বারান্দায় বেরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলাম। কিন্তু, মনের মধ্যে কবীর সাহেবের দোঁহাটুকু বার বার জেগে উঠেছিল—

'দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী—পলক্ পলক্ লহু চোষে।

দুনিয়া সব বাউরা হো কর্—ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পোষে॥'

চাকরটি বারান্দার বাইরে হাত ঝুলিয়ে শতরঞ্জি, গালচে সব ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করছিল। অনেক ইতস্ততর পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম,—কাল রাত্রে মাইফিল হয়েছিল বুঝি?

চাকর সানন্দে উত্তর দিল,—হাঁ জী! রামপুরকা নবাব সাহাব আয়েঁ থে। বিশ রুপাইয়া ইনাম মিলা।

আমি আবার চুপচাপ। মনে মনে ভাবি, আমাদের মতো ভাঁড়ে মা ভবানীর দল এখানে এসে যে খাতিরটুকু এখনও পাচ্ছি, এ আমাদের পূর্ব-জন্মের সুকৃতি।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম,—তা বিবিজী ঘুম থেকে উঠেছেন তো?

চাকর উত্তর করলো,—জী! খবর দিয়া। বিবিজী গোসলখানামে গিয়া। আপ ঠাহ্‌রিয়ে না—। ম্যয় আভি চা লেকর আতা হুঁ।

চাকরের ব্যস্ততা দেখে বললাম,—তাহলে ত' ঘণ্টাখানেক দেরি হবে তোমার বিবিজীর বেরুতে?

চাকর উত্তর দেয়,—নেহি বাবুজী! খুবসে খুব দের হোগা তো আধাঘণ্টা।

আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম,—বেশ আমি তাহলে আধঘণ্টা পরে আসবোখন। একটু ঘুরে আসি।

চাকর বাঈজীর খাস চাকর। অতিথির বেখাতির হবার আশঙ্কায় বলে ওঠে, —চা তো পিকর যাই-এ!

আমি বললাম, –না ফিরে এসে চা খাবোখন। বিবিজীকো বঁলো—আমি এসেছিলাম।

বহুত তকল্লুফ দেখিয়ে চাকর আমায় ক্ষণিকের ছুটি মঞ্জুর করল। আমার মনস্তুষ্টির জন্যে সিঁড়ি পর্যন্ত নামতে নামতে বললো,—কাল রাত কো জলসামে বিবিজী আপকো বাংলা গানাহি নবাব সাহাব কো পেশ কি থী।

আমি তার কোন উত্তর না দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই পেলাম ট্রাম—উঠে বসলাম।

অন্যমনস্ক হয়ে বসে, শুধু মনের মধ্যে কবীর সাহেবের দোঁহাটির কথাগুলোতে সুরযোজনা করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

পাঁচ

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু যেন এতক্ষণ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করেই শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বললেন,—যাক বাঁচা গেল।

বাবার মৃত্যুর পর লেখাপড়ায় ভাঁটা পড়লো—কিছু অর্থাভাব আর কিছু যথাযথ অভিভাবকের অভাবে। আমি যেন চলতে লাগলাম, হালভাঙা, দাঁড় বিহীন এক নৌকার মতো।

গান বাজনার আসর-বাজী, ছেড়ে দিয়েছি। সাত নম্বর রাম মোহন রায় রোডে এক বন্ধুর বাড়ির ছাতে এখন আড্ডা বসিয়েছি। বন্ধুটির নাম অমিয় বসু—আমরা ডাকি 'ইউ' বলে।

ইউ—এম. এস. সি পড়ে সায়েন্স কলেজে। কলেজ থেকে ফিরে খোলা ছাতে বসে বাঁশি বাজায়, আমি গান করি।

বিকেলের আড্ডা শেষ করে, বাড়ির পাশে খোলা মাঠে বসে আমাদের রাত্রের আড্ডা। পাশেই স্যার জগদীশ বসুর বিজ্ঞান মন্দির। অনেক রাত পর্যন্ত লেবরেটারীর গ্যাসের আলোগুলি ধক্ ধক্ করে জ্বলে। পাশের মাঠে তার রশ্মি এসে পড়ে, সৃষ্টি করে এক আবছায়া চন্দ্রালোকের মতো আধ আলো, আধ ছায়া।

সেইখানে বসে আড্ডা জমে। এ আড্ডার আড্ডাধারীরা সবাই আমারই মতো নিষ্কর্মা না হলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর স্তরে যাবার যোগ্যতা রাখেনি। গড়পার নিবাসী ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণু ঘোষ রাত নটার পর বাঁশি বাজাতে বাজাতে এসে রোজ হাজির হতো।

বিষ্ণু ঘোষের বাঁশি সুললিত। শৈল মিত্তির ছিল অ্যামেচার থিয়েটারের উচ্চাঙ্গের স্ত্রীচরিত্র অভিনেতা। অমিয় ঘোষ শিখতেন বুদি মিশ্রের কাছে তবলা আর প্রতাপ মিত্তির শিখতেন ৺দুর্লভ ভট্টাচায্যির কাছে পাখওয়াজ। এই কয়জনকে নিয়েই জমে উঠতো আমাদের রাতের চতুষ্পাঠী।

শৈল মিত্তিরের উৎসাহে আমিও শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনয় করতে শুরু করে দিলাম।

ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক, ওল্ড ক্লাব, চোরবাগান নাট্য-সমাজ, বীণাপাণি ক্লাব, ডেপুটি কমিশনর ৺প্রভাত মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ক্লাব, আনন্দ পরিষদ—এইগুলিই ছিল সে সময়ের বিখ্যাত শৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠান।

আনন্দ পরিষদে ভূতনাথ মুখুজ্যে (স্ত্রীচরিত্রাভিনেতা) চরিত্রহীন নাটকে কিরণময়ীর ভূমিকা করে শরৎবাবুর কাছে স্বর্ণপদক উপহার পেলেন।

অবশ্য ভূতনাথবাবু তা প্রত্যাখ্যান করে হেসে বলেছিলেন,—আমি গরীব বামুন, মেয়ের বিয়ে দিতে পারছি না—মেডেল নিয়ে আমার কি হবে? শরৎচন্দ্র হাসিমুখে তাঁকে একটি তিনশত টাকার চেক্ লিখে স্টেজে দাঁড়িয়ে উপহার দেন।

এই সব দলের সংস্পর্শে আমি আমার নতুন পথের যাত্রা শুরু করি। কিন্তু ইউ-এর সংস্পর্শ আমি ছাড়তে পারলাম না। কারণ সে সংস্পর্শে পেতেম আমি অন্তরের তৃপ্তি।

সায়েন্স কলেজের ছাত্র ইউ—তাই সায়েন্স কলেজের ছাত্ররা প্রায়ই জড়ো

হতেন কলেজের ছাতে। সেইখানে বসেই জমে উঠতো বৈকালীয় আড্ডা—কলেজের মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে।

একদিন সায়েন্স কলেজের ছাতে বসে ইউ বাঁশি বাজাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল প্রফুল্ল বসু, সুধীন রায়, অতুল চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদিরা। প্রফুল্ল বসু অধুনা ডাঃ প্রফুল্ল বসু—জগদীশ ইনস্‌টিটিউটের অধ্যক্ষ; সুধীন রায় অল ইণ্ডিয়া রেডিওর স্টেশন এঞ্জিনিয়ার; অতুল চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার; ইউ হচ্ছেন প্রখ্যাত ডাক্তার।

অমিয়র বাঁশির পর সবাই মিলে আমায় ধরল গান গাইতে। গান শেষ হতেই পিছু থেকে একটি ছোটখাটো দাড়িওয়ালা লোক, গায়ে খদ্দরের ছোট পাঞ্জাবি, খালি পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলেন,—কে কেরে—ছোকরা? বাঃ ভারী মিষ্টি গলা তো তোর? চল্ চল্ নীচে আমার ঘরে চল্।

সবাই বিব্রত হয়ে দাড়িয়ে উঠি।

ভদ্রলোক আমার হাতটি নিজের হাতে ধরে, অপর হাত দিয়ে আমার বুকে একটি ঘুষি বসিয়ে দিলেন।

আমি চমকে উঠলেও লাগেনি একটুও। তিনি বলেন,—উদাত্ত স্বরে গান গাইতে গেলে কলজের জোর চাই!

তারপর বলেন,—হ্যাঁরে তোরা একে কিছু খেতে দিয়েছিস তো—দিসনি? বেশ তোরা—চল্, আমার ঘরে মুড়ি নারকেল খেয়ে গান শোনাবি।

সবাই-এর মুখের পানে চেয়ে বুঝতে পারি যে ইনি অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তি, কিন্তু চিন্‌তে পারছি না—ইনি কে?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো নীচের সিঁড়ির পথে তাঁকে অনুসরণ করলাম।

পথে ইউর কানে কানে জিজ্ঞাসা করলাম,—কে ইনি?

ইউ বলে,—সে কিরে! স্যার পি. সি. রায়।

ঘরে এসেই নিজেই একটা টিন থেকে মুড়ি নিয়ে ডিশে ডিশে সবার হাতে দেন, তারপর বলেন,—দাঁড়া দেখি। নারকেল নাড়ু আছে কিনা।

নারকেল নাড়ু যা ছিল তাই ভেঙে ভেঙে সবাইকে ভাগ করে দিলেন। সবাই নিঃশব্দে প্রসাদের মতো তা মুখে তুলে নিলাম। মনে হলো যেন মাতৃস্নেহে সিঞ্চিত অমৃত খাচ্ছি।

খাওয়ার মাঝেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন,—যে গানটা গাইছিলি ওটা কবীর সাহেবের না?

আমি বলি,—হ্যাঁ।

কিছু ইতস্তত করে পরে বলি,—আপনি তো সায়েন্স নিয়েই থাকেন—এ সব জানলেন কি করে?

হেসে উনি উত্তর দেন,—এঁরাও সব বড় বড় বিজ্ঞানী রে!—তারপর বলেন, কি পড়িস তুই?

কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর দিই,—আই. এস. সি. পর্যন্ত পড়েছি, তারপর আর লেখাপড়া হলো না।

স্যার জবাব দিলেন অন্যমনস্ক হয়ে,—লেখাপড়া শিখেই বা করবি কি—চাকরগিরি? তার চেয়ে ব্যবসা—ব্যবসা কর! বাঙালী জাতটাকে বাঁচা!

—ব্যবসা কি করে করতে হয় সে জানি না।

তিনি স্মিত হেসে বলেন,—ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়, যেমন গান শিখেছিস।

আমি চুপ।

তিনি বলেন,—কি ভাবতে বসলি? তুই কি এখনি ব্যবসা করতে যাচ্ছিস নাকি রে? ও সব পরে ভাবিস—হ্যাঁ তবে ভাবিস।

একটু থেমে আবার বলেন,—জানিস একজনকে চামড়ার কারবার করতে বললাম। বেশ বড়লোকের ছেলে টাকাকড়ি আছে, তা বলে কি না ওসব মুচির কাজ—ও সব কাজ করলে জাত যাবে! তারপর শুনছি প্রায় বিশ হাজার টাকা জমা দিয়ে এখন এক ইংরেজী লেদার ফ্যাকটরীর গুদামে বড়বাবুর চাকরি নিয়েছে। চামড়ার গুদামে বসে কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধ শুঁকলে জাত যাবে না—যত জাত যেতো চামড়ার কারবার করলে। এমনি আমরা মুর্খ। তাইতো বলি, এরা মরে যাবে। বাঙালী বাঁচবে না রে, বাঁচবে না, সব মরবে।

কথাগুলো শুনে বুকে বড় ব্যথা পাচ্ছি, করার কিছু নেই, অথচ—

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলেন,—যা-যা বাড়ি যা। আমার ঢের কাজ আছে। তারপর প্রফুল্ল বোসের দিকে চেয়ে বলেন,—হ্যাঁ প্রফুল্ল, তোমার এ মাসের সায়েন্স জারনালটার প্রুফ দেখা শেষ হলো?

আমরা ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে পা রাখলাম। পিছে থেকে আওয়াজ এলো,—আবার আসবি!

সেই দিন থেকেই মাথায় চেপে গেলো, ব্যবসা করতে হবে। অথচ কিসের ব্যবসা, কেমন ব্যবসা—কি করতে হবে কিছুই মাথায় নেই।

ইউদের ছাতে আড্ডা চলেছে।

ইউএর ছোট মেসো পরেশবাবুর উপরের ভাই দীনেশ বোস বারিপদা থেকে কলকাতায় এসেছেন। বারিপদা ময়ূরভঞ্জের রাজধানী।

দীনেশবাবু ব্যবসাদার, বারিপদায় তাঁর একটি বড় রকমের অল স্টোর আছে। সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জের রাজার ছোট ভাইদের বিয়েতে ডে লাইট সাপ্লাই করবেন বলে অর্ডার নিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেন, রাজার গেস্টদের জন্যে একটা ক্যানটিন খুলতে চান—বাঁধা অর্ডার। লাভ হবে প্রায় দুহাজার থেকে আড়াই হাজার টাকার মতো। কিন্তু একজন বিশ্বাসী লোকের অভাবে অর্ডারটা নিতে সাহস করছেন না।

ইউ বলে,—যদি লোক জুটিয়ে দি, তবে তাকে কি দেবেন ?

দীনেশবাবু বলেন,—মাইনে চান মাইনে, নইলে কমিশন বা পার্টনার হিসাবে সাড়ে বার পারসেণ্ট সবই হতে পারে।

ইউ বলে,—ধরুন আমি যদি আপনার একাজে পার্টনার হই—অবশ্য টাকা দিয়ে নয় ওয়ার্কিং পার্টনার, আমায় কত পর্যন্ত দিতে পারেন ?

তিনি সোৎসাহে বলেন,—তুমি হলে আধাআধি পর্যন্ত করতে পারি। কারণ লাভ আমি চাই না। যখন ছোট রাজার বিয়েতে সব অর্ডার আমিই নিয়েছি—এটাকে আর অপর হাতে তুলে দিতে চাই না। টাকা ইনভেস্টমেণ্টের সুদটুকু পোষালেই আমার যথেষ্ট।

—বেশ, তবে আমার এই বন্ধুটিকে আপনি নিয়ে যান। ওকে অবশ্য আমার মাসী আর পরেশবাবু যথেষ্টই চেনেন।

উৎসাহিত হয়ে দীনেশবাবু বলেন,—বেশ বেশ। তবে উনি ঠিক যাবেন তো ?

পরনে আমার কোঁচানো চুন্নট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে নেন। আমি বলি,—ব্যবসায় আমার অমত নেই। কি কি করতে হবে ?

উত্তরে তিনি বলেন,—ক্যানটিন চালাতে হবে! বামুনকে দিয়ে অর্ডার অনুযায়ী যথাযথ বানিয়ে সাপ্লাই করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিল লেখার কাজটাও সমাধা করা হবে।

—আপনার ভালো কুক আছে তো ?

তিনি বলেন,—ফিরার পথে মেদিনীপুর থেকে ভালো ঠাকুর আমি সাথে

করে নিয়ে যাব। ওখানকার কারীগরদের নাম আছে। চপ কাটলেট মোগলাই, পরটা সবই জানা করে।

আমি রাজী হয়ে গেলাম।

কথা রইল যে আমি সামনের রবিবার ময়ূরভঞ্জে রওনা হবো। দীনেশবাবু কলকাতা ত্যাগ করে যাচ্ছেন তাই ইউ-এর কাছে আমার পাথেয়টা জমা করে দিয়ে উঠে পড়েন।

ভদ্রলোক নীচে নেমে যেতে ইউ বলল,—এঁরই মেজদার শ্বশুরমশাই ছিলেন ময়ূরভঞ্জ মহারাজের দেওয়ান সাহেব। দু'বছর হলো মারা গেছেন। মহারাজ এঁদের পরিবারবর্গকে তাই অকারণ বহু সাহায্য করেন। পরেশবাবুকে ওঁদের স্টেট প্লীডার করে নিয়েছেন।

সারাটা রাত ব্যবসার অনুপ্রেরণায় আমার বাঁধন-হারা মনটাকে ময়ূরভঞ্জের পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি। ভোরে উঠেই পরেশবাবুকে একটা চিঠি দিয়ে ফেললাম। দু-তিনদিন হাতে যা ছিল তার মাঝে আমার সামান্য জিনিসগুলি গুছিয়ে, সময় আমার এতই উদ্বৃত্ত হলো যে কিছুতেই যেন আর সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না।

রবিবার রওনা হয়ে সোমবার ভোরে রূপসায় পৌঁছলাম। এখান থেকে ট্রেন বদলি করে ময়ূরভঞ্জ রাজার নিজের স্টেটের রেলে বারিপদায় পৌঁছতে হয়।

শাল-মহুয়ার ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলেছে। মনে অসীম উদ্দামতা।

বার বার স্মরণে আসছে আচার্য পি. সি. রায়ের ব্যবসার উদ্দীপ্ত বাণী: বাঙালী ব্যবসা করতে চায় না—এরা সব মরবে, মরবে, মরবে!

ছয়

আজ দু'দিন এসে বসে আছি, দীনেশবাবুর expert cook এসে পৌঁছয়নি। কাজেই ওঁর দোকানে মাঝে মাঝে বসছি আর ওঁরই খরিদ্দারদের সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছি। আর একঘেয়ে লাগলে ময়ূরভঞ্জ শহরটিকে প্রদক্ষিণ করে আসছি।

তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে দীনেশবাবু নোটিশ দিলেন যে অর্ডার এসে গিয়েছে, কারণ আজ সকালেই রাজার গেস্টরা কিছু কিছু এসে পৌঁছে গেছেন। বিকেলে তাঁদের জল-খাবারাদির জন্য পঞ্চাশটি চপ কাটলেট আর চা সরবরাহ করতে হবে।

বললেন,—লোকাল-কুক ধরেছি। আপনি খেয়ে-দেয়ে নিয়ে অতি অবিশ্যি করে দোকানে পৌঁছুচি যাওয়া করবেন।

তথাস্তু!

খাওয়া-দাওয়া সেরে দীনেশবাবুর দোকানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা সাড়ে বারটা।

সামনের মাঠে একটা তাঁবু খাটিয়ে আমাদের যৌথ ক্যানটিন খোলা হয়েছে।

আলু, মাংস, ডিম, পিঁয়াজ মালমসলাদি এসে পড়েছে। ছোট ছোট দুটি বয়' উনানে আগুন দিতে ব্যস্ত কিন্তু কুকের টিকিটির পর্যন্ত দেখা নেই।

বেলা তিনটার সময় দীনেশবাবু ছুটতে ছুটতে এসে বললেন,—কি হবে মশাই? সর্বনাশ হইছে! এখানে এমন কোনো রেডি-মেড্ দোকান নাই, সেখান হতে হঠাৎ কিনে লইয়ে সাপ্লাই করে দেবো অথচ কুক বেটা বিট্রে করিছে।

বুঝলাম সমস্যা জটিল!

দীনেশবাবুর ফ্যাকাশে মুখখানির দিকে চেয়ে মনে দয়ার উদ্রেক হলো। অগত্যা আমি বললাম, আজকের মতো হয়ত আমি চালিয়ে নিতে পারবো! কিন্তু এরকম করে রোজ হওয়া তো সম্ভব হবে না।

দীনেশবাবু গদ্‌গদ হয়ে বলেন,—শুধু আজকের মতো করে লইলে কাল কুকের টিকি ধরে আনা করিয়া ছাড়িব।

বললাম,—নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখি কি করতে পারি!

দীনেশবাবু বাক্যব্যয় না করে, আমায় মুহূর্তের মধ্যে শ'খানেক স্তুতি ও ধন্যবাদবাক্য জ্ঞাপন করে সটান কেটে পড়লেন।

উনান আর ধরে না।

এ কয়লা আঁচের উনান নয়—এ হচ্ছে কাঠের জাল। কাঠ আবার কিছুটা কাঁচা; কাজেই বয় দুটি হিমশিম খেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে আমি সরঞ্জাম নিয়ে যথাযথ কেটে কুটে, ধুয়ে পরিষ্কার করে, সেগুলিকে তৈরি করার উপযুক্ত করে নিলাম।

বয় দুটি উনান সম্বন্ধে হতাশ হয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করে কাকুতিস্বরে জানালো, —না বাবু, এ হবেনি।

ওদের বাটনা বাটা, মসলা গুঁড়ানো, বিস্কুট গুঁড়ানোর কাজে বাহাল করে, নিজেই লেগে গেলাম উনান ধরাতে। আমার চোখ দুটি দেখতে দেখতে করমচার মতো লাল হয়ে উঠলো।

অতিকষ্টে প্রচেষ্টায় সফল হয়ে কড়াই চাপালাম। পড়ি কি মরি করে কাজকারবার বজায় রাখবার চেষ্টা শুরু করলাম। তখন চোখ নিদারুণ ভাবে জ্বালা করছে—ফ্রাইং প্যানের কাটলেটগুলি যেন চোখের সামনে একের জায়গায় দুইটি হয়ে উঠছে।

বেলা পাঁচটার মধ্যে অর্ডার সার্ভ করবার নোটিশ এসে গেলো। এদিকে মাল তৈরী নেই। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ অনভ্যস্ত হাতের কেরামতিগুলো যথাক্রমে গেস্টদের হাতে গিয়ে পৌঁছালো।

আমি তখন নাকের জলে, চোখের জলে ও সারা অঙ্গের ঘর্মের জলে জলবৎ তরলং হয়ে গেছি। ভাবছি, গান বাজনার আসর ছেড়ে এসেছি ব্যবসা করতে—ঠেকে-ঠেকেই শিখতে হয়।

সব জিনিস যখন পাঠিয়ে দেওয়া হলো তখনও রাজবাড়ির লোক এসে বলে,—আর নেই? ওখোনও যে সবাই চাইছে।

এমন সময় দীনেশবাবু বীবদর্পে প্রবেশ করেন। রাজবাড়ির লোকটিকে একটা দাবড়ি দিয়ে বললেন,—অর্ডার মাফিক সাপ্লাই করা হইছে—ভাল লগিছে বলে তো আর মাল জন্মাইবে না।

রাজবাড়ির লোক ফিরে যায়। দীনেশবাবু খপ্ করে আমার ডান হাতটা ধরে এক ঝাকুনি দিয়ে বলেন,——**wonderful**! সবাই বলা করছে অপূর্ব **tasteful** হইছে। যাক মান বাচাইছেন মশাই। কাল সক্কালে কুক বন্দোবস্ত করি তবে অন্য কাজে হাত লাগাইব।

আমি দীনেশবাবুর উড়িয়া অ্যাকসেন্টের বাংলাভাষা শুনে স্মিত হেসে ফেলি। তিনিও সে হাসিতে যোগ দিয়ে বলেন,—কষ্ট হয়নি তো? আজ যা করা করলেন চোখের তারা ঘুরিয়ে দিছেন। নিন দু'প্যাকেট সিগারেট রাখুন পকেটে।

আমি আমার জামাটি দেখিয়ে দিলাম। সেটি তাঁবুর বাঁশে ঝুলছে—আমার গায়ে আছে গেঞ্জি।

বাড়ি ফিরে স্নান করে, আহারাদি সেরে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি বোধ করলাম। দিগ্বিজয়ের আনন্দ মনের কোণে উঁকি মারছে। আচার্য পি. সি. রায়ের মন্ত্র-সাধনায় আজ আমি উত্তীর্ণ। বার বার কানে বাজছে ঃ

Young generation must do business, otherwise Bengalees will die away.

পরের দিন দীনেশবাবুর শত চেষ্টাতেও কুক এসে পৌছল না, কাজেই পূর্বদিনের পুনরাবৃত্তিই ঘটলো। খালি সাপ্লাই তালিকায় পঞ্চাশটির বদলে দেড় শ করে বৃদ্ধি পেলো।

আজ সাতদিন একাই কুক, একাই সাপ্লাইয়ার আর একাই বিলিং ম্যানেজার। স্যার পি. সি. রায় দেখলে নিশ্চয়ই একটা মেডেল দিতেন।

আগুনের তাপে রক্ত আমেশা মশাইএর দর্শন পেয়েছি। শরীরটা অবসন্ন, তবু মনকে ব্যবসায়ী করে গড়ে তুলেছি।

সেদিন শনিবার। ছোট রাজকুমারের গায়েহলুদ—গেস্টে গেস্টে রাজবাড়ি ছেয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে সাপ্লাইএর ফর্দটি বাড়তে বাড়তে আজ উঠে গেল পাঁচশর পর্যায়। আইটেমে যোগ হয়েছে ফিশ-ফ্রাই!

ভোর থেকে কাজ শুরু করেছি। আজ চারদিন দীনেশবাবু টিফিন কেরিয়ার করে দুপুরের আহার্য সাইকেলের পেছনে বহে এনে আমায় পৌছচ্ছেন। আজও তার ত্রুটি হয়নি। কিন্তু, সময়াভাবে আজ তা অভুক্ত অবস্থায় টিফিন বাক্সেতে ভেপ্‌সিয়ে উঠেছে। বেলা তিনটের সময় দীনেশবাবু হন্তদন্ত হয়ে টেণ্টে প্রবেশ করলেন। ওঁর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝেছি সাপ্লাই তালিকা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম ঠিক তা নয়, তবে যা, তা সত্যই অভূতপূর্ব—অবর্ণনীয়!

দীনেশবাবুর এক হাতে সাবানদানি, তোয়ালে আর অপর হাতে আমারই একটি কোচান ধুতি আর গিলেদার পাঞ্জাবি।

বললাম,—ব্যাপার কি?

তিনি বললেন,—শীঘ্‌গির সাফ্‌ হয়ে নউন। এই নিন সাবান—মুখে হাতে দিয়ে, ভাল করে ধুয়ে ব্যস্‌ কাপড়-জামাটা পালটে নিয়ে চলা করুন।

বললাম,—কোথায়?

দীনেশবাবু একগাল হেসে উত্তর দেন,—ছোট মহারাজ আসছেন মেজদার শ্বশুরবাড়ি। তাঁকে মেজ বৌদি নিমন্ত্রণ করেছেন গায়ে হলুদের

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—তা আমি কি করবো?

তিনি আমার পিঠে একটা চপেটাঘাত করে বলেন,—আপনার গুণপনা সবই শুনেছি মশাই। পরেশ বলেছে, আপনার অপূর্ব গলা। কাজেই ছোট রাজাসাহেবের অভ্যর্থনায় মেজবৌদি ঠিক করেছেন যে আপনাকেই গান করতে হবে।

বলি,—সেকি ? এদিকের সব রান্নাবান্না বাকী—তাছাড়া আমার এখনও খাওয়া হয়নি।

দীনেশবাবু যেন আরও খুশী হয়ে উত্তর দেন,—বাচালেন মশাই, এখনও খাওয়া হয়নি তো ভালই হইছে। ওগুলা আমি বয়দের বেটে দেবখনি। আপনি বৌদির ওখানে ভাল ভাল সব খাবেন। আর দেবি করবেন না—দোহাই ! ঠিক চারটের সময় ছোট রাজাসাহেব আসি যাবেন। নিন-নিন——শিঘ্‌গর করুন।

হাতমুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে দীনেশবাবুর মেজদার শ্বশুরবাড়িতে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হলাম যখন, তখন ঠিক চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট।

দীনেশবাবু একটা মোটরসাইকেল যোগাড় করেছিলেন। তারই পেছনে চড়িয়ে আমায় নিয়ে পড়ি কি মরি করে এনে তুললেন—ওঁর মেজবৌদির বাড়িতে।

সামনের বসার ঘরের সাজসজ্জা রাজ আমন্ত্রিতের অপেক্ষায় কাল গুণছে—একটি তানপুরা আর পাখওয়াজ সুরক্ষিত। একটি ভদ্রলোক পাখওয়াজে আঠা চড়িয়ে হাতের ময়দাগুলি ধীরে ধীরে সাফ করছেন—বুঝলাম ইনিই সঙ্গত করবেন।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছার সময় হয়ে উঠলো না, জোড়া শাঁখ বেজে উঠলো। ছোটরাজা দেউড়িতে এসে নামলেন।

সুন্দর সুপুরুষ। ক্ষত্রিয়রক্ত শরীরে যে আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। উঁকি মেরে দেখছি, এমন সময় দীনেশবাবু ছুটে এসে বলেন,—শুরু করুন—শুরু করুন !!

আমি যন্ত্র-চালিতের মতো তানপুরায় আঙুল সঞ্চার শুরু করে গান ধরলাম। গানখানি ছিল বৃন্দাবনী সারেঙ্‌।

ছোট রাজকুমার ঘরে ঢুকেই একমুহূর্ত স্থির হয়ে গান শোনেন, পরে ধীরে ধীরে তাঁর আসন গ্রহণ করেন। তাঁর মুখ-চোখের দিকে লক্ষ্য করে যেটুকু বুঝেছিলাম তাতে মনে হয় তাঁর গানখানি ভালই লেগেছে।

আসরী কসরৎ না করে মোটামুটিভাবে গানখানি শেষ করে তানপুরাটি যথাস্থানে রেখে তাঁকে আমার অভিবাদন জানালাম।

দীনেশবাবু আমার ছোট একটি পরিচয় করিয়ে গদ্‌গদ স্বরে বললেন,—শুধু আপনারই অভ্যর্থনার জন্যে কলকাতা থেকে উনারে বহু অনুরোধ করে আনা করিয়েছি।

আমি স্তম্ভিত! বুঝলাম যে দীনেশবাবুর এর মূলে হয়ত ব্যবসাবুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

ছোট রাজকুমার মৃদু হেসে যথারীতি প্রতিনমস্কার জানিয়ে আমায় বললেন, —আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আপনার গলাটি আমার ভারী ভাল লাগল। আরও শুনতে ইচ্ছে করছে অথচ প্রোগ্রাম আমার বাঁধা। এখানে থাকবো মাত্র ন'দশ মিনিট—তা সাত মিনিট কেটে গেছে। কাজেই আপনি যদি অনুগ্রহ করে রাজপ্রাসাদে আসেন!

আমি বললাম,—বিলক্ষণ!

তিনি স্মিত হেসে উত্তর দিলেন,—সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় গাড়ি পাঠাবো—তাহলে অসুবিধা হবে না তো?

উত্তর দেন দীনেশবাবু, বলেন,—উনিকে আপনারই জন্যে আনা করাইয়াছি—যখন বলবেন তখনই যাইবেন।

এরপর মেয়েরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বরণাদি শুরু করলেন। কপালে হলুদ, গলায় চন্দন ফুলের মাল্যদানাদি শেষ করলেন। রূপার থালায় ও রেকাবি ভরা খাবার আয়োজন হয়েছে। ছোট রাজকুমার খাওয়ার আসনেই বসলেন না, শুধু রূপার ডিবা হতে একটি ছোট এলাচি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন।

রাজসিক নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করার বুঝি এই রীতি! সভা ভঙ্গ হলো।

ছোট রাজার গাড়ি চলে যেতেই আমি দীনেশবাবুকে বললাম,—ছোট রাজকুমারের জন্যে তো আমাকে আনা করিয়েছেন, কিন্তু এদিকের কি হবে?

নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়ে দীনেশবাবু উত্তর দিলেন,—সবই তো তৈরী করে রেখে এসেছেন।

আমি বলি,—না-না, কিছুই হয়নি এখনও। সবে চপ গড়া শুরু করেছিলাম। আজ আবার তিন রকমে মিলে পাচশখানার মতো অর্ডার।

দীনেশবাবুর যেন কোনই উত্তেজনা নেই, উদাসভাবে বললেন,—ও হয়ে যাবেখনে। আজ দাদার বাড়ির কুককে দিয়ে চালিয়ে দেব।

এমন সময় তাঁর মেজবৌদি জলখাবার এনে আমার সামনে ধরলেন। দীনেশবাবু খাবার রেকাবিখানা খপ্ করে তাঁর হাত থেকে টেনে নিয়ে বলেন, —হৈ গ্যাখো! উনার যে এখনও আহার হয়নি। বৌদি তুমি উনারে পোলাও তরকারি দাও।

আমি বলি,—থাক্-থাক্ আর খেয়ে কাজ নেই। বেলা পড়ে গেছে। তাছাড়া, একটু আমেশার মতোও হয়েছে।

দীনেশবাবু আমার হাত ধরে ভেতরের দালানে তাঁরই পাশে একটি থালায় বসিয়ে, আমার কোনরকম আপত্তি বাণীতে কর্ণক্ষেপ না করে বললেন,—শুনুন মশাই! রাজবাড়ির আবার সব নিয়ম কানুন আছে। এরা সবাই বত্রিশঘর ফিউডেটারী-চীফ্। আর আমাদের ময়ূরভঞ্জের রাজাবাহাদুরই হচ্ছেন এঁদের প্রমুখ। এঁদের নিজেদের বছরে একটি করে ফাঁসির অর্ডার স্যাংশন রইছে। তাই সাবধানে মেলামেশা করবেন।

আমি বললাম,—নইলে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেবেন বলে তো মনে হলো না। বরং মনে হলো অতি ভদ্র, সজ্জন।

দীনেশবাবু উত্তেজিত হয়ে জবাব দেন,—ভদ্রলোক তো বটেই—তবে বেফাঁস কথাটি কইছো তো প্রাণটি নিয়ে টানাটানি।

দীনেশবাবুর বলার ভঙ্গী দেখে হাসি চাপা গেল না। মানিয়ে নিয়ে জবাব দিলাম,—বেশ! সাবধানেই মেলামেশা করবো। তবে, আপনাদের ময়ূরভঞ্জে ক্যানটিন থেকে শুরু করে রাজদরবার পর্যন্ত সর্বত্রই প্রাণটি নিয়ে যে টানাটানি—এটা একদিনে বেশ বুঝে ফেলেছি।

এবার দীনেশবাবু হেসে ফেললেন। বুঝলাম দীনেশবাবু ব্যবসাদার হলেও রসিক।

বাড়ি ফিরে স্নানাদি সেরে প্রসাধন করতে করতে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে নিজে নিজে আউড়ে নিলাম—বাঃ রে বরাত! রাঁধুনী থেকে একেবারে রাজদরবার!

সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে ছটায় রাজবাড়ির গাড়ি এসে হর্ন দিল। তখনও আমার কাপড়-জামা ছাড়া হয়নি। দু'তিনখানা কাপড় নাড়াচাড়া করে সরিয়ে রেখেছি—রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষার উপযুক্ত কাপড়চোপড় আমার নেই। পরেশবাবুর স্ত্রী সেটুকু লক্ষ্য করে বলেন,—ফরসা হলেই হোলো। পুরুষের ওর বেশী লাগে না।

আমি অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় পরেশবাবুর স্ত্রী মৃদু হেসে আমার যাত্রার পূর্বে উপদেশ দিয়ে বলেন,—মেজ ভাশুরের কথায় ভয় পাবেন না। আপনার নিজের ভদ্রতার যখন অভাব নেই তখন কোনো অভদ্রতাই ওতরফ থেকে হবে না।

গাড়িতে উঠে বসেছি। ড্রাইভার সেলাম করে দরজাটা বন্ধ করে গাড়ি ছেড়ে দিল।

ভাবছি—ছোট রাজকুমার যে ভদ্র সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নেই, তবে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের দলটি যদি পিছুতে লেগে যায়, তবেই রক্ষা নেই।

ভাবতে ভাবতে গাড়ি সিংদরজা পার হয়ে রাজবাড়ির উঠানে এসে থামলো। আমায় নাবিয়ে নেবার লোক প্রস্তুত ছিল। পথ দেখিয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরের হল ঘরে পৌছে দিলেন।

ঘরটি রাজোচিত সাজানো। আঠার উনিশ শতাব্দীর যে কোনো জমিদার বাড়ির খাস বৈঠকের চেয়ে উৎকৃষ্ট। চারপাশে চিতা, হরিণ, বুনো মহিষ আর ভাল্লুকের চামড়ায় সুসজ্জিত। হলের মাঝে পার্সিয়ান কার্পেট বিছানো। তারই একপাশে গদির উপর ছোট রাজার বসার আসন। আর তারি সামনে, অপর দিকে একটি চৌকা গদির আসনে তানপুরা আর পাখোয়াজ রাখা।

পাখোয়াজে আঠা চড়াচ্ছেন যিনি—তিনি বেশ সৌম্য পুরুষ।

তিনি আতিথ্য দেখিয়ে বললেন,—বসুন। ছোট রাজবাহাদুর একটু ভিতরে গেছেন।

আমি দরজার পাশটিতে কার্পেটেই স্থান বেছে নিলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে হাজির হলেন তিনটি ছোট ছোট মেয়ে, একটি আট-দশ বছরের ছেলে ও একটি অন্ধ তবলা বাদক নিয়ে এক হিন্দুস্থানী ওস্তাদ। মাথায় বিশগজি পাগড়ি, কানে হীরের টপ্ ঝক্‌ঝক্ করছে।

মেয়ে তিনটিকে দেখলেই মনে হয়—এরা তিনটি বোন। বড়টির বয়স ষোল-সতেরো হবে আর এটিকে অনুসরণ করেই বাকী দুটির বয়স।

বড় ও ছোট মেয়েটির রং ফরসা আর মেজটি একটু নিরেস। সব কখানি মুখই একটু নেপালী ছাঁচের।

সামনে গায়কের আসনেই এঁরা বসলেন। পিছনে ঘেরাটোপে বাধা বায়া-তবলা আর তানপুরা।

ছোটরাজ এসে উপস্থিত হলেন। আমার দিকে চেয়ে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—কতক্ষণ এসেছেন?

—এই মিনিট দশেক।

ছোটরাজ তাঁর কর্মচারীর দিকে ফিরে বললেন,—খবর পাঠাওনি কেন?

লক্ষ্য করলাম যে এই নবাগত ওস্তাদগুষ্টিকে যেন ছোট রাজসাহেব চিনলেনই না।

ওস্তাদজী নিজেই কথা শুরু করলেন,—নমোস্তে ছোট রাজসাহেব!

ছোটরাজ সাহেব মেয়ে তিনটিকে দেখে নেন, পরে বলেন,—এই তিনটি মেয়েই আপনার ?

ওস্তাদজী উত্তর দেন,—জী হাঁ ! ইয়ে তিনোহি আচ্ছা গাতি হ্যায়। আউর ইয়ে মেরা লেড়কা কিষাণ্। বহুত তবলা বাজাতা হ্যায়।

ছোটরাজ স্মিত হেসে তারিফ জানালেন। পরে বলেন,—তব্ শুরু কীজিয়ে ওস্তাদজী !

ওস্তাদজী তানপুরায় মোচড় দিতে দিতে নিজের গুণগান করে চলেন,—ম্যায় নেপাল সে আজ চার মাহিনা আ গয়া। কলকাতা সিমলা লেন মে মায় রহতা হুঁ। উঁহাই আপকা দাওয়াতি-খৎ মিলা।

তারপর তানপুরা বাধা হলে বলেন,—তাহেলে ইয়ে তিনো লেড়কিয়োঁ আপকো কুছ পেশ করেঙ্গী। বড়কী কী নাম অলকনন্দা, বিচলী তারা আউর ছোটকী কী নাম হায়—সিতারা। নান্নু মিশ্রকো তো আপ জানতেহি হোঙ্গে।

গান শুরু হলো—সঙ্গত করছে কিষণ।

তিনটি মেয়ে গেয়ে উঠলো—

সাজন বিন নিদ্ ন আওয়ে—

উন বিন মায় তো কছু ন ভাওয়ে।—ইত্যাদি।

প্রথমটি ছাড়ে তো দ্বিতীয়টি ধরে, দ্বিতীয়টি ছাড়ে তো তৃতীয়টি ধরে। তিনটিতে মিনিটের মধ্যে গানের ত্রিধারা রচনা করে আসর জমিয়ে তুললো।

ছোটরাজ সাহেব আমায় তাঁর পাশটিতে ডেকে নিয়ে নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে মেয়ে তিনটি বাটোয়ারা, তান, উপেজ গেয়ে হাঁফিয়ে পড়লো। তারপর ওস্তাদাজী নিজে গান ধরলেন। ভূমিকায় রাজাধিরাজ ময়ূরভঞ্জের গুণগাথা শ্লোকে আবৃত্তি করে নিয়ে নিজে দীন পরিচয় দিয়ে গাথা শেষ করলেন। পরিচয়ে বুঝলাম ইনি নেপালের বিখ্যাত গায়ক শ্রীশুখদেও মিশ্র।

ওস্তাদ শুখদেও মিশ্রের গলাটা কিছু জখম ছিল, তাই ছোটরাজ তাঁর গান থামিয়ে দিয়ে বললেন,—মালুম হোতা হায় আপকো গলা থোড়া জখম হুয়া হায়—তা আপনি দুদিন বিশ্রাম নিন। সাদিমে ফির জানে পড়ে গা তো ?

শুখদেব মিশ্র ইতিমধ্যে খেয়াল, টপ খেয়াল শেষ করে চতুরঙ্গ ধরেছিলেন। রাজা সাহেবের কথায় তা থামিয়ে দিয়ে লম্বা কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন।

ছোটকুমার আমার দিকে চেয়ে এবার বলেন,—কিছু শোনান!

—কি গাইব?

—স্রেফ্ বাংলা গান।

হারমনিয়াম টেনে নিয়ে আমি শুরু করলাম রবীন্দ্র সংগীত, ডি. এল. রায়, রজনী সেন, অতুল প্রসাদ—সব কবিরই রচিত কিছু গান।

নজরুল সাহেবের বাংলা গজল ছোট রাজকুমারকে বেশ মস্ত্ করে তুলেছিল।

রাত বারোটায় সভা ভাঙলো।

উঠবার সময় বললেন,—পরশুদিন আমি রাজপুতানায় যাবো—আপনি সঙ্গে যাবেন?

আমি নীরব।

সেটুকু লক্ষ্য করে বলেন,—কিছু মনে করবেন না—অবশ্য বরাতের মতো সাজসজ্জার ব্যবস্থা আমিই করিয়ে নেবো। আমার ইচ্ছা রাজসিক দরবারী গান ছাড়া—আমার সেলুনে আপনাকে রাখতে পারলে এই সমস্ত প্রাণবন্ত গানে সময়টা ভালই কাটতো!

আমি সম্মতি জানালাম।

বিদায় দিতে তিনি নিজে নীচে এসে গাড়ির পাশটিতে দাঁড়ালেন। গাড়ি ছাড়ার সময় বললেন,—কাল ফের সন্ধ্যা ছটায় কেমন? Good night.

সাত

আমার মন থেকে দীনেশবাবুর অর্ডার সাপ্লাইং ক্যানটিনটি গত সন্ধ্যা থেকেই গতায়ু হয়েছিল। শরীরটারও জিরেনের দরকার হয়েছিল। রক্ত আমেশাটা বেশ রুদ্রমূর্তি ধরেছে। কাজেই সারা দিন ধরে পরেশবাবুর স্ত্রী পরিবেশিত বার্লি আর থানকুনি পাতার রস খেয়ে পড়ে থাকা গেল।

সাড়ে পাঁচটায় ছোটরাজ সাহেবের গাড়ি আমায় নিতে এলো। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম গাড়ি দাঁড় করিয়ে দীনেশবাবুর বিলিং করাটাও পথে সেরে নেবো।

দীনেশবাবুর দোকানে গিয়ে লজ্জিত হলাম। বিলিং তিনি নিজেই করে নিয়েছেন। আমি আমার শরীরের অসুস্থতার উল্লেখ করলাম। তিনি মৃদু হেসে

বলেন,—ব্যবসা করার আলাদা শরর থাকা দরকার। শৌখিন শরীরে সইবে না—তার চেয়ে বাণিজ্যই ভাল।

আমি বললাম,—বাণিজ্য ?

তিনি উত্তর দেন,—ব্যবসাতে আর বাণিজ্যে অনেক তফাত। ব্যবসা করতে গেলে লোহার শরীর দরকার আর বাণিজ্য ? বলে, ফিক করে হাসলেন।

আমি বিস্ময়ে চেয়ে থাকি ওঁর মুখের পানে। তিনি বলেন,—সবই ফর্দ মাফিক কেনাকাটা হয়ে গেছে মশাই—তা প্রায় দেড়শো পৌনে দুশো টাকার মতো বাণিজ্য হবে। এর উপর শাল—দোশালা বাকী।

আমি আরও অবাক হয়ে যাই। বললাম,—কিসের কেনাকাটা, কিসের বাণিজ্য !

দীনেশবাবু ফিক্ করে হেসে উত্তর দেন,—সবই বুঝি মশাই! একরাতে এমন মন কাড়ি নিছেন যে সকাল না হোতেই লম্বা ফর্দ করে অর্ডার স্লিপ পাঠাইলেন ছোটরাজ সাহেব নিজে। কাপড় জামা, গেঞ্জি, রুমাল এমন কি জুতো শ্লিপার পর্যন্ত কিছুই বাদ দেন নি। আমিও চামড়ার একটা সুটকেশ ভরে সব আনিয়ে লইছি বাড়ি গিয়ে দেখবেনখনে। হ্যাঁ—একেই বলে বাণিজ্য। খুব বরাত করছিলেন মশাই। তবে হ্যাঁ সবার মূলেই এ দীনেশ বসু। তারপর, হা হা করে হেসে উঠলেন। দোকানের সবার উৎসুক চোখগুলো একসঙ্গে আমায় বন্দী করলো। আমি অবরোধটুকু জোর করে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছোট রাজসাহেবের গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি রাজবাড়ির পথে রওনা দিলে।

আজকের আসরে ছোটরাজ সাহেবের খাস বন্ধুরা এসে পৌঁছে গেছেন। জোর পাশা চলছে। ঘরে ঢুকতেই ছোট রাজকুমার, তালচরের রাজভ্রাতা, কনিকাব কুমার বাহাদুর, সারাইকালার ছোট কুমার—আরও অনেক ভদ্রলোকদের দেখতে পেলাম। ছোট রাজসাহেব সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন,—এঁরা সবাই আপনার অপেক্ষায় বসে।

সবার অনুরোধে তখনি হারমনিয়ম নিয়ে বসে পড়তে হলো।

আজ স্বরচিত বাংলা গান শোনালাম। সবার মুখেই শুনতে পাচ্ছি তারিফ। বাঈজী মহলে যে গানগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বিশেষ করে সেই গানগুলি এঁদের সবারই মনোরঞ্জন করল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি সবারই যেন প্রিয় হয়ে উঠলাম।

রাত নটায় আমার গান বন্ধ হলো। এইবার শুরু হবে ওস্তাদ শুখদেও মিশ্রের বড় মেয়ে শ্রীমতী অলকনন্দার নাচ। গত দিনের মতো আজ আর মিশিরজী তাঁর তিন কন্যা নিয়ে এ ঘরে বসে থাকতে পাননি। অপর এক কামরায় সময় গুণছিলেন ছোট রাজকুমারের ডাকার অপেক্ষায়। তাছাড়া তাঁর মেয়েদের জন্য আজ দরকার ছিল প্রসাধন কক্ষ।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু হঠাৎ আমায় থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা বলত এটি কোন অলকনন্দা ?—বিখ্যাতা নৃত্য পটিয়সী।

উত্তরে আমি বলি,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা তাঁকে নন্দা বলেই জানতাম। পরে ইনিই ভারত বিখ্যাত নাচিয়ে হয়ে পড়েছিলেন অলকনন্দা নামে।

এঁরই মেজ বোন হচ্ছেন তারা। তারাও একজন শ্রেষ্ঠা নৃত্যসাধিকা। ইনি বিবাহ করেন এক মারাঠী যুবককে—নাম তাঁর মারুতি। এঁর ছেলেই হচ্ছেন প্রখ্যাত গোপীকিষণ !

ছোট বোনটি চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী সিতারা। সিতারার নৃত্যকলা শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরে সুদূর রাশিয়া পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত।

—ওঃ বুঝেছি—এবার বল !

অলকনন্দার নাচ শুরু হয়েছে।

একটি কানা উঁচু থালিতে রাখা একথাল জল। তারই কিনারে পা রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন অলকনন্দা—মাথায় আছে সুদীপ্ত ঝাড় প্রদীপ।

থালার কিনারে পা দুটি রেখে কথকের বোলে 'ধাতি নাড়া'র ছন্দ তুলেছেন—দ্রুত লয়ে। আরো দ্রুত !—আরও দ্রুত !!—অথচ থালার জল চলকে পড়ছে না, শুধু ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছন্দ-তরঙ্গে দোদুল্যমান।

মাথার প্রদীপ্ত দীপ সে ছন্দটুকু তালরক্ষা করে শিখায় শিখায় আলোড়ন তুলছিল।

সত্যিই চমকপ্রদ !

রাত বারটা বাজলো। অলকনন্দা সবার করতালির সাথে নাচ শেষ করলেন। বিশিষ্ট অতিথিরা সবাই অলকনন্দাকে বকশিশ করলেন।

ওস্তাদ শুখদেও মিশ্র নমস্কার—আদবরজ জানিয়ে বিদায় নিলেন একতাড়া নোট হাতে করে।

সকাল হতেই দীনেশবাবু ঘরে ঢুকে আমায় বললেন,—মশাই ব্যাডিং আনিছেন ?

আমি থতমত খেয়ে দীনেশবাবুর প্রশ্নের মানে বুঝতে না পেরে নিজের বিছানার দিকে চাই।

দীনেশবাবু বলেন,—কি দেখছেন ? না, এ চলবি না।

আমি এবার বুঝেছি তাই বেডিং সম্বন্ধে মন্তব্য করলাম ; বললাম,—কেন চলবে না ? এইতো আজ প্রায় দশবারো দিন ধরে বেশ চলে আসছে।

তিনি উত্তর দেন,—দশবারো দিন চলতে পারে তবে স্পেশিয়ল লিস্টের যাত্রীদের এ ব্যাডিং চলবিনি। নিন—উঠুন। ওই পরেশের ঘরে তক্তাপোশের নীচে বড় সুটক্যাশ ঠেসে জামাকাপড় লয়ে রাখছি—দেখেশুনে লউন। আর কিছু চাই যদি দোকানে লিস্ট পাঠিয়ে দিবেন। হ, এরেই কয় বাণিজ্য—করে লউন—করে লউন। যে কদিন লেক্ নজরে আছে করে লউন। তবে সবার যোগে আছে এই দীনেশ বসু হঃ।

তারপর সাইকেল নিয়ে এগিয়ে চলেন। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেন,—পরেশের স্ত্রীর কাছে আপনার শালটি রাখা আছে। ওটা ছোট রাজবাহাদুর আপনাকে মেজবৌদির বাড়ির গান শুনে প্রেজেন্ট পাঠায়েছেন।

আমি প্রসঙ্গ এড়াতে বললাম,—কখন আমায় আজ দোকানে যেতে হবে ?

দীনেশবাবু চোখ পাকিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন,—ক্যানটিনে টিন বাজয়ে আর হবে কি ? তার চেয়ে বাণিজ্য করুন মশাই বাণিজ্য করুন।

—তাহলে ক্যানটিন থেকে আমায় বিদায় দিলেন ?

দীনেশবাবুর আওয়াজ এলো,—হঃ।

আজকের সন্ধ্যায় আসরে সব ব্যবস্থা জানা যাবে। কে কোন গাড়িতে স্থান পাবেন। স্পেশাল সেলুন তিনখানি, তার মধ্যে একটিতে মহারাজ ও তার বিশিষ্ট বন্ধুর দল ; দ্বিতীয়টিতে ছোটরাজা সাহেব ও তাঁর বিশিষ্ট ইয়ার বন্ধুরা এবং তৃতীয়টি বিশিষ্ট রাজকর্মচারী, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট—পুলিস অফিসাররা ইত্যাদি, থাকবেন স্থির হলো।

আজ সন্ধ্যায় রাজবাড়ির পারিপার্শ্বিকী দেখে সত্যি মনে মনে ভয় হয়েছে। এই রাজ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি কত অসহায়—কত দুর্বল। তার উপর শরীরটা খারাপ। এখনও সারেনি।

হঠাৎ সারাইকালার ছোট কুমার জানালেন যে তাঁর শরীরটা খারাপ হওয়ায় তিনি বরাতের সঙ্গে রাজপুতনায় যাবেন না। বরাতের সঙ্গে কয়েকটি স্টেশন একসঙ্গে গিয়ে দেশে ফিরবেন।

তাঁকে কানে কানে আমার অসুখটুকুও জানিয়ে রাখলাম। তিনি ছোট-রাজ সাহেবকে বললেন,—এনার শরীরও ভাল নয়, রক্ত আমাশয়ে ভুগছেন। ইনি বরং আমার সঙ্গে আমার ওখানে ক'দিন থেকে হাওয়া বদলে নিন। বৌভাতে দুজনে একসঙ্গে যোগ দেবো—তাতে জমবে ভাল।

কি জানি কি ভেবে ছোটরাজ সাহেব রাজী হয়ে গেলেন। তবে কথা রইল যে একসঙ্গে একই সেলুনে আমরা যাত্রা করব।

সকাল থেকেই রাজভবন লোকে লোকারণ্য !

বেলা আড়াইটায় বরাত বাড়ি থেকে রেল স্টেশনে যাত্রা করবে। সারাটা রাস্তায় ময়ূরভঞ্জের অধিবাসীরা কাতারে কাতারে রাজদর্শনে দাঁড়িয়ে আছে।

দূরদূরান্ত থেকে লোক সমাবেশ হয়েছে। সবাই আজ রাজবাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ফিরবে। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য স্টেটের সব গাড়িগুলি দৌড়াদৌড়ি করছে।

নহবৎ থেকে শুরু করে কলকাতার থেকে আনা নামী ব্যাণ্ডপার্টিরা পালা করে বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

রাজবাড়ির অতিথিদের মাঝে যেন হারিয়ে গেলাম। সবাইকে নির্দিষ্ট ব্যাজ্ দেওয়া হয়েছে। সেই ব্যাজ্ দেখে স্পেশাল ট্রেনের কামরাগুলি রিজার্ভ করা।

রাজার শোভাযাত্রার পূর্বেই ছোট রাজার বিশিষ্ট বন্ধুরা তাঁদের বিশিষ্ট সেলুনে গিয়ে উঠে—ছোট রাজের প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুণছেন।

এ হেন রাজসিক পরিবেশে পড়ে আমি নিজেকে হারিয়ে বসেছি। কানের কাছে অনবরত দীনেশবাবুর কথাগুলো ভেসে আসছে—করে লউন মশাই করে লউন—এর নাম বাণিজ্য। ভাবছি এ আমার জয় না পরাজয়।

বারিপদা স্টেশনের গগন ধ্বনিত হলো রাজা সাহেবের জয় গানে।

ট্রেন ছাড়লো তখন ৩-৩০ মিনিটে।

সারাপথেই জনসমাগম। সুদূর গ্রামবাসীরা রাজদর্শনের অভিলাষে রেল লাইনের দু ধারে ভিড় জমিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের সামনে দিয়ে ট্রেন পাশ করার সময় জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলছে। এমনি করতে করতে বারিপদা থেকে রূপসা পৌছতে ট্রেন প্রায় দুঘণ্টা লেট হয়ে গেল। লেটে কারো কিছু যায় আসে না—সবাই যখন বরাতি যাত্রী। রূপসা

থেকেও স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা। ট্রেন যখন রূপসা ছাড়লো তখন প্রায় রাত আটটা।

ছোটরাজের স্পেশাল সেলুনে পাশা পড়েছে, তার সঙ্গে চলছে আমার গান। খেলার মাঝেও তারিফের অন্ত নেই।

মনটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এ যেন নেমন্তন্ন বাড়ির বৈঠকে গান হচ্ছে। গাইয়ে গেয়ে চলেছে—দলে দলে নিমন্ত্রিতরা আসছে, খাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যারা তারা দায়ে পড়ে গান শুনছে—খাওয়ার ডাক এলে যে যার সাজানো পাতের সন্ধানে ছুটে চলে যাচ্ছে। গানের এ যে কত বড় অপমান সেইটেই মনকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তবু গাইতে হচ্ছে।

দীনেশবাবুর কথা স্মরণ করিয়ে দিল—

মনে হলো গান বন্ধ করে দি। কিন্তু, এতবড় বেফাঁস কাজ করলে হয়ত ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে না দেয়।

এমনি করে ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। রাত দশটায় সারাইকালার কুমার বলেন,—এইবার আমি নেমে পড়ব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন নাকি?

দলাদলি শুরু হলো। কেউ বলেন—থেকে যান, অসুখ সেরে যাবে'খনে। কেউ বলেন—না, সেখানে গিয়ে বাড়লে পরে বিপদ হবে।

গাড়ি স্টেশনে ঢুকছে। ছোটরাজ সাহেব আমার দিকে চেয়ে ইসারায় অনুমতি জানালেন,—ছোট কুমারের সঙ্গে একসঙ্গেই ফিরছেন তো?

আমি বলি,—নিশ্চয়ই!

ময়ূরভঞ্জের ছোটরাজ সাহেবকে ছেড়ে এবার যাত্রা শুরু হলো সারাইকালার ছোট কুমারের সঙ্গে।

আট

সারাইকালার রাজ্যটি সত্যিই সুন্দর। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও রাজ-পরিবারের প্রাচীন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টাটুকু প্রতি পর্যায়ে প্রতীয়মান হয়।

সরাইকালার শ্রেষ্ঠ দেশীয় নৃত্য হচ্ছে—'ছৌনৃত্য'। রাজপরিবার গোষ্ঠীর সবাই এই ছৌনৃত্যে পারদর্শিতা লাভ করেছেন।

পরদিন আমায় নিয়ে বসে গেলেন এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

ছৌনৃত্যে গোষ্ঠী নাচ থেকে শুরু করে প্রায় সর্বপ্রকার নৃত্যের সম্ভারে এ অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিশেষে ছোটকুমারের 'ময়ূরনৃত্য'—আমার জীবন-অধ্যায়ে এক ছাপ রেখে গেছে।

'মত্ত-ময়ূর' ছন্দে পুরাকালে বুদ্ধোত্তর যুগে বহু নৃত্য-পারদর্শিনী নটী যে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন এ যুগে ছোট কুমারের ময়ূরনৃত্যের মধ্যে তার প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়।

আষাঢ়ের মেঘ সমাবেশে ময়ূরের কি ভাবাবেশ হয়, প্রথম বর্ষণে কেমন করে সে পাখা মেলে নেচে বেড়ায়,—ময়ূরীর প্রেমে অভিসারে কেমন করে সে মত্ত-যাত্রা করে, প্রেমনিবিড় বন্ধনে সে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে পা ফেলে ভ্রমণ করে, নিবিড় আলিঙ্গনের পর নিজের প্রেয়সীকে কেমন করে ফিরে ফিরে চায়, তার অদর্শনে কি ভাবে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকে —সবই তাঁর ময়ূর-নৃতের অনবদ্য দানে পর্যবসিত করেছেন।

জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের শ্লোকে আছে—'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানাম্।'—রাধার আগমন প্রতীক্ষায় কৃষ্ণের অপেক্ষা—'রচয়িত শয়নং সচকিত লোচনং পশ্যতি তব পন্থানম্॥'

এই নাচে ছোটকুমারেরও ময়ূরের এই প্রতীক্ষা প্রতি পত্রপাতে সচকিত নয়ন—বার বার পথপানে প্রলুব্ধে চাওয়ার পূর্ণ প্রকাশ করে দেখালেন। পেছন থেকে সেদিন আমি গীতগোবিন্দের এই শ্লোকটি না গেয়ে থাকতে পারি নি।

সত্যি এই পদ সংগীতের সঙ্গে ছোটকুমারের ময়ূরের এই তিতিক্ষাটুকু এতই সুপ্রকাশিত হয়েছিল, যে সমস্ত দর্শকেরই সেদিন চিত্তাকর্ষণ করেছিল।

সারাইকালার 'ছৌনৃত্যের' ঐতিহাসিকতা কিন্তু লোকনৃত্য মাত্র—তবু তাকে উচ্চাঙ্গের যে কোনো অভ্যাদয়িক নৃত্যের পর্যায়ে ফেললে বেমানান হয় না।

নাচ ব্যতিরেকে এরা যে দেশী যন্ত্রের ঐকতান সজ্ঞ গড়ে তুলেছিলেন তাও প্রশংসার যোগ্য।

এছাড়াও গান বাজনার রীতিমতো চর্চা এই রাজ পরিবারের অন্তর্গত। গানের আসরে সবাই সুন্দর গাইলেন। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি পর্যন্ত সবেরই অপর্যাপ্ত পরিবেশ হলো।

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। বন্ধুত্ব জমেছে যথেষ্ট। সাত দিনের দিন আমরা দুজনে আবার বারিপদায় ফিরে এলাম।

আরও একদিন পরে এলেই ভাল করতাম কিন্তু ছোটরাজ সাহেবের রাণী নিয়ে ফেরার দিনই আমরা পৌছলাম।

রাস্তায় বাঁধা রোশনি। হাতী থেকে শুরু করে মোটর গাড়ি, সর্বশেষ সাইকেল পর্যন্তর শোভাযাত্রার বর ও কনে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

আজ সাতদিন ধরে বারিপদা নগর উৎসব মুখর!

রোজই প্রায় অনুষ্ঠান—

স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, বাঈজী, পাঁচালী, যাত্রাভিনয় দিনের পর দিন প্রতি সন্ধ্যায় রাজভবনের প্রাঙ্গণটিকে প্রতিধ্বনিত করে তুলতে লাগলো।

মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনীত 'আত্মদর্শন' নাটকের বিবেকের ভূমিকায় শ্রীমতী আঙুরবালা তাঁর গান শুনিয়ে প্রচুর পুরস্কার পেলেন।

তাঁর গান কখানি গলায় তুলে নিয়ে রাখতে অনুরোধ জানালেন ছোটরাজ সাহেব।

আজ দুপুরে বাড়ির মেয়েদের মাঝে সেই গান আমায় বিতরণ করতে হলো। সবাই মুগ্ধ হয়ে গান শুনলেন। রাজকীয় কেতা অনুযায়ী নবাগতা ছোটরাণী সাহেবা আমায় একটি স্বর্ণমণ্ডিত বাঘের কণ্ঠ-হাড়ের মাফলার পিন্ উপহার দিলেন। বাঘের কণ্ঠ-হাড়কে ইংরাজরা বলে Lucky bone অর্থাৎ সৌভাগ্যের লক্ষণ তাই, এই পিনটির নাম Lucky pin.

আজ রাত্রে উৎসব মঞ্চে আমায় শত অতিথির সামনে বসে গানের নিমন্ত্রণ এসেছে। আজ নাকি শুধু বাংলা গানেরই আসর। কাল ক্ল্যাসিক ওস্তাদদের।

বিকেল বেলায় দীনেশবাবু এসে আমার হাতে তুলে দিলেন—চুড়িদার পায়জামা, শিরোস্ত্রাণ আর এক বিরাট বাঁধাই পাগড়ী। এই বেশেই আমায় রাজপ্রাসাদের রাজ-আসরে বসে গান করতে হবে।

আমি সটান ইন্‌কার করে বসলাম। বললাম,—মশাই আমি তো আর পাগল হতে যাইনি যে ঐ বিশ্বম্ভর পোষাকে নিজেকে বিশ্বেশ্বর সাজিয়ে সবার সামনে বসতে হবে? তাছাড়া ওই জগঝম্প পোষাক পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে সংগীত বস্তুটি আমার অন্তর থেকে অন্তর্ধান করবে।

পরেশবাবুর স্ত্রীর অনুরোধে পোষাকটিকে নিয়ে ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তির পর গায়ে ওঠালাম। শীতের দিনেও ঘেমে গেলাম। পরেশবাবুর স্ত্রী এসে সেলাম করে বললেন,—ওস্তাদজী নমস্তে!

টেনে খুলে ফেললাম পোষাকটিকে।

দীনেশবাবুর চক্ষুস্থির। এ পোষাক না পরলে বারিপদা হতে আমার প্রাণ নিয়ে আর ঘরে ফিরতে হবে না। হয়ত ছোটরাজ সাহেবের এতে অপমান করা হবে। কিন্তু যখন আমি কিছুতেই ওই সঙের পোষাক পরতে রাজী হলাম না তখন সত্যই দীনেশবাবু প্রমাদ গুণলেন।

রাত সাতটা বেজে গেছে—ফিরে গেছে ছোটরাজ সাহেবের কাছ থেকে পাঠানো রথ। দীনেশবাবু—হায়-হায় করে উঠলেন।

এমন সময় মোটর নিয়ে এসে হাজির হোলেন সারাইকালার ছোটকুমার নিজে। ব্যাপার কি—আমি কি অসুস্থ হলাম নাকি?

পরেশবাবু ছোটকুমারকে সারা ইতিবৃত্ত খুলে বলেন। হেসে ওঠেন সারাই-কালার ছোটকুমার। আমার ঘরে এসে ঢোকেন। আমি ততক্ষণ ধুতি পাঞ্জাবিতে বিভূষিত হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি।

ঘরে ঢুকে তিনি বলেন,—এই তো বাঙালীর চিরন্তনী সনাতনী পোষাক। বাঃ বাঃ বেশ। নিন চলুন মশাই—সবাই আপনার অপেক্ষায় বসে।

রাজভবনে এসে পৌছলাম রাত আটটায়। সাদর অভ্যর্থনার মাঝে ছোটরাজের বন্ধুমহল আমায় সম্ভাষণ জানালেন। সারাইকালার ছোটকুমার ছোটরাজসাহেবের কানে কানে কি যেন বলছিলেন। ছোটরাজসাহেব মৃদু হেসে বললেন,—এই জন্যে দেরি? কি ছেলেমানুষ আপনি মশয়! ওটা আপনাকে সম্মানিত করা হয়েছে নিমন্ত্রণ পত্র হিসাবে। পরা না পরা আপনার অভিরুচি। তাছাড়া ও পরে, কারোরই গান করা সম্ভব নয়।

আসর মঞ্চে ওঠার সময় সারাইকালার কুমার কানে কানে বলে দিলেন আজ আর অন্য কিছু নয়—স্রেফ বাঙলায় গজল্ আর ঠুংরী।

কিন্তু, আসর মঞ্চে উঠে আমার যেন সব গুলিয়ে গেল। আসর যে এত দর্শক সমাকীর্ণ তা পূর্বে উপলব্ধি করতে পারি নি। আসর-মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমার সামনে জন-সমুদ্র! যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু দর্শক আর শ্রোতা!

আমি সবাইকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে তানপুরা বেঁধে নিয়ে সুর জুড়লাম। সঙ্গতী ইসারায় জিজ্ঞেস করলেন—তবলা না পাখোয়াজ। আমি পাখোয়াজটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। সারাইকালার ছোটকুমার খুশী হলেন না।

ইমন-কল্যাণ চৌতালে বাঙলা ধ্রুপদ শুরু করলাম। গানখানি নববধূ ও বরের কল্যাণে স্বরচিত। সবাই উন্মুখ হয়ে গানের ভাষা পান করতে থাকেন। পরিশেষে গানের সমাপ্তিতে নবদম্পতীর জয়ধ্বনির সঙ্গে তেহাই দিয়ে শেষ করলাম। করতালিতে সারা রাজ-অঙ্গন ভরে উঠলো। হঠাৎ স্টেজের উপর একটি আট-দশ বছরের রাজকুমার উঠে এসে, আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। আবার করতালিতে অঙ্গন মুখরিত।

তানপুরা ঠেলে রেখে, হারমনিয়ম টেনে নিই। পাখোয়াজ নামিয়ে সঙ্গতী তবলায় হাতুড়ি মারেন। সারাইকালার ছোট কুমারের মুখ খুশীতে ভরে ওঠে। গাইলাম বুঢ়ামঙ্গলে বিদ্যাধরীর জন্য রচিত সেই গজল—'বাজেনা-বাজেনা আর শ্যাম বেণু মধুরাতে'—আর ঠুংরীতে জদ্দান বাঈএর গাওয়া গান—'এলোরে বাদল…'

জানি না—অদৃশ্য ভগবানের সহায়তা পেয়েই বোধ হয় সে রাত্রে এই বিরাট জনসম্মিলনীর সামনে মান অক্ষুণ্ণ রেখে ঘরে ফিরেছিলাম। গান হলো প্রায় তিনঘণ্টা একাদিক্রমে। প্রত্যেকটি শ্রোতার কাছে সুখ-শ্রাব্য হয়েছিল।

মধ্য আসরেই ছোটরাজসাহেব সবার সমক্ষে আমার হাতে একটি হীরার আংটি পরিয়ে দিয়ে আমায় সম্মানিত করেছিলেন।

গান শেষ হলে সারাইকালার ছোটকুমার আমায় আলিঙ্গন করে অভিনন্দিত করেন।

এরপর থেকে ছোটরাজসাহেবের সব বন্ধুরা আমায় নিয়ে আলোড়ন তুললেন। সবার বাড়িতেই আমায় নিমন্ত্রণ জানালেন। বুঝলাম উড়িষ্যা বাণিজ্যপ্রধান দেশ। দীনেশবাবুর কথা মনে পড়ে গেল—হঃ, এরেই কয় বাণিজ্য—করে লউন —করে লউন।

নয়

সারা উড়িষ্যা প্রদক্ষিণ করে কলকাতায় যখন ফিরলাম তখন শীতের অন্ত হয়ে মধুঋতুর সমাগম হয়েছে। বাণিজ্যের সম্ভারে পণ্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠা। কলকাতার বিশিষ্ট অ্যারিস্টোক্র্যাট মহলে আমার ভূয়সী প্রতাপ।

এই সূত্রের খেই ধরে আমার একদিন ডাক পড়লো বেলেঘাটার নস্করদের বাড়িতে।

তৎকালে জেলে পাড়ার সঙ কলকাতার একটি প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। বাঙলা-দেশের রাজনৈতিক থেকে স্ব স্ব নৈতিক জীবনের বাৎসরিক ভুলভ্রান্তিগুলিকে গানের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরাই ছিল এ অনুষ্ঠানের প্রধান কাজ। সারা বছরের ভুল ভ্রান্তি অর্থাৎ Follies of the year যেমন রিভিউ করে বৈদিশক দল—এও কতকটা সেই রকম। নস্কররা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মণ্ডলীর একজন প্রমুখ সভ্য। তাই শ্রীযুত হেম নস্কর মহাশয়ের নিমন্ত্রণ এসেছে।

হেমদার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রভাতদার ক্যালকাটা সেণ্ট্রাল ক্লাবের সৌজন্যে। আমার গান তাঁর ভাল লাগে তাই, এই অনুষ্ঠানের কবিতাংশে সুরারোপের কতকাংশের ভার আমায় দিতে চান। আমি তা বহু ভাগ্য বলেই গ্রহণ করলাম।

শুনেছি এর প্রতিপাদ্যাংশ রচনা করতেন স্বয়ং রসরাজ শ্রীঅমৃতলাল বসু। হয়তো অন্যান্য কবিদেরও কিছু কিছু অবদান থাকতো কিন্তু তাঁদের নাম আমার আজও অজানা তাই তাঁদের উদ্দেশেও প্রণাম জানাই।

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এই জেলেপাড়ার দল সেজেগুজে দলে দলে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলতেন গাইতে গাইতে। ভিড়ের মাঝে আসর রচনা করে নিয়ে, প্রতিপাদ্য বিষয়টি নেচে গেয়ে, রঙ্গে ব্যঙ্গে সবাইকে শোনাতেন। তাই নাম হয়েছিল তার 'সঙ'।

বাবার বন্ধু বলেন,—এর পদ্যাংশের কিছু কি তোমার মনে আছে?

আমি বলি,—সেই কথাই বলছিলাম। সেকেলে পূর্বপুরুষের উপার্জিত ধনে একদল বড়লোক—'বাবু' পর্যায় উঠে প্রতি সন্ধ্যায় চৌঘুড়ী হাঁকিয়ে,

বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিলাতী মদে মত্ত হয়ে, দু-দশজন নর্মপ্রিয়া বা ভাড়াটে সঙ্গিনী নিয়ে বাগানবাড়িতে রাত্রি যাপন করে—ভোর রাতে তাঁরা বাড়ি ফিরতেন। এই নিয়ে তাঁদের গর্ব, শৌর্য ও বীর্য। কেউ হয়ত নেশার দায়ে বাবুহুণ্ডী কেটে একরাতে কাপ্তেন সাজতেন। সেই সম্বন্ধে কটাক্ষ করে একটি গান পেলাম—

"আছে মরা বাপের আমদানী!
আমি সেই সুবাদে করি বাবুয়ানী।
সকাল দশটায় নিদ্রা ভাঙে, আড়মোড়া খাই শুয়ে,
দুই চাকরে মর্দন করে, হাতে পায়ে, গায়ে,
পাথর দিয়ে আটকে আছে, কেমনে চক্ষু-তুলি
রাত-খোঁয়াড়ি ভাঙতে গেলে, আবার বোতল খুলি,
মাথার তেলোয় মালিশ করে 'আতর'—চাকরাণী।
আমি সেই সুবাদে করি বাবুয়ানী॥"

আবার গৃহিণীদের উপর কটাক্ষ করে গান বেঁধেছেন—

"সংসারে চায় গৃহলক্ষ্মী সরু কাপড় গয়না,
গয়না পেলে ধনী, হেসে কথা কয় না।
একটি পয়সার মুড়িমুড়কী পিতামাতা পায় না,
আর ক্ষীরের তক্তি লেডিকেনী, নইলে ধনী খায় না॥"

বাবুদের তৈলমর্দন নিয়ে ব্যঙ্গ করে তেলেনী সুন্দরী গাইছে—

"আমার তেলের দোকান তাইরে,
তৈল বিনা সুখ সুবিধা এই দুনিয়ায় নাইরে॥"

ইংরেজদের পা চেটে, অনুকরণ যাঁরা করেন, তাঁদের নিয়ে শ্লেষ দিয়ে গেয়েছেন—

"ও গোরা ফরসা তোমার পা-দুখানি, মাথায় রাখো যদি,
চৌদ্দ পুরুষ ধন্য হব, আমার শক্ত হবে গদি।"

ইংরেজী আমলের প্রতিবাদের জন্যে গেয়ে উঠেছেন—

"আজ শ্বেত ইঁদুরে করলো ঝাঁঝর বৃন্দাবনী শাড়ি,
বস্ত্রহরণ পালা হবে—আয়োজন যে তারি,
আজ, সামলে রাখো ঘরের ঝি-কে কাজের অবকাশে।
আজ, রং লেগেছে ভোরের আকাশে॥"

দেশের নৈতিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দৃষ্টিপাত ছাড়াও থাকতো বাঙালী জাতির উন্নতির মন্ত্র—

"বাঙালি—কাঙালি কেরানী কেন হও।
ইংরেজী বুলি ছেড়ে ব্যবসায়ে রত রও॥"

এছাড়া, বহু ছড়া, কবিতা, আবৃত্তিতে রঙ্গরস-ব্যঙ্গরস মিশ্রিত শ্লেষে বাঙালী জাতির চরিত্র উন্নতি করার সুপ্রচেষ্টা জেলেপাড়ার সঙের ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

চৈত্র সংক্রান্তির দুপুরে, বেলা বারোটা পর্যন্ত সাজ সজ্জা করে এই দলগুলি রাস্তায় বার হতেন—বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলে। সঙ্গে থাকতো বড় বড় মোষের গাড়ির উপর মাচা বাঁধা স্টেজ। তার চারপাশটিতে নারিকেল পাতা দিয়ে সুসজ্জিত। অভিনেতাদের সুবিধের জন্যে সঙ্গে থাকতো খাবার জল। এমন কি কিছু কিছু খাবারও সঙ্গে সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হতো।

সমস্ত দল, বহুবাজার স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে আবার বহুবাজার নেবুতলায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের ডেরায় ফিরে যেতেন। এই অভিনয়-শোভাযাত্রাকে ঠিক বারোটায় যাত্রা করে ঘরে ফিরতে হতো অন্তত রাত দশটা।

পথের দুধারে জনতা। মধ্যপথে গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ রাস্তায়, দলে দলে লোক হাতে হাত ধরে গোল বেষ্টনী করে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো। পথচারী অভিনেতা বা পুরুষবেশী নারী অভিনেত্রীরা, এই সব গোলাকৃতি মণ্ডপে জনতার মাঝে দাঁড়িয়েই অভিনয় করতেন, গান করতেন, পায়ে ঘুঙুর দিয়ে নাচতেন।

একদল একটি বাহু-বেষ্টনী থেকে রেহাই পেতে না পেতেই বন্দী হোতেন অপর জনব্যূহ বেষ্টনীতে। মহিষের গাড়িতে বাঁধা স্টেজে যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা মোড়ে মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একই নাটিকা বার বার অভিনয় করতেন।

সারা কলকাতার লোক জড় হতেন এই সঙ-উৎসবে। মধ্যে মধ্যে এত বেশী ভিড় হতো যে ভিড়ের চাপে বহু মানুষ জ্ঞানহারা হতেন। বহু শিশুর প্রাণান্ত ঘটেছে।

আমার এই অভিনব অনুষ্ঠানে সুরারোপের খবর পেয়ে বন্ধুরা এসে জড়ো হয়েছেন মোড়ে মোড়ে। আমার দলের মধ্যে আছেন আমার পূর্বতন বৈকালীন আড্ডার সায়েন্স কলেজের বন্ধুরা, বিশেষ করে 'ইউ'।

একটির পর একটি দল তাদের গান শেষ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ ইউ একটি গয়লানী-বেশী সঙ ধরে নিয়ে এলো সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাহু বেষ্টনীর ব্যূহ-চক্র ভেদ করে।

গয়লানীর কোমরে ও মাথায় দুধের কেঁড়ে, পায়ে ঘুঙুর। মেয়েলী ঢঙ করে সে হাত মুখ ঘুরিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে গাইছে—"জল মেশানো দুধ নহে মোর, দুধ মেশানো জল"। সুরটি বিদ্যাসুন্দরী। এ সুরারোপ আমার। ইউ বলে—best of the lot—খুব সুন্দর সুর হয়েছে।

পাঁচটা বেজে গেল, আমরা শ্রান্ত হয়ে উঠলাম সায়েন্স কলেজের খোলা ছাতে—খোলা হাওয়ায়।

ছাতে বসে জেলেপাড়ার সঙেরই আলোচনা চলেছে। দেশ সংস্কারে এগুলির প্রয়োজনীয়তা যে কতদূর সে সম্বন্ধে জোর করে বলেন প্রফুল্ল বোস। তার প্রতিবাদে আমাদের মধ্যে কে যেন বলেন,—এতে দেশের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জ্যাঠামো শেখানো হচ্ছে।

পেছু হতে ঘোর প্রতিবাদ এলো—স্যার পি. সি. রায়ের নিকট থেকে। তিনি কোন ফাঁকে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বললেন—এই জেলেপাড়ার সঙ শুনে বরিশালের অশ্বিনী দত্ত মশাই দেশের কুসংস্কার দূর করার জন্যে বসিয়েছেন তাঁব প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দাসের যাত্রার দল। জাতের সংস্কার হলেই সারা দেশের সংস্কার, বুঝলি ?

আমার দিকে চেয়ে বলেন,—তোর কি খবর রে ? অনেকদিন আসিস্ নি কেন ?

প্রফুল্ল বোস মশাই বলেন,—ও এবার জেলেপাড়ার সঙে কিছু কিছু সুর যোজনা করেছে।

—তাই নাকি ? তুই মুকুন্দর গান শুনেছিস ?

—হ্যাঁ, শুনেছি। সবটা মনে থাকে না তাই ওঁর ভাবে নিজেও কিছু কিছু গান লিখেছি।

স্যার বলেন,—বটে ! তাই নাকি—কৈ দেখি কি লিখেছিস ?

স্যার পি. সি. রায়ের কাছে ভণিতা চলে না। তাই, দ্বিরুক্তি না করে গান শোনাই—

> আজ ভিড় জমেছে দিয়ার জলুস ঘিরে,
> ওরে ও পতঙ্গেরা যাস না হোথা পুড়বি তোরা আয় ফিরে।

ওখানে চাঁদীর মেলা, চাঁদের মেলা,

নবাবজাদার খুশ-খবর,

তোরা যে গরীব প্রজা, বড্ড সোজা,

তোদের হোথা কৈ আদর ?

তোদের ছেঁড়া কাঁথার দাম দেবে যে চিনে নে সেই মা-টিরে।

চুমকির চক্‌মকানি,-ঝক্‌মকানী—সে ধম্‌কানি

দেবেরে চোখ ধাঁধিয়ে—

তোদের ও বলদ ও হল, কাস্তে-কোদাল, করবে বেহাল,

হাতেরে মচকে দিয়ে—

তার চেয়ে মাটিই ভালো, মা-টি ভালো

আয় মাটির মন্দিরে !

গান শেষ হলে স্যারের চোখে দরদর ধারে অশ্রুবন্যা বইছে দেখলাম। হঠাৎ আমায় জড়িয়ে নিয়ে আদর করে বলেন,—তোর কাজকর্ম কিছু হলো ?

আমি হেসে বললাম,—অমিয় ব্যবসা করবার সুযোগ করে দিয়েছিল—কিন্তু ফিরে এলাম বাণিজ্য করে।

তিনি হেসে বলেন,—বাণিজ্য কিরে ?

আমি তখন ছোট্ট করে আমার বাণিজ্যের ইতিহাসটুকু তাঁকে জানালাম।

উনি খুশী হয়ে বলেন,—বেশ করছিস ! এবার ওদের সব ধরে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল।

রাত দশটা বেজেছে—সবাইকে নিয়ে স্যার নীচে নেমে গেলেন। ঘরের দরজা থেকেই সবাইকে ছুটি দিলেন।

দশ

বাড়ি ফিরে শুনলাম এক ভদ্রলোক সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত আমার অপেক্ষায় বসে থেকে চলে গেয়েছেন। যাবার সময় একটি পত্রাঘাতও করে গেছেন।

উপরে উঠে শোবার ঘরে পত্রখানি পেলাম। জামা-কাপড় না খুলেই পত্রখানি পড়তে শুরু করলাম। বিখ্যাত ইম্প্রাসারিও হরেন ঘোষ মহাশয়ের ভাই চিঠিখানি লিখেছেন। তাঁরা ক'জন বন্ধু মিলে কাল দার্জিলিং যাত্রা করবেন,

আমারও নিমন্ত্রণ। পুনশ্চে লিখেছেন—জামাকাপড় বেডিং ছাড়া যা কিছু ব্যয় তাঁরাই বহন করবেন, খালি আমার যাওয়া চাই-ই চাই।

চিঠিটা ভালই লাগলো। দার্জিলিং যাবার ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য ছিল না কাজেই এ সুযোগ হারাতে চাই না। জামা-কাপড় ও শাল বারিপদার বাণিজ্যে অভাব হবে না, কিন্তু একটা চেস্টার (বড় লম্বা গরম কোট) অন্তত থাকা দরকার।

পরদিন সকালে আমার বাল্যবন্ধু বিভূতি দত্ত ওরফে সিধুর ওখানে যাবো স্থির করলাম। সিধুর গরম চেস্টার আছে। ওটা পেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সকাল হতেই সিধুর বাড়িতে গেলাম। সিধু থাকে ওর মামার বাড়িতে। সিধুর নতুন মাইমা আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি গোপাল ভক্ত। বৈশাখে গোপালের শীতল ভোগ খেতে কতবার নতুন মাইমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। নতুন মাইমার একটি মাত্র মেয়ে—কণা, তখন ছেলেমানুষ কত কাঁধে পিঠে চড়েছে। নতুন মাইমার বাপেরা কলকাতায় বিরাট নামজাদা লোক।

বড় হয়ে সিধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম। গোপালের মন্দিরে বসে ভজন গেয়ে শোনাতাম। তারপর বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নি।

সিধু আমায় দেখেই বলে,—তোরই বাড়ি আমায় এখনি ছুটতে হচ্ছিল। নতুন মাইমার বড্ড অসুখ। তোর গান শোনাবার জন্যে বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন।

আমি বলি,—তা হবে'খন।

—হবে'খন কিরে?—এখনি ওপরে চল, উনি অপেক্ষা করছেন। ডাক্তাররা সবাই জবাব দিয়ে চলে গেছেন। উনি বললেন—সিধু, মরণকালে যদি তোর বন্ধুর ভজন শুনে মরতে পারতাম।

মনটা কেমন করে উঠলো। কথার উত্তর না দিয়ে সিধুর সঙ্গে ওপরে উঠে গেলাম। বারান্দায় সিধুর নতুন মামা মাথা নীচু করে যাচ্ছেন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলাম নতুন মাইমা মাথার চুল এলো করে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে তাঁর একমাত্র মেয়ে কণা মায়ের মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে। আমায় দেখে কণার চোখে জল গড়িয়ে পড়লো। এক ফোঁটা জল নতুন মাইমার কপালেও বুঝিবা পড়লো।

উনি চোখ মেলে চাইলেন, বললেন—ছিঃ কাঁদছিস কেন? সবাই কি চিরদিন বেঁচে থাকে যে তোর মা বেঁচে উঠবে!

আমি ধীরে ধীরে বিছানার পাশটিতে একটি মোড়ায় বসে পড়লাম এবং বিনা অনুরোধেই ভজন শুরু করলাম।

'হৃদ বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে বিহর হৃদয়শ্যাম !'

এ গানখানি নতুন মাইমার বড় প্রিয় ছিল। আজ তাই গেয়ে উঠলাম। একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে তিনি পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজিয়ে শুনতে থাকেন। শুনতে শুনতে চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

গান থামলো, তবু তিনি তন্ময় !

কণা বলে,—আপনি সেই গানখানা মাকে শোনান না, সেই গোপালের গানখানা।

আমি কণার কথার উত্তর না দিয়ে গান ধরি। এ গানও নতুন মাইমার বড় প্রিয় গান—তবে হিন্দী।

'দেখো রে এক বালা যোগী—দ্বারে মেরি আয়া হ্যায়।

কানেমে কুণ্ডল, গলে তুলসী মালা, যোগী, ভালা কৌপীন পীন্‌হা হ্যায়।

অন্দরসে নন্দরাণী, নিকষি মতিয়ানা থালি ভরায়া হ্যায়।

বলে ভিক্ষা লেও—ভিক্ষা লেও—মেরা গোপাল তুকো ডরায়া হ্যায় ॥'

গানের মাঝেই নতুন মাইমা ফুঁপিয়ে ওঠেন। বুঝলাম এ-কান্না তাঁর ভক্তির চরম অভিব্যক্তি।

আমি গেয়ে চলি—

'এতেনী বাত্ শুনকে যোগী বলে—মাঈ নন্দরাণী

ম্যয় ন্ চাহি তেরি দৌলৎ দুনিয়া—ন্ চাহি তেরি কাঞ্চন মায়া,

তেরি গোপালকো মু থোড়া দেখ্‌লায়ে দেনা,

ম্যয় শিউ, উসি দরশনে আয়া হ্যায় ॥'

গান থামলো। সম্বিতে ফিরেছেন নতুন মাইমা—আমার দিকে হাত বাড়ালেন। আমি আমার ডান হাতখানি এগিয়ে দি। তিনি সেই হাতখানা কাছে টেনে নিয়ে কণাকে বলেন,—কাছে আয়।

কণা মাথার কাছ থেকে উঠে পাশে এসে দাঁড়ালো। তিনি কণার বাঁ হাতটি নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন,—কণাকে তোমাদের কাছেই রেখে গেলাম। সাক্ষী রইলো সিধু আর আমার গোপাল।

হাতটা আমার কেঁপে উঠলো !

আমাদের হাত দুটো হঠাৎ, তারপর স্খলিত হয়ে পড়লো—যেন ছেড়ে

দিলেন। কারো মুখে কথা নেই। সিধু নিশ্চুপ চেয়ে থাকে ওই সমাধিস্থ নতুন মাইমার মুখের পানে—ও যে স্পন্দনহীন!

হঠাৎ কি যেন বুঝে কণা মা-মা করে কেঁদে নতুন মাইমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়লো। আমি আর সিধু যেন কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

বাইরে থেকে নতুন মামা ছুটে এলেন। ছুটে এলেন সিধুর ডাক্তার দাদা। নাড়ী টিপে চোখ দেখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পা টিপে টিপে বাইরে এসে বারান্দার রেলিং ধরে ভাবতে লাগলাম—এই তো সেদিন, বছর দুই আগে, পুজোর ছুটিতে সিধু শিমুলতলায় গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল নতুন মাইমা কণা নতুন মামা আর সিধুর বর্মার মামা মামী। ওঁর বর্মা থেকে এসেছিলেন ওঁদের একমাত্র মেয়ে প্রতিভার বিয়ে দিতে। পূজার সময় কলকাতায় থেকে সম্বন্ধ ঠিক করে শিমুলতলায় নতুন মাইমার সঙ্গে হাওয়া খেতে গেছিলেন।

সেই সময় হঠাৎ সিধুর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে শিমুলতলায় ওদের বাড়িতেই অতিথি হয়েছিলাম।

কণা তখন মাত্র বার-চোদ্দ বছরের কিশোরী।

মনে পড়ে, শিমুলতলায় যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখনও ভোরের আলো দেখা দেয়নি। সিধুর নির্দেশমতো ওদের বাড়ি খুঁজে যখন বার করলাম তখন সিধু বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। হাঁক ডাকে সিধু বেরিয়ে আসে। বলে,—কি রে এসে গেছিস, আয়। ওর ঘরটিতে নিয়ে গিয়ে বলে, এখনও ভোর হয় নি, শুয়ে পড়!

রাত্রে ট্রেনে ঘুম না হওয়ায় সিধুর কথায় রাজী হয়ে, ওরই পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন ওখানে শীতের আমেজ। সারা শরীর ঢেকে নিয়েছি সিধুরই একটি র‍্যাপার।

হঠাৎ সারা শরীরে ধাক্কা পেয়ে জেগে উঠি; শুনছি যেন এক কিশোরীর কণ্ঠস্বর। বলছে,—এই সিধুদা ওঠো না! কাল বলেছিলে তো খুব ভোর ভোর স্টেশনে যেতে হবে তোমার বন্ধু আসবেন। ওঠো, কত ঘুমুবে?

আমি ভাবি একি স্বপ্ন দেখছি। না কি—এ কণার কণ্ঠস্বর।

একটান মেরে র‍্যাপারখানা সরিয়ে নেয়।

হঠাৎ চোখের সামনে দেখি একটি সুন্দরী ষোড়শী। আমার দুর্দশা দেখে হাসতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে।

চার চোখের মিলন হতেই ষোড়শী লজ্জায় লাল হয়ে উঠে পালায়।

সঙ্গে সঙ্গে সিধু এসে ঘরে ঢোকে। একটু আগে ও উঠে মুখে হাতে জল দিতে গিয়েছিল। বললে,—কে ডাকছিল রে, টেঁইয়া বুঝি!

—টেঁইয়া?

সিধু বলে,—বর্মার মামার মেয়ে। আয় তোর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দি। সিধু ডাকে,—টেঁইয়া, এই টেঁইয়া, আয় আয় এদিকে আয়।

টেঁইয়া এসে ঘরে ঢোকে। লজ্জায় তখনও ওর ফরসা মুখখানি রাঙা হয়ে রয়েছে। আমারও অবস্থা তথৈবচ। দুজনের পরিচয় হয়ে গেল। তারপর তিনজনে ভোরে ভোরেই একচক্র ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। চলার পথে বলা শুরু হয়। ক্রমে আড়ষ্ট ভাব কেটে গিয়ে আলাপ জমে ওঠে।

ক্রমে দুজনের মাঝে গড়ে ওঠে হৃদ্যতা। কিশোরী কণা এসে বিপত্তি ঘটায় দুজনের মাঝে। দুজনেই অস্বস্তি বোধ করি। কথায় কথায় আমি কণাকে বলেছিলাম,—একটা চিজ্! ঠোঁট ফুলিয়ে কণা চলে যায় অন্যত্র। চোদ্দ বছরের মেয়ের মনে জেগে ওঠে জেলাসি।

টেঁইয়া বড়লোকের মেয়ে—শিক্ষিতা, আপ-টু-ডেট। তার কোন অংশেই আমি যোগ্য নই জানি তবু যেন দুজনেরই মাঝে মন টানাটানি ঘটে উঠছিল। কলকাতায় ফিরে টেঁইয়ার বিয়ে হয়ে গেল এক আই. সি. এসের সঙ্গে, আমাদের হৃদ্যতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে।

সেদিনের বিচ্ছেদের বিরহব্যথার মাঝে 'চিজ্' এসে আমায় দিয়েছিল স্তোক সান্ত্বনা। কাছে ঘেঁষে, পায়ে পায়ে জড়িয়ে সে নিয়েছিল আমায় আপন করে।

তারপর দুটো বছর কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে ওসবের ব্যর্থ ছবি।

ভাবি, আজ তা নব-পর্যায়, নব-রূপে, নব-সমাবেশে একি ঘটে গেল? মনে হলো আমি যদি না আসতাম। নতুন মাইমাকে না গান শোনাতাম। তাহলেও কি নতুন মাইমা শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে কণা আর আমার মাঝে এই যোগসূত্র রচনা করে যেতেন? আবার ভাবি গান শোনার অনুরোধ তাঁর বাইরের অঙ্গ মাত্র—হয়ত এইটুকু সারবার জন্যেই আমায় গানের নাম করে ডেকে আনার ব্যবস্থা! তবে কি কণাই তার মাকে এ সম্বন্ধে কোনো ইশারা দিয়ে রেখেছিল। এমনি কত কি।

কণা এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে,—আপনার গানে আজ আমার মার আত্মা

শান্তি পেয়েছেন। আমি মাকে চন্দন-সিঁদুরে সাজিয়ে দি, ততক্ষণ আপনি ওখানে বসেই মাকে গান শোনান।

আমি হতবাক্। কি গাইব—এই কি গানের পরমক্ষণ? মানুষের সুখে দুঃখে, জীবনে, মৃত্যুতে এমনি করেই, হয়ত শিল্প, মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয় তা যেন আজ প্রথম উপলব্ধি করলাম। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে মোড়াটিকে টেনে নিয়ে সজল নয়নে গান ধরলাম।

"ক্যা জানু কুছ পুণ্য প্রগটে মানুষ অবতার।
এ্যাসো জনম নেহি বারংবার,
বিন্ সুর রাগ্ মুখোসেঁ গাওয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রণকার,
ঘটকে সব পট খোল দিয়া হ্যায়, লোকলাজ সব ডার,
মীরাকে প্রভু গিরিধর্ নাগর, চরণকমল বলিহার॥"

চোখের জলে সারা ঘরদোর আমার সামনে ঝাপসা হয়ে গেছে আমার হাত ধরে সিধু বাইরে নিয়ে এলো। আমি বলি,—বাড়ি যাচ্ছি, এখনি ঘুরে আসছি।

বাড়ি গিয়ে একটা চিঠি লিখে এলাম। লিখলাম—

'দার্জিলিং যাবার পুরা ইচ্ছা থাকলেও, আপনাদের সঙ্গে যাওয়া বিধি ঘটালো না। আমার যেতে অন্তত দুতিন দিন দেরি হবে। জানি আপনারা এ দেরির কোন কৈফিয়ত খুঁজে পাবেন না—কিন্তু আমি নাচার। পরে সাক্ষাতে সব বলবো।'

শ্রীযুত হরেন ঘোষের ভাইয়ের নামে চিঠিখানা পোস্ট করে ফিরে এলাম সিধুদের বাড়ি।

শ্মশান থেকে ফিরে চুপি চুপি বাড়িতে চলে আসছিলাম রাত তখন ন'টা হবে। কণা ছুটে নেমে এসে সিঁড়ির পাশটাতে দাঁড়িয়ে বললো,—কাল আসবে, বেশী দেরি করো না।

পথে পা দিয়েও যেন কণার কথাগুলো কানে বাজতে থাকে। কণা হঠাৎ আমায় 'আপনি' সম্বোধন থেকে 'তুমি' শুরু করলো কেন? এ কী তার অধিকার—গড়ে উঠেছিল গত দুবছর ধরে যা আজ পূর্ণ করে স্থাপনা করলো তার মায়ের মৃত্যুর পর?

বাড়িতে ফিরে আবার চিঠি পেলাম—'ভগবান যা করেন ভালর জন্যে। আমাদেরও আজ দার্জিলিং যাওয়া স্থগিত হয়েছে। কাল সকালে এসে দেখা করে সব বলবো।'

এগার

শনিবার দিন দার্জিলিং যাওয়া ঠিক হলো।

রাত্রে খেয়ে-দেয়ে শুতে যাচ্ছি। হঠাৎ টেলিফোনে রিং হলো। কণা বলছে, —কাল সকালেই আমি মামার বাড়ি চলে যাবো ফিরতে পরশু হবে—কাজেই তুমি আর কাল এসো না।

—কাল হয়ত আমি দার্জিলিং-এ চলে যেতে পারি।

—এ্যাঁ তুমিও যাবে? কাজের পর মামাবাবু আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছেন। মামাবাবুর ওখানে বাড়ি আছে।

—বেশ, পারি তো ওখানে দুদিন থেকে যাবো। জানি না যাদের সঙ্গে যাবো তাঁরা কাল সকালে এসে কি ঠিক করে যাবেন।

যাওয়া ত' ঠিক হলো। কিন্তু—

বাবার বন্ধু বললেন,—কিন্তু, কিন্তু কি!

আমি বললাম,—হরেনবাবুর ভাই তাঁর এক বন্ধুর বোনকে সঙ্গে নিয়েছেন —নাম তার কমলা। ষোড়শী তবে কালো, কষ্টিকালো।

ট্রেনে কমলার সঙ্গে আলাপ হলো। সুন্দর—সুসভ্য ব্যবহার।

সময় কাটাবার জন্যে কমলার গান আমাদের একমাত্র পথের পাথেয় হয়ে উঠেছিল।

সকাল বেলায় শিলিগুড়িতে নেমে দার্জিলিং-এর গাড়িতে সবাইকে তুলে দিয়ে আমার বন্ধুপ্রবর আমায় নিয়ে রেলওয়ে ক্যানটিনে চায়ের অছিলায় ঢুকে চা পান করতে করতে, মৃদুস্বরে বলেন,—কমলাকে আপনার পছন্দ হয়?

আমি একটু অবাক হয়ে যাই। পরে সামলে নিয়ে বলি,—বেশ মেয়ে, বেশ হাসি খুশী। খালি ভগবান ওকে রূপ দেন নি।

আমার বন্ধুবর বলে ওঠেন,—তাহলে তো সোনায় সোহাগা হতো। লেখাপড়ায় নাচে, গানে, স্কুলের অভিনয়েও ফার্স্ট। তেমনি করে ঘরের কাজ। আমার বন্ধুর ইচ্ছা যে আপনার মতো একটি জামাই ঘরে নিয়ে আসেন।

আমি বললাম,—তা আমার মতো কেন? আপনার মতো হলে আপত্তি কোথায়?

বন্ধুপ্রবর হেসে উত্তর দেন,—আপনাকে দেখবার জন্যেই তো ওর বাবা আমার সঙ্গে পাঠালেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করি,—হঠাৎ আমার চারপাশ ঘিরে প্রজাপতির এ ঝাপটা কেন? কলকাতায় এক বন্ধুর বোন হঠাৎ আপনি থেকে তুমি বলা শুরু করে দিল। আপনার বন্ধু আমায় হঠাৎ তাঁর জামাই ঠিক করে নিলেন। তাই ভাবছি যে কী গুণে হঠাৎ আমি গুণান্বিত হলাম যে কন্যাপক্ষেরা আমাকে তাঁদের ideal জামাই বলে সাব্যস্ত করে নিলেন। অথচ প্রজাপতির অনুগ্রহে আমার দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হচ্ছে না, অকারণ মনে পুলক জাগছে না, কি করি বলুন তো?

মাথাটা জোরে নেড়ে বন্ধুবর বলেন,—না, না, আপনার অমত হলে চলবে না।

আমি বলি,—সে কি মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান। আমি বয়ে গেছি বটে তবে এখনও বাড়িতে দাদারা রয়েছেন, মা রয়েছেন, তাঁদের মতামত দেখাশোনা কিছু না করেই সুদূর দার্জিলিং-এ বিয়ে সমাধা করে ফিরে যাবো? এখনও এত স্বাধীন হয়েছি বলে আমার মনে ধারণা জন্মায় নি।

গাড়ি ছাড়লো। কমলার আনন্দ আর ধরে না। গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিয়েছে।

'একদা তুমি প্রিয়ে, আমার এ তরুমূলে, বসেছো ফুলসাজে সে কথা কি গেছো ভুলে?' বন্ধুবরের প্রোপোজাল, কণার 'তুমি' বলার ঘটা—সবই একসঙ্গে ভেবে চলেছি। এর মধ্যে কে ফুলসাজে সেজে আমার অপেক্ষায় কোন্ অজানা বনস্পতিমূলে বসে আছেন, সত্যিই ভুলেছি।

এঁরা কি এইজন্যেই দার্জিলিং-এ নেমন্তন্ন করে আমায় সঙ্গে এনেছে—বাঁধবে বলে? মন আমার যতই উদাস হোক, যতই ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে হোক—নতুন মাইমার শেষ কথাগুলি এবং মরণোন্মুখী আত্মার কন্যার হাতটি আমার হাতে তুলে দেওয়াটুকু আমার সুপ্ত অতনুর দরজায় যে ঘা দেয়নি—এ আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারব না। তবে, কণা বড়লোকের মেয়ে, আমি সামান্য মধ্যবিত্ত, তার চেয়ে ছোট আমার নিজের বিত্ত, কাজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটুকু মনের কোণে উঠে মনেই লীন হয়ে যাচ্ছিল। এর মাঝে ঘটা করে কমলার আবির্ভাব, ঘটা করে বিয়ের প্রস্তাব!

দার্জিলিং-এ পৌঁছে গিয়ে হোটেলে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। আমার ঘরটি একলা আলাদা সিঙ্গল বেড। কমলারও তাই, তবে পাশাপাশি।

দার্জিলিং স্যানিটোরিয়মে আজ বিকালে একটি ছোটখাট জলসা হবে—তাই, খবর নিতে এসেছেন, যদি কোন গুণী কলকাতা থেকে হোটেলে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। হঠাৎ সবাই মিলে আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপরই শুরু হলো জোরাজুরি, শেষ পর্যন্ত আমার হয়ে কমলা মত দিয়ে ফেললো! বললো,—ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আমরা সবাই যাবো, ভয় নেই।

আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন।

বিকেলে স্যানিটোরিয়মের আসরে কবিশেখর কালিদাস রায় প্রভৃতি গুণী জ্ঞানী ও বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে শুরু হলো অনুষ্ঠান। কেউ আবৃত্তি, কেউ স্কেচ, কেউ গান করে সকলের প্রীতিভাজন হলেন। আমার ভাগ্যেও সুনাম জুটলো—উপরন্তু স্বনাম ধন্য নেড়ুদা সারা দার্জিলিংএ আমাকে নিয়ে হুজুগ তুললেন।

নেড়ুদা—সবার নেড়ুদা!

মহারাজ বর্ধমান, স্যার জগদীশ, রাজা সুবোধ মল্লিক থেকে শুরু করে দার্জিলিঙের সবজিওয়ালা পর্যন্ত ওঁকে নেড়ুদাই বলেন।

নেড়ুদা—অদ্বৈতাচার্যের বংশধর। অতি সজ্জন ভদ্রলোক। দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালটিতে কাজ করেন, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অগ্রণী। এ হেন নেড়ুদার দৃষ্টিতে আমি পড়ে গেলাম।

আমাদের হোটেলে এসে আমার সঙ্গে পরিচয়কালে বেরিয়ে পড়লো যে তিনি আমার পূর্ব পরিচিত, শুধ্ সময় ও কালের যবনিকায় তা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

নেড়ুদা তখনি আমায় তাঁর বাড়িতে টেনে নিয়ে যান আর কি? আমার সহযাত্রী বন্ধুবান্ধবরা নেহাত আমায় ছাড়লেন না তাই—তবুও দিনের মধ্যে প্রায় সর্বসময়েই নেড়ুদা আমায় বগলদাবা করে ওখানকার প্রথিতযশাদের বাড়ি ধরে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। ফলে, কলকাতার ও বাঙলার নামজাদা বংশ-গুলির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত হলাম।

একদিন নেড়ুদা এসে বললেন,—আজ তোমায় মায়াপুরীতে যেতে হবে। সেখানে কীর্তন আর ভজন শোনাতে হবে স্যারকে—।

মায়াপুরী হচ্ছে স্যার জগদীশচন্দ্রের বাড়ি ও বাগিচার নাম। স্যার জগদীশের কাছ থেকে ডাক এসেছে গান শোনাবার—এ এক শুভ মুহূর্ত আমার জীবনে! রাজী হয়ে গেলাম।

তারপর দিন বেলা তিনটায় ওখানে গিয়ে পৌছলাম।

মায়াপুরী যেন একটি ঋষির আশ্রম। আশ্রমের ঋষি আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর সামনে এসে তাঁর পদধূলি নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তিনি নিতান্ত পরিচিতের মতো বললেন,—তোমাদেরই প্রতীক্ষায় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম নেড়ু।

নেড়ুদা বলেন,—ইনিই হচ্ছেন সেই যাঁর কথা কাল বলেছিলাম।

আমার মুখের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থেকে বলেন,—আপনাকে আমি তুমিই বলবো। কি বলেন?

আমি তো অপ্রস্তুতের একশেষ। একে তো আমার মতো নগণ্যের প্রতীক্ষায় অতবড় ঋষি বাইরে পায়চারি করছেন তার উপর এইরকম কথা শুনে লজ্জায় নীলাভ হয়ে বলি,—নিশ্চয়ই স্যার, তুমি কেন? তুই বললেও ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই।

তারপর তিনি হেসে বলেন,—একে নিয়ে আমার ঘর-সংসার দেখিয়ে নি, কি বল নেড়ুদা, এসো আমার সঙ্গে এসো।

এই বলে তাঁর অর্চ্যার্ডের মধ্য দিয়ে বাগান পথে পদার্পণ করলেন। বললেন,—এরাই সব আমার পরিবারবর্গ! কেউ ছেলে, কেউ মেয়ে, কেউ প্রিয়, কেউ প্রিয়া, বলে বালকের মতো হাসলেন। আবার বলেন,—এরা আমার সঙ্গে কথা কয়, গল্প করে, এদের নিয়েই আছি। খালি এরা তোমার মতো গান শোনাতে পারে না—তবে, কেউ শোনালে ভারী খুশী হয়।

আবার বালকসুলভ হাসি।

হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠেন। লক্ষ্য করে দেখলাম —ওঁর চলার পথে একটি লতা এসে ওঁর গা ছুঁয়েছে। তাকে সযত্নে হাতে করে তুলে ধরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। কেমন অস্বস্তিতে উচ্চকণ্ঠে ডাকেন, —অপূর্ব! অপূর্ব!

পাশের কাঁচের ঘর থেকে অ্যাপ্রন-পরা একটি ফরসা বেঁটে ভদ্রলোক বার হয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। তাঁকে দেখে স্যার বলেন,—তোমায় অপূর্ব কতবার বলেছি, কিন্তু তুমি নিজে দেখ না—

অপূর্ববাবু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন,—কেন স্যার, কি হয়েছে ?

স্যার বলেন,—একে জল খেতে দেওয়া হয়নি, এ নালিশ করছে।

অপূর্ববাবু লতাটির দিকে চেয়ে বললেন,—না স্যার, কালই একে জল দেওয়া হয়েছে।

স্যার জগদীশ বলেন,—হয়তো তোমাদের ভুল হয়েছে, নইলে এরা তো মিথ্যা বলবে না অপূর্ব ! কৈ কালকের প্লেটটা নিয়ে এসো দিকি।

অপূর্ববাবু, বিনা বাক্যব্যয়ে প্লেট খুঁজতে গেলেন।

স্যার আমার দিকে চেয়ে বলেন,—এরা সব আমার সঙ্গে কথা বলে। এ বললে যে এ জল পায়নি, অপূর্ব প্রতিবাদ করছে। এরা কি মিথ্যা জানে ?

অর্চ্যার্ডের মধ্যে যে সমস্ত নিস্তেজ লতা বা চারাগাছ রয়েছে প্রতিদিনই তাদের জলগ্রহণের সময় ফোটোগ্রাফী প্লেটে রেকর্ড করা হয় ; অপূর্ববাবু এই লতাটির সেই প্লেট আনতে লেবরেটারীতে গিয়েছেন।

হাতে দুটো প্লেট নিয়ে বেরিয়ে এলেন অপূববাবু।

স্যারের সামনে ধরে বললেন,—আপনি ঠিক বলেছেন স্যার, মালী ভুল করেছে—এর দু'দিনের প্লেট তোলা হয়নি। এ দুখানি তার আগের প্লেট।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি—একী সম্ভব ?

স্যার বললেন,—তাই বলছিলাম ও যে নালিশ জানাচ্ছিল। দাও দাও ওকে জল দাও।

কথা কইতে কইতে ওঁর বসার ঘরের সামনে দরজা দিয়ে একটিবার পোর্টিকোতে পৌছলাম। উনি নিজ হাতে আমার চেস্টারটিকে গা থেকে নামিয়ে নিয়ে একটি র‍্যাকের হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিয়ে হেসে বললেন,—এটা এখানেই থাক, বেরোবার সময় গায়ে দিও—নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।

ঘরের মধ্যে বসার জায়গাটুকুতে আতিশয্যের বালাই নেই। ছিমছাম দরকারী জিনিস দিয়ে সাজানো।

স্যার আমায় বললেন,—হারমোনিয়মে গাইবে না শুধু গলায় গান শোনাবে ?

—হারমোনিয়ম এখানে আছে ?

—আছে বোধহয়। বলে বাইরের দিকে এগিয়ে যান।

নেড়ুদা বলেন,—কাকে ডাকবো স্যার ?

উনি বলেন,—হারমোনিয়ম ওই যে ওপাশটাতে বাক্সর মধ্যে রাখা আছে। আমি বয়টাকে খুঁজছি—কিছু খাবার-টাবার এনে দিক। খেয়েদেয়েই গান শোনা যাবে।

নেড়ুদা বলেন,—ও আবার মাছ-মাংস খায় না।

—ভয় নেই, আমি ওর জাত মারব না। আমার দিকে চেয়ে বলেন, —মাছ-মাংস খাও না কেন? জীব হত্যার ভয়ে? না কীর্তন-ভজন করো তাই খাও না?

আমি অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিই,—না, তা ঠিক নয়, এমনিই ভালো লাগে না।

স্যার স্মিত হেসে আবার বলেন,—আমি ভাবলাম প্রাণী হত্যার ভয়ে। শাকসবজি গাছ-পাতাতেও প্রাণ রয়েছে—তা খেলেও ওই একই দোষ ঘটে। তবে তোমার রুচি নেই সে আলাদা কথা।

বয় একটি ডিসে দুটি করে চপ আর অপর প্লেটে দুটি করে সন্দেশ ও বিস্কুট দিয়ে গেল।

আমি চপ দুটির প্লেটে হাত না দিয়ে, সন্দেশের প্লেটের দিকে হাত বাড়াতেই স্যার বললেন,—ও দুটিতে মাছ-মাংস কিছুই নেই। এমন কি পেঁয়াজের রসটুকুও দেওয়া হয় না। ওগুলো শাকসবজি থেকেই বানানো হয়েছে।

ভেবে আশ্চর্য হই এত বড় বিজ্ঞানের যিনি আচার্য, দিনরাত গবেষণায় সমাধিস্থ, তিনি কি করে খোঁজ রাখেন, কি দিয়ে কি বানানো হয়েছে?

আমি চপ দুটি উদরস্থ করলাম। সত্যই এতে পেঁয়াজ-রসুনের ছোঁয়াচ পর্যন্ত নেই। পরে খেলাম সন্দেশ বিস্কুট চা। একটাও ফেলতে পারব না বলেই আদেশ পেলাম। স্যার যেন আমায় খাওয়াচ্ছেন—মা যেমন সামনে বসে খুঁটিনাটির দিকে নজর রেখে খাওয়ান।

এবার গান শুরু করলাম। গানের পর গান গেয়ে যাচ্ছি, উনি চুপটি করে কান পেতে শোনেন। একটি ভজন শেষ হলে আমায় বলেন,—গানের ভাষাগুলো আমার কানে পৌঁছয় না, কিন্তু সুরের প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের রূপ আমার চোখের সামনে দেখতে পাই—যেন তারা সব মূর্তি ধরে আকাশপথে বিচরণ করছে। আমি প্রত্যক্ষ করি, এরা যেন যুগ যুগ ধরে ধ্বনিত হচ্ছে, হয়ে চলেছে—বিশ্বের ভাঁড়ার ঘরে থাকবে চির-রক্ষিত। ভাঁড়ার ঘরের চাবির সন্ধানীরা যখন তারা চাবি পাবে—তারা চাবি খুলে দরকার মতো ফিরিয়ে আনতে পারবে এদের, আজকেরই মতো পূর্ণ রূপে।

একটা ছোট নিঃশ্বাস চেপেফেলে বলেন,—থাক ওসব কথা। এবার তুমি একটি কীর্তন করো।

যদিও আমি নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কিছুদিন কীর্তন শিখেছিলাম তবু আমি আমাদের মাস্টারমশাই রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের রচিত ও সুর-যোজিত 'মম মানসী মাধবী কুঞ্জে শ্যাম বিহরগো নিশিদিন'—গানখানিকে প্রাণ মন ঢেলে, গেয়ে শোনালাম। স্যার তৃপ্ত হলেন কি না, বোঝা গেল না। শুধু আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন,—আর তোমায় কষ্ট দেবো না, অনেক গান করেছো। আরো একদিন আসবে আমার এখানে, শোনাবে তোমার সুরের আলাপ আমার ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনকে—ওরা সুরে বড় তৃপ্তি পায়! মানুষের চেয়ে ঢের বেশী সমঝদার ওরা। মানুষ সুর নিয়ে শৃঙ্খলা হারায় কিন্তু ওরা বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। ওরা যেন ওদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে এক ছন্দের আবেগে উন্মাদ হয়ে পড়ে। অপূর্ব ধরে তুলে রেখেছে একে প্রমাণিত করার অঙ্ক কষায়—আমার জীবনে না হলেও অঙ্কেও ওগুলো একদিন ধরা পড়ে যাবে। আচ্ছা, অনেক রাত হলো বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

আমি বাইরে এগিয়ে চলেছি। উনি পিছু থেকে আমার কাঁধটি ধরে ফেলে বলেন,—দুষ্টু ছেলে, ভুলে গেলে চলবে না—ঠাণ্ডা লেগে যাবে, অসুখ করবে।

নিজে হাতে আমার চেস্টারটি পরিয়ে দেন—স্নেহময় পিতারই মতো। আমি পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

স্যার বলেন,—তোমাদের তানপুরা যন্ত্রটি বড় ভালো। ওটি দেখি সেদিন যদি যোগাড় করে রাখতে পারি—তাহলে দেখবে আমার আত্মীয় গোষ্ঠী কেমন আনন্দে লাফায়।

আমরা পথ চলি।

অন্ধকারে ঢেকে যায় মায়াপুরী। কিন্তু তাঁর মায়াজালে সৃষ্টি করা বাণীর জালে আমি আটকা পড়েছি। কানের মাঝে ঋষির কথাগুলি বার বার ঝঙ্কৃত হতে থাকে কিন্তু এর অর্থ বোঝার সামর্থ্য আমার তখনও এতটুকুও জন্মায় নি।

একসঙ্গে ঋষি, যোগী আবার গৃহীর কথা রামায়ণী যুগে পড়েছি কিন্তু এঁদের সঙ্গে পরিচিত হলে তার প্রমাণ উপলব্ধি হয়। ঋষি কবির সঙ্গ পেয়েছি, ঋষি বিজ্ঞানীদ্বয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম, নিকট আত্মীয়দের মতো মেশবার অবকাশ পেলাম—দেখলাম এঁরা সব মস্তিষ্কের বিকাশ করতে গিয়ে, মনটিকে হারান নি! এঁরাও যেন রামায়ণী যুগের এক একটি মহর্ষির প্রতিচ্ছায়া!

রাত ন'টায় হোটেলে ফিরেই সবার শত প্রশ্ন কৈফিয়তের মধ্যে যেন হারিয়ে গেলাম। সবারই এক চার্জশীট্—যে বিকেল থেকে গা-ঢাকা দিয়ে কোথায় পালিয়েছিলাম। কমলার চার্জশীটে আবার একটু অভিমান জড়ানো রয়েছে। সে নাকি সিনেমার টিকিট আনিয়ে আমার অনুপস্থিতিতে তা বেকার করে দিয়েছে। সবাই সে টিকিটের সদ্ব্যবহার করে এসেছে কিন্তু কমলা নাকি সারা বিকাল ও সন্ধ্যা হোটেলের জানলায় বসে একনিষ্ঠা শবরীর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দিয়েছে।

এর কিছু খেসারত দিতে, সে রাতে আহারের পর অনেকক্ষণ তাস খেলতে হয়েছে। কমলা সে খেলায় আমার পার্টনার ছিল। ফলে কমলা, তার পর দিন থেকে আমায় পার্টনার বলেই ডাকতে শুরু করে দিলে।

সাতটা দিন কেটে গেছে।

কলকাতার মধুমাসের রেশটুকু দার্জিলিঙের হিমেল হাওয়াও নিঃশেষ হয়ে গেছে, তবু আমার পার্টনার এই হিমানীতেও যেন মাঝে মাঝে 'ব্লু' হয়ে যাচ্ছেন। আজ ক'দিনের পর তিনি যেন আমার 'সর্বময় কর্ত্রী' হয়ে পড়ার ভার জোর করেই নিয়েছেন, অথচ আমার প্রতি কিছু বিরাগ বা অনুরাগের ভাবে ভাবান্তরী ছলনা শুরু করেছেন। এতে আমার কিছু যাওয়া আসার উচিত ছিল না তবু যেন কি এক অলক্ষ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছি।

ইতিমধ্যে কলকাতার বাঙালী যাত্রীদের সমন্বয়ে একটি 'শো' রচনা করেছেন নেড়ুদা। কেউ নাচবেন, কেউ গাইবেন, কেউ আবৃত্তি করবেন ইত্যাদি। সে আসরে আমাকেই তাঁদের প্রধান নায়ক করে তুলেছেন।

কমলা—'শেফালি তোমার আঁচলখানি, বিছাও শারদ প্রাতে' গানখানির উপর আধুনিক নৃত্যের কলা প্রদর্শন করবেন। আমায় তাই গানের সুরখানি হারমনিয়মে তুলে দিলেন—কারণ তাঁর নাচে আমায় অর্গান বাজাতে হবে।

গানের সুরটি আগাগোড়াই ভুল তোলালেন। আমি কিন্তু এর প্রতিবাদ জানাই নি এবং মনোযোগ সহকারে ভুলই শিখে নিলুম কারণ প্রতিবাদে প্রতিপক্ষেরা সুখী হন না।

স্টেজে কমলা নাচবার আগে নেড়ুদা পরিচয়পত্র এনাউন্স করলেন যখন তখন কমলা স্টেজেতেই প্রসাধন ও সাজসজ্জায় সমাসীন। নেড়ুদা বললেন, —কলকাতার প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী কমলা মিত্র—'শেফালি তোমার আঁচলখানি' গানখানির উপর আধুনিক নৃত্য দেখাবেন এবং 'শেফালি তোমার'

গানখানির যিনি রচয়িতা এবং সুরকার তিনি স্বয়ং শ্রীমতীর সঙ্গে অর্গান বাজাচ্ছেন।

কমলা জানতো না যে এ গানের রচয়িতা বা সুরকার আমি। অথচ মনে মনে নিশ্চয়ই জানতো সে যে সুরটুকু আমায় তুলিয়েছে সেটি ভুল তাই বোধকরি ঘোষণার সাথে সাথে, এমনি ঘাবড়ে গেল যে স্টেজে নাচতে গিয়ে অত্যন্ত 'সরি ফিগার' সৃষ্টি করলো। নৃত্যান্তে তার যতকিছু ত্রুটির বোঝা আমার কাঁধেই চাপিয়ে দিল। অভিমানে ফুলে ফুলে বলতে লাগলো,—কেন আপনি বলেন নি এটি আপনার লেখা গান? কেন আপনি বলেন নি যে এটা আপনারই সুর করা? হয়ত ভুলই তুলিয়ে দিয়েছি! তা' বলে কেন আপনি সেগুলো আমায় সংশোধন করিয়ে দিলেন না—ইত্যাদি ইত্যাদি। নালিশ অভিযোগের উত্তেজনায় শেষপর্যন্ত সে কেঁদেকেটে একটা 'সিন্' সৃষ্টি করে বসলো। নিতান্ত অপরাধীর মতো আমি সুযোগ পেয়ে সরে পড়লাম।

সে রাতে আমি নেড়ুদার বাড়িতেই রাত্র যাপন করেছিলাম—অবশ্য নেড়ুদার বাড়িতে আমার নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ পূর্ব হতেই ছিল।

পালিয়ে বেড়াচ্ছি আজ দু'দিন।

আজ বিকেলে স্যার জগদীশচন্দ্রের মায়াপুরীতে আবার যাবার ঠিক করেছেন নেড়ুদা। সকাল হতেই কোথা থেকে একটা তানপুরা বগলে করে এসে আমায় বললেন,—দেখ তো এই তানপুরাটা চলবে?

—খুব চলবে।

নেড়ুদা বলেন,—কাল স্যারের বাড়িতে সকালের দিকে একবার গিয়েছিলাম; উনি তানপুরার ভারটা আমার উপরই দিয়ে বলে দিয়েছেন আজ ঠিক তিনটায় তোমায় নিয়ে ওখানে উপস্থিত হতে। কাজেই আজ তোমার হোটেল থেকে ডুব মেরে আমারই এখানে খেয়ে দেয়ে নিতে হবে। এখন বরং তোমাকে ঘুরিয়ে আনাবার একজন লোক দিচ্ছি—তোমার যেখানে খুশী ঘুরে এসো, ততক্ষণ আমিও এসে যাবো। কিন্তু হোটেলে ফিরলে আর ঘড়ি ধরে পৌছতে পারব না। স্যার ভারী পাংচুয়াল।

নেড়ুদা লোক ঠিক করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোকটিকে দিয়ে হোটেলে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে রাস্তায় দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটি ফিরে এলে আমি তাকে সঙ্গে করে গেলাম নেপালী মন্দিরে।

মন্দিরে যখন পৌঁছলাম তখন চাইনিজ টেম্পলের ঘণ্টার সারিতে আঘাত দিয়ে এক সুললিত সঙ্গীতে সারা মন্দির প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শিবের সামনের এই আরাত্রিক দেখে মনে হয় যেন সত্যই দেবতা এখানে বিরাজমান। সবাই চোখ বুজে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে। আমি একপাশে জোড়হাতে চুপটি করে দাঁড়ালাম। পাশেই একটি লোক তাঁর সারা অঙ্গটি বালাপোশে মোড়া, যেন শাল গায়ে দিয়েছেন।

আরতির শেষে মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী ওঙ্কার ধ্বনি তুলে সারা মন্দির প্রকোষ্ঠকে ভরিয়ে তুললেন। আমিও তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠলাম। গান সমাপ্তে পাশের বালাপোশধারী লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনার কণ্ঠ তো ভারী মিষ্টি!

লোকটির পানে তাকিয়ে মনে হলো একে যেন কোথায় দেখেছি—খুব চেনা মুখ। আমি ধীরে ধীরে বলি,—আপনাকে যেন খুব চিনি চিনি মনে হচ্ছে। যেন কোথায় দেখেছি, অথচ—

—আমার নাম শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

চমকে উঠি, পরক্ষণেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে দীনভাবে বলি,—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাকে চিনতে না পারাও পাপ। বিশেষ করে আমার পক্ষে।

তিনি আমার মুখের দিকে সস্নেহে চেয়ে থাকেন।

আমি বলি,—কারণ, গত নন-কোয়পারেশন মুভমেণ্টের সময় আমি আমার কলেজের প্রমুখ হয়ে স্বরচিত গান গাইতে গাইতে শ্রদ্ধেয় লিয়াকৎ আলি সাহেবের দলের সঙ্গে বিডন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হই। বিডন স্কোয়ারে ছিল মিটিং—সে মিটিং-এর সভাপতি ছিলেন আপনি। আমরা উপস্থিত হলে আপনি আমাদের গানের রচনার সুখ্যাত করেছিলেন। লিয়াকৎ সাহেব আমায় দেখিয়ে বলেছিলেন—গান লিখেছে এই ছেলেটি। আমায় ছোট ছেলে দেখে আপনি আমায় বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন—কৈ গাওতো তুমি নিজে তোমার গানখানা। আমি গেয়ে আপনাকে শুনিয়ে ছিলাম—সে গান আমার ধন্য হয়েছিল।

উনি স্মিত হেসে বলেন,—কি গান তোমার মনে আছে।

আমি বলি,—হ্যাঁ—'মায়ের শোকে হয়ে ম্রিয়মাণ
সহকারিতা করিয়া বর্জন,
চলে আগুয়ান—ভারত সন্তান' ইত্যাদি।

উনি আবার তেমনি হেসে বল্লেন,—আমারও মনে পড়ে গেছে। তোমায় আরও একবার দেখেছিলাম গড়ের মাঠে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর দিনে। সেদিনও তুমি গান বেঁধে দল নিয়ে এগিয়ে এসেছিলে। গানখানা অবশ্য আমার মনে নেই—তবে সেটাও বেশ স্ট্রাইকিং গান ছিল।

আমি উৎসাহিত কণ্ঠে বলি, সেটা লিখেছিলাম—

"আজকে হঠাৎ গিয়াছে ছিঁড়িয়া ভারত-বীণার একটি তার,
তাই, বিশ্ব জুড়িয়া বহিছে আজিকে—একটা মহা শোকের ভার।
কাঁদোগো হিন্দু, কাঁদো মুসলমান—ভারতের যত সন্তান আর॥"

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন দাশ সাহেব। বল্লেন,—সুন্দর।

তারপর আমার পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বল্লেন,—তোমার গলা শুনলাম, একদিন আমার বাড়িতে এসো না—গান শুনি। এখানে কোথায় উঠেছো?

আমি উত্তর দিই,—উঠেছি হিল ভিউ হোটেলে তবে নেড়ুদার বাড়িতেই প্রায় সময় থাকি।

উনি বল্লেন,—আমাদের নেড়ু? মানে সচ্চিদানন্দ গোস্বামী? বেশ, বেশ! তাহলে ওকে দিয়েই তোমায় খবর পাঠাবো। এখন থাকা হবে তো?

আমি নম্রভাবে হ্যাঁ জানাই।

বাইরে লোকজন ওঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। উনি বল্লেন,—চলি।

উনি চলে গেলেন। মনে হলো কি শুভক্ষণেই না দার্জিলিঙে এসেছিলাম। এই দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে এসে কত না মহামানবের সঙ্গে পরিচিত হলাম—এমন ঘনিষ্ঠভাবে। নেপালী মন্দিরের শিউজীকে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে নেড়ুদার বাড়ি ফিরে এলাম।

দুপুরে খেতে বসে নেড়ুদাকে সকালের ঘটনা জানালাম। উনি বললেন, —আমারও ইচ্ছা ছিল তোমাকে ওঁর কাছে একবার নিয়ে যাবার, তা ভগবান সে সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

আমি বলি,—জানেন নেড়ুদা—আমি অবাক হই যে, এই সব মহামানব এঁদের কাজের অবধি নেই। অথচ কবে, কোথায়, কাকে একটু ভাল লেগেছে ঠিক মনে রেখেছেন তো?

নেড়ুদা হাসেন। বল্লেন,—তাই তো ওঁরা মহামানব হে।

বেলা তিনটা বাজতেই নেড়ুদা আমায় নিয়ে মায়াপুরীর মায়াভরা উদ্যানে

•ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঋষি জগদীশচন্দ্রও আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। আমাদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন।

কাছে এসে বললেন,—আজ আর ঘরের মধ্যে নয়, আজ বাইরে বাগানেই ব্যবস্থা করেছি—আমার নিকট আত্মীয়দের মাঝে।

বাগানের মাঝে একটি বেদিতে তানপুরা রাখা। পাশের কাঠের বেঞ্চিতে উনি বসলেন। বেদিতে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তানপুরা হাতে তুলে নিয়ে কি গাইব না ভেবেই ধরলাম ওঁকারধ্বনি—সকালে মন্দিরে দাঁড়িয়ে যা শুনেছিলাম তাই হলো আজ সুর। ওঁকারধ্বনির সঙ্গে ধীরে ধীরে আনি ছন্দ। তখন ঋষি জগদীশ বলেন,—ঐ দেখ, এরা সব ছন্দে ছন্দে দুলছে কাঁপছে।

অপূর্ববাবু কি একটা ফোটোগ্রাফিক মেসিনে ওদের আনন্দের ভাইব্রেশনের ফোটো তুলতে থাকেন। স্যার বলেন,—ওরা যে কতখানি উৎফুল্ল হয়েছে তারই পরিমাপটুকু অপূর্ব তুলছে। কাল তোমাদের দেখাবো।

এরপর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে গৌড় সারেঙ থেকে শুরু করে পুরবীতে এসে গান থামালাম। সমস্ত উদ্যান স্তব্ধ—তার মাঝে ধ্যানমৌন মহাঋষি কিসের স্বপ্নে বিভোর। বনানীর লতাপাদপের মতোই মৌন অথচ সারা মুখে তাঁর তৃপ্তির চিহ্ন।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললেন,—সুরের প্রতিটি অনুরণন এদের প্রাণময় সতেজ করে তুলতে পারে তা আজ আমি প্রত্যক্ষ করলাম। দেখি অপূর্ব কত দূর কি করলো।

তারপর সংজ্ঞায় ফিরে এসে বলেন,—ভিতরে চলো, কিছু খাবে চলো।

আমরা উঠে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। আজ আশ্রমের নিয়মকানুন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিজেই করলাম। উনি হেসে বলেন,—সেদিনের কথাগুলি ভোলনি দেখছি। নাও বসো, কিছু খাও!

আমরা দেখলাম খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই হয়ে রয়েছে, খালি আমাদের আসার অপেক্ষা মাত্র। খাওয়ার মাঝে মজা করে বলেন,—মাছ-মাংস দিয়ে সন্দেশ তৈরি করিয়ে রেখেছিলাম, কেমন সব খেলে?

আমরা হাসলাম।

তিনি তারপর বলেন,—সময় বড্ড কম, নইলে রোজ তোমার গান শোনা যেতো। আমি যে ছাই গাইতে জানি না, নইলে তোমার মতো গেয়ে এদের শোনাতাম।

স্যরের কথাগুলি শুনছি আর মনে হচ্ছে যেন কোন মহর্ষির তপোবনে বসে আমরা তারই মুখের অমৃত বাণী পান করছি।

সব ফুরলো, বিদায় দিলেন। তিনি গেট অবধি এগিয়ে এলেন আবার প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হোটেলে ফিরেছি। সবাই বেড়াতে বেরিয়ে গেছে শুনে হৃষ্টমনে ওপরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। চেস্টারটা খুলছি, পেছন থেকে কথা এলো,—ক'দিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? আমার জন্যে? বলেন তো আমিই না হয় কলকাতায় ফিরে যাই।

তিনটি পরের পর প্রশ্নের মাঝে 'ফিল-আপ দি ব্ল্যাঙ্ক' করবার এতটুকু চেষ্টা করিনি বরং অপরাধীর মতো নীরব ছিলাম। শেষ প্রশ্নের একটা জবাব দেওয়া দরকার নইলে বোবা না ভাবলেও কথার বৃশ্চিক দংশনে পাছে বোবা করে দেয় সেই ভয়ে বলি,—পালাব কেন? স্যার জগদীশচন্দ্রের মায়াপুরী দেখতে গিয়েছিলাম। ভারী সুন্দর লাগলো, জানো কমলা! ওঁরাই ধন্য, আর আমিও দেখে ধন্য। মনে হচ্ছিল যেন কবি কালিদাস-বর্ণিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখে এলাম।

নিমেষের জন্যে চুপ করে থেকে কমলা বলে ওঠে,—নিশ্চয়ই কোনো তন্বী শ্যামা-শকুন্তলার দেখা পেয়েছেন, তাই একেবারে গদ্‌গদ।

আমি উত্তর দেই,—আশ্রমে খুঁজেছিলাম, পেলাম না। আশ্রম-উপান্তে শৈল-শোভা সৌধে শ্যামাঙ্গিনী শকুন্তলার দেখা পেলাম। দুরন্ত দুষ্মন্তের রথচক্র যেখানে এসে থেমে গিয়েছে—এক বালখিল্য বালিকার কটাক্ষ ধমকানিতে।

এবার কমলা গম্ভীর থাকতে পারলো না। খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলো। তারপর বললো,—চেস্টারটা গায়ে চড়ান, চলুন একটু ম্যল্‌ থেকে ঘুরে আসি। আজ সতের দিন দার্জিলিঙে এসেছি, আপনার সঙ্গে একটু বেড়াবার অবকাশ দেন নি। নিন্‌ চলুন দেখি।

আমি বাক্যব্যয় না করে চেস্টার গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কমলার সাথে, ম্যলের পথে।

দেখতে দেখতে দোকান পসার, হোয়াইটওয়ে লেডল সবই পার হয়ে উপরের চত্বরে উঠে পড়লাম। দুজনে গল্প করে চলেছি, নীচে খাদের পাশে কাঠের রেলিংএর ধারটিতে দাঁড়িয়ে। আধআলো আধছায়াতে কালিংপঙে পাহাড়ের

দীপালীমালার দিকে চেয়ে থাকি। কমলা আমার কাছটি ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। পাশ দিয়ে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি ষোড়শী যেতে গিয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন দুজনের সামনে। বলেন,—তুমি! তুমি তাহলে আজও এখানে আছ?

হঠাৎ কণাকে সামনে দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে যাই। কথার উত্তর দিতে পারি না। দুটি ষোড়শীই দুজনের দিকে একবার করে কটাক্ষপাত করলেন। কণা আমায় বলে,—আচ্ছা চলি, বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।

হন্ হন্ করে চলে গেল কণা।

কমলা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তারপর বলে,—চলুন হোটেলে ফিরি, রাত অনেক হলো।

যা নিমেষে বাইরে ঘটলো তারই রেশ গুরুভার হয়ে অন্তরে চেপে বসলো বুঝলাম। কিন্তু এ কৈফিয়ত আমার জীবনে কেন? আমি কি দুজনের একজনকেও—থাক ভেবে লাভ নেই!

ম্যল্ থেকে নামতে গিয়ে পার্টির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কমলা তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে, যেন সোয়াস্তি পেলো। দুধে আমে মিশে গিয়ে আমি আঁটির মতো গড়াগড়ি খেতে খেতে বলি,—আপনারা এগোন, আমি একটু নেড়ুদার বাড়ি ঘুরে ফিরবো।

রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নামবার পথে একটা ক্যালভার্টে বসে ভাবতে লাগলাম—এ কি নতুন ফ্যাসাদ আমার জীবনে এসে ব্যক্তিগত করবার চেষ্টা শুরু করছে! মন স্থির করলাম যে এসব ঝঞ্ঝাট থেকে যে করেই হোক রেহাই পেতে হবে। ভাবলাম একবার, নেড়ুদার কাছে অকপটে আমার পরিস্থিতিটা বলে, এ থেকে রেহাই পাবার রাস্তা খুঁজে নিই। আবার ভাবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-বিরহ নিয়ে অপরকে জড়ালে শুধু বদনামই ছড়িয়ে পড়বে।

উঠে পড়লাম, ধীরে ধীরে নেড়ুদার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

নেড়ুদা বলেন,—এত রাত্রে! ব্যাপার কি?

—কালকের নতুন প্রোগ্রাম কি করা যায়? জিজ্ঞাসা করলুম।

উনি বলেন,—কাল ভোরে রাজা মল্লিকবাবুদের বাড়ির গেস্টদের নিয়ে টাইগার হিলে যাচ্ছি যে। তুমি যাবে?

রাজা বাবুদের গেস্ট! কণা নেই তো? যাই হোক, মনে মনে কিছু চিন্তা করে চুপ করে থাকি। নেড়ুদা বলেন,—যাও তো আমার এখানেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো। কাল ভোর রাত্রে বেরিয়ে পড়বো।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। আবার ভাবি, ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার হবে না তো? নেড়ুদা বল্লেন,—বলি অত ভাবছো কি? টাইগার হিল তো তুমি যাওনি? যখন সুযোগ পেয়েছো চলো না। ওঁদের সঙ্গে গেলে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না, আমি তো রয়েছি।

রাজী হয়ে গেলাম।

ভোর তিনটায় উঠে নেড়ুদার সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়লাম। রাজবাড়ি যখন পৌছলাম তখন প্রায় পৌনে চারটে। রথ প্রস্তুত, যাত্রীরা প্রস্তুত, খালি গাইডের অপেক্ষা মাত্র। একটি গাড়িতে মেয়েরা—অপরটিতে পুরুষেরা উঠে বসা হলো। তারপর যাত্রা শুরু।

পুরুষদের মধ্যে কাকেও চিনি বলে মনে হলো না। নেড়ুদা তাঁর ভাই বলে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমিও এ দলটিকে নতুন দেখে কিছু আশ্বস্ত হলাম।

ভোরের আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে ওঠা শুরু হয়েছে। আগে আগে চলেছেন মেয়েরা। তাঁদের কলরব কানে আসছে। কখন কখন চমকে উঠছি—এ যেন চেনা আওয়াজ। পদে পদে ত্রস্ত হয়ে সবার পেছনে ধীরে ধীরে উঠছি

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে সবাই চেয়ে থাকেন কাঞ্চনজঙ্ঘার সাতরঙা রামধনুর দিকে। সবারই হাতে একটি করে দূরবীন। যাঁদের নেই তাঁরা পাশের লোকের দূরবীন কেড়ে নিয়ে দেখছেন।

ওদেরই কিছু দূরে আমি দাঁড়িয়ে, সৌম্য কাঞ্চনজঙ্ঘার বহুরূপী বেশের সন্ন্যাসী মূর্তিতে সমাহিত। নেড়ুদার দূরবীনটা চোখের সামনে ধরে আছি।

যারা গোষ্ঠী আমায় গোষ্ঠী ছাড়া করে রেখেছেন। আমি নেড়ুদার ভাই, তায় নাবালক তাই তাঁরা হাসি-মস্করার দূরে দূরেই আমায় কিছু ঠেলে রেখেছেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে অভিযাত্রীদের শেষ পূর্ণচ্ছেদ রচনা করে সুখে আছি।

এমন সময়, হঠাৎ পেছু থেকে কে যেন আমার চোখের দূরবীনটা ছোঁ-মেরে কেড়ে নিয়ে নারী কণ্ঠে বলে ওঠে,—খুব যে এড়িয়ে চলার মন্ত্র শিখেছো!

চমকে উঠি, ধরা পড়ে গেছি।

কণা আমার হাতটি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে যাত্রীগোষ্ঠীর

মাঝে এনে খাড়া করে দিয়ে, অর্ডার করলো,—চট্ করে একটা গান বেঁধে ফেল তো ওই সপ্তবর্ণী কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে।

তারপর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নেভুদাকে বললো,—আপনার ভাইটির ওপর জুলুম করছি বলে কিছু মনে করবেন না। উনি আপনার ভাই হলেও আমাদেরও কিছু! তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে,—কবিবর, কৈ গান ধরো!

ইতিমধ্যে আমি সত্যই হিমগিরির ওই রূপে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ছ'ছত্তর রচনা করে ফেলেছিলাম। তাই দ্বিধা না করে তাকে ভৈরবী সুরে গেয়ে উঠি—

একী গম্ভীর রূপে, হে সন্ন্যাসী এলে অপরূপে।
আমার সাধন, অন্তর-ধন, মিলাবে কী আজ চুপে—
চুপে-চুপে!

তারপর সুরের সঙ্গে সঙ্গে সারা গানখানির ভাষা আপনি জুটে যেতে লাগলো।

গান শেষে চা-টিফিন, হৈ-চৈ সব কিছুতেই আমাদের গোষ্ঠী জমে উঠলো। কাল রাত্রির মনের অস্বস্তিটুকু ধীরে ধীরে নেমে গেল। কণা যেন প্রতিশোধ নিতেই আজ আমার সঙ্গে এমনভাবে মিশতে লাগলো যেন গতকাল কিছুই ঘটেনি। আমি যেন তার চিরকেলে সম্পত্তি, সে সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারিণী একমাত্র সে। গোষ্ঠীর ভদ্রলোকদের সামনে মাঝে মাঝে আমি অপ্রস্তুতে পড়ে যাচ্ছিলাম।

ফেরবার পথে নেভুদা ওঁদের জানালেন যে আজ বিকেলে 'স্টেপ্ এসাইডে' দাশ সাহেবের বাড়ি আমার গান হবে, আপনারা পারেন তো যাবেন।

আমি বলি,—কাল আছে নেভুদা।

তিনি পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিলেন। দাশ সাহেব লিখেছেন —যদি সুবিধা হয় তবে কাল হলেই ভালো হয়। আমার বাড়িতে কয়েকজন অতিথিও কাল আসবেন। ইতি—গত কালের তারিখ।

বিকেলে দাশ সাহেবের বাড়ি গান-বাজনা হলো কিন্তু কণারা এল না। কারণ কারো গৃহে গানের আসরে, বিনা নিমন্ত্রণে আসাটা শিষ্টাচারে বাধে বলে।

দাশ সাহেবের বাড়ির গান-বাজনায় ছ'দশজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাই শুনতে চাইলেন কীর্তন। কীর্তন বাজাবার জন্যে

খুন্ত্রী নেই, তাই ভাঙা কীর্তন দুটি একটি গেয়ে নিয়ে, ভজনে মনযোগ দিলাম। নিছক বাংলা ভজন—

"ব্যথার বাঁশীতে, নয়নের মণি শ্যাম হয়ে থাক বাধা,
কালো তারা ছেয়ে ঝরুক শ্রাবণ, ধারাময়ী শ্রীরাধা।"

দাশ সাহেব উদ্বেলিত হয়ে কেঁদে ফেললেন। আসরে গান শুনতে শুনতে তিনি সমাহিত অবস্থায় নিজে গান ধরে নিলেন—

"বসনের ভার সইতে নারি, ঘুচাও হরি আবরণ—
দাও আমারে ন্যাংটা করে, ওগো আমার লজ্জা হরণ।"

গানখানি দাশ সাহেবের নিজেরই রচনা, নিজেরই সুর সংযোজনা। সবাই মুগ্ধ হয়ে গান শুনি। তাঁর দরদ-ভরা গান শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই।

তাঁর তন্ময়তা দেখলে ভক্তি আসে। অমন তন্ময় হয়ে গাইতে পারি কই! যেন প্রতি শ্বাসের রেচকে পূরকে তাঁর গায়কীটুকু অনবদ্য গতিতে উঠা-নামা করতে লাগলো। তৃপ্তি দিতে এসে তৃপ্ত হলাম। তাঁর মতো চুম্বকী শক্তির কাছে আমার লৌহ-জড় মনটুকুতে চুম্বকীশক্তির উদয় হলো। আর বুঝলাম গান সুরময় যেমন, তেমনি ভাবময়ও। সুর আনে একনিষ্ঠতা আর ভাষা আনে ভাবের ধারা।

জলাতঙ্কের মতো আমার কি যেন কেন হোটেলাতঙ্ক হয়েছে।

হোটেলে ফিরতে হলেই মনে পড়ে যায় যারা পয়সা খরচ করে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে আমায় দার্জিলিং পর্যন্ত নিয়ে এলেন তাঁদের প্রতি কর্তব্যের ক্রটি হয়ে যাচ্ছে।

ঘরেতেই খাবার ঢাকা ছিল, চুপি চুপি ঘরে ঢুকে খেতে বসেছি হঠাৎ খট্ করে আওয়াজ হলো দরজায়। উঠে দরজাটা খুলে দিলাম।

কমলা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলো।

ইলেকট্রিক আলোয় দেখলাম মুখখানি তার কালবৈশাখীর পূর্ব লক্ষণের মতো। অভিমানে ঠোঁট দুটি থরথর্ করে কাঁপছে, কথা কইলেই ফেটে পড়বে। আবার চুপ করে থাকলে এলোমেলো ঝড় কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আমি আস্তে আস্তে বলি,—এসো।

ও চুপ করে থাকে। আমি বলি,—দাশ সাহেবের বাড়ি গান ছিল। দাশ সাহেবও অপূর্ব গান করলেন, আমায় তাঁর স্বরচিত কীর্তন গান শোনালেন।

কমলা এবার ধীরে ধীরে বলে—কাল রাত থেকে আজ অবধি বুঝি প্রহর-কীর্তন হচ্ছিল ?

আমি কি জবাব দেবো উত্তর খুঁজে পাই না। শুধু ঢোক গিলে বলি,—ঠিক তা নয়, তবে সকালে অন্য এক জায়গায় যাবার জন্যে খুব ভোররাত্রে বেরুতে হয়েছিল। তাই, সুবিধার জন্যে রাতে আর হোটেলে ফিরতে দিলেন না নেড়ুদা।

কমলা বললো,—আমিও তাই মণিদাকে বলছিলাম, ওকে পেতে গেলে এখন নেড়ুদার পারমিশান দরকার।

আমি হেসে ফেলি। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলি, ঠিক তা নয়। প্রোগ্রাম আমিই করেছিলাম। নেড়ুদার এতে হাত ছিল না, তবে যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে নেড়ুদা গাইড মাত্র।

—নেড়ুদার গাইডেন্সে কাল কি প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন একটু জানতে পারি কি ?

—কাল ঠিক করেছি ছু'চোখ যে ধারে নিয়ে যাবে সে ধারেই রওনা দেবো।

—তারপর কখন ফেরা হবে ?

—তা জানি না, নাও ফিরতে পারি।

—না ঠাট্টা নয়, কাল কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

—তাই না কি! বিস্ময়ে বলে উঠি। এক মিনিট চুপ করে থেকে বলি,—তা আমায় কি—

কথা কেটে কমলা জবাব দেয়,—না, আপনার ফেরার ইচ্ছে না থাকলে আমাদের কোনই আপত্তি নেই। কারণ আপনার স্বাধীন জীবনের কিছুতেই প্রতিবন্ধক হতে চাই না।

আমি বলি,—হলে ভালো হতো।

কমলা কথা কইল না। মনে মনে বুঝলাম রাগ করেছে কমলা, তাই চুপ করেই রইলাম। হঠাৎ কমলা আমার হাত ছুটো ধরে বলে,—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অত নিষ্ঠুর হয়ো না!

এর জবাব কি দেওয়া উচিত নিজেই জানি না, তাই আবোল তাবোল যা মনে এলো বলে গেলাম। তার তাৎপর্য হচ্ছে—আমি একজন বাউণ্ডুলে, উদাসী। আমার যাত্রাপথের নিশানার ঠিক নেই অথচ, যাযাবরও নই, কাজেই—

কমলা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে জানায়,—হয়তো তোমায় সুখী করতে পারতাম কিন্তু যে নিজেকে ধরা দেবে না তাকে ধরার চেষ্টা শুধু বৃথাই।

চুপ করে থাকি বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বলি,—কমলা, একটা ছোট্ট কথা বলে আমাকে তোমার কাছে সুস্পষ্ট করে তুলতে চাই। আমি হচ্ছি একটা শুষ্ক মরুভূমি! যেটুকু কোমলতার প্রকাশ আমার শিল্পচর্চার মাঝে পাও, সেটুকু হচ্ছে মরুর মাঝে ওয়েসিস! কোন লোকই ওয়েসিস অবলম্বন করে জীবন যাপন করতে পারে না। ওটা হচ্ছে ক্ষণিক বিশ্রামের অবসরভূমি। শ্রান্ত মানুষ, ক্লান্তি ঘোচাতে সবুজ আশ্রয়ে কিছু তৃপ্তি আহরণ করে, আবার পথ চলে।

কমলা আর কথা কইল না। স্তব্ধ হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকে। তারপর নিঃশব্দে আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম—হয়তো এ আমার অন্যায় হলো। যাদের উদ্যোগে দার্জিলিঙে এসে এতগুলি মহাপুরুষের দর্শন পেলাম, সঙ্গ পেলাম, পরিচিত হলাম, তাদের এভাবে প্রত্যাখ্যান করা পাপ। কাজেই কমলার সঙ্গে ফিরে যাওয়াই আমার উচিত।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। সকাল বেলায় হর্নের পর হর্ন শুনতে পেয়ে হোটেলের সবাই প্রায় বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমিও এসে দাঁড়াই। আর পেছনে পেছনে এসে দাড়িয়েছিল কমলা।

মোটর থেকে মুখ বার করে একটি মহিলা আমারই খবর নিচ্ছিলেন। আমায় দেখে ফেলে বলেন,—এই, নেমে এসো।

আমি চোখ ফেরাতেই কমলা বারান্দা থেকে ফিরে চলে গেল নিজের ঘরে। আমি নীচে নেমে গিয়ে মোটরের পাশটিতে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করি,—কি ব্যাপার?

মহিলা হচ্ছেন কণা।

হেসে বলে,—ড্রেস করে নাও, মামার বাড়িতে একটু চা খেতে হবে।

কি একটা আপত্তি জানাতে যাচ্ছিলাম কমলার কথা স্মরণ করে, কিন্তু কণার চোখের ধমকে তা প্রকাশ পেল না। ওপরের ঘরে উঠে কাপড়-জামা বদলাতে শুরু করলাম। ইচ্ছে করেই দেরি করছিলাম, যদি কমলা আসে, তাহলে পরিস্থিতিটুকু তাকে বুঝিয়েই যাবো। কিন্তু কমলা এলো না।

এটা ওটা সেটা করে প্রায় দশ মিনিট কাটিয়ে দিলাম। এমন সময় কণা এসে ঘরে ঢুকলো। বলল,—উঃ সো লেট। চলো, চলো! সবাইকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

কণার সঙ্গে মোটরে গিয়ে উঠলাম। ওপর দিকে চাইতে লজ্জা করছিল কারণ জানি নিশ্চয়ই কমলা সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে।

কণার মামাবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখলাম চা ব্যতীত বেশ একটু গান বাজনার ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে। অতিথির সংখ্যাও খুব কম নয়। সবার সন্তুষ্টির জন্যে তাঁদের ফরমাশ মতো বহু গানই গাইতে হলো। সবার মনেই উদয় হয়েছে, আজ সকালটা বেশ কাটলো।

ইংরেজী আদবকায়দায় চা ও নাস্তা যথাযথ সরবরাহ করা হলো পোষাক পাগড়ীধারী বেয়ারাদের দিয়ে। অতিথিরা পরম তৃপ্তি সহকারে তা উদরস্থ করে যে যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। পড়ে রইলাম আমি একা কণার অপেক্ষায়!

কণার মামা আমায় একলা পেয়ে আহ্বান জানিয়ে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে বসালেন। কণা ততক্ষণ ভেতরের বাড়িতে, বোধহয় খাওয়া-দাওয়া করছিল।

লাইব্রেরি ঘরের দরজাটা কিঞ্চিৎ ভেজিয়ে দিয়ে কণার মামা বললেন,—আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও আপনার গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু কথাই কণার মা, অর্থাৎ স্বর্গতা বোনের কাছে শুনেছি। আজকাল কণার মুখে আপনার কথা বেশী করেই শুনে থাকি। আজ আপনার গান শুনে সে বিষয় সমর্থন না করে পারা যায় না—Really you are a great entertainer.

আমি কুণ্ঠা বোধ করছি, উনি কিসের চিন্তায় নীরব। তারপর ধীরে ধীরে বলেন,—আমার ভগ্নীর মৃত্যুশয্যায়, আপনি তাঁকে গান শুনিয়ে তাঁর আত্মার শান্তিতে সহায়তা করেছিলেন এর জন্যে আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

আমি যেন কিছু প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিলাম এমন সময় উনি আবার বলেন,—হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছি যে উনি মরবার সময় আপনার ও সিধুর হাতে কণাকে তুলে দিয়ে গেছেন! আশা করি আপনারা তাঁর শেষ ইচ্ছার মর্যাদা রাখবেন। কণার ধারণা যে ওর মা ওকে আপনার হাতেই সম্প্রদান করে গেছেন কিন্তু সেটা ওর ভুল ধারণা। সত্যিই আপনাকে, সিধুকে, সমরকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন—প্রায় ছেলের মতো। তাই, মরণকালে আপনাদের হাতেই কণার ভার তুলে দেওয়াটা তাঁর মরোণোন্মুখী মনের সুস্থ পরিচয় বলেই আমি মনে করি। আপনার কি মনে হয়?

অদ্ভুত প্রশ্ন। এর কি জবাব দিই।

সামলে নিয়ে উত্তর দিই,—নিশ্চয়ই! এর যেটুকু অন্তরূপ কণা বুঝেছে সে তার সম্পূর্ণ বালিকা সুলভ সরলতা মাত্র।

সুবোধবাবু বলেন,—ঠিক-ঠিক। এইটুকুই তুমি বাবাজী ওকে একটু অবরে-সবরে বুঝিয়ে বলো।

মামাবাবু আমাকে তাঁর শেষ কথায় 'তুমি এবং বাবাজী' সম্বোধন করলেন। আমিও বুঝলাম যে আমার উত্তরে নিশ্চিন্ত হয়েই তিনি আমাকে তাঁর নিকট বন্ধনে বেঁধে নিতে পেরেছেন।

তিনি বলেন,—ড্রাইভার এইবারে তোমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসুক।

তিনি উঠে পড়ে বাইরে এগিয়ে চলেন, পিছু পিছু আমিও অনুগমন করি। কণা ততক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে বলে,—ও তুমি বুঝি মামাবাবুর সঙ্গে লাইব্রেরিতে ছিলে? আমি ভেবেছিলাম কি ছোটলোক তুমি, যাবার সময় একবার বলেও গেলে না!

মামাবাবু ড্রাইভারকে আজ্ঞা দেন আমায় পৌছে দিয়ে আসার জন্যে। কণাও উঠে বসে গাড়িতে।

পথে কণা জিজ্ঞেস করে,—লাইব্রেরি রুমে কি কথা হচ্ছিল দুজনে?

আমি উত্তর দেই,—কিছুই না; নতুন মাইমার মৃত্যুর দিনের কথা হচ্ছিল। আমি তাই ওঁকে বলছিলাম—জানেন নতুন মাইমা আমাকে আর সিধুকে তাঁর ছেলের মতো ভালবাসতেন, তাই কণার ভার কণার দুটি ভাইয়ের উপর দিয়ে তবে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন।

কণা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সারা পথটায় একটা কথাও সে বললো না। নামবার সময় সে শুধু বলে,—আমিও দেখবো যে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওঁরা এগোলে কণা কি—নাকি করতে পারে!

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম,—কণা, হঠকারিতায় নিজেকে যেন নিঃশেষ করো না কারণ আত্ম-নিঃশেষ পাপ।

কণা ম্লান হেসে উত্তর দেয়,—আত্মহত্যার চিন্তাও আমি করতে পারি না, কারণ আমি কাওয়ার্ড নই। তবে জীবন রেখেও জীবন কি করে নিঃশেষ করতে হয় সে মন্ত্রও আমি জানি।

উত্তেজনায় দরজাটা ধড়াস করে বন্ধ করে দিল। তারপর বলল,—ড্রাইভার

খর্। গাড়ি দূরের টিলাটায় একটা গোঁত্তা মেরে উঠে সবেগে মোড় ঘুরে মিলিয়ে গেল। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে হোটেলের সিঁড়ি ধরি।

আহারাদি সেরে ঘরে এসে বিকেলে কলকাতায় ফেরার জন্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় মণিবাবু এসে বললেন,—একি, তাহলে আপনিও আমাদের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন?

আমি বলি,—সঙ্গে যখন এসেছি তখন সঙ্গে না ফেরার কথাই তো ওঠে না।

মণিবাবু বলেন,—কমলা বলছিল যে আপনি বোধহয় আরও কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

উত্তরে আমি স্মিত হেসে জানাই,—কমলা ছেলেমানুষ; কমলা যা খুশী ভাবতে পারে, তাই বলে আপনি এমনটি ভাবলেন কি করে?

লজ্জায় পড়ে যান মণিবাবু। ধীরে ধীরে ঘর ত্যাগ করেন। মনে হলো সুখবরটা কমলাকেই পৌঁছে দিতে গেলেন।

একটু পরে কমলা এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। একমিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সুটকেশটাকে আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে গোছাতে শুরু করে দেয়। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বলি,—তাহলে এই ফাঁকে চট করে আমি নেভুদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি, তুমি গুছিয়ে নাও।

যথাক্রমে বিকেলবেলায় দার্জিলিং পরিত্যাগ করলাম। সকলের এক গাড়িতে জায়গা হলো না তাই ওদের ছেড়ে আমি অপর কম্পার্টমেণ্টে উঠেছি, বাহানা দেখিয়েছি যে নেভুদার একটি বন্ধু কার্সিয়ং পর্যন্ত যাবেন, তাঁর সঙ্গে যেতে হচ্ছে। কার্সিয়ঙের পর এসে আবার একত্র হবো। আশা পথ চেয়ে কমলা বসে থাকে।

কম্পার্টমেণ্টে উঠে দেখি মিঃ সরকার বসে। মিঃ সরকার হচ্ছেন ফরেস্ট রেঞ্জার। ইউএর বাবা যতীনবাবু ছিলেন ফরেস্ট কনজারভেটার। কালিম্পঙে পোস্টেড। মিঃ সরকার তাঁরই এক্তারের রেঞ্জার। গত গরমের ছুটিতে ইউএর সঙ্গে কালিম্পঙে থাকাকালীন মিঃ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচয় ঘটে।

মিঃ সরকারকে পেয়ে খুশী হয়ে উঠলাম। উনি মাত্র একটা স্টেশন যাবেন। নামবেন 'ঘুমে'। সেখান থেকে ঘোড়ায় করে যাবেন 'ধাড়ান্', নেপাল সীমানায়।

কালিম্পঙে থাকাকালীন মিঃ সরকারের অনুকম্পায় ওরই সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে, ভুটান সীমান্ত, সিকিম সীমান্ত আমার দেখা হয়ে গেছে। এবার নেপাল সীমান্ত দেখলে কেমন হয়—হঠাৎ মনে উদয় হলো। বললাম,—যাবো নাকি আপনার সঙ্গে, ধাড়ানে !

—হ্যাঁ-হ্যাঁ চলুন না, খুশী হয়ে তিনি উত্তর দেন। বলেন,—অসুবিধা হবে না, স্টেশনে ছুটো ঘোড়াই প্রস্তুত থাকবে কারণ আমার সহকারীরও যাবার কথা ছিল ; কিন্তু বিশেষ কাজে তাকে দার্জিলিঙে থেকে যেতে হলো। কাজেই ঘোড়া যখন প্রস্তুত তখন অসুবিধার কথাই ওঠে না।

ঘুমে এসে গাড়ি থামলো। মিঃ সরকার নামতে নামতে বলেন,—কৈ নামুন ?

কারোকে কিছু না বলে ঘুমেই নেমে পড়লাম। মিঃ সরকারের আয়োজন যথেষ্ট, কাজেই স্টেশনের বাইরে এসে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম নির্বিবাদে।

ঘোড়ায় চড়ে উপলব্ধি করলাম যে আমি আজ মুক্ত। যে সূক্ষ্ম বাঁধনে অস্বস্তির রেশ জমে উঠেছিল সারা মনে, এক মুহূর্তে কুয়াশার মতো যেন তা নীচে নেমে গেল।

প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে আমিও যেন নেমে চলেছি।

অদূরের ঐ গিরিশৃঙ্গরাজি আজ আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সমাজ, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা, অহেতুকী কটাক্ষ, বাক্যবাণ, শ্লেষ, উপেক্ষা সব কিছুরই অবসান ঘটিয়ে দেয় ঐ অফুরন্ত আনন্দলোক।

অনির্বচনীয় সন্ধ্যা নেমে আসছে।

মিঃ সরকারকে বললাম,—আমার এই যাত্রায়, আপনাকে পাওা করে এগিয়ে চলেছি ধাড়ানের পথে কিন্তু ফেরার দায়িত্বটুকু নিজের হাতেই তুলে রাখলাম। অর্থাৎ আপনার কাজ শেষ হলেই যে বলবেন—চলুন মশাই, তা হবে না। আমার যদি ভালো লাগে আমি সেখানে যাতে ছদিন থেকে যেতে পারি তার ব্যবস্থাও কিন্তু রইল পাণ্ডার হাতে।

মিঃ সরকার বলেন,—অনায়াসে। যদি সত্যি থাকেন তাহলে আমাদের ফরেস্ট অফিসকে জানিয়ে আসব, অসুবিধা হবে না।

নীচের বনে সন্ধ্যার ঘন ছায়া, ওপরে আলোর রঙীন খেলা।

আমাদের ঘোড়া খাদ ঘেঁসে নেমে চলেছে।

ভিজে হাওয়ায় জিরানিয়া ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

বার

তিনঘণ্টা ঘোড়ার সফর করার পর রাত আটটায় ধাড়ানে এসে পৌছলাম।

এ শহর নয়, সামান্য নেপালী ছোট গ্রাম। কয়েকটি খোলার চাল বিশিষ্ট কাঠের বাড়িতে ছোট গ্রাম রচনা করেছে। দূরে শিবমন্দিরে আরতির ঘণ্টা, ঝাঁঝর আর দামামা একসাথে তালে তালে বেজে চলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন এরাই এখানে সজীব আর বাকী সব অন্ধকারে মৃত্যুর মতো শিথিল হয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে।

ফরেস্ট বাংলোর ছোট্ট একঘরী-কুটিরের সামনে দু'চারজন পোর্টার আগুন জেলে শীতের অন্ত করছে। ঘরটিতে ঢুকে আমরা দুজনে চৌকিতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, এমন সময় বয় এসে 'র' চা পরিবেশন করলো। বাইরের ক্লান্তিটুকু যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল নিমেষে।

রাতের খাওয়া শেষ করে শুতে যাচ্ছি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এলো এক ঝলক সংগীত।

মিঃ সরকারকে জিজ্ঞেস করলাম,—এ গান কোথা থেকে আসছে?

—দেহাতীদের গান হবে বোধহয়।

কিন্তু এ গানের উৎস যে দেহাতীদের মধ্য থেকে নয় সে আমি বেশ বুঝেছি। পাখোয়াজের সঙ্গে এক অনবদ্য আভ্যুদয়িক সংগীত স্ত্রীকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে, তাই ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে পোর্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কাঞ্চা, এ গান কোথা থেকে আসছে?

কাঞ্চা উত্তর দিলে,—বাবুজী, শম্ভুজীর মন্দিরের পাশে এক মস্ত বড় যোগিনী আশ্রম করেছেন। তিনিই তাঁর শিষ্যা নিয়ে প্রতিরাতে এমন গান করেন। আপনারা ঘুমালে আমরাও ওখানে চলে যাবো। সারা রাত্রি গান শুনে সকালে ফিরে এসে সাহেবের সেবা করবো।

আমি জিজ্ঞাসা করি,—সারা রাত ধরে উনি গান করেন?

কাঞ্চা উত্তর দেয়,—হ্যাঁ বাবু। উনি গান করে পূজা করেন, সবাইকে উপদেশ দেন। আজ একমাস ধরে সারা গাঁ প্রতিরাত্রে তাই ওখানে বসে থাকে। যোগিনী মার কাছে রাত জাগলে দিনে ঘুম আসে না, মনে হয় না, সারা রাত জেগে কেটেছে।

যোগিনী গায়িকার বহু গুণাগুণ শুনতে শুনতে বলি,—আমি আজ তোমাদের সঙ্গে ওখানে যাবো।

কাঞ্চা বলে,—তবে চলুন।

প্রায় আধমাইল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে যোগিনীর আশ্রমে পৌছলাম। এটি যেন একটা পাহাড়ের বাহির-গুহা। সেখানে ঢুকলে প্রথমেই নজর পড়ে সামনের বেদিতে রাখা ত্রিশূলটির উপর। তারই পাদপীঠে বসে যোগিনী শিবস্তোত্র পাঠ করে চলেছেন। দুপাশে দুটি মেয়ে সাধুনী, দুটি তানপুরাতে আঙুল চালাচ্ছেন। যিনি পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন তিনিও এক যোগিনী।

বাইরে দেহাতী লোকের ভিড়।

একটি স্তোত্রের শেষ চরণ উচ্চারণ করে দম নিতে গিয়ে আমার প্রতি যোগিনীর দৃষ্টি পড়লো। ইসারায় আমায় বসতে বললেন। সেইখানেই বসে পড়লাম। পাশের দেহাতী-প্রতিবেশীরা সন্ত্রস্ত হয়ে আমায় এগিয়ে যেতে বললো কিন্তু আমি তাদের চুপ করতে ইঙ্গিত করলাম।

যোগিনী যখন স্তোত্র উচ্চারণ করছেন তাঁর সারা দেহ কি এক স্পন্দনে ছন্দে ছন্দে কেঁপে উঠছে। তানপুরার সা-এ তাঁর গলা এসে মিলে যাচ্ছে যখন, তখন সারা শ্রোতৃমণ্ডলী অকারণে শিউরে শিউরে উঠছে। সে শিহরণ আমিও উপলব্ধি করলাম। মনে হলো যেন এক তড়িৎ-প্রবাহ সারা শরীরের মধ্য দিয়ে গতায়াত করছে। সারা শরীরটা যেন ঘুমের নেশায় ঢুলছে অথচ ঘুমের নেশা মাত্র চোখে নেই। না-ঘুমানোর ক্লান্তিও অনুভব করছি না। এ যেন নিদ্রা-জাগরণের মাঝে এক নিরালম্ব আশ্রয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানি না হঠাৎ চমক ভাঙলো যোগিনীর আহ্বানে, বললেন,—আপ আগয়ে ?

আমি ভাবি—আমি যে আসবো এ কথা যোগিনী কি জানতেন নাকি ? স্মিত হাসলাম, উত্তর দিলাম না। তিনি শুধু কি একটা ইঙ্গিত করলেন। তারপর তানপুরা ধারিণীদের মধ্যে একজন এসে আমায় তাঁর তানপুরাটি এগিয়ে দিলেন। আমি ত্রস্ত হয়ে কিছু বলার আগেই যোগিনী বলেন,—গানামে ইনকার গানেওয়ালাকে লিয়ে গুণা হ্যায় (অর্থাৎ যাঁরা গান জানেন তাঁরা গান গাইতে পারবো না বললে পাপ হয়)।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তানপুরা হাতে নিয়ে ওংকার ধ্বনি তুললাম।

সঙ্গে সঙ্গে যোগিনী ও তাঁর সহচরীদ্বয় তাতে যোগ দিলেন। লয় ও ছন্দে পাখোয়াজ ধ্বনিত হলো, প্রতি পর্দার সঙ্গে সুর-সম্বাদ (harmonisation) সূত্র বচনা করতে লাগলেন যোগিনী নিজে।

যোগিনী যে সুরের সুর-সম্বাদ সৃষ্টি করছেন তারই মধ্য থেকে যোগিনীর সহচারীরা নতুন সুর-সম্বাদ সৃষ্টি করে যেন সারা বনস্থলী সুরময় করে তুলতে লাগলেন। আমি অনভ্যস্ত, সুর-বিকাশের দিকে ধ্যান দিতে গিয়ে হঠাৎ স্বর স্তব্ধ হলো। যোগিনী হেসে বললেন,—আগে বাঢ়হিয়ে বেটা, চুপ কিঁউ হো গয়ে?

আমি বললাম,—সুরের খেই হারিয়েছি।

যোগিনী এবার নিছক বাংলা ভাষায় উত্তর দিলেন,—আউম্ মানে ত্রয়ী। অ-উ-আর ম্। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে তার জিহ্বার বিনা সংযোগে 'ওয়া' বলে কেঁদে উঠে পরিসমাপ্তি ঘটায় এক অস্ফুট অম্ ধ্বনিতে। 'ওয়া' আর 'ম' বলতে গেলেই এসে পড়ে এর মাঝে এক 'উ'। এ তিনের সংযোগে হয় 'আউম্'। এই জীবন্ত চেতনের প্রথম বাণী—তাই সে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের প্রথম প্রণব। বাক্যে যেমন আ-উ-ম, সংগীতে তেমনি স-গ-ম, বর্ণে তেমনি লাল, হলদে, নীল।

আমি এর একবর্ণও বুঝলাম না। তিনি বোধ করি তা উপলব্ধি করলেন, তাই বললেন,—আপনি সংগীতজ্ঞ, আপনি ইচ্ছে করলেই ভগবানকে দর্শন করতে পারেন।

ভগবান দর্শনের আশায় যোগিনীর আশ্রমে আসি নি, এসেছিলাম ঘুমন্ত ধাড়ানের নিশুত রাত্রে এক সুরের জাদুর আকর্ষী মায়ায়। কুণ্ঠিত হয়ে বলি,—আমায় আবার আপনি কেন?

যোগিনী উত্তর দেন,—সংগীত গৌরবে তোমাকে আপনি বললাম কারণ আপনি একজন সুগায়ক। জন্ম হতেই শিউজী তোমায় ওর অধিকার দিয়েছেন। তাই তুমি আপনি।

যোগিনীর হেঁয়ালী কথাগুলো চারিপাশের কুয়াশার মতোই দুর্ভেদ্য তাই ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে মগজে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। তিনি বলেন,—সংগীত বলতে তুমি কি বোঝ বল দেখি!

উত্তর নেই, চুপ করে থাকি। সংগীতের যৌগিক ব্যাখ্যা তো জানি না। তবু সাধারণ শাস্ত্রে যা পড়েছি তাই স্মরণ করে বলি,—সংগীত মানে গীত, বাদ্য ও নৃত্য। এই ত্রয়ী নিয়েই সংগীত।

উনি বল্লেন,—ঠিক বেটা। যে গীত সারা অঙ্গে ছান্দিক গতির আরোহণ অবরোহণ করায় তাকেই বলে সংগীত। সংগীতে দুটি পর্যা, পর্যানুক্রমে স্বর ও সুর-সম্বাদ সৃষ্টি করছে। মার্গ আর দেশী।

আমি বলি,—অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সংগীত আর দেহাতী সংগীত।

যোগিনী হেসে বল্লেন,—মার্গ্ মানে রাহ্, পথ। যে সংগীত পথ দেখিয়ে 'ধ্রুবকে' কাছে নিয়ে আসে। তাহলে পথটি কি জানতে হবে। পথ হচ্ছে দেহের পথ। গান যে করে তারই দেহ আর সেই দেহেরই পথ। এই হচ্ছে জীবদেহের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডের যে পথ তার আবার জায়গায় জায়গায় স্তর আছে। স্তরের অবার পদ্মের মতো দল আছে। এ দল নিয়ে এক একটি স্তরকে বলে দেশ! প্রতিদেশ বা স্তরের বর্ণ শোভার নামই হচ্ছে দেশী। কাজেই মার্গ যখন পথ দেখিয়ে স্তরে এগিয়ে নিয়ে যায় তখন গায়ককে স্তরে স্তরে উঠিয়ে তাদের স্ব-স্ব দলগুলি বর্ণশোভায় রঙিন করে তোলে। মার্গ—জ্ঞান, আর দেশী—বিজ্ঞান। দুটির সুর-সম্বাদ হলে মানুষ যোগী হয়। তাকে আর যোগ সাধনা আরাধনা কিছুই করতে হয় না।

স-গ-মএর সংযোগে যেমন বারটি সুর আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে আর তৈরি হয় একটি অষ্টাঙ্গ সুর মণ্ডল, (octave) তেমনি শেষ হয়ে যায় যোগীর রাজযোগের কঠিন অষ্টাঙ্গ—য়ম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধেয়ান ও সমাধি। তাই যোগ সাধনায় জীব যায় শিবে আর শিব নামে জীবে, কিন্তু সংগীত-সাধনায় শিব যায় রুদ্রে, আর রুদ্রনামে শিবে।

আমি এতক্ষণে কথা বললাম,—মানে বুঝলাম না!

তখন তিনি বললেন,—ছিল static মানে শিব, এলো সংগীত মানে vibration, তখন static ভাইব্রেটেড্ হয়ে গেল রুদ্রে'! এখন রুদ্র মানে? তানপুরায় সুর উঠলো। যোগিনী স্তোত্র উচ্চারণে রুদ্ররূপ বোঝাতে শুরু করলেন—

"কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।
কেশী বিশ্বং স্বদৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে॥"

ব্যাখ্যা করেন—কেশিন্ মানে রশ্মিযুক্ত সূর্য বা অগ্নি। এই রশ্মিসম্পাত-কণাগুলি পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে 'রোদসী' অর্থাৎ কাঁদছে। কাঁদবে নৈ কি, পরস্পরকে ভালবাসার আকর্ষণ চুম্বকে বেঁধে রেখেছে, পাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে

ছড়িয়ে পড়ে তাই কাঁদছে। এই রোরুদ্যমান জ্যোতিকণার কান্না দেখে বলা হলো—

"রোদনং রুদ্র ইত্যেবং, লোক খ্যাতিং গমিষ্যতি।"

জন্মাকর্ষণেই রোদন—জ্যোতির ছান্দিক আকর্ষণীর প্রলয়ংকর নৃত্যছন্দই তাই নটরাজ রুদ্রের প্রলয়ংকরী নাচ, ইংরেজীতে একেই বলেছে electrons.

সংগীত পর্যায় সৃষ্টি হলো নটরাজের নৃত্য, বৈষ্ণবদের কাছে তাই হলো রাস-নর্তন। সবই কৃষ্ণময়, অথচ প্রত্যেকেই কৃষ্ণ-হারা! জ্যোতিকণার আকর্ষণী নৃত্যে সবার পাশেই, সবাইকে জড়িয়ে থাকতে দেখছে অথচ কার অবলম্বনে এ স্বাবলম্বন তা কেউ বলতে পারছে না, বুঝতে পারছে না অথচ উপলব্ধি করতে পারছে সেই আকৃষ্টবান কৃষ্ণের সর্বত্র উপস্থিতি!

সংগীতের মার্গ যখন দেশীয় সৌরভে সৌরভান্বিত হয়ে ধ্রুব-র কাছে পৌছায়, সে তখন হয় আভ্যুদয়িক সংগীত—absolute music. ছন্দে তালে লয়ে সেই মহারুদ্রেই লয় পেয়ে যায়।

যোগিনীর অনাহত সংগীত-প্রবাহে ডুব দিয়ে বসেছিলাম। যখন স্রোত থেমে গেল তখন মাথা তুলে দেখলাম, ভোরের আলো দিগন্তে ফুটে উঠেছে। পাখিদের কলধ্বনির সাথে, পাশের খরস্রোতার কুলুকুলু ধ্বনি মিলে স্বর্গরাজ্য রচনা করেছে।

প্রণামান্তে সবাই উঠে দাঁড়ালো। তারপর বাসায় ফিরলাম।

মিঃ সরকার বললেন,—দেহাতে যাত্রা হচ্ছিলো বুঝি, সারা রাত ধরে তাই শুনলেন? ধন্য ধৈর্য আপনার!

একটু পরে মোটা রকম নাস্তা খেয়ে উনি ওঁর কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি একা। একার অনেক্ সমস্যা! লোকারণ্যের তারিফের হাততালি পেয়ে পেয়ে যার নেশা জন্মেছে তার কাছে একা থাকা যন্ত্রণাদায়ক। তাই একা একাই বেরিয়ে পড়লাম। পথঘাট কিছুই চিনি না, চিনি শুধু পূর্ব রাত্রের পরিচিত যোগিনীর আশ্রম।

ধীরে ধীরে নিরলস গতিতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম সেই পাহাড়গুম্ফার সামনে। কোথাও জনমানব নেই। ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম বেদির উপরের ত্রিশূলটিও উধাও হয়েছে, গুম্ফার ভিতরেও কারো সাড়াশব্দ নেই। ভাবলাম গতরাত্রের সংগীত সাধনা সুর-সম্বাদ, সবই কি স্বপ্নময় ছিল—ব্যাপার কি? সব গেল কোথায়? কে উত্তর দেবে!

বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। উতরাই পথে, একটি নেপালী ছেলে ভেড়া চরাচ্ছিল। তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম,—যোগিনী কোথায় গেলেন? সে তার ভাষায় ও ইঙ্গিতে যা বললো তাতে বুঝলাম, জঙ্গলে গেছেন।

তবে, গতরাত্রের ঘটনা সত্য! স্বপ্ন নয়?

আরও নেমে এলাম। এবার গ্রামের বাজারের কাছ বরাবর এসে পড়েছি, হঠাৎ দেখা হলো আমাদের পোর্টারের সঙ্গে। সে আমাদের জন্যে সবজি সংগ্রহ করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যোগিনীর কথা!

সে বললো,—দিনের বেলায় যোগিনী গভীর জঙ্গলে যোগে বসে থাকেন আর রাত হলে গুম্ফায় ফিরে এসে গান করেন।

সত্যি, এ বড় অদ্ভুত। শিল্পচর্চায় বহু গুণীকেই সাধনা করতে দেখেছি কিন্তু যোগিনীর সাধনা যে কী তা বুঝে উঠতে পারলাম না। গত রাতের কথাবার্তায় বুঝেছিলাম যে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, অথচ যোগিনীর জঙ্গলে গিয়ে যোগ সাধনার কৃচ্ছ্র সাধনই বা কেন?

জিজ্ঞাসা করলাম,—কোন্ বনেতে তিনি যোগ সাধনা করেন?

পোর্টার বলে,—উপরের ওই পাহাড়ের মধ্যে ওঁর পঞ্চবটী আছে, সেইখানে বসে সাধন ভজন করেন।

বাড়ি ফিরে এলাম। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে যোগিনীর পঞ্চবটীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

পাহাড়কে নিশানা করে পথ চলেছি, একা।

উঠতে উঠতে মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে পড়ছি, জানি না ঠিক লক্ষ্যে চলেছি কিনা। পথে ছোট ছোট উৎসের পর উৎস। তার শীতল জল পান করে পথের কষ্ট দূরীভূত করছিলাম। একটা নেপালী ছোকরা, ফুটফুটে দেখতে, হঠাৎ আমার পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। চোরবাট্টু অর্থাৎ চোরাপথ দিয়ে দু'তিন মিনিটের মধ্যেই পঞ্চবটীর উপান্তে পৌঁছে দিয়ে বললো,—হৈ-হুঁয়া, আপ যাইয়ে। হুঁয়া হামারা জানেকা মানাই হ্যায়।

বুঝলাম গাঁয়ের সবাই জানে এটি সন্ন্যাসিনীর যোগাশ্রম কিন্তু যোগিনীর মানা থাকায় কেউ আসতে সাহস করে না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি পঞ্চবটীর দিকে।

নির্জনতার মাঝে কচিৎ উৎসের ঝর্‌ঝর্ শব্দ ছাড়া কিছুই শোনার মতো

নেই। আশ্রমের পাশে এসে দাঁড়ালাম কিন্তু যোগিনী কৈ, কোথায় বা তাঁর সহচরীর দল ?

হঠাৎ এ পরিস্থিতিতে মনটা দমে গেল। মনে কিছু ভয়ের উদ্রেক হলো। তবু আশ্রমের বেদিটায় একটু বসে নিলাম। বসামাত্রই যেন চারিদিক থেকে সঙ্গীত স্রোত উঠতে লাগলো, আমি চমকে উঠলাম।

চারিপাশে কোথাও জনমানুষ নেই, অথচ এ সঙ্গীত স্রোত কোথা থেকে আসছে? অদূরে দেবদারুরা মণ্ডপ রচনা করেছে। সেইখানে তৃণাসনে বসে যোগিনী সহচরীদের নিয়ে সঙ্গীত সাধনা শুরু করেছেন।

অপূর্ব সে এক সুর-সম্বাদ। ইংরেজী সঙ্গীতে এই সুর-সম্বাদ আছে যাকে বলে 'হারমান'। কিন্তু প্রাক্ মুসলমানী যুগে সুর-সম্বাদ যে ভারতেরই ছিল তার পূণ প্রমাণ পেলাম। বেদে সঙ্গীতের অধ্যায়ে এই সুর-সম্বাদের কথা কিছু কিছু উল্লেখ আছে, আজ তা স্বকর্ণে শুনতে পেলাম।

একক উচ্চারিত সুর যে এভাবে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতে পরিণত হতে পারে তা প্রথম এই উপলব্ধি করলাম।

ওঁদের সামনে যাবার পর্যন্ত সাহস হলো না! পাছে, এই 'প্রথম সামরব' এই তপোবনে থেমে যায়।

ওস্তাদ মহলের সঙ্গীত সাধনায় দেখেছি, সাক্ষ্য রাখি বাঈজী মহলের সঙ্গীত সাধনার, নিজেও সঙ্গীত সাধনায় আত্ম নিবেদন করেছি, কিন্তু এভাবের সঙ্গীত সাধনা অভূতপূর্ব। বনানীর প্রাঙ্গণ বক্ষে বসে আজ প্রথম বিশ্বাস করলাম, —নাদ ব্রহ্ম, সুর ব্রহ্ম, স্বর ব্রহ্ম।

চুপিচুপি ওঁদের না জানিয়েই ফিরে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। দু-চার পা এগিয়েছি, এমন সময় তীক্ষ্ণ স্বর এসে কানে পৌঁছয়,—ঠাহ্‌রিয়ে!

দাঁড়িয়ে গেলাম। আবার কথা এলো,—ইধার পধারিয়ে।

ফিরে দাঁড়ালাম, দেখলাম সন্ন্যাসিনীর সহচরীদের একজন পঞ্চবটীর কাছে দাঁড়িয়ে আমায় ডাকছেন। কাছে গিয়ে সন্তর্পণে দাঁড়ালাম। উনি বললেন,— ইধার পধারিয়ে।' বুঝলাম ওর সঙ্গেই যেতে হবে।

ধীরে ধীরে যোগিনীর দেবদারু মণ্ডপে প্রবেশ করলাম। যোগিনী হেসে বললেন,—এখানে কেন? এ যে সাধনার জায়গা। এ পীঠস্থানে এলে দক্ষিণা দিয়ে তবে যেতে হয়!

আমি পকেটে হাত পুরে দক্ষিণার জন্যে প্রস্তুত হবার চেষ্টা করছি। যোগিনী

বলেন,—এখানকার দক্ষিণা পয়সা নয়, শুধু গান। একখানা বাঙলা গান শোনাতে হবে বাবু।

আমি মৃদু হেসে ওদের পাশে বসে তানপুরাটা হাতে তুলে নি, তারপর তুষার হিমাদ্রির প্রথম দর্শনে টাইগার হিলে বাঁধা নতুন গানখানি গাইতে শুরু করি—

"একী গম্ভীর রূপে, হে সন্ন্যাসী, এলে অপরূপে !

আমার সাধন, অন্তর-ধন মিলবে কি আজ চুপে ?"

নিস্তব্ধ বনানীকে সাক্ষী রেখে যে মন্ত্র আমি আজ ভিক্ষা চাইলাম, যোগিনী বুঝি সেটুকু লক্ষ্য করে বলেন,—তোমার গানে শিউজী তুষ্ট হুয়া। গাওয়াইকা কে লিয়ে মন্ত্রতন্ত্র কিছু নেহি বাবুজী। শুধু গান করে যাও—ব্যস্! ওতেই সব। সৎ-চিৎ আনন্দ। আনন্দ্‌মে রহো !

অন্তরের মন্ত্র ভিক্ষা চাওয়ায় বোধহয় উত্তর পেলাম !

কথাগুলো যখন হচ্ছিল আমি তানপুরাটা থামাই নি। ভেবেছিলাম সুর চালু রাখলে নিশ্চয়ই যোগিনী আবার গান শুরু করবেন।

সুরের আওয়াজ ছাড়া সমস্তই স্তব্ধ। যোগিনী হঠাৎ কেমন ধ্যানস্থ হলেন।

সবাই চুপ। হঠাৎ সংবিতে ফিরে বলেন,—কি পেতে চাস্ বেটা, বোল ?

কি জবাব দেবো ভেবে পাই না। কিবা চাইব স্থির করতে পারি না। শুধু বলে ফেললাম,—পথ !

যোগিনী হেসে বলেন,—পথ ? সবই পথ। যার যা অভিরুচি। তবে গানের পথ হচ্ছে 'সহজিয়া'। তাই এর আর এক নাম 'সহজযান'। কৃষ্ণ তাই বেণুকর হয়ে পূজা পায়, শঙ্কর তাই ছন্দের আবর্তে পূজা পায়। রামানুজ বল, তুকারাম বল, সুরদাস, তুলসীদাস, দাদু, কবীর, রুইদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নিমাই, নিতাই, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত সবাই এই সহজযানের মাধ্যমে ভগবৎকৃপা লাভ করেছে। সঙ্গীতের ঝঙ্কারে রুদ্রের জাগরণ। আবার রুদ্রের পূর্ণালোক ভাস্বর হয়ে ওঠে ধ্রুবের জ্যোতিধারায়। তাই ধ্রুবকে পেতে হলে বায়ুসংযমের দরকার। সংযমিত বায়ু না হলে অগ্নির দাহিকাশক্তি উৎপাদন হয় না। এই বায়ুসংযম সঙ্গীতে থাকে পূর্ণমাত্রায়, তাই সে সবার বড় অথচ সহজ সাধ্য।

বায়ুসংযম একানুগতি হলে আত্মচুম্বকী (self-magnetism) সৃষ্টি হবে। চুম্বকীশক্তির টানে আনবে সবাইকে কাছে টেনে। তাদের sympathetic

vibration আনবে সাধকের মাঝে self-resonance. তখন অশ্রুত আত্মধ্বনি শ্রুতির অধ্যায়ে নেমে আসবে। তাকে তখন শুনতে পাবে, দৃষ্টির অনুভূতিতে সে রূপ নেবে, তাঁর দর্শন পাবে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি,—তাঁর দর্শন পাওয়াই কি জীবনের পরম কাম্য?

যোগিনী মৃদু হাসলেন।

আমার মনে হলো, যেন আমি যা বলতে চাইছিলাম, তা ঠিক প্রকাশিত হলো না, হঠাৎ যেন কি বলতে কি বলে ফেললাম।

তিনি বলেন,—যারা পায়, তারা নেয় না। নিতে গেলে অপমানিত হতে হয় অথচ পাওয়ার নেশাটুকু যাবে কোথায়? পাওয়া মানেই মৃত্যু, পেলেই সব ফুরিয়ে যায়। তাই দর্শনে দেহের অবসান। দেহের অবসান হলে তখন বসে বসে দেখবে কে? তাই তো এত লুকোচুরী। দর্শন দেবে দেবে করেও দর্শন দেয় না। পাওয়ার নেশায়—তাই, কেউ হয় দার্শনিক, কেউ গায়ক, কেউ কবি, কেউ যোগী, আবার কেউ দেউলিয়া হয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

অনেক শুনলাম কিন্তু কিছুই মনের মণিকোঠায় ধরে রাখতে পারলাম না, সব গুলিয়ে ফেললাম। চুপ করে থেকে বলি,—আচ্ছা আমার ভবিষ্যৎ কি?

খিলখিল করে হেসে ওঠেন যোগিনী। বলেন,—আমি কি বাপু তোমার জ্যোতিষী যে বলে দেবো তোমার ভবিষ্যৎ কি! আমি গায়িকা, আমি শিবের সেবিকা। এর বেশী আমি কিছুই শিখিনি তাই জানি না। তবে বেটা তোমাকে গৃহী হতে হবে, সংসার ধর্ম করতে হবে, সারা জীবন খেটে কর্মক্ষয় করতে হবে। তারপর সামনের জন্মে তোমার দর্শন।

আমি একটু চুপ করে থেকে বলি,—তাহলে আমাকে পথটা বলে দিন।

যোগিনী চুপ করে থাকেন, উত্তর দেন না। তারপর বলেন,—আও বেটা, তুমহে আজ সুর প্রাণায়াম শিখা দুঁ।

জোড়া তানপুরা বেজে উঠলো।

যোগিনী ওংকার ধ্বনি তুললেন। স্বরগ্রামে ওঠা-নামার মাঝে শ্বাসের সংযমটুকু শেখাতে শুরু করলেন সন্ন্যাসিনী।

সারা বনানীর বনমর্মরে তা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। আমি সজ্ঞানে না অজ্ঞানে জানি না, সেই সুর সংযমে প্রাণায়াম করে চললাম। ক্রমে যেন সারা পৃথিবীর আলো আমার কাছে ম্লান হয়ে চোখের উপর এক নীলাভজ্যোতি

ফুটে উঠলো। আমার বোধশক্তি শরীরের সীমানা পার হয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল, জানি না। শুধু জানি যে জ্যোতির নীলাভ আভাটুকু আমায় ক্রমে ক্রমে ঘুম পাড়িয়ে ফেলছে।

আমার চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সরকারের কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো। তিনি বলছেন,—যাক্ জ্ঞান ফিরেছে!

পাশের লোকটি আমার নাড়ী দেখছিলেন, বুঝলাম ডাক্তার বাবু। তিনি বললেন,—এবার ঠিক হয়ে যাবেন। দুপুরে রৌদ্রে হেঁটে হেঁটে পাহাড়ে উঠেছিলেন, তার উপর কলকাতার বাসিন্দে।

চোখ বুজিয়ে নিলাম। কানে সব কথাই আসছিল। ভাবলাম তবে কি আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কৈ আমার তো কিছু মনে পড়ছে না। যোগিনীর সঙ্গে সুর-সাধনা করতে করতে এক নিঃসীম নীলান্তে তলিয়ে যাচ্ছিলাম সত্যি কিন্তু একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম!

মিঃ সরকার একটু ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—কি? এখন কেমন বোধ করছেন?

—বেশ ভালই। কেন, আমার কিছু হয়েছিল নাকি?

মিঃ সরকার ছোট গলায় বলেন,—ও সব এদেশীয় যোগিনী ফোগিনীর পাল্লায় পড়বেন না। ওরা সব কামাখ্যাসিদ্ধ, কি করতে কি করে বসবে!

আমি বলি,—উনি তো আমায় কিছুই করেন নি। শুধু সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা, কিছু গানের সুর।

মিঃ সরকার জিজ্ঞাসা করেন,—কিছু পেসাদ-টেসাদ খেতে দিয়েছিল?

—কৈ না তো! জঙ্গলে এক ঝরনার জল ছাড়া কিছু খেয়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ে না।

মিঃ সরকার বলেন,—আজকের কাজ শেষ হলেই আমি চলে যাবো। পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে আপনাকেও ফিরতে হবে।

আমি কথা কইলাম না। উনি যথাযথ আপিসে বেরিয়ে গেলেন।

আমি উঠে বসি।

পোর্টারের মুখে শুনলাম যে আমার অজ্ঞান দেহ যোগিনী নিজে ও তাঁর সঙ্গিনীরা বহন করে পৌছে দিয়ে গেছেন। আর যাবার সময় একটি চিঠি লিখে ওর কাছে রেখে গেছেন আমার জন্যে। আমি চঞ্চল হয়ে উঠি চিঠির

জন্যে। পোর্টার তার কোমরের বন্ধনী থেকে এক খণ্ড কাগজ বার করে দেয় আমার হাতে। তাতে স্ত্রী লোকের হাতের অক্ষরে লেখা একটি হিন্দী চিঠি। তার মানে হচ্ছে—

"এ পথ তোমার নয়। তবে সঙ্গীত সাধনা যখন করো তখন এর দর্শনটুকুও অনুধাবন করবার চেষ্টা করো। সে সুযোগ তুমি পাবে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে। এখন সংসার করো। পারিবারিক আর লৌকিক সঙ্গীতে তুমি পারদর্শী হবে। যৌগিক অধ্যায় আসবে তোমার পরজীবনে। ইতি—আঃ ভৈরবী ভুবনেশ্বরী সরস্বতী।"

পুঃ—"আমরা এখন চলেছি পশুপতিনাথ দর্শনে। ওখান থেকে কেদার-বদ্রির পথে আমরা ফিরে যাবো, সেইখানেই আমাদের সাংসারিক আস্তানা।"

চিঠি পড়ে মনে হতে লাগলো এ যেন আমার জীবনে এক ঔপন্যাসিক কাহিনীমাত্র। স্মৃতির গোপন মন্দিরে একে তুলে রাখা ছাড়া উপায় নেই। লোকসমাজে বলতে গেলে হয় পাগল বলবে লোকে, না হয়, অতিরঞ্জিতের অধ্যায়ে ফেলে রেখে আমায় করুণা করবে।

বাবার বন্ধুকে বললাম,—আজ আপনার সামনে এগুলো খুলে বলবার হেতু হলো এই যে---শিল্পলোকের এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

তিনি বললেন,—শিল্পালোচনায় এ অধ্যায়েরও প্রয়োজন আছে।

আমি উত্তর দিই—হ্যাঁ। রাজদরবারের দরবারী শিক্ষা—নটী, ওস্তাদ মহলের মাঝে সঙ্গীতের যে রূপ আমি দেখেছিলাম—তার সঙ্গে এ রূপের অনেক পার্থক্য। সাধারণ ঘরওয়ানা সঙ্গীতের যে ক্রমবিকাশ তার সঙ্গে এই আভ্যুদয়িক সঙ্গীতের কোনই সামঞ্জস্য নেই। এর ক্রমবিকাশের ধারা হয়তো মানুষকে তার মুক্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে। সঙ্গীতাংশের এই নবরূপটুকুর উল্লেখ করার লোভ তাই সংবরণ করতে পারলাম না।

বাবার বন্ধু বলেন,—এ দিকটিও সঙ্গীতের কম বড় নয়, কাজেই শিল্পচর্চায় এর আলোচনাটুকুও অন্তরে দাগ দেয়।

তের

যাযাবরী-জীবন ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে এসে নিজ গৃহে গৃহবাসী হতে হলো। এবার সত্যি সত্যি ব্যবসা খুললাম, প্রেস আর পাবলিকেশন।

'কল্লোল' অফিসে যাঁরা সব বন্ধু ছিলেন তাঁদের নিয়ে গড়ে তোলা হলো ছেলেদের এক পত্রিকা 'আলপনা'। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত মহাশয় করলেন এই নামকরণ। সুনির্মলবাবু হলেন এর সম্পাদক। এছাড়া অখিল নিয়োগী, প্রবোধ সান্যাল, পূর্ণ চক্রবর্তী, ফণী গুপ্ত, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়রা সকল সুহৃদ মিলে পত্রিকার কলেবর গঠন করে তুলতে লাগলেন। ওদিকের যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান তাঁরাও কেউ বাদ দেন নি। শ্রীনরেন দেব মহাশয়, শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত (এখনকার দেব), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়, সুখলতা রাও প্রভৃতি বহু সুসাহিত্যিকের সহানুভূতিতে সমৃদ্ধ হলো 'আলপনা'র কারুশিল্প। শ্রীযতীন সেন মহাশয় আঁকলেন প্রচ্ছদপট, চারুদা দিলেন ভেতরে ছবি। এমনি কত কি।

এমনি করে বহু সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার পরিচয়ে শুধু যে ধন্য হলাম তা নয়, বলতে গেলে জাতেও উঠলাম।

এই সূত্রে শ্রীঅবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে আমায় যেতে হয়েছিল। তিনি আলপনায় রং ধরাতে লিখলেন 'প্রজাপতির ডানা'।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে গল্প হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন প্রজাপতির ডানায় রঙের আলপনার কথা। এমন সময় বেজে উঠলো শাঁক, তার সাথে কাঁসর ঘণ্টা। - আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

অবীন্দ্রনাথ বলেন,—এতে অবাক হবার কি আছে গো! আমরা তো আর বেহ্মজ্ঞানী নই, আমরা যে পিরুলি বামুন। লক্ষ্মীপূজা, সত্যনারায়ণ সবই হয়। বেহ্মজ্ঞানী হচ্ছে ও বাড়িরা।

বুঝলাম রবীন্দ্রনাথের বাড়ির কথা বলতে চান।

আর একদিন জোড়াসাঁকোর পুকুর ধারে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করলেন, —এই যে পুকুর দেখছো, এ যে-সে পুকুর নয়, এখানে একদিন সরস্বতী উদয় হয়েছিলেন।

আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি ওর মুখের পানে। উনি বলেন,—হ্যাঁ হে সত্যি ঘটনা; তোমাদের কবি তখন ছেলেমানুষ। ওর দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীও কিশোরী। একদিন দুপুর বেলায় পুকুরধারে গাছের ছায়ায় খেলা করছেন ভাই বোনে। রবীন্দ্রনাথ খেলতে খেলতে ওর দিদির কোলে মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন আর ওর দিদি নিজেও ঢুলে ঢুলে রবীন্দ্রনাথের শুয়ে পড়া দেহটার উপর মাথা রেখে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিছুক্ষণ পরে, হঠাৎ দুজনেই একসাথে চমকে জেগে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন.—দিদি, দিদি দেখেছ ?

স্বর্ণকুমারী দেবী বলেন,—তুই দেখেছিস ?

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—দেখলাম পুকুর থেকে সরস্বতী দেবী স্বয়ং উঠে তোমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তোমার হাতে একটা সোনার কলম দিতে গেলেন, তুমি বললে—ওটা আমার চেয়ে রবির কাজে লাগবে। শেষে সরস্বতী দেবী আমারই হাতে কলমটি দিয়ে অন্তর্ধান করলেন।

স্বর্ণকুমারী আনন্দে অধীর হয়ে উত্তর করেন,—আমিও ঠিক এই স্বপ্নই দেখেছি।

অবনীন্দ্রনাথের মুখে শোনা এই গল্পটুকু যদিবা গল্পই হয়, তবু এর বাস্তবরূপ জগৎ আজ উপলব্ধি করেছে। অথচ যে যুগের কথা বলছি, সে যুগের লোকেরা তাঁকে হাসি মস্করা করেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

যাক্, যে কথা বলছিলাম। সঙ্গীত মহলে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যিক মহলে ক্রমেই প্রতিপত্তি জমে উঠলো। আমার লেখা কল্লোল ছেড়ে বেরুতে শুরু করল প্রবাসী, অর্চনা, মানসী ও মর্ম্মবাণী এই সব পত্রিকায়। কিন্তু আমার প্রেস আর পাবলিকেশন অকালেই ইহলোক ত্যাগ করলো আমার কর্ম্মদক্ষতা আর ব্যবসায়ী তৎপরতাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে। লোকসানের হিসেবে আশাতীত, আশাহত হলো খালি বাড়ির কর্তৃপক্ষ কারণ টাকা ঢেলেছিলেন তাঁরা কিনা! আমি কিন্তু সদর্পে সাহিত্যিক ও শিল্পী গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে মনের আহ্লাদে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সায়েন্স কলেজের ছাতের আড্ডায় খাতির বেড়েছে, আমি শুধু গাইয়ে বা গীতিকার নই আমি একজন পূর্ণ সাহিত্যিক।

সেদিন হঠাৎ প্রফুল্ল বোস আমায় বললেন,—আজ ডাঃ শিশির মিত্র মহাশয় আমাদের কলেজ থেকে রেডিও ট্রানসমিট করবেন। ভারতে এই একসপেরিমেন্ট

হচ্ছে রেডিও জগতে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান। সায়েন্স কলেজের বন্ধুরা আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে এই প্রথম অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী করে দিলেন। তাঁরা আমার গাওয়া কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত—'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গান খানি, বিনা তারে সিন্ধুর ওপারে পাঠাবারই পূর্ণ ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমার আনন্দের আর সীমা নেই।

১৯২৬ সালে হাইকোর্টের কাছে টেম্পল চেম্বারের বাড়িতে হঠাৎ এক ইংরেজ কোম্পানি রেডিও কেন্দ্র খুলে বসলো। ছোট ছোট আবৃত্তি, গান, কিছু নাটকাংশ, কিছু খবরাখবর ও খেলাধুলোর খবর ছিল তখনকার প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম ছেপে কিছু বার হতো না। তারা যখন যেটা করতেন সেইটাই সেদিনের প্রোগ্রাম। কোম্পানিটির নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি'। তার কর্ণধার ছিলেন মিঃ ওয়ালিক্।

এখানে হঠাৎ গলাটা গলিয়ে দিলাম। এখানে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক অভিনীত হলো। সেটি রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত প্রচার সচীব শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়। নাটকটির নাম ছিল 'দেবতাদের মর্তে আগমন'।

১৯২৭ সালে আগস্টের শেষে ব্রডকাস্টিং কোম্পানি ১নং গারস্টিন প্লেসে উঠে এলো। এই সময় হিজ মাস্টার ভয়েসের বড় সাহেব ছিলেন মিঃ কুপার। মিঃ ওয়ালিক খুঁজছিলেন একজন সঙ্গীতবিদ্‌কে এই ব্রডকাস্টিং-এর ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্যে। মিঃ কুপার মিঃ ওয়ালিকের পরমবন্ধু ছিলেন। এই সূত্রে তাঁকেও এই রকম কর্মীর জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। মিঃ কুপার বিখ্যাত ক্লেরিওনেট বাজিয়ে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার মশাইকে বাংলা প্রোগ্রামের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করার পরামর্শ দেন। শুনেছি প্রখ্যাত মেগাফোন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার মহাশয় নাকি নৃপেনবাবুর নাম মিঃ কুপারকে সাজেস্ট করেন।

টেম্পল চেম্বারের বাড়িতে উড়ো-বৈঠকে গান করেছিলাম। মনে মনে বাঁধা বৈঠকে গান করার বাসনা ছিল, তাই গিয়ে হাজির হলাম মিঃ মজুমদারের কাছে।

মিঃ মজুমদারের এসিস্টেণ্ট প্রখ্যাত মিউজিক ডাইরেক্টার শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের কাছে আমার ভয়েস টেস্ট পড়লো। টেস্টের আগেই রাইচাঁদ বললেন,—ওকে আমি খুব চিনি, ও আমার বাল্য বন্ধু, কাজেই ওকে গাইতে দিতে

আপনি অনায়াসেই পারেন। অতএব আমি রেডিওর বাঁধা আসরের গাইয়ে নিযুক্ত হলাম।

ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয় তখন শুনেছি ছাই মুঠোও সোনা মুঠোতে পরিণত হয়, আমারও তাই ঘটলো!

একাধারে বেতার শিল্পী আর সাহিত্যিক হয়ে উঠলাম। কিন্তু ইউদের বাড়ির ছাতের মোহ ছাড়তে পারলাম না। ইউ এখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। বাঁশী ছেড়ে অসি ধরেছে। তাই সরস সন্ধ্যা আজকাল নীরস মনে হয়। এমন সময় ইউএর এক মেডিক্যাল কলেজ-ফ্রেণ্ড, গাইয়ে হিসাবে জুটে গেল। তিনি নাকি রেকর্ডে গান করে সুপ্রতিষ্ঠা নিয়েছেন। গ্রামোফোন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই তাঁকে করলাম। নতুন নতুন কথা শুনে চমকে উঠি, তাঁর নিজের কৃতিত্বের কথা বার বার শোনাতে থাকেন।

মনের কোণে একটা আশা যেন উঁকি মেরে ওঠে। ভাবলাম সবই তো হলো এবার গ্রামোফোনটা হলে কেমন হয়। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি এমনি অবজ্ঞা ভরে আমায় নিরুৎসাহ করে দিলেন যে আমি একেবারে ধুলোয় মিশে গেলাম।

হিজ মাস্টারস ভয়েসের তখনও ইলেক্ট্রিকাল রেকর্ড শুরু হয়নি। সে সময় টিনের চোঙা মারফত গান পাঠাতে হতো দম দেওয়া ঘূর্ণায়মান এক মোমের চাকতিতে। পিনের কলমে তার বুকে দাগ কেটে গান ধরে নিত। মোমের চাকতি থেকে ওটাকে তামার চাকতিতে রূপান্তরিত করে তা থেকে ছেপে ছেপে বাজারে বেরুতো।

চোঙার সামনে গাইতে শিল্পীর গলার বেশ জোর দরকার হতো। ইউএর বন্ধু বললেন,—রেকর্ডে গান করা কি সহজ কথা, কত বড় বড় শিল্পী ঘাবড়ে কেঁদে-কেটে কি রকম হয়ে যায়। এই তো সেদিন আশ্চর্যময়ী গান গাইতে গিয়ে ফেন্ট্ হয়ে পড়ে গেলেন।

আমি থেমে গিয়ে অন্য কথা পাড়ি। বুঝলাম আমাদের পক্ষে এসব চিন্তা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সেদিন ইউদের ছাদের আড্ডার পর আমি আমাদের পাড়ার এক ভদ্র-লোকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। ভদ্রলোকের নাম শ্রীশশিভূষণ দে, আমার পরমবন্ধু ক্লেরিওনেট বাজিয়ে রবি দের বড় ভাই। ইনি গ্রামোফোন অফিসের ক্লার্ক ছিলেন।

তাঁকে অকপটে আমার আবেদন পেশ করলাম। তিনি মাধববাবুর মতো অকরুণ ছিলেন না, তাই আমায় কাছে বসিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডিং সেকশনের বড়বাবু শ্রীযুক্ত ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয়কে একটি চিঠি লিখে দিলেন। ওঠার সময় বুঝিয়ে দিলেন যে, গ্রামোফোনে গান দেবার আগে রিহার্সল ঘরে তাকে 'সময়' 'স্পষ্টতা' ইত্যাদি মহলা দিয়ে নিজেকে উপযুক্ত করে নিয়ে তবেই রেকর্ডিং ঘরে যেতে হয়। গরানহাটার মোড়ে 'বিষ্ণু-ভবন' বলে একটি বাড়ি এর জন্যে ব্যবস্থা করা আছে। সেইখানেই আমাকে ভগবতীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

বিষ্ণু-ভবন রিহার্সল বাড়ি আর রেকর্ডিং করা হয় বেলেঘাটায় এইচ. এম. ভি কোম্পানির নিজস্ব এলাকায়। বছরে দুটি করে সেশন (session) হয়। সেই সময়ের মধ্যে মনোনীত গায়ক-গায়িকাকে তৈরী হতে হয়। তখন রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার বিলেত থেকে আমদানী করা হতো। তাঁরা তাদের রেকর্ডিং কাজে রোঁদে বেরুতেন। সারা ইয়োরোপ আফ্রিকা ঘুরে ভারতে পদার্পণ করতেন। মাসাবধির মধ্যে এখানকার রেকর্ডিং সেরে বার্মা অঞ্চলের দিকে পাড়ি জমাতেন। কাজেই ঠিক এই সময়ের মধ্যেই যা কিছু রেকর্ডিং সেরে নিতে হতো।

সমস্ত বুঝিয়ে-সুজিয়ে শশীবাবু ছুটি দেন। মনে বল নিয়ে আমি ঘরে ফিরি। ইউএর বন্ধুটির কথায় কোথায় যেন একটা হুল ছিল। সেইটি আমায় বিদ্ধ করেছিল, তারই জ্বালায় অন্তর জ্বলছিল—তা বুঝি এরপর জুড়িয়ে গেল।

পরের দিন বেলা দুটার পর বিষ্ণু-ভবনে উপস্থিত হলাম। নীচেই পথরোধ করল দ্বারী শ্রীদশরথ। উড়িষ্যাবাসী, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম এই দ্বারীর কৃপালাভ করলে বহু অসাধ্যও সহজ সাধ্যে পরিণত করা যায়। দশরথের আশ্রয় নিলাম। সে তখন দেবদর্শনে আমায় উপরের তিনতলায় নিয়ে পৌছে দিলে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ পাশে বড় একটা ঘর।

ঘরে সতরঞ্জি বিছানো তার উপর চাদর। বড় বড় তাকিয়া হেলান দিয়ে তিনটি প্রবীণ গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন আর গল্প করছেন। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—ভট্চাজ্জি মশাই আছেন?

একটি টাক মাথা বৃদ্ধ উত্তর দিলেন,—কেন? আমি। কি চান?

বিনা বাক্যব্যয়ে শশীবাবুর চিঠিখানা তাঁর হাতে তুলে দিই। তিনি মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করে বলেন,—ও হ্যাঁ শশীবাবু আজই আমায় আপনার কথা অফিসে বলছিলেন বটে। তা বসুন, আপনি কি গান গাইতে পারেন?

আমি বলি,—বাংলা গান।

ভট্টাচার্জিমশাই বলেন,—বাংলা গান তা জানি, আমি জিজ্ঞেস করছি কার লেখা গান গাইবেন?

আমি বলি,—আমারই নিজের লেখা আর সুর দেওয়া গানই আমি গাই, তবে আপনারা অন্য কিছু দিলেও আমি গাইতে পারব।

বৃদ্ধ আরও দুজনের দিকে চান। অপর বৃদ্ধ বললেন,—কি গান, কেমন গান, শোনাও দেখি বাবা!

আর দ্বিধা লজ্জা না করে, পাশের হারমনিয়মটি টেনে নিয়ে গান শোনাতে বসি। একটি একটি করে ওঁরা আমার পাঁচ-সাত খানা গান শুনলেন। সবারই মুখে অনুমোদনের ছাপ দেখলাম।

গান থামলে সবাই একবাক্যে বললেন,—বেশ গেয়েছো।

ভট্টাচার্জিমশাই বলেন,—আপনার দুখানি গান এই সেশনে রেকর্ড করাবো। এর জন্যে আপনি পয়সা পাবেন না, তবে ভাল হলে এর পর থেকে আপনাকে যথাযোগ্য মুল্য দেওয়া হবে।

আমি বলি,—আপনার শর্ত আমার মঞ্জুর কিন্তু আমারও একটা ছোট্ট শর্ত আছে স্যার।

—কি শর্ত?

—আমার গান বাজারে বার হবার আগে আপনাদের আর্টিস্ট মাধববাবুকে জানাতে পারবেন না যে আমি গান করছি।

তিনি হেসে বলেন,—ভাল শর্ত। তারপর দুটি বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন ইনি বিখ্যাত সুরকার ভূতনাথ দাস যিনি জয়দেব আত্মদর্শনে সুর দিয়েছেন আর ইনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক আর নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরের দিন থেকেই আমার রিহার্সল শুরু করতে হবে আদেশ হলো। এবং যেন আমি প্রত্যহ যখন হোক এসে একবার করে রিহার্সল করে যাই সে অনুরোধও জানালেন।

পরের দিন দুপুরে বিষ্ণু-ভবনে উপস্থিত হয়ে আলাপ হলো ধীরেন দাস মহাশয়ের সঙ্গে। আমরা ছিলাম সমবয়সী। আরও একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেব। জমীরউদ্দিন সাহেব 'বাংলা ঠুংরী'র সুর সৃষ্টি করছিলেন, আমি তারই পাশে বসে তারিফ করতে শুরু করলাম।

একটু পরে প্রফেসর বিমল দাশগুপ্ত মশাই এলেন, সঙ্গে তাঁর শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী মশাই। আসর জমে উঠলো।

এমন সময় দশরথ শ্রীমতী আঙুরবালাকে নিয়ে এসে হাজির হলো। আঙুরবালা রিক্শ চড়েন না, তাই ট্যাক্সিতে এসেছেন। পৌঁছে দিয়েই দশরথ রিক্শ নিয়ে শ্রীমতী ইন্দুবালাকে আনতে ছোটে।

দু'দুটি নামকরা আর্টিস্টের সমাবেশ হবে। আমার আনন্দের আর সীমা নেই। ধীরেন দাশ আমার সঙ্গে শ্রীমতী আঙুরের আলাপ করিয়ে দিলেন।

এবার এলেন কে. মল্লিক মহাশয়। পরিচিত হলাম, অমায়িক ভদ্রলোক। ধীরেন হেসে বললে,—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছে হায়—মহাশয়।

হোহো করে হাসি উঠেছে এমন সময় বাবরী চুলের রাশি নিয়ে হাজির হলেন কবি নজরুল। বলেন,—এত হাসি কেন গো ?

ধীরেন শ্রীমতী আঙুরকে নিয়ে পাশের ঘরে রিহার্সলে চলে গেল। কাজী সাহেব, কে. মল্লিকমশাইকে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই, ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল'—শেখাতে শুরু করলেন। আমি নীরব অপেক্ষায় বসে শুনছি। এক লাইন শেখানোর পর কাজী সাহেব হেসে বলে ওঠেন,—এখানকার বাগিচায় নতুন বুলবুলি কে এলেন মল্লিক মশাই ?

মল্লিকমশাই বলেন,—বুলবুলি তো দেখিছ না, দেখছি একটি নতুন বুলবুল এসে বসে আছেন। কাজীদাকে আমার দিকে ইসারা করে দেখান।

আমি হেসে উত্তর দেই,—মানে একটি ষাঁড় নয় দু'দুটি ষণ্ড আপনার সামনে বসে আছে, অর্থাৎ Bull—Bull !

হোহো করে হেসে ওঠেন কাজী সাহেব।

তারপর হাসি থামিয়ে বলেন,—ট্রেনে একবার চলেছি। পাশের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক বসে আছেন আর আমার দিকে ফিরে ফিরে দেখছেন। হঠাৎ বলে ওঠেন,—এই শালা, তোর কাছে দেশলাই আছে ?

আমি চমকে উঠি। পরক্ষণে হেসে পকেট থেকে দেশলাইটা তাঁর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলি,—লে বে লে শালা।

ভদ্রলোক পাশের বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে হোহো করে হাসতে হাসতে এসে আমার পাশটিতে বসে বলেন,—আলাপ-পরিচয়ের একটু পরে তো এই সম্ভাষণেই এসে পৌঁছুতাম তাই অনেক ভেবে ওইখান থেকেই শুরু করে

দিয়েছি। কাজটি কি ভাল হয় নি, কি বলিস? বলে, হা-হা-করে কাজীদা হাসতে থাকেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলেন,—তাই তোর সঙ্গেও শুরু করলাম। কিছু মনে করিস নি। রতনে রতন চেনে। কি বলিস? আবার সেই সরল হাসি।

আমিও হাসি। বলি,—আপনাকে আজ থেকেই না হয় তুমিই শুরু করে দেওয়া গেল কিন্তু তুই বলতে কোনো দিনই পারবো না।

কাজীদা বলেন,—আমি সব পারি! তবে অত মনে করে বলতে পারবো না, যখন যা মুখে আসবে বলবো। তোর পরিচয় নীচেই বিমল বলে দিয়েছে। ভাবলাম বেশ হলো, কথা কয়ে বুঝলাম সগোত্র!

ধীরেন এসে ঘরে ঢুকে বললো,—কাজীদা, ইন্দুদি নীচে ডাকছেন।

কাজীদা বলেন—আর কত নীচে নামবো ভাই! যাই, যখন ডাক এসেছে। হা-হা করে আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতেই নেমে চললেন। ধীরেন, মল্লিক সাহেবকে 'বাগিচায় বুলবুলির' 'সময়' ঠিক করিয়ে দিতে শুরু করলো।

মল্লিক মশাই-এর গজলটাইপটা রপ্ত হচ্ছে না। তাই হেসে ধীরেন বলে,—'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার' গেয়ে মল্লিক মশাই গলার বারটা বাজিয়েছেন।

মল্লিকমশাই ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর করেন,—জানো তো কত দম লাগে ও-গানে।

ধীরেন হাসে।

নীচে ভট্‌চাজ্জি এসে পৌঁছিয়েছেন। আঙুরবালা বিদায় নিলেন। হঠাৎ হুঙ্কার এলো ইন্দুবালার। ঢুকতে ঢুকতে বলেন,—হ্যাঁ ভট্‌চাজ্জিমশাই,—আঙুরের জন্যে ট্যাক্সি আর ইন্দুর বেলায় রিকৃশা?

ভট্‌চাজ্জিমশাই ইন্দুবালার কথার জবাব দিতে গিয়ে আমতা আমতা করে বলেন,—মানে মানে তুমি ইন্দু হচ্ছো ঘরের লোক। মানে তোমার উপর আমাদের কত জোর, বুঝলে না!

ইন্দুবালা জল হয়ে গেলেন। প্রকৃত শিল্পীর সত্তা, শিল্পীর পুরো লক্ষণ রয়েছে ইন্দুর শরীরে। তাই রাগলে রুদ্র আর মিষ্টি কথার বেলপাতাজলে —মহাতুষ্ট শান্তং শিবং। শ্রীমতী ইন্দুবালার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল পূর্বেই এবং এক শুভক্ষণে। আমায় ইনি দাদা বলেই সম্বোধন করতেন। তাই জানি শ্রীমতী ইন্দু মুখে খুবই স্পষ্ট বক্তা কিন্তু হৃদয়খানি তাঁর কোমল।

যেদিন প্রথম পরিচয় ঘটে সেদিনের কথাটুকু এ প্রসঙ্গে না বলে থাকতে পারছি না তাই বলি। শ্রীমতী ইন্দুবালা প্রতিবছরেই ওঁদের পার্টি নিয়ে করতেন অভিনয়। এঁদের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল যে এটি মহিলা থিয়েটার পার্টি। সবাই হলো মহিলা, পুরুষেরা এ দলে অভিনয়ের সুযোগ পেতেন না।

সেবার এঁদের দল অভিনয় করছেন 'কুব্জা ও দরজী'। তখন আমার প্রেস ছিল। আমার বন্ধু অমিয় ঘোষ বুঁদি ওস্তাদজীর কাছে তবলা শিখতেন আগেই বলেছি। বুঁদি ওস্তাদজীর বড় ভাই ছিলেন গৌরীশঙ্করজী। ইনি গহরজানের প্রধান সারেঙ্গী বাজিয়ে।

শ্রীমতী ইন্দুও গৌরীশঙ্করজীর কাছে তালিম নিতেন। বুঁদি ওস্তাদজী অমিয়র বাড়িতে গৌরীশঙ্করজীকে নিয়ে এসেছেন। এখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। অমিয় আমাকে শ্রীমতী ইন্দুর থিয়েটারের প্রোগ্রামটি ছেপে দিতে অনুরোধ জানালেন। গৌরীশঙ্করজীও সে অনুরোধে যোগ দিলেন।

আমি প্রোগ্রাম ছাপার ভার নিলাম। গৌরীশঙ্করজী আমায় নিমন্ত্রণ কার্ড দিয়ে গেলেন। এবং ঠিক হলো ছাপা প্রোগ্রাম সঙ্গে নিয়ে অমিয়র সঙ্গে গিয়ে শ্রীমতী ইন্দুবালার সঙ্গে থিয়েটারের রাতেই আলাপ করব।

যথাসময়ে প্রোগ্রাম নিয়ে স্টেজের মধ্যে উপস্থিত হলাম। শ্রীমতী ইন্দুর সামনে গিয়ে বললেন,—এই যে ইনি আমাদের প্রোগ্রামটি অমনি ছেপে দিয়েছেন। এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি, ইনি আমার পরমবন্ধু।

পরিচিত হবার পর আমার কাছ থেকে ছাপা প্রোগ্রাম দেখতে চাইলেন। আমি পুরা প্যাকেটটি ওঁর হাতে তুলে দিলাম।

শ্রীমতী ইন্দু তা থেকে একটি প্রোগ্রাম নিয়ে উলটে পালটে দেখে নেন।

আমি ভাবি বুঝি একটা ধন্যবাদ পেলেম আর কি!

শ্রীমতী ইন্দু আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন,—দাদা, দিলেন দিলেন তা বলে এমন করে দাদের মলম ছেপে দিলেন কেন?

আমি ওঁর কথার তাৎপর্য না বুঝে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

উনি বলেন,—কাগজ যা দিয়েছেন, ও কাগজে দাদের মলম ছাড়া আর কিছু কিন্তু ছাপা হয় না ভাই। ওতে প্রোগ্রামটি তাই মানায় নি।

আমি লজ্জায় মরমে মরে গেলাম।

উনি হেসে বললেন,—কিছু মনে করবেন না দাদা। ইন্দু স্পষ্টবাদি, তাই বলে ফেলেছি।

সেই অবধিই আমি ইন্দুর দাদা। দাদার মান রাখতে সে রাত্রে ইন্দু পায়ের ধুলো নিয়ে স্টেজে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু দাদাটি নিতান্ত অপরাধীর মতো সন্ত্রস্ত হয়ে দাদের মলম ছাপা প্রোগ্রাম দিয়েই বাইরে দর্শকদের মাঝে মিলিয়ে গিয়েছিলেন।

একটি অঙ্কের পর দাদার খোঁজ পড়লো। ভিতরে গিয়ে সামনে দাঁড়াতে তখনও লজ্জা পাচ্ছিলাম। অমিয় ছাড়লো না।

ইন্দু আমায় সামনে পেয়ে বলেন,—দাদা, বোনের মিষ্টি মুখ পেয়েছেন এবার সত্যি একটু মিষ্টি-মুখ করুন নইলে অপরাধী হয়ে থাকবো।

এক প্লেট মিষ্টান্ন তাঁর ঘরে বসিয়ে সাদরে খাওয়ালেন।

পরিশেষে বলেন,—আপনাকে দাদা বলেছি, অমিয়দার বন্ধু আপনি, যেন পালিয়ে যাবেন না। কেমন দেখছেন রিপোর্ট দিয়ে তবে বাড়ি যেতে পাবেন।

আমি শ্রীমতী ইন্দুর অন্তরটুকুর সরল অভিব্যক্তি সেদিন থেকে আর ভুলতে পারি নি। যতদিন দেখা হয়েছে তিনি ডেকেছেন,—দাদা! ভালো তো?

ব্রডকাস্টিংএ ওয়ালিক সাহেবের আমল বদলেছে। এখন স্টেশন ডিরেক্টরের আসন গ্রহণ করেছেন মিঃ স্টেপল্‌টন। নৃপেনবাবুর এসিস্‌টেন্ট হয়েছেন শ্রীযুত রাইচাঁদ বড়াল। খবর বিভাগের ভার পড়েছে শ্রীযুত রাজেন সেনের হাতে। রাজেন সেন মহাশয় প্রথম আই-এফ-এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের হাফ-ব্যাক। আর গল্প দাদুর আসর নিয়েছেন শ্রীযোগেশ বসু হাইকোর্টের এডভোকেট।

আর মাঝে মাঝে আসতেন কথকঠাকুর, কৃষ্ণ ও কালী কীর্তনের দল। কেউ পড়তো গল্প, কেউ করতেন আবৃত্তি। কোন কোন সৌখিন দলের ছোট নাটকও অভিনীত হতে শুরু করলো।

সবাই মিলেমিশে এক পরিবার গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাসেবকের মনোবৃত্তি নিয়ে কাজকর্ম এগিয়ে চলতো। এই গোষ্ঠীর প্রমুখ ছিলেন নৃপেনবাবু। তাঁর কর্মচাতুর্যে ও অমায়িক ব্যবহারে সবাই ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। এঁরই প্রীতির সৌজন্যে আমার নিজের ব্যক্তিগত গান পরিবেশনা ছাড়াও বহুতর নতুন নতুন পরিকল্পনা বেতারে উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার নিজে গুণী শিল্পী ছিলেন। অদ্ভুত বাঁশীতে আলাপ করতেন ক্ল্যারিওনেট। শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশাইয়ের থিয়েটারে তিনি বাঁশী বাজাতেন। সীতা নাটকের সারা আবহ সঙ্গীত এই বাঁশীর মাধ্যমে তিনি এমনি বাজাতেন যেন একটা সুরের মায়াজাল দর্শকের মনে বিছিয়ে দিতেন।

বেদনাবিধুর আবহাওয়ায় সৃষ্টি করতে নৃপেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন। সীতা নাটকের প্রস্তাবনার রবীন্দ্রনাথের 'কথা কও' গানখানির সুর করেছিলেন তিনি। এ ছাড়াও ঐ নাটকে হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত 'ধরার মেয়ে' গানখানির সুরও তাঁরই দেওয়া! দুখানি গানই শ্রোতাদের শুধু মুগ্ধ করেনি তাদের চিরস্মরণীয়ের পর্যায়ে তুলে রেখেছেন। এই উপলক্ষে, শিশিরবাবুর যখনই আহ্বান আসতো শত কাজকর্মের মাঝেও তিনি তা পূর্ণ করবার চেষ্টা করতেন। শেষে কাজের অবকাশ মিলতো না বলে সে ভার আমার উপর ক্রমে ন্যস্ত হয়েছিল। সেই থেকে শিশিরবাবুর থিয়েটারে আমার অবাধ গতি হলো।

যদিও শিশিরবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশেষ পরিচয় পূর্ব হতেই ছিল—তবে সে দাদা হিসাবে, গুরু হিসাবে, তাই ভয়ে তাঁর থিয়েটারের ত্রিসীমানায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি। শিশিরবাবুর জেঠতুতো ভাই শ্রীযুত নলিনী ভাদুড়ী মশায়ের কোচিং ক্লাসে আমরা পড়তাম। শিশিরবাবুর ন' ভাই ঋষি আমার সহপাঠী। এ ছাড়া দাদা ছিলেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর সহপাঠী। এই রকম নানা সূত্রে শিশিরবাবুর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা।

শিশিরবাবুর শিক্ষাধীনে 'জনা' নাটক অভিনয় হয় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে। তাতে আমার বড়দা সেজেছিলেন জনা, শিশিরবাবুর ভাই শিবু ভাদুড়ী, প্রবীর। গঙ্গারক্ষক সেজেছিলেন শ্রীনরেশ মিত্র মহাশয়। সেই থেকে শিশিরবাবুর যাতায়াত আমাদের বাড়িতে। তিনি সপরিবারে বহুবার গিয়ে থেকে এসেছেন—আমাদের শিমুলতলার বাটিতে।

কিন্তু তাঁর থিয়েটারে সুরকার হিসাবে আমার এই প্রথম পদার্পণ। এর আগে একবার গিয়েছিলাম তাঁর নলিনী সরকার স্ট্রীটের বাড়িতে নাটক শোনাতে। আমারই লেখা একটি নাটক, পড়তে গিয়ে বারে বারে হোঁচট খাই। হাত থেকে টেনে নিয়ে শিশিরদা নিজেই পড়ে আমায় শোনান। অদ্ভুত সাবলীল তাঁর পড়ার ভঙ্গী। যেন এ তাঁর নিজের লেখা নাটক। দ্বিতীয় না তৃতীয় দৃশ্যে ছিল গণিকালয়ের দৃশ্য। তিনি থেমে গিয়ে বলেন,—এ সব বাড়িতে কখনো গেছিস?

আমি আমতা আমতা করে উত্তর দিই,—বাঈজীদের বাড়িতে এক-আধবার গান শুনতে গেছি।

উনি বলেন—ওখানে যখন যাবি তখন এসব দৃশ্য লিখিস নইলে অনভিজ্ঞ হাতের লেখার কোনই মূল্য নেই।

সেই অবধি ওঁর ত্রিসীমায় যেতে পেতাম ভয়। অথচ, ওঁর কাছেই শিখেছিলাম রিসাইটেশন। ছেলেবেলায় কাঁড়ি কাঁড়ি প্রাইজ এনেছি, কিন্তু ঐ রাশভারী লোকটির সামনে যাওয়া তো দূরের কথা বরং এড়িয়ে চলতাম। যখন ছাত্র হিসাবে বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে ওঁর সেক্সপীয়ার পড়ানো শুনতাম, বাংলা ক্লাসে 'সাজাহানের' আবৃত্তি শুনতাম, তখনও যেমন ভয় ছিল, আজও সেই রকম। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে সবাই আমারই মতো মূক হয়ে থাকতো। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা না বলে থাকতে পারছি না।

গিয়েছি মনমোহন বোর্ডের নাট্যমন্দিরে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' নাটকের অভিনয় দেখতে। ইন্দ্রের ভূমিকায় শিশিরকুমার। নিঃশব্দ রঙ্গালয় শিশিরদার উদাত্ত অমৃতকণ্ঠের স্বরে ধ্বনিত। হঠাৎ অভিনয় করতে করতে শিশিরদার নজর পড়লো উপরের বক্সে।

তখনকার দিনে স্টেজ থেকে একটা সিঁড়ি উঠে প্রোপ্রাইটারের বক্সে গিয়ে শেষ হতো।

শিশিরদার নজর সেই প্রোপ্রাইটার বক্সের দিকে। ওখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী মশাই থিয়েটার মালিকের একটি প্রতিনিধির সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কিছু আলোচনা করছিলেন। শিশিরদার লক্ষ্য সেই দিকে অথচ সাবলীলভাবে অভিনয়ও করে চলেছিলেন।

হঠাৎ থেমে গেলেন। বলেন,—My audience, excuse me for a minute এই কথা শেষ করে, গলার মুক্তার হার, ইন্দ্রের মুকুট খুলে স্টেজের মঞ্চে নামিয়ে রাখেন। মুগ্ধ দর্শকেরা ভাবেন এও বুঝি ওঁর অভিনয়।

শিশিরদা বক্সের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান এবং পরমুহূর্তে চীৎকার করে বলেন,—Get out, I say get out !

প্রতিনিধিমশাই প্রেক্ষাগৃহের মালিকানা দেখিয়ে শিশিরদাকে হুমকি দেন—This is our Theater, we can do what we like.

শিশিরদা বলেন,—I pay for it, get out !

প্রতিনিধিকে তাড়াতে তাড়াতে সিঁড়ি দিয়ে বাইরে বিডন স্ট্রীটের পথে নামিয়ে দিয়ে তিনি দর্শক মণ্ডলীর মধ্য পথ দিয়ে ফিরলেন। তখনও হাঁপাচ্ছিলেন, স্টেজের সামনে উঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন,—মালিকের প্রতিনিধি পাশের একটি বক্সের মহিলাদের বেইজ্জতী করবার চেষ্টা করেছিলেন তাই বাধ্য হয়ে আপনাদের রসভঙ্গ করলাম। এর জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।

বলতে বলতে স্টেজে গিয়ে দাঁড়িয়ে তুলে নেন মাথায় ইন্দ্রের মুকুট, গলায় পরেন মুক্তার মালা। তারপর বলেন,—হ্যাঁ কতদূর পর্যন্ত হয়েছিল ?

শ্রোতারা খেই ধরিয়ে দেন। তিনি আবার পাষাণীর ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করে সবাইকে বিমুগ্ধ করে তোলেন। অথচ এর জন্যে প্রেক্ষাগৃহে এতটুকু প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো না, এমনিই তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল।

আজ মঞ্চাভ্যন্তরে মহলা চলেছে গিরিশবাবুর 'পাণ্ডবগৌরব' এর। তারই অনতিদূরে বাইরের খোলা জায়গাটায় শিশিরদা তাঁর পূর্ণ সভা জাঁকিয়ে বসেছেন। আছেন ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীসুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবৃন্দেরা। আমি পৌঁছতেই শিশিরদা বলেন,—কি রে তুই এখানে? আবার নাটক লিখেছিস নাকি ?

আমি অপ্রস্তুত। নৃপেনদার একটুকরো চিঠি দিলাম ওঁর হাতে তুলে। উনি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলেন,—There you are ! গান, গানের সুরযোজনায় তুমি কৃতি হয়ে উঠেছো এ আমি শুনেছি। সুর করে এনেছো ?

আমি বলি,—হ্যাঁ।

শিরিদা বলেন,—বেশ। আসুন আপনারা সব। গানের সুর শোনা যাক।

ভেতরে অর্গানে বসিয়ে দেন। ভেতরের মহলা থেমে যায়, সবাই এসে বসেন। শিশিরদা প্রভাকে বলেন,—প্রভা, তুমি এগিয়ে এসো, মনোযোগ দিয়ে শোনো, এ গান তোমারই।

'পাণ্ডব গৌরব'এ প্রভা উর্বশীর অভিনয় করবে। ওরই গান, তাই আহ্বান।

আমি ভয়ে ভয়ে সুর শোনাতে শুরু করি।

প্রথম লাইন গাওয়া শেষ হতে না হতেই উনি বলেন,—That's very good. তুমি scene-এর mood বুঝে ফেলেছো! খালি "বোনে'-র জায়গায় 'বনে' বলবে।

আমি কিন্তু সাহস করে প্রতিবাদ জানাই। বলি,—বড়দা, 'বনে' যেমন আবৃত্তিতে মধুর শোনায়, গানে কিন্তু তেমন শ্রুতিমধুর হবে না।

শ্রোতৃমণ্ডলী একসঙ্গে আমার সমর্থন করলেন। শিশিরদা ক্ষুণ্ণ হয়ে রাজী হলেন। বললেন,—ভাষার আ-কার ই-কারগুলো ঠিক করে উচ্চারণ করলেই আপনি তা সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। গানের সুরে হয়তো তা আরও মিষ্টি হবে বলেই আমার ধারণা। তবে যখন গাইতে জানি না প্রতিবাদ করবো না।

প্রভা এসে পাশে দাঁড়ায়। তাকে শেখাতে শুরু করি! শিশিরদা পায়চারি করতে থাকেন। হঠাৎ আমার সামনে থেমে বলেন,—তুমি আমার থিয়েটারে যোগ দাও না!

আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

উনি বলেন,—আচ্ছা আচ্ছা থাক, ও আমি নেপেনকে জিজ্ঞাসা করে নেব'খন। দরকার হলে তোমার মাকেও বলবো।

বুঝলাম এক্ষেত্রে নেপেন মানে রেডিয়োর নৃপেন মজুমদার নয় আমার দাদা, ওঁর শিক্ষাধীনে 'জনা'র জনা।

আমি ধীরে ধীরে উত্তর দিই,—স্টারের প্রবোধ গুহমশাই আমার মাকে এ বিষয় approach করেছিলেন, তিনি কিন্তু মত দেন নি।

শিশিরদা বলেন,—প্রবোধ গুহ আর শিশিরকুমারের তফাত বোঝবার তোমার বয়স হয়নি! থাক, সে আমি বুঝবো। তুমি এখন শিখিয়ে দাও, শেখানো শেষ কর।

ধীরেন দাশ তখন শিশিরদার স্টেজেও এসেছে।

পাশের আড্ডার গুণীরা উঠে বাইরে চলে গেলেন। ধীরেন এসে পাশে দাঁড়ায়। কানে কানে বলে,—বড়দার যখন নজর পড়েছে, তুমি এবার গেছো!

আমি হাসি।

প্রভার সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। ওর গান শেখা শেষ হলে হঠাৎ পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমি সংকুচিত হয়ে বলি,—ওকি! ওকি করছেন।

প্রভা একগাল হেসে বলে,—গুরু হলেন যে!

বাদুড়বাগানে থাকাকালীন নলিনী ভাদুড়ী মহাশয়ের কোচিং-এ পড়া চলতো। তারই পাশের বাড়িতেই থাকতেন শিশিরদা। শিশিরদার কালে আমাদের আবৃত্তি শিখতে হতো, compulsory training, কারণ নলিনীবাবু বলতেন বই পড়া মুখস্থ করে হয় না। পড়ার ভঙ্গিমা যার যত শুদ্ধ ও পরিষ্কার তার কাছে পড়ার মানে ততই সুগম হয়ে ওঠে। এই জন্যে সে ব্যবস্থা তিনি করিয়েছিলেন। শেখাবার সময় শিশিরদা কখনো কারোকে বলতেন না যে তুমি আমার মতো করে বল। বরং বলতেন, তুমি যা বলছো সবই ঠিক আছে তবে উচ্চারণগুলো শুদ্ধ করে বল। 'অ' আর 'ই'-কার জ্ঞান হলেই, ভাষা আপনি তার মানে বলে দেয়। তারপর শেখাতেন punctuation, তারপর

modulation. অকারণ সুর টেনে নাটকী চীৎকার করলে বলতেন—এগুলো melodramatic হচ্ছে তবে 'মেলো'রও দরকার হয়, যখন শ্রোতাকে নিজের ভাবধারায় আকৃষ্ট করতে হয়, সুখদুঃখের খর আবর্তের বিপাকে। তবে যেখানে শুধু narrative সেখানে melo এলে শ্রুতিকটু হয়। এমনি করে তিনি ছাত্রের নিজের করা আবৃত্তির রূপ ঘোরাতে ঘোরাতে তাঁর নিজের ধারায় যে কখন টেনে নিয়ে যেতেন তা ছাত্রও বুঝতে পারতো না।

বাইরের উন্মুক্ত অঙ্গনে তাঁর বন্ধুদের সামনেই কাকে যেন মহলা দেওয়াচ্ছেন, তাই কানে আসছিল আর ভাবছিলাম আমার ছেলেবেলাকার শিক্ষার কথা। ঠিক সেই প্রথায় তিনি আজও শেখাচ্ছেন।

কলেজ জীবনে সিটি কলেজের ছাত্র হয়েও যেতাম মেট্রোপলিটনে তাঁর ইংরেজী ক্লাসে সেক্সপীয়ার আর বাংলা ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের রচিত আবৃত্তি শুনতে। আজকের মহলায় শুনছি, গৈরিক ছন্দের আবৃত্তি আর সেদিন শুনতাম রাবীন্দ্রিক ছন্দের আবৃত্তি। দুইটি যেন এক হয়ে কানে বাজছে। পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান রেকর্ডের রেকর্ডিং-প্রাঙ্গণে বসে স্বকর্ণে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের আর শিশিরদার আবৃত্তি, তাঁদের দুজনকার আলোচনা। দুজনেই করেছেন এক পদ্যের আবৃত্তি, রেকর্ডিং হয়েছে। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে'! রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—শিশির, তোমার আবৃত্তি আমায় অভিভূত করে। শিশিরদা বলছেন,—আবৃত্তির পূর্ণ নিয়ম আপনি পালন করেন আর আবৃত্তির সরসতাও আছে আপনার কণ্ঠে। আমি যা করি তাতে নাটকীয় সংঘাতের রূপ এসে পড়ে এ আমি জানি। তাই আমার আবৃত্তির চেয়ে আপনার আবৃত্তিতেই পাই আবৃত্তির আসল রস আর রূপ।

১৯১৮ সালের যুদ্ধান্তে শান্তি অনুষ্ঠানে কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে হয়েছিল বিরাট প্রদর্শনী। এইখানে শিশিরদার 'সীতা' নাটক (দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত) প্রথম জনসমাজে সমাদৃত হয়ে ওঠে। পরবর্তী কালের সীতা নাটকের নাট্যকার শ্রীযোগেশ চৌধুরী। শিশিরদার প্রতিভার আগাগোড়াই যেন আমার এক পলকে মনে পড়ে গেল।

গান শেখানো শেষ করে আবার বাহির প্রাঙ্গণের মজলিসে এসে দাঁড়ালাম। সবারই মুখের চেহারা প্রশান্তিতে ভরা, তারই মাঝে বুড়োদা-শ্রীযুত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী বললেন,—বেড়ে সুর হয়েছে হে।

আমি কৃতার্থ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলাম।

বুড়োদা লোকটিকে কলকাতায় প্রতিটি সম্ভ্রান্ত গুণী সভায় দেখা যেত। তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাতনামা লোক। এ ছাড়া তাঁর সবগুণ ছাড়িয়ে যে গুণ রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বিমুগ্ধ করেছিল, সেটি হচ্ছে তাঁর আসর জমানো বাক্যালাপ। তাঁর বলার ভঙ্গী প্রকাশভঙ্গী আর স্পষ্টতা এতই সাবলীল এবং রসে ভরা যে, কেউ তা উপভোগ না করে থাকতে পারতো না।

বুড়োদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় 'আলপনা' মাসিক পত্রিকা বার করবার সময়। উনি তখন শ্রীযুত গিরিজাবাবুর সঙ্গে 'যাদুঘর' পত্রিকার সম্পাদক। কান্তিক প্রেসে ছিল বুড়োদাদের প্রধান আড্ডা।

এ আড্ডা ঘরের সভ্য ছিলেন শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচারু রায়, শ্রীগিরিজা বসু, মাঝে মাঝে শ্রীনরেন দেব, বুড়োদা ইত্যাদি সমস্ত গুণীজন। কিন্তু আসর জমিয়ে রাখতেন বুড়োদা। বিচিত্র তার অভিজ্ঞতা আর বিচিত্র তার সে অভিব্যক্তি।

সেবারে চারুদা বলেছেন আমাদের 'আলপনা'র ছবি এঁকে দেবেন। আমি, অখিল (স্বপনবুড়ো), সুনির্মল, সবাই মিলে গিয়ে হাজির হয়েছি কান্তিক প্রেসে। সুখিয়া স্ট্রীটে (এখনকার কৈলাস বসু স্ট্রীট) পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। উপরে উঠে দেখি হলের মাঝে শতরঞ্চ বিছানো, সেখানে সবাই বসে আছেন এক শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধকে ঘিরে।

শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ সবার হাত দেখছেন মনোযোগ সহকারে। এমন সময় সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে বুড়োদা এসে দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করেই, ভিজে দক্ষিণ হাতটা ভিজে কাপড়েই বেশ করে ঘষে সাফ করতে করতে বলে ওঠেন,—এই যে বেশ জমেছে। বাদলার দিনে, তেলেভাজার বদলে হস্ত রেখা, মন্দ কি! দেখুন দিকি আমার হাতখানা!

বৃদ্ধ অপরের হাত ছেড়ে দিয়ে বুড়োদার হাতটি ধরে বিচক্ষণ দৃষ্টিতে পরীক্ষার মনোযোগী হয়ে উঠলেন। সভা নিস্তব্ধ। ব্যাকুল আগ্রহে সবাই চেয়ে আছেন বৃদ্ধের দিকে, কি অভিমত দেন।

বৃদ্ধ বুড়োদার হাতটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শুনে বললেন,—এই যে উর্ধ্বরেখা, এটি বেঁকে না গিয়ে সোজা যদি উঠে, তর্জনী আর মধ্যমার মাঝ ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতো, তো আপনি ভালো ওয়েলার ঘোড়ার জুড়ি চড়ে কলকাতার রাস্তায় টগ্‌বগ করে ঘুরে বেড়াতেন।

বুড়োদা নিঃশব্দে একবার নিজের হাতের রেখা আর বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন,—বটে ?

—হ্যাঁ মশাই !

তারপর বুড়োদা নিজের হাতটির রেখাগুলিকে নিবিষ্ট মনে দেখতে দেখতে বলে উঠেন,—আচ্ছা মশাই, ভাগ্য রেখাটা অল্প বেঁকে গেছে বলে কৈ ওয়েলার ঘোড়ার পুচ্ছের একগাছি বালামচীও তো হাতে ঠেকছে না।

সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম।

বুড়োদা বলেন,—না-না হাসি নয়, আমার ভাগ্য নিয়ে সবাই হেসো না। তারপর বৃদ্ধের দিকে চেয়ে বলেন,—তো, মশাই চুপ করে রইলেন কেন, কিছু বলুন !

বৃদ্ধ বলেন,—তুমি তো ছোকরা বেশ রসিক আছো !

উত্তরে বুড়োদা বলেন,—না স্যার, ছিলাম না। তবে আপনার গণনা দেখে রসিক হয়েছি।

আজ বুড়োদা যখন 'বেশ সুর হয়েছে' বললেন, ভাবলাম—বুঝি গেছি, এবার, কিন্তু সত্যিই তিনি আমার গুণগ্রাহী হয়েই বলেছিলেন।

বাবার বন্ধু প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন,—শিশিরবাবু সম্বন্ধে আর কি তোমার মনে পড়ে ?

আমি বলি,—প্রথম জীবনের বহু কথাই আমি জানি, কিন্তু তাঁর নাট্য-জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পর্যন্ত সব খবর রাখি না।

তিনি বলেন,—শুনেছি তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন। সে কথা কি সত্যি ?

আমি বলি,—দাম্ভিকতা বলে যা তাঁর জীবনে রটনা ছিল সেটাকে 'কনফিডেণ্ট' নামেই অভিহিত করা যেতে পারে। যেটা তিনি জানতেন না, তা তিনি একটা বালকের সামনেও অকপটে প্রকাশ করতেন। গান সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, কৈ সেখানে তো দাম্ভিকতা দেখিয়ে সুর suggest করতে এগিয়ে আসেন নি। ভাল না লাগলে সাধারণ শ্রোতার মতো বড়জোর বলতেন, ভাল লাগে নি। কিন্তু সবজান্তার দাম্ভিকতা নিয়ে কোনদিনই কারুকে উত্ত্যক্ত করেন নি। গানের mood বোঝাতে শূন্যে আঙুল সঞ্চালনে গ্রাফ এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন বটে কিন্তু গুনগুন করেও কাউকে দাম্ভিকতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন নি। তবে যেটা তিনি জানতেন সেটা সজোরে সগর্বে

প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সামনে আবৃত্তি সম্বন্ধেও যে কথাবার্তা বলে গেছেন, সেখানেও তাঁর দাম্ভিকতার পরিচয় পাইনি।

বাবার বন্ধু বলেন,—কিন্তু 'প্রবোধ গুহ ও শিশিরকুমারের তফাত বোঝার বয়স তোমাব হয় নি' কথাটায় তাঁর দাম্ভিকতার পরিচয় প্রচ্ছন্নভাবে কি ছিল না?

আমি বলি,—প্রবোধবাবু ছিলেন থিয়েটার প্রোপ্রাইটার মাত্র এবং শিশির-বাবু হচ্ছেন নট। প্রবোধবাবু হচ্ছেন সাধারণ শিক্ষিত কিন্তু শিশিরবাবু হচ্ছেন শিক্ষক, পণ্ডিত। প্রবোধবাবু হচ্ছেন আমাদের পরিচিত মাত্র কিন্তু শিশিরবাবু আমাদের নিজেদের পরিবাবভুক্ত দাদার স্বরূপ। কাজেই দুইয়ের পার্থক্য দেখাতে যদি তিনি ওকথা বলেন তাকে তাঁর দাম্ভিকতার পরিচয় বলা চলে না। তা সত্য অতি কঠিন সত্য হতে পারে। আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা হয়েছিল যে শিশিরদা আর মাইকেল মধুসূদন বোধকরি একই পথের পথিক ছিলেন। নিজের ভালমন্দর বিচার নিজেব হাতেই তুলে নিয়েছিলেন। পরমুখাপেক্ষী হয়ে অপর কারো হাতেই তুলে দিতে চান নি। তাও তাঁদের এটুকু শুধু তাঁদের ideology সম্বন্ধে, অন্যান্য কোন ব্যাপারেই তাঁরা আঁকড়ে ধরে বসে থাকেন নি বরং পরের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন। তাই শিশিরদার ব্যবসা উঠে গেল, দেউলে করে দিয়ে গেল আর মাইকেল মধুসূদনকে হাসপাতালে মরতে হলো।

বাবার বন্ধু এর পর জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, শিশিরবাবুর মদ খাবার জন্যেই না তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন?

আমি উত্তর দিই,—বাদুড়বাগানের বাড়িতে থাকাকালীনই তাঁর স্ত্রী আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেন সে কথা সত্য। তবে আমি নিশ্চয়ই জানি যে তাঁর আত্মহত্যা তাঁর নিজের অভিমানের আতিশয্যে। কারণ বহু পুরুষই মদ খান, তার জন্যে তাঁদের স্ত্রীরা সব আত্মহত্যা করেন না। কিন্তু তার অতিরিক্ততা দেখে সবাই ধারণা করেছিল যে বুঝি মদেই তাঁকে খেয়ে ফেলেছে! এই ইতিহাসটুকু আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই মুখস্থ কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে যে বিশ বছর তিনি মদ ছুঁতেন না এ খবরটুকু বোধকরি আপনারা রাখেন নি। অসম্ভব তাঁর ছিল মনের জোর, সে জোরটুকুকে কেউ কেউ গোঁয়ারতমি বা গর্ব বা দাম্ভিকতা বলে মনে করেছেন। কিন্তু এইটুকু না থাকলে তিনি মৃত্যুর পূর্বে 'পদ্মভূষণ' উপাধি উপেক্ষা করতেও পারতেন না।

বাবার বন্ধু বলেন,—ওটা তাঁর আত্মশ্লাঘা মাত্র!

আমি বলি,—আর আমি যদি তাকে আত্মবিশ্বাস বলি। তিনি নিজেকে যেমন প্রসার করতে চেয়েছিলেন তেমনি চেয়েছিলেন তাঁর শিল্প-প্রেমের স্বরূপ প্রচার! সেটুকু স্বাধীন ভারতের বিশিষ্টরা কিছু পরে উপলব্ধি করেছেন। শিশিরদার অসাধারণ ব্যক্তিত্বটাকে তাই বিকৃত করেই লোকের সামনে তুলে ধরেছেন। নারী নির্যাতন তাঁর জীবনে কখন পরিকল্পনাতেও আনা যায় না, তবু তাঁর স্ত্রীর আত্মঘাতীর দায়ী করতে চান তাঁকে। আমি নিজে তাঁকে দেখেছি স্টেজে প্রমত্ত অবস্থায় যখন চীৎকার করে দৃশ্য রচনা করেছেন তখন প্রভা, ঊষাবতী প্রভৃতিরা তাঁকে ঘিরে যে মুহূর্তে তাঁকে শান্ত হতে বলেছেন সেই মুহূর্তেই তিনি শান্ত বালকের মতো স্থির হয়ে গেছেন। নারীদের মর্যাদা তিনি এইভাবেই দিতেন অথচ লোকের মনে রয়ে গেছে যে তিনি পত্নীঘাতী।

তিনি হেসে বলেন,—তুমি দেখছি শিশিরবাবুর অন্ধ follower.

—আমি তাঁর চেয়েও তাঁর শিল্প-প্রতিভাকে সশ্রদ্ধ সম্মান দিই। দোষে গুণেই মানুষ হয় কিন্তু যখন তাঁর গুণের পাল্লার ওজন মানুষের ব্যক্তিগত ওজনকেও ছাড়িয়ে যায়, তখন তাঁকে দিই মহামানবের আখ্যা। নাটক শিল্পে এ আখ্যার তিনি সত্যই অধিকারী।

এতক্ষণে মৃদু হেসে তিনি বলেন,—এ আমিও বিশ্বাস করি।

আমি বলি,—যে গুণে তিনি বাস্তবতা হারিয়ে নাটকের অবাস্তব রূপে মুহূর্তে সমাহিত হয়ে লোকরঞ্জন করতেন, সেই গুণেই তিনি সময় সময় অবাস্তবতার সমাহিত অবস্থাকে বাস্তবের পর্যায় ফেলতে গিয়ে জনসমাজে অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর সমাহিত হওয়ার গুণ এতটুকু কমে নি বলে আমি মনে করি। সমাহিত মানুষই হয় কবি, শিল্পী, যোগী। বাস্তবতার তুলাদণ্ডে তার মান ঠিক করতে গেলেই তাকে না হয় বলবেন, উদাসী বা দাম্ভিক বা পাগল।

আপনার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গেল শিশিরদার আন্তরিকতা সম্বন্ধে, যা শুনলে আপনি বুঝবেন যে তিনি কি রকম sincere ছিলেন। একবার বাদুড়বাগানে আমাদের বাড়ির রোয়াকে বসে আমার দাদা আর আমাদের প্রতিবেশী জহর মল্লিক মশাই গল্প করছেন। জহরবাবুর কাছ থেকে শিশিরবাবু প্রায় দশহাজার টাকা থিয়েটার খাতে কর্জ করেছিলেন। তাই জহরবাবু সে টাকা আদায় করতে না পেরে দাদার কাছে

বসে শিশিরবাবুর চৌদ্দপুরুষান্ত করছেন, এমন কি ঠগ্‌জোচ্চোর বলতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। দাদা মুখ বুজিয়ে তা হজম করছেন।

এমন সময় শিশিরদার মোটর এসে জহরবাবুর দোর গোড়ায় থামলো। শিশিরদা নামতে নামতেই জহরবাবু উঠে পড়লেন। দাদা চোখের ইসারায় তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন। তিনি দাদার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলে গেলেন,—বলবোই তো, একশবার বলবো, টাকা আদায় করে তবে ছাড়বো।

শিশিরদাকে নিয়ে জহরবাবু তাঁর বৈঠকখানায় বসে একঘণ্টা আলোচনা করে নীচে নেমে এলেন। দেখলাম বেশ হাসিমুখেই মোটরে উঠে শিশিরদা চলে গেলেন।

জহরবাবু তাঁকে বিদায় দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। দাদা তাঁর কাছটিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—টাকা আদায় হলো? কবে দেবেন বললেন?

জহরবাবু বললেন,—ফের পাঁচ হাজার নিয়ে গেল! কি যে সব বললো, মনে হলো একটাও মিথ্যা নয়।

এরপর সে টাকাও ফেরত আসে নি। কিন্তু শুনেছি জহরবাবুর মৃত্যুশয্যার খবর পেয়ে শিশিরবাবু নিজে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে অপারগতার কারণ জানিয়েছিলেন। জহরবাবু শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে বলে গেলেন,—ও টাকা তোমায় আমি দিয়ে গেলাম শিশির, তোমার শিল্প সাধনার খরচ হিসাবে।

শিশিরদা উত্তরে বলেছিলেন,—শিল্প সাধনার খরচা দেশের বহু লোকই তুলে দিয়েছেন আমার হাতে কিন্তু সাধনার সিদ্ধি কাউকে না দেখিয়েই আমাকেও হয়ত চলে যেতে হবে!

বাবার বন্ধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন,—বোধকরি National Theatre গড়ার পরিকল্পনাই তাঁকে ওকথা সেদিন বলিয়েছিল। এতক্ষণে বুঝলাম যে তাঁর জীবনের একমাত্র কল্পনাকে অগ্রাহ্য করে তাঁর ব্যক্তিত্বকে 'পদ্মভূষণে' ভূষিত করতে গিয়েছিল বলেই তিনি সে উপাধি তুচ্ছ করে ফেলে দিয়েছিলেন।

গ্রামোফোন রিহার্সলরুমে খবর এসেছে যে এ বছর চোঙার ভিতর দিয়ে আর গান তোলা হবে না, ইলেক্‌ট্রিকাল রেকর্ডিং-এর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। গানের আইটেমও বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে একটি নাটকের পালা। নিমাই চরিত, শ্রীযোগেশ চৌধুরীর লেখা।

আজ নীচের হল ঘরটা তাই জনাকীর্ণ। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী করবে নিমাই-

এর অভিনয়। অন্যান্যদের মাঝে, শচীমা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, বিষ্ণুপ্রিয়া ছোট সুশীলা, বাকী পুরুষ অভিনেতার দলে আছে সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী (সুলাল), ধীরেন দাস প্রমুখ অভিনেতারা।

সবার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো। বিশেষ করে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালো শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে। ওর গলাটায় যে জাদু আছে এমন মধুর কণ্ঠ আমি খুব কমই শুনেছি। কৃষ্ণভামিনী বলে, আমার চোখ দুটোতে মায়া আছে। এমনি করে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ বেড়ে উঠেছে দিনের পর দিন।

একদিন কান ঘেঁষে ধীরেন দাস বললো,—সাবধান ভাই, ওঁর কর্তাটি একটি wild buffalo, হঠাৎ বাগে পেলে শিঙে তুলে উলটে ফেলে দেবে।

কাজীদা হেসে উঠে বলেন,—মহিষাসুর বধ স্বয়ং দেবীই করবেন, ভয় নেই তুই এগিয়ে চল। যখন দেবী কৃপা করেছেন তখন ওদিকে উদাসীন হলে মহিষাসুরের আগেই দেবীর আক্রোশে পড়ে যাবি। তার চেয়ে দেবীর তুষ্টিতে সব দিক রক্ষা হবে।

জানি না কিসের আকর্ষণে সত্যি সত্যিই একদিন কৃষ্ণভামিনীর বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ খেতে পৌঁছলাম। আদর-আপ্যায়ন যথেষ্ট পেলাম। সারাক্ষণ আমায় মাথায় রাখবে না কোথায় রাখবে ভেবে পায় না। খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রামান্তে গান শোনা হলো।

হাঁ করে চেয়ে থাকে আমার চোখের দিকে। আমি বলি,—কিছু বলো!

ও বলে,—বলার চেয়ে মৌনতাই ভালো, কারণ যা উপভোগের তা বাইরে প্রকাশ করতে গেলেই সৌন্দর্যহারা হয়ে যায়।

আমি বলি,—শিল্পীর মতো কথা। কিন্তু তোমার বেলায় কিন্তু অন্য। তুমি কথা কইলেই আমার উপভোগ, মূকের অভিনয়ে কিন্তু তুমি নাম করতে পারতে না।

ও হেসে ওঠে। ওর হাসির ঝঙ্কার আমি চোখ বুজিয়ে শুনি।

বেলা পড়ে আসে, আমায় উঠে দাঁড়াতে হয়। বলি,—আজ চলি।

ও বলে,—আবার আসতে হবে।

—আবার কেন?

ও আমার হাতখানা খপ্ করে ধরে বলে,—শুধু দেখবো!

আমি উত্তর দিতে পারি না, বাইরে পা রাখি।

নীচের তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওর কর্তা উঠে আসছিলেন। বিরাট বপু,

সারা সিঁড়িটাই জুড়ে ফেলেছেন। সত্যিই তাই, যা ধীরেন বলেছিল। আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে বলেন,—কাকে চাই ?

আমি বলি,—যাকে চাই দেখা হয়েছে, এখন নেমে যাচ্ছি।

ভদ্রলোকের পাশ কাটাতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নীচে নেমে এলাম।

এরপর ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল। পূর্ণ থিয়েটারে যখন আর্ট থিয়েটার লিঃ মাঝে মাঝে মঞ্চাভিনয় করতো। উত্তরে স্টার বোর্ডে আর দক্ষিণে পূর্ণ বোর্ডে।

সেদিন পূর্ণ থিয়েটারের সামনে শ্রীযুত অপরেশবাবু ফুটপাথে পায়চারি করছেন। কে একজন নট এসে তখনও উপস্থিত হন নি তাই অপরেশবাবু উৎকণ্ঠায় ব্যস্ত হয়েছেন। হঠাৎ পূর্ব-বর্ণিত ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে অপরেশবাবুকে নমস্কার জানিয়ে সামনে দাঁড়ালেন।

অপরেশবাবুর ঘাড়টায় দোষ ছিল, স্টিফ্ নেক। তাই সারা দেহ উঁচু করে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন,—কে তুমি ?

ভদ্রলোক বলেন,—আমি আপনার জামাই !

অপরেশবাবু আবার সারা দেহখানি বেঁকিয়ে ভদ্রলোকটিকে বার বার দেখে নিয়ে বলেন,—আপনাকে কৈ দেখিনি তো, আমার জামাই ?

ভদ্রলোক বলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ আপনার জামাই, আমি কৃষ্ণভামিনীর বাবু !

অপরেশবাবু বলেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তবে তো জামাই-ই বটে ! যাও যাও উপরের বক্সে যাও।

জমিদারী পয়সার জোরে কৃষ্ণভাগিনীকে নজর বন্দী করে রেখেছিলেন। সেকথা কৃষ্ণভামিনী আমায় একদিন নিজেই বলেছিল।

সব শুনে আমি বলেছিলাম,—টাকা তোমার চাই, অভিভাবকও তোমার চাই ! কাজেই এক্ষেত্রে এই উপযুক্ত পাত্রকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করাই তোমার কর্তব্য। আমাদের চোখের মায়ায় মরীচিকার ছায়ায় ঘোরা তোমার মতো স্বনামধন্যার শোভা পায় না।

আর্ট থিয়েটার ছেড়ে ও যেদিন শিশিরবাবুর থিয়েটারে যোগ দিয়েছিল সেদিন আবার আমার সঙ্গে পুরানো আলাপ ঝালিয়ে নিয়ে বেমালুম জ্বলজ্বলে করে তুলেছিল।

সেদিন পেছিয়ে পড়েছিলাম আমি।

মারা যাবার আগে যে শেষ দেখা হয়েছিল তার সংলাপ অংশ আমার

মনে পড়ে। বলেছিল,—যা মন চায় তা পাওয়া যায় না, মনে হয় এই না-পাওয়ার ধাক্কাই আমায় একদিন নিঃশেষ করে দেবে।

উত্তর দিয়েছিলাম,—পাওয়ার নেশা যার চাপে, তার একটার পর একটা পাওয়া হলেই, আবার নতুন করে নতুন জিনিষ পেতে চায়, শেষে পাওয়ার নেশাতেই সে দেউলিয়া হয়ে যায়। তাই, ওর জন্যে আপসোস করার কিছুই নেই। যেটুকু পাওয়ার ছিল, তা তোমার ভাগ্যে বিধাতা পূর্ণভাবে পাইয়ে তোমায় যশের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পর আর মনের বিক্ষোভ সাজে না।

জানি না কেন সেদিন বিদায়কালে সে আমার পায়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করেছিল।

আমিও চুপটি করে দাঁড়িয়ে তার সেই আন্তরিক প্রণাম গ্রহণ করেছিলাম।

ইলেক্‌ট্রিক্যাল রেকর্ডিং ওপন্ করবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

যথাযথ তারিখে বেলেঘাটা গ্রামোফোন অফিসে সবাই উপস্থিত হলাম। তখন বেলেঘাটাতেই গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ড ফ্যাক্টরী।

ভট্‌চাজ্জিমশাই বললেন,—রবীন্দ্রনাথ আসার পূর্বেই রেকর্ডিং মেসিন ঠিক কাজ করছে কিনা কোরান সাহেব দেখে নিতে চান।

কোরান সাহেব ছিলেন তখনকার রেকর্ডিস্ট।

মাইকের সামনে বসে গান করলাম ধীরেন আর আমি। দুটি রেকর্ডিং বেশ ভালই হলো। কোরান সাহেব বাঃ বলে খুশী হলেন। প্লেটে করে 'মিষ্টান্নমিতরে জনা' বিতরণ করা হল। সবারই মিষ্টিমুখ।

রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির হলেন। সবাই তাঁকে স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। মিঃ কুমার গ্রামোফোন কোম্পানির সর্বময় কর্তা, নিজে তাঁকে সঙ্গে করে সারা ফ্যাক্টরী, প্রেসিং ডিপাটমেণ্ট ঘুরিয়ে এনে রেকর্ডিং রুমে বসলেন।

কবির সঙ্গে আছেন শ্রীযুত প্রশান্ত মহলানবীশ। কবি করবেন রেকর্ডিং মেসিনের উদ্বোধন আবৃত্তি।

লাল আলো যথাযথ জলে উঠলো। ভট্‌চাজ্জিমশাই ইশারায় শুরু করতে জানান। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—শুরু করি?

নষ্ট হয়ে গেল সেখানি। ভট্‌চাজ্জিমশাই বলেন,—লাল আলো জললে আর কথা বলবেন না একেবারে শুরু করে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—ওঃ, ভুল হয়ে গেল না? আচ্ছা, এবার নিন্!

আবার সব রেডি হলো। লাল আলো জ্বলে উঠলো। কবিকে ইশারা করে ভট্‌চাজ্জিমশাই জানিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—প্রশান্ত, তুমি আমার পাশটিতে এসে বসো।

এবারও নষ্ট হলো।

লজ্জিত হয়ে কবি বলেন,—এটাও নষ্ট করলাম! কিন্তু একটু নার্ভাস অনুভব করছিলাম, তাই প্রশান্তকে কাছে ডাকলাম।

কোরান সাহেব রবীন্দ্রনাথকে চেনেন না। তাঁর খ্যাতির সঙ্গে পরিচিত নন, তাই গজগজ করতে থাকেন। আবার শুরু হলো। এবার কিন্তু অনবদ্য-ভাবেই কবি তাঁর আবৃত্তি শুরু করলেন, কিন্তু শেষ হবার আগে একটু-আধটু গলার খাঁকারি নম্রভাবে দিয়ে ফেলেছিলেন। সেই শুদ্ধই রেকর্ডিং শেষ হলো।

দুখানি আবৃত্তির টাইটেল শেষ করে উনি যখন উঠলেন তখন প্রায় চারটা বাজে। উঠেই তিনি জল চাইলেন। জল খেয়ে বালকের মতো বলেন,—ছেলেবেলায়, মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়া বলতে গিয়ে এমনি ঘাবড়ে যেতাম।

ওঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আমরা যে যার টাইটেল রেকর্ডিং করতে শুরু করলাম। উনি চুপটি করে বসে দু-তিনখানা টাইটেলের রেকর্ডিং শুনলেন। এমনি করে সেদিনের উদ্বোধনী অধ্যায় সাঙ্গ করা হলো।

বাবার বন্ধু বললেন,—কি আবৃত্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তোমার মনে পড়ে?

আমি বলি,—না, ঠিক মনে নেই, তবে খুব সম্ভব—

> "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামলো—
> বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামলো।" এই কবিতাটাই।

প্রথম দিনের ফলাফলের জন্যে অন্যান্য রেকর্ডিং অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল দুটো একটা দিন। রিহার্সালরুমে সবার ভিড়। ধীরেন দাস সবার রিহার্সালেই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল যৎপরোনাস্তি। ভট্‌চাজ্জিমশাই থেকে শুরু করে দশরথ পর্যন্ত সবাই বেলেঘাটা আর গরানহাটার বিষ্ণু-ভবন এক করে ফেললেন।

কিন্তু নিরালায় মদন দেব তাঁর নিভৃত কার্য সমাধান করে চলেন বিষ্ণু-ভবনের ত্রিতলের দক্ষিণের কামরায়।

ধানবাদ অঞ্চল থেকে একটি গায়িকা এসেছেন। ইনি ঝরিয়া রাজার স্টেটের

গায়িকা ছিলেন শুনলাম। সুকণ্ঠী, কিন্তু কোলিয়ারি অঞ্চলের পাহাড়ী কাঠিন্যে লাবণ্যবিহীন, আর কোথাও কোনো রস আছে বলে মনে হয় না। তাঁর যত রস গানে। সুন্দরী না হলেও বিশ্রী বলা চলে না। জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে উর্দু গজল শিখছেন বাংলা ভাষায় তর্জমা করা। আর ঠুংরীর বন্দেজে লেখা বাংলা গান।

ধীরেন দাস, আমি, বিমল দাশগুপ্ত, বিমলবাবুর বন্ধু লাহিড়ীমশাই, সবাই মিলে ঘিরে বসে এ কাঠিন্যে রসসঞ্চারের চেষ্টা করছি কিন্তু মহিলার প্রাণ ছেড়ে মুখেও এক ফোঁটা রসসঞ্চার-বোধ প্রকাশিত হচ্ছে বলে মনে হয় না।

কদিন আপ্রাণ চেষ্টার পর ধীরেন বলে,—ভাই তোমার তো এ বিষয়ে হাতযশ যথেষ্ট, দেখতো পাথর ফুঁড়ে জল বের করতে পার কি না!

নিরালায় বসে ভাষার মানে বুঝিয়ে রসসৃষ্টি করার চেষ্টা করি। মহিলা আমার মুখের পানে খালি চেয়ে থাকেন! বিরক্ত হই, বলি,—বুঝেছেন?

কদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাংলা গানের মাঝে রং ধরাতে গিয়ে হঠাৎ মহিলার মুখের কথা শুনে চমকে উঠি। মহিলা আমায় বলেন,—আপনার চোখে চোখে যে রং খেলছে তার বর্ণচ্ছটা গানের লাইনে পাবো কোথা?

খবরটা পৌছে দিলাম বন্ধুদের মাঝে। কমোশন পড়ে গেল!

ধীরেন বলে,—পঞ্চবন্ধুর পঞ্চশর উপেক্ষা করে অতনু দুটি চক্ষের বালাইকে বরণ করে নিল শেষ পর্যন্ত? তুমি ভাগ্যবান!

আমি বলি,—পাথর খুঁড়ে জল বার করেছি সত্যি, তবে সে জল বার প্রাণ চায় পান করো, অবগাহন করো তাতে আমার আপত্তি নেই।

মিঃ লাহিড়ী বলেন,—পাহাড়ের মাঝে উৎস যখন আছে তখন তৃষিত পথিক আপনি এসে জুটবে। আমার ভাই, তোমরা যাই বল, ওর ওই চম্পক অঙ্গুলি-গুলি মন হরণ করেছে।

কবি রামেন্দু দত্ত পদ্য লিখে সুর দিতে দিয়ে গেছেন—

'একটুখানি পাথর দিয়ে চাপা, আমার ঝরণাভরা জল!'

ধীরেন আপন মনে তাতে সুর দিয়ে গেয়ে ওঠে আর মুচকে মুচকে হাসে। আমি আর বিমলদা নীচের হলঘরে নেমে যাই আর উপরের দক্ষিণ কামরায় 'চম্পক অঙ্গুলি'কে নিয়ে লাহিড়ীমশাই কবি হয়ে উঠলেন।

দোতলার পূবের ঘরে মানিকমালাকে নিয়ে ধীরেন বসলো। তাকে শেখাচ্ছে ধীরেন মুখার্জি মশায়ের রচিত—'মালা চাই'। মানিকমালা তার জাপানী

পুতুলের মতো চেহারা নিয়ে নিজের নামের পেছুনের মালাতে আর ধীরেনবাবুর রচিত 'গালা চাই'তে জোট বাঁধিয়ে বসেছে। ধীরেন তাই, ধীরে ধীরে খুলছে। মানিকমালা আমাদের বন্ধু, বোধ করি উপরতলার শুভ খবরটা ধীরেন পৌঁছে দিয়েছে, তাই আমাকে দেখে ড্যাবড্যাবে চোখ বের করে হাসছে।

বড় হলটায় নিমাই সন্ন্যাসের পালা চলেছে। হাবুলদা (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, থিয়েটারের বিখ্যাত প্রম্‌টার) আজ সরস্বতীকে নিয়ে এসেছেন শ্রীবাসের মেয়ের পাট করবার জন্যে। সরস্বতী সুন্দরী, যেমন রঙে তেমনি গড়নে।

সুনীল প্রভৃতি আমরা সবাই ইশারায় তাঁর সঙ্গে চোখে চোখে জমিয়ে তুলেছি।

মহলার অবসরে পরিচয় হলো। অতি মিষ্ট ব্যবহার তাঁর তেমনি হাস্যময়ী।

এমনি করে রিহার্সলের মধুচক্র মধুতে ভরে উঠলো। কয়েক দিনের মধ্যে সে মধু চয়ন করে যে যার ঘরে ফিরে গেল। কোম্পানি সে মধুর অংশটুকু রেকর্ডে ভরে নিয়ে সর্বজন সমক্ষে মূল্য বিনিময়ে বিকিয়ে দিলেন।

চৌদ্দ

প্রথম রেকর্ডেই নাম হয়ে গেল। সে নাম নবপর্যায় পরিচিতি পেলে সবার কাছে। পুরাতনী সম্বন্ধের ভুলে যাওয়া সম্প্রীতি নতুন করে ঝালিয়ে উঠতে পুরাতন বন্ধুবর্গের এলো আহ্বান।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে একদিন পেলাম কণার চিঠি। লিখেছে—

'তোমার গান দুখানি অপূর্ব হয়েছে। বাবা তোমায় একবার ডেকেছেন, যত শীঘ্র পারো দেখা কোরো। ইতি—কণা।'

পরদিন প্রভাতেই ছুটে গেলাম কণাদের বাড়িতে। 'পরভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু দিন যাবে মোর ভালো—'

কণা বলে,—এসেছো? তবু ভালো। যাও, বাবার ঘরে যাও, আমি চা আনছি। কণার বাবার ঘরে ঢুকতে কণার বাবা বলেন,—এই যে এতদিন কোথায় ছিলে? কণার মার মৃত্যুর পর থেকেই তুমি এখানে আসা বন্ধ করেছো। মেয়েটা একা একা গুমরে মরে। মাঝে মাঝে আসবে, কেমন? হাঁ৷ ভালো কথা, তোমাদের শিমূলতলায় একটা বাড়ি আছে না?

আমি বলি,—হাঁ৷ আছে।

ভাবছি কণাকে নিয়ে দিনকতক অর্থাৎ মাসখানেক ওখানে ঘুরে আসবো। তুমি যদি বাড়িটা দাও?

আমি বলি,—বিলক্ষণ! মালীকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আপনি কবে যাবেন বলুন?

উনি বলেন,—তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। আমাদের পৌছে দিয়ে না হয় তুমি সাতদিন পরে চলে এসো।

আমি আমার কাজের চাপের কথা উল্লেখ করে এড়াতে চাইলাম কিন্তু রেহাই পেলাম না। ঠিক হলো সঙ্গে করে পৌছে দিয়ে আবার তার পরদিনই ফিরে আসবো।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। কণা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাসছে।

চা-টা খাওয়া শেষ করে ঘরে ফিরলাম।

রেডিয়োতে প্রোগ্রামগুলো নৃপেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে ডুটো তিনটে দিনের ছুটি নিলাম। বলে গেলাম খুব দেরি হলে সাতটা দিন। নৃপেনবাবু বুঝেছিলেন সাতদিনের আগে আর আমি ফিরছি না।

যাত্রার দিন সকালে নিজের বেডিং সুটকেশ ঠিক করতে করতে ভেবেছি —বহু অন্তরায়, তাই ও মামলার নিষ্পত্তি করেই দার্জিলিং থেকে পালিয়ে বেঁচেছিলাম। আবার কেন? ভয় হয় পাছে পুনর্মূষিকো ভব না হয়ে যাই।

ট্রেনে উঠলাম। এবার যেন কণার চেয়ে কণার বাবার যত্নে অতিশয়টা বেশী বলে মনে হলো। কণার সঙ্গে রয়েছেন কণাদের বামুনমা। তিনি ক-ঘণ্টার পথের মাঝে ডুবার খাবার দিলেন।

শিমূলতলা স্টেশনে ফুলচাঁদ মালী, মায় গরুর গাড়িটা পর্যন্ত নিয়ে উপস্থিত। মালপত্তর গরুর গাড়িতে চাপিয়ে, পদব্রজে সবাই রওনা হলাম। সুশীল বালকের মতো কণার বাবার অনুগমন করছিলাম, আর কণা তার বামুনমার সঙ্গে যেতে-যেতে ক্ষণে ক্ষণে হাসিতে ফেটে পড়ছিল।

সন্ধ্যে উৎরে গেছে।

বাইরের ইজি চেয়ারে চুপটি করে বসে আছি। ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে সব গোছগাছ করে নিচ্ছে।

ভিতরে ডুখানা বড় বড় ঘর পাশাপাশি, তার একটাতে কণার বাবা অপরটিতে কণা ও বামুনমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘর ডুখানার সামনেই প্রকাণ্ড ঘেরা দালান। বাইরের দিকে একখানা বড় ঘর, তার পাশে ছোট একখানা। সেইটাতে আমার শোবার ব্যবস্থা করেছে। ঘেরা দালানের বাইরে বড় উঠোন, কুয়াতলা, অপর দিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি।

অন্ধকারেই বসে আছি। ভিতরের ব্যবস্থার খটাখট শব্দ আসছে। কণা এসে কপালে হাত রেখে বলে,—কি ভাবা হচ্ছে কবি!

বলে নিজেই আবৃত্তি করে—

অন্ধকারের অন্তরেতে উৎসারিত আলো—
সেই তো তোমার আলো!

ওঠো, চা খাবে এসো।

আমি উঠতে যাচ্ছি, ও বলে,—বসো, এইখানেই নিয়ে আসি। ডুজনে বসে খাওয়া যাবে। বাবা ততক্ষণ পুজো-টুজো সারুন।

ও চলে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওর করস্পর্শে সারা দেহটায় শিহরণ এনেছিল। ও বোধ হয় বুঝতে পারে নি।

চা আর খাবার নিয়ে এসে টুলটা টেনে দুজনার খাবার নামিয়ে দিয়ে পাশ ঘেঁষে বসে। আমি চুপটি করে বসে ওর কথা বলার প্রতীক্ষায় কাল গুণছি।

ও বলে,—নাও, খাও।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিই। নিস্তব্ধ সন্ধ্যার ঝিঁঝির ডাকে যেন সব দিকটাই ঝিম্‌ঝিম্ করছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে ও বলে,—আজ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব।

আমি উত্তর দিই না।

ও বলে,—হঠাৎ অমন লুকিয়ে দার্জিলিং থেকে পালিয়ে এলে কেন? আমি বাঘ না ভাল্লুক। খেয়ে ফেলতাম না, কমলার কাছ থেকে দৈত সময়ে ছিনিয়ে নিতাম না।

বুঝলাম আগের মামলার নিষ্পত্তি হয় নি। আজ তার শুনানি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকি, তারই মধ্যে ও বলে ওঠে,—ভাবছো বোবার শত্রু নেই না? কিন্তু সে হচ্ছে যে প্রকৃত বোবা, বোবা সেজে থাকা নয়।

আমি বলি,—আমি ভেবেছিলাম সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, কারণ তোমার মামার জাজমেণ্টটা বেরিয়ে গেছিল কিনা!

তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে কণা। বলে,—হু ইজ্ মামা! ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পার্শন্যাল। দিস্ ইজ্ বিটুইন উই এণ্ড মি।

আমি বলি,—পারিপার্শ্বিককেও তো মানতে হয়?

ড্যাম ইওর পারিপার্শ্বিক। বিয়ে করব আমি, অপরের কথায় যায় আসে কি? তার উপর যখন মার শেষ ইচ্ছা!

আমি বলি,—মামীমার শেষ ইচ্ছাটা যদি আমাদের না জানিয়ে তোমার বাবাকেও জানিয়ে যেতেন হয়ত—

কণা কথা কেটে রেগে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—তুমি কাওয়ার্ড। নিজের অধিকারকে গ্রহণ করবার শক্তি তোমার নেই।

চুপটি করে থাকি।

একটু নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে কণা ভিতরে চলে যায়।

রাত্রে খাওয়ার পালা শেষ হলো, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা।

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটেনি।

গরম এক কাপ চা করে এনে কণা তার ঠাণ্ডা হাতখানা কপালে ছুঁইয়ে আমার ঘুম ভাঙালো। চোখ বুজিয়ে অনুভব করলাম কিন্তু চোখ খুলতে ইচ্ছে করছিল না, পাছে এই নরম করস্পর্শ নিমেষে মিলিয়ে যায়।

—এই ওঠো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আর শুয়ে থাকা চলে না, উঠে পড়লাম।

কণা বলে,—চট্ করে তৈরী হয়ে নাও, বেড়াতে যাবো।

তথাস্তু!

ভোরের হাওয়ায় দুজনে বেরুলাম, সঙ্গে বামুনমা।

দু'পা যেতেই কণা হুকুম দিলে,—বামুনমা, তুমি বরং ফিরে গিয়ে বাবার ফুল গুছিয়ে দাও আমি এখুনি ঘুরে আসছি।

বামুনমা ফিরলো।

দুজনে চলেছি, কারো মুখে কথা নেই। উঁচু পথটা ক্রমেই নীচুর দিকে নিয়ে চলেছে নদীর ধারে। নদীর পা ভেজা জলে, জুতো হাতে করে পার হতে গিয়ে কণা বলল,—এই, ধর-ধর, বসে যাচ্ছি যে।

চোরা বালিতে কণার পা বসে গেছে। ওকে ধরে তুলতে যেতে ও জড়িয়ে ধরে আমায়।

সন্তর্পণে তুলছি ওকে। ও বলে,—ভয় কি অপরের জিনিসে তো হাত দিচ্ছো না। এত সঙ্কোচ কেন?

আমি বলি,—কণা, মিথ্যে এ খেলায় কেন জীবনান্ত ঘটাবে?

কণা অভিমানে ফুলে উঠে কথা বলে,—মামার ইচ্ছে মামা জানিয়েছেন, আমার ইচ্ছে আমি জানিয়েছি। এখন তোমার ইচ্ছে যে কি সেইটার অপেক্ষায় জীবনান্ত এমনি ঘটছে।

আমি উত্তর দিলাম না।

পাশেই কালো পাথরের একটা বড় টিপি, ওর উপর একটা গাছ আছে। গাছে ফল ধরে ঠিক যেন এক একটা নূপুর। দু-চারটা ফল পেড়ে ওর হাতে দিই। কণা পায়ে পরে নেয় নূপুরের মতো করে। বলে,—নতুন কনের পায়ে মানাচ্ছে ভালো!

আবার চুপ করে থাকি। বলার মতো কত কথাই মগজে গজগজ করছে কিন্তু কথা কইলেই বিপদ—তাই চুপ করে থাকাই মঙ্গল।

কালো পাথরের বেদিটায় আমি বসে পড়ি। কণা বিনা বাক্যব্যয়ে এসে আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে। এ যেন তারই সম্পত্তি, এটাকে ব্যবহার করতে তার কোন অনুমতি দরকার বোধ করে না।

দূরে নেড়া পাহাড়টায় গরু চরাচ্ছে রাখাল ছেলেরা। ওদের বাঁশীর শব্দ আর গরুর গলায় টিনের ফুকো ঘণ্টায় দূরান্তে প্রতিধ্বনি নিয়ে ফিরে ফিরে আসছে। দুজনেই আনমনা, আর উন্মনা।

হঠাৎ নজর পড়লো—দূরে নদীর পথ বেয়ে কে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন।

দুজনে উঠে পড়ি, পথ ধরি।

পথেতেই দেখা হয়ে যায় ওর বাবার সঙ্গে। তিনি আমায় বলেন,—ভোরে উঠে ওকে নিয়ে খুব বেড়াবে। তারপর, কণাকে বলেন,—কণা, এখন বাড়ি যা। ফুলচাঁদ দুধ আনতে বাড়ি গেছে। দুধটা জ্বাল দিয়ে রাখিস। আমি চট্ করে পাহাড়টায় পাড়ি মেরে আসছি।

দুজনে বাসায় ফিরি। পথে কারো মুখে কথা নেই, তবে সারাটা পথ আমার হাতখানা কণারই হাতের মধ্যে ন্যস্ত।

আমার মনে তোলাপাড় চলে—ওর বাবা কি তাহলে?

বাসায় ফিরে জিরোতে জিরোতে শুধু এই কথাটাই বার বার ভাবছি।

দুধ-মিষ্টি হাতে কণা এসে ঘরে ঢুকলো। মৃদু হেসে বলে,—খেয়ে নিয়ে ভাবনাচিন্তাগুলো সেরে নিও।

আবার হাসে, বলে,—আমি কিন্তু ওগুলো শেষ করে ফেলেছি।

দুধটাকে গলাধঃকরণ করে বাগানে কুলতলায় গিয়ে দাঁড়াই। পাশেই একটা হেলা পেয়ারা গাছ, ওর ডালে শুয়ে কত না দুপুর বাল্যকালে কেটেছে আমার—যখন শুনতাম শুয়ে শুয়ে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। আজ ইচ্ছে হচ্ছে, ওই ডালে শুয়ে পড়ে হাঁপিয়ে পড়া মনটাকে নিরাশায় শান্তি দিই।

ডালেই শুয়ে পড়লাম। দেহ ভারী হয়ে গেছে—ডালটা নুয়ে পড়লো। প্রায় মাটিতে লাগে আর কি!

কণা এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে,—পড়ে গেলে হাড়গোড় সব ভেঙে যাবে যে।

আমি বলি—সেবা করবার লোক যখন মজুত তখন ভয়টা কোথায়? সইব সুখে মৃত্যু জ্বালা তোমায় নিয়ে পাশে।

কণা, বলে,—ওসব অলক্ষুনে কথা এখন থাক। চলো দেখি ঘরে গান শিখবো।

রেকর্ডের গান দু'খানা কণা রপ্ত করে তুলেছে! তারপর নাওয়া-খাওয়া বিশ্রাম সবই সারা হয়েছে। বৈকালিক চাএর আগেই বেডিং বাঁধতে শুরু করে দিই। কণা এসে ঘরে ঢুকে বলে,—একি! কার হুকুমে বিছানায় হাত দেওয়া হয়েছে শুনি?

আমি বলি,—আজই যে যেতে হবে।

ও বলে,—কবে যেতে হবে সেটা তুমি জান না বরং আমি কিছুটা জানি।

চামড়ার বেল্টটা খুলে বিছানাটা আলগা করে তক্তাপোশে ছড়িয়ে দিলে। বললো,—জামা-কাপড় পরে নাও, লীলাবরণ যাবো। সেই ছেলেবেলায় গেছি, প্রায় ভুলেই গেছি। আজ দেখে আসি একবার।

বিকেল বেলায় ওর বাবা স্টেশনে যাবেন। আমায় কণাকে নিয়ে লীলাবরণ যাত্রা করতে হলো সঙ্গে জেলের পেছনে কেলে হাঁড়ি বামুনমা।

অনেকখানি পথ দুজনে গল্পগুজবে চলেছি, বামুনমা পেছিয়ে পড়ে।

লীলাবরণে নদীটা কতকগুলো পাহাড়ী পাথর ঠেলে ছোট ঝরনার মতো ঝরে পড়ছে। এমন কিছু না তবে বেশ লাগে।

কণা গান ধরেছে—সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে

প্রেমডোরে বাঁধা ঝুলনা।

বামুনমা নিরালা সময়টা উঁচু পাথরে বসে সন্ধ্যাজপে মন দিয়েছে।

আমি ঝরনার জলে পা চালাচ্ছি, কণা গান থামিয়ে পাশে এসে বসলো। বললো,—পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন? বামুনমা? ওকে আমি বশ করেছি! তারপর খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে হঠাৎ বলে,—বিশ্বাস করছো না, দেখবে?

ও ডাকে বামুনমাকে বলে,—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, চলো ফিরে চলো।

বামুনমা জপ করতে করতে কথা বলে না। ইশারায় বলে,—না।

আমার দিকে কণা চেয়ে হাসে। আমায় বলে,—ও বুড়ী-এখন রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখছে চোখ বুজিয়ে, চোখ চাইলেও যাতে সেই মূর্তিই দেখতে পায় তার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত, কি বল?

কি হচ্ছে কি?

—বাঃ রে! তোমার সামনেও বেহায়াপানা করতে পারবো না? কণা আমায় জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঠেকায়।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সব দোষ বামুনমার। ও কেন জোরে হাঁটতে পারে না, ও কেন সন্ধ্যা পর্যন্ত জপ করলো ইত্যাদি।

বামুনমা ওর বাবাকে বলে,—সবই রান্না করা আছে, খালি লুচি কখানা ভেজে নিলেই হয়ে যাবে।

ওর বাবা ওতেই সন্তুষ্ট।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নটার মধ্যেই সবাই শুয়ে পড়লাম। রাত্রে ফুল-চাঁদ বাড়ি গেছে।

হঠাৎ কার কোমল স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি।

—এ কি! করেছো কি তুমি?

আমার দু'পা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে কণা। বলে,—কথা দাও তুমি আমায় ঠেলে ফেলবে না!

তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বলি,—ছিঃ এমন করে না। আমার জীবনটুকু ঘিরে তুমি যদি সুখী হও তো আমার কোনই আপত্তি থাকতে পারে না, তবে বড় দুঃখ পাবে।

কণা চোখের জলে বলে,—সে দুঃখ আমার।

—তোমার বাবার মত আছে?

—সে ভার আমার।

চুপচাপ দুজনে থাকি। ওর চিবুক ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলি,—বেশ তবে তাই হোক। শোও গে যাও, রাত অনেক হলো।

—কথা দিচ্ছ?

—বললাম তো, আমায় নিয়ে তুমি সুখী হলে আমার তৃপ্তির আর অবধি নেই।

কণা উঠে দাঁড়ায়। আমি বলি,—শোনো।

—কি বল?

—কাল দশটার ট্রেনেই আমি চলে যাবো, বাধা দিতে পারবে না কিন্তু!

—কেন? আরও দুটো দিন—

—না, তা হয় না, কালই সকালে, কথা দাও।

কণা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,—তাই হবে, কিন্তু—

আমি বলি,—কিন্তুর সব ভার তোমার। এদিকের মতামত পাকা করে আমায় জানিও, আমার ব্যবস্থা অটুট রইল।

ও চুপটি করে পাশে বসে রইলো। তারপর ধুপ্ করে আমার কাছে শুয়ে পড়ে। আমি বলি,—একি করছো! যাও শোও গে যাও।

হঠাৎ ও কান্নার সুরে বলে ওঠে,—যেতে যে ইচ্ছে করছে না।

—তবু তোমায় যেতে হবে।

—বেশ তবে যেতেই হবে।

সকাল থেকে কণার দেখা নেই।

বামুনমা চা দিয়ে গেল। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, কণা কোথায়। কিন্তু কে যেন গলার স্বরটা বন্ধ করে দিল।

বামুনমার দিকে চেয়ে বললাম,—আজ এগারোটার ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যাবো। দশটার মধ্যে রান্না করে খাইয়ে দিতে হবে।

বামুনমা বলে,—বাবু তো সকালে স্টেশনে গেছেন মেয়েকে নিয়ে মাছটাছ কিনতে, দেখি যা হয় করবো।

ফিরে চলে বামুন মা।

হঠাৎ থেমে গিয়ে, ফিরে এসে বলে,—তুমি বাছা না হয় বিকেলেই যেয়ো। যদি ভালো মাছটাছ আনেন দুমুঠো ভাল করে খেয়েদেয়ে গেলেই ভাল হতো না? শুধু শুধু মেয়েটাকে কাঁদিয়ে রেখে গেলে কি সুখ পাবে বাবা অন্তরে? কাল সারাটা রাত তো মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে, তবু সাধ করে নিজেই বাজারে দৌড়েছে ভোর না হতেই। সামনে বসে ভালমন্দ খাওয়ালে তবু মেয়েটা ওই স্মৃতি নিয়ে দিন কাটাবে। তা না ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে, যাবো বললেই অমনি যাওয়া হয়!

বামুনমা হাত ঘুরিয়ে চলে গেল।

আমি উঠেপড়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে বাগানে হেলা পেয়ারার ডালে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরে কণা এসে বললো,—বেশ লোক যা হোক, সারা বাড়ি খুঁজে একশা, উনি এখানে বসে দোল খাচ্ছেন! ওদিকে বাবা তোমায় ডাকছেন।

হঠাৎ বাবা ডাকছেন! তবে কি এরই মধ্যে কণা কিছু তাঁকে বলেছে নাকি!

কণা আমায় ধরে নিয়ে ওর বাবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। উনি বলেন,—রান্নাঘরে দেখেছো, কত বড় রুইমাছ পেয়েছি? আজ আর যাওয়া হলো না, অন্তত এ বেলায়। বরং সন্ধ্যার ট্রেনে খেয়ে-দেয়ে যেয়ো, কেমন?

আমি প্রতিবাদ না করে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই।

দুপুরের আয়োজন পোলাও আর পায়েসে গিয়ে ঠেকেছিল। সঙ্গে ছিল সামনে বসে পাখা হাতে কণার সকরুণ আবেদন—না, কিছু ফেললে চলবে না!

পাতে পড়ে রইল অনেক। হেসে বললাম,—ওগুলো রাখতে হয়, তুমি বরং বামুনমাকে জিজ্ঞাসা করে নিও।

চার চোখের মাঝে তড়িৎ খেলে গেল। দুজনেই একসাথে উঠে পড়ি। কণা বলে,—দুষ্টু কোথাকার!

বিকেল বেলা ফুলচাঁদ বিছানাটা বেঁধে দিচ্ছে। বামুনমা এসে বলে,—হাত-মুখ ধুয়ে নাও বাছা, মেয়ে জলখাবার করছে।

আমি বলি,—সে কি? এখন কি আর কিছু খাওয়া চলে! ও রাত্রের খাবারের সঙ্গে বেঁধে দিন।

বামুনমা বলেন,—সেতো এই পুঁটলিতে বেঁধে এনেছি। বেগুন ভাজা আলুদ্দম আর লুচি। উপরেই মিষ্টিটা রেখেছি।

এক থালা জলখাবর নিয়ে কণা ঘরে ঢুকলো।

বললাম,—ও সব আমার পেটে ধরবে না।

কণা বলে,—বারে! নিজের হাতে করে নিয়ে এলাম আর তুমি খাবে না?

আমি উত্তর দেই,—আমি না হয় তোমার হাতে, আমার পেটটা তো আর তোমার হাতে নয়, ও শুনবে কেন?

কটাক্ষ হেনে কণা বলে,—আসুন গুরুমশাই, হাতে-মুখে জল দিলেই খেতে ইচ্ছে হবে।

তৈরী হয়ে নিয়েছি, ওরাও নিয়েছে; বাড়িতে থাকবে খালি বামুনমা।

বলি,—সাবধানে থাকবেন, এ বাড়িতে আবার ভূতের উপদ্রব আছে।

বামুনমা সঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বলেন,—তবে আমিও সঙ্গে যাই!

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো কণার বাবাই বাড়ি চৌকি দেবেন। বামুনমা আর ফুলচাঁদের সঙ্গে কণা আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে।

অন্তরাত্মা বোধ করি এইটাই চাইছিল।

কণা বলে,—গিয়ে চিঠি দেবে।

—চিঠি পেলে রেগে যাবে তাই ভাবছি।

—কেন?

—কারণ বিদ্যাসাগরী বাংলায় কুশলাদি জানাইয়া বাধিত করিবেক, ছাড়া লেখা হবে না। তোমার বাবার হাতে যদি চিঠি পড়ে যায়!

—যায় যাক্।

আমি চুপ করে থাকি।

ট্রেন ছেড়ে দিল। কণার চোখ দুটো ছলছল করে জলে ভরে ওঠে। আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে আশ্বস্ত করলাম। কারো কিছু বলার নেই, করার যেটুকু সেটুকু ও ঈশ্বরের হেফাজতে।

পনেরো

কলকাতায় পৌঁছেই হোলির সমারোহ।

গ্রামোফোন ক্লাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি, তাছাড়া অফ্ সিজন। শুধু ধীরেন দাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হাজির হলাম। কাজীদাও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে মোটা মতো একটি ভদ্রলোক। কাজীদা বলেন,—ওকেও হোলিতে নেমতন্ন কর দেবু। ধীরেন যাবে না, ও সামাজিকতা রাখে না।

হোলির দিনে সেজেগুজে যাবো যাবো করছি এসে দাঁড়ালো একটা মোটর গাড়ি। গাড়িতে কাজীদা নিজে। চললাম ভবানীপুরে দেবুর বাড়ি। ওখানে উঠে দেখি শ্রীযুত নলিনী সরকার, শ্রীযুত দুর্গাদাস বাড়ুজ্যে, আরও সব অতিথিরা বসে শোরগোল তুলেছেন। ব্যবস্থা—একরাশ খাদ্য, সঙ্গে কিছু পানীয়। শুধু যেটুকুর অভাব, সে হচ্ছে একটি বাসরাই 'সাকী'র।

পিচকারী আর ফাগে, গোলাপজলের গন্ধে ভরিয়ে তুলেছে ঘরখানি। অপর পক্ষের পক্ষচ্ছেদন করা হয়েছে তাই সবাই একতরফা। এখানে শেষ করে হয়তো অপর নতুন পক্ষের সন্ধানে সব বেরুবার ব্যবস্থা ছিল। যাঁরা পানপাত্রের প্রেমিক তাঁরা সাকীর স্মরণ করেই পিয়াস মেটালেন। আর যাঁরা সাকীর বিরহে বিরস বদনে চেয়ে রইলেন তাঁদের জন্যে রক্তমদিরে স্নানের ব্যবস্থাও করা হলো।

এক জার রক্তমদিরা আমার মাথা এসে গলগল করে পড়লো। কাজীদা কবিত্ব করে বলেন,—নে বেশ করে স্নান করে নে, পরকালে কৈফিয়তের জবাবদিহি করতে পারবি। 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওবে স্নান কর হৃদয়-নীরে'। হা-হা-করে হেসে ওঠেন কাজীদা, সবাই যোগ দিই।

মদ না খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। গাড়ি আমায় জায়গা মতো নামিয়ে দিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে পেলাম কণার চিঠি। সাঁওতাল পরগনার পলাশকৃষ্ণচূড়ার মাথায় মাথায় কেমন হোলি লেগেছে তারই বর্ণনা। মাথার সিঁদুরের মতো ফাগে ভরে উঠেছে প্রকৃতি, আর সব বিকৃতি অনাসৃষ্টি!

সৃষ্টির মাঝে অনাসৃষ্টি ঘটানোই প্রকৃতির খেলা। সে খেলা চোখের দৃষ্টির বাইরে, মনের দৃষ্টির বাইরে, বাইরে তাই অদৃষ্ট!

মনে মনে বলি,—হে অদৃষ্ট দেব, সব মুছে দাও, মুছে দাও অতীত, বেঁচে থাক শুধু বর্তমান। সে তো আর তোমার মতো অদৃষ্ট নয়, সে যে দৃশ্যমান পরমবাস্তব।

দুম্ করে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে বেশ করে সাবান ঘষে নিজেকে সাফ করি। আজ আবার বিকেলে রেডিওতে স্পেশাল প্রোগ্রাম। লম্বা জলসা; কৃষ্ণচন্দ্র, পেয়ারা সাহেব, জমীরউদ্দিন খাঁ সাহেব, আসবাগ হোসেন, ঊষারাণী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, লীলা (কক্স) প্রভৃতির প্রোগ্রাম জুড়ে খালি—'ঘরে চলো গুঁইয়া আজু খেলে হোরি' চলবে তার মধ্যে একপাশে কর্ত্রী-পক্ষের দাক্ষিণ্যে আমার আধুনিক বাংলা গান।

এরই মধ্যে আমায় জব্দ করতে রাইচাঁদবাবু, নৃপেনবাবু আমায় প্রোগ্রাম দিয়েছেন আধুনিক গান, গজল নয়, ঠুংরী নয়। সবাই ভেবেছেন যে, এ ছোকরার ডাঁট ভাঙবো আজ।

কিন্তু দুষ্টু মী বুদ্ধি আমারও খেলে গেল মগজে। নিরালায় বসে একখানা স্পেশাল গান রচনা করে ফেললাম। যথা সময়, এই সব ক্লাসিক গাইয়েদের মাঝে পড়ে ধরে দিলাম শ্যামাসংগীত—

ভারী ভুল করেছি শ্যামা জপতে গিয়ে তোরে কালী,
আজি এ হোলির দিনে কি দিয়ে রাঙিয়ে দিবি মুণ্ডমালী!

এতবড় হোলির প্রোগ্রামের মাঝে হঠাৎ এরকমের একখানা বাংলা গান সব শ্রোতাদেরই মন আকর্ষণ করলো। 'আত্মশক্তি' কাগজে হেডলাইনে তুলে ধরলো এই প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আমার নাম, আমার সাহসের পরিচয়!

হোলির দিন রাতে আমাদের প্রোগ্রামের পর সারা রেডিও স্টেশনের স্টাফেদের নিয়ে নৃপেনবাবু চলেন নাট্যমন্দিরে। শিশিরদার কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। ওদের হচ্ছে বসন্ত লীলা।

স্টেজের উপর প্রথম বসলো জলসা।

বাজান রাইচাঁদ বড়াল আর ছোটে খাঁ সাহেব, তবলা আর সারেঙ্গী। স্টেজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন আমাদের নলিনী দা!

গান-বাজনার আসর শেষ হতেই শুরু হলো বসন্ত লীলা। কৃষ্ণচন্দ্র দের মাইকেল মধুসূদন দত্তরচিত 'বন অতি-রমিত হইল, ফুল ফুটনে' গান দিয়ে।

সারা স্টেজ ফাগে ভরে যায়। কুঙ্কুমের গোলা নিয়ে স্টেজের রঙ্গিনীরা ছুঁড়ে মারে অডিটোরিয়মের দর্শকবৃন্দকে। দর্শকবৃন্দেরাও এসেন্স মাখানো আবীর কুঙ্কুম ছুঁড়ে দেন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। এ এক পরম সুন্দর হোলি, সবাই সবাইকে রঙ দেয়। বাসন্তী রঙের উড়নি উড়িয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আবার গেয়ে ওঠেন—

আরে সে মোহন যমুনা কূল
আরে সে কেলি কদম্ব মূল
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল
আরে সে মধুর যামিনী! (বলরাম দাস)

পিচকারী নিয়ে একটি পুরুষ অভিনেতা একটি মেয়ের আঁচল ধরে রঙ দিতে ছোটে। ঘোমটার জালিকা টেনে মেয়েটি (শেফালিকা-পুতুল) গেয়ে উঠে—

বধূ রং দিওনা গায়,
নীল শাড়ি মোর ভিজিও নাকো, ধরছি তোমার পায়।

গানটি লিখেছিলেন হেমেনদা অর্থাৎ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

এমনি করে জমে ওঠে হোলির আসর। সে আসর ভাঙতে রাত বারটা বেজে গেল। হোলির এই নিছক নিষ্পাপ উৎসবের জন্যে সারাজীবন হাঁকপাক করেছি, কিন্তু শিশিরদার প্রতিবৎসরের এই শিল্পনিদর্শন অতুলনীয় হয়েই রয়ে গেল।

রাত্রে বাড়ি ফিরে বিছানা নিয়েছি।

মনে পড়লো লাল পলাশের চূড়াগুলো পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন লাল পথরেখা টেনেছে। মনে পড়লো কণার চিঠি। চিঠিখানা বার করে আবার পড়ি!

রেডিও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তখন।

বাড়ির দুই একটি কুমারীও গানের আসরে যোগ দিয়েছেন। এঁদের আসর বসতো রবিবার সন্ধ্যায়। বাড়ির গার্জেনদের সঙ্গে এসে গান করে বাড়ি ফিরে যেতেন এঁরা।

স্টাফদের প্রায় সবারই ছুটি, তাই নৃপেনবাবু এই আসরটির ভার সম্পূর্ণ আমার হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। কুমারীদের সঙ্গে কখনো কখনো বাজাতেন শ্রীরাইচাঁদ বড়াল—আর অরগানে আমায় থাকতে হতো।

ক্রমে এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো ঘনিষ্ঠভাবে। কখনো কখনো আমায় নিয়ে এঁদের ভজন ডুয়েট ইত্যাদি গানও পরিবেশিত হতো।

মনসিজ অতনুও এঁদের নিয়ে কম খেলা খেলতে ত্রুটি করেন নি, কিন্তু প্রকাশ্যে সবাই সজাগ থাকায় কোনো দিনই কোনক্রমেও রেডিও স্টেশনে কোনো বদনামের ভাগী হয়নি।

এদের মধ্যে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা ছিলেন মিস্ চ্যাটার্জি। ফুলের মতো শুভ্র আর সুন্দর। এঁর অকাল মৃত্যুতে রেডিও বহুবারই এঁর স্মৃতি-বাসর রচনা করেছে। এঁর বাবা ছিলেন অমায়িক ভদ্রলোক। কন্যার শোকে বহুদিনই দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কারণ তাঁর ওই একটি মাত্রই কন্যা। আর আছে এক পুত্র। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মিস্ চ্যাটার্জি এক-আধটি রেকর্ডও করে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন তাঁর গুরু।

পারিবারিক সংঘর্ষে কণার দুর্ধর্ষ একাগ্রতার বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল যতই, ততই গড়ে উঠছিল এই শুভ্র-কুমারীর অপরিসীম শান্ত মূক প্রীতির সম্ভারে। অবশেষে একদিন তার বাড়িতে আমার আমন্ত্রণ হলো। গান শেখার অজুহাতে গড়ে উঠলো, বিরহের ভাঙা নদীর অপর পাড়। অতল জলধি থেকে চড়া উঠে এ কূল তৈরী হয়েছিল তাই ধস্ নামেনি কারো কাছেই। সে ছিল যতদূর অপ্রকাশ তার নিজের কাছে, ততদূর আমারও কাছে।

কিন্তু দুজনেই জানতাম।

মিস্ চ্যাটার্জি আমার বাড়িতে ঘরের মেয়ের মতো এসে আমার মা, বোন, বৌদির মন হরণ করেছিল। সামাজিকতার আড়াল থাকায় সবার মনের ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গিয়েছিল, শুধু জাগ্রত ছিল তার আর আমার মাঝে।

তার বাড়িতেও আমার নিমন্ত্রণ হতো প্রায়ই। যথাযথ অদৃশ্য হাতের সেবা ঝরে পড়তো কোথা থেকে, সে আমি বুঝতাম। আমার চাঞ্চল্যে সে স্থির থেকে প্রবোধ দিয়েছে!

একান্ত করে জীবনে যাকে নিয়েছিল তাকে না পেয়েই বোধকরি অকালে ঝরে পড়েছিল সে।

মৃত্যুর দিনে ওর বাবা বার বার রেডিও স্টেশনে, আমার বাড়িতে এসে, আমার খবর করেছেন—

ও ডাকছে আমায়, শেষ দেখা দেখবে।

আমি লুকিয়ে বসে ছিলাম, তবু যাই নি।

ভেবেছিলাম, যা সবার অগোচর, তাকে মৃত্যুক্ষণে গোচরে আর আনতে চাই না।

ওর বাবা আমায় সেদিন অভিশাপ দিয়েছিলেন। আমি জানতাম এ পরিচয়ে ওর শুভ্র নামে কলঙ্ক লেপে যাবে, তাই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি।

মৃত্যুর পাঁচবছর পরে আমি বোম্বাইয়ে বসে ওর ছোট ভাইয়ের চিঠি পাই। সে লিখেছিল—

আমি জানি দীর্ঘ পাঁচবছর আপনি কি অসহ্য বেদনা বুকে চেপে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে অন্তত আমার কাছে এসেও আপনি আমাদের উভয়ের অশ্রু একত্রে মেশাবার সুযোগ দেবেন। কিন্তু আপনার দিক থেকে কোনো সারা না পেয়ে এক নিদারুণ অভিমান এসে আমার মনকে আচ্ছন্ন করলো। ভাবলাম যার জন্যে আপনার উপর এত জোর, সেই যখন চলে গেছে তখন কি জন্যে আপনার আশা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠতো, গুমরে গুমরে কেঁদে বলতো—ওরে, কেমন করে তুই তার ভালবাসার ধনকে এমন করে অবহেলা করছিস্!

কিসের তোর অভিমান?

কই সে তো এক দিনের জন্যে এমন অভিমান বা অনুযোগ করেনি। শুধুই ভালবেসেছে, তবে?

আপনি যে কি গভীরভাবে আমাদের দুজনের মনে রেখাপাত করেছিলেন তা আপনি নিজেই জানেন না।

সে চলে গেছে আজ পাঁচবছর হতে চললো কিন্তু এই দীর্ঘ দিন আমি কাঁদতে পারিনি। আমি জানি যদি প্রাণভরে কাঁদতে পারি খানিকটা তাহলে বোধ হয় কতকটা হালকা হই। কিন্তু কাঁদতে আমি পারি না।

আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল যে খানিকক্ষণ যদি আপনার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারতাম তাহলে এ কষ্টের বোধ হয় কতকটা উপশম হতো; কারণ আপনি তাকে ভালবাসতেন।

এখনও বাসেন কিনা জানি না কিন্তু শপথ করে বলতে পারি, যদি পরলোক বলে কিছু থাকে তবে সে সেখান থেকেও বসে আপনাকে তেমনি ভালবাসে।

কে বলে আপনার আশীর্বাদের ক্ষমতা নেই। আপনার আশীর্বাদই আমার কাম্য—

ইতি আপনার—

শিল্পী জীবনের বেদনাতুর ইতিহাস শুনতে শুনতে বাবার বন্ধুর চোখদুটো চিক্‌চিক্ করে ওঠে। আমি বলি,—সমুদ্রসৈকতের বেলাভূমিই হচ্ছে শিল্পীর মন। লীলায়িত তরঙ্গের আছাড়ি-পিছাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে সফেন আবার পরক্ষণেই ধূধূ বালুরাশি। জলের অবলেশ পর্যন্ত থাকে না। অথচ খনন করলে হয়তো পাওয়া যায় ফল্গুর অবলুপ্ত খরস্রোত।

যারাই জীবনের স্রোতধারায় এসে মিশেছিল ঘটনাচক্রে তাদেরই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছি ক্ষণে ক্ষণে, কিন্তু যাকে পেলে জীবনের পূর্ণ প্রশান্তি হয়তো পেতাম সে মিলালো মরীচিকার মতো সুদূরে।

কর্মময় জীবনের ব্যস্ত জীবনযাত্রার অবকাশে সে দাঁড়াতো মূর্তি ধরে, তাই জীবনান্ত প্রলোভনকে জয় করতে পেরেছিলাম।

রেকর্ডিংএর দু'মাস হয়নি তখনও, দশরথ এসে উপস্থিত হয়েছে একদিন সকালে। চিঠি দিল। পড়ে বুঝলাম ইলেক্‌ট্রিক্যাল রেকর্ডিংএর দৌলতে এবার সেশন বসবে দু-একদিনের মধ্যেই, সেই কথাই ভট্‌চাজ্জি মশাই জানিয়েছেন। আমাকে নিয়ে বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন, তিনি নাকি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

যথাসময়ে ভট্‌চাজ্জিমশায়ের সঙ্গে দেখা করি তাঁর বাড়িতেই। শুনলাম গ্রামোফোন অফিস উঠে যাচ্ছে দমদমায়, নতুন ভবনে। সেইখানেই হবে রেকর্ডিং তবে রিহার্সল হবে বিষ্ণু-ভবনেই।

কুপার সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। সাহেব বললেন,—কিছু ভ্যারাইটি আপনার কাছ থেকে আমি আশা করি! মিঃ মজুমদার আপনার সম্বন্ধে আমায় জানিয়েছেন।

আমি সোৎসাহে বলি,—এখানকার বাংলা গানে থাকে হারমোনিয়াম আর তবলা! আমার মনে হয় এতে যদি অর্কেস্ট্রা যোগ দেওয়া হয় তো গানগুলো আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

মিঃ কুপার এক মুহূর্ত আমার মুখের পানে চেয়ে থাকেন; বলেন,—ভারতে অর্কেস্ট্রা বলে কোন জিনিসের আইডিয়া আছে? আজ পর্যন্ত ভারতের রেকর্ডিং এ অর্কেস্ট্রা হয়ে ওঠেনি তার কারণ এ দেশেরই অজ্ঞতা. অর্কেস্ট্রা সম্বন্ধে এদের কোনই ধারণা নেই সে আমি কথা কয়ে দেখেছি।

ইংরেজী পেগন মিউজিকের রেকর্ডখানা হাতে তুলে দিয়ে বলেন,—একে বাংলা করে দিতে পারেন?

আমি রাজী হয়ে তখনি শুনতে বসি। ওতে একটি যন্ত্র বাজছে, কি যে সেটি বুঝে উঠতে পারছি না, তবে ভারী মিষ্টি লাগছে।

মিঃ কুপার বলেন,—ওর নাম হাউইয়ান গিটার।

১৯২৯ সালের রেকর্ডিং সেশনে আমার উপর ভার পড়লো প্রায় চল্লিশখানা টাইটেল। বিখ্যাত 'শেফালি তোমার আঁচলখানি' গানখানি হলো ভারতের প্রথম অর্কেস্ট্রাল রেকর্ড। প্রভাতে আশ্রম দৃশ্য, বর্ষার গান, কালবৈশাখী ঝড়ের গান: হলো অর্কেস্ট্রা ও শব্দযোজনা (acoustic) যুক্ত রেকর্ড, ভজন ডুয়েট আর ছোট ছেলেদের নার্সারি রেকর্ড হলো ভ্যারাইটির পর্যায়।

সবগুলির লেখা, সুর, অর্কেস্ট্রা আমারই উপর ন্যস্ত হলো। প্রযোজনা, গায়ক, অন্যান্য গায়ক-গায়িকার সংকলন সবই আমার দায়িত্বে।

রেডিওতে, শিয়ালদহের 'অর্ফিক ক্লাব' ঐক্যতান বাজাতে এসেছিল। ওদের নিয়ে গড়ে তোলা হলো অর্কেস্ট্রা পার্টি। তার প্রমুখ ছিলেন তারক দে. সুরেন পাল প্রভৃতি মহোদয়গণ। তাঁদের ক্লাবে বসেই রিহার্সল চলে।

এদিকে প্রফেসর বিমল দাশগুপ্তের ছোট বোন সুধীরাকে নিয়ে নার্সারির প্রথম রেকর্ড রচনায় ব্যস্ত হলাম! অন্যদিকে ঢাকা থেকে এসেছেন প্রখ্যাত হরিমতী। তাঁকে নিয়ে নিজেই ভজন ডুয়েটের জন্যে তৈরী হলাম।

পেগন গানখানিকেও বাংলায় অনুরূপ করে গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। তারকবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মেসার্স বিভান কোম্পানি থেকে গিটারের ছবি ও গিটার শিক্ষার বই সংগ্রহ করা হলো। কিন্তু ভারতে ও-যন্ত্র কেউ বাজায় না বলে, এর আমদানী বিভান কোম্পানি করেন না, কাজেই পাওয়া গেল না। কুপার সাহেব পরামর্শ দিলেন auction sale থেকে কেনবার। ফিরিঙ্গী চোরা বাজার থেকে শেষে একখানি পুরনো গিটার পেলাম। একেই মেজে ঘষে বইয়ের পাঠ অনুযায়ী শ্রীমান তারক দে-কে দিয়ে গিটার বাজাবার প্রয়াসান্তে রিহার্সল এগিয়ে চললো। ভারতে গিটার যন্ত্রটির এই সর্বপ্রথম প্রচলন শুরু হলো।

ভট্চাজ্জিমশাই এর উপর ডেকে বলেন—আপনার নিজের সোলো (solo) রেকর্ড করে দিতে হবে। উঠে পড়ে লেগে গেলাম। সেই দিনই ঠিক হলো সুধীরার গান ছাড়াও নার্সারি রেকর্ডে 'মধুসূদন দাদা' পালা তোলা হবার। এ পালার লেখক, সুরযোজক, প্রযোজনা সবই আমায় করতে হবে। আমি হাবুলদা আর ধীরেনদাসকে সঙ্গে নিয়ে কিছুটা রেহাই পাই। পূজনীয় সুরকার ভূতনাথ দাস মহাশয় আমায় সহানুভূতি জানাতে দুখানি গানে সুর করে দিলেন, ধীরেনও দিল একখানির সুর।

রেকর্ডিংএ ঢাকা ইউনিটের অধ্যক্ষ হচ্ছেন শ্রীযুত হেম গুহ। অতি সজ্জন ও অমায়িক। ঢাকা ইউনিটের জন্যে ঝড় বাদলের গান আর প্রভাতী আশ্রমদৃশ্যের মহলা চলেছে। কর্মকর্তা আমি ব্যতীত সঙ্গে আছেন বিখ্যাত তবলা বাদক শ্রীগৌর বসাক। গৌরদার হাত রেকর্ডিংএর উপযোগী। এত সুন্দর তবলায় রেকর্ড পারদর্শী কেউ ছিলেন না। গ্রামোফোনের প্রায় সব টাইটেলেই তিনি বাজাতেন আর বাজাতেন রাসবিহারীবাবু।

১৯২৯ সালে বাংলায়, তথা ভারতে, রেকর্ড জগতের এক ঐতিহাসিক বছর। সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রা সংযোগে বেরুলো,—'শেফালি তোমার আচলখানি' গান আর ওর উল্টোদিকে 'চৈতী হাওয়ায় কে দিলরে দোল' 'সিমফনিক্যাল রিফ্রেন' সংবলিত। গেয়েছিলেন মিস্ লাইট (তারকবালা)। শিশুদের সর্বপ্রথম নার্সারি রেকর্ডে বেরুলো 'ওলো বকুল ফুল' আর 'শেফালি ও শেফালি' গেয়েছিলেন সুধীরা দাশগুপ্তা। শেফালি ও শেফালি রচনা করেছিলেন আমার পরম বন্ধু ইউএর ছোট ভাই শ্রীযুত পরিতোষ বসু। অধুনা সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ইস্টার্ণ টকিজ দক্ষিণেশ্বর।

এই বছরের পূজায় বার হলো শিশু নার্সারি রেকর্ডে 'মধুসূদন দাদা পালা। এতে অভিনয় করেছিলেন,—জটিলের ভূমিকায় শ্রীমতী সরস্বতী (ফকা), কৃষ্ণের ভূমিকায় মিস্ লাইট ও শ্রীমতী নবতারা প্রভৃতি নাট্যালয়ের বিশিষ্ট অভিনেত্রীরা ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (ছাবুলদা)।

ঢাকা ইউনিটের বার হলো বাদলের গান (অর্কেস্ট্রা ও শব্দ-নিয়োগ), কাল বোশেখীর গান (সিমফনিক্যাল ও শব্দ নিয়োগ), শ্রীমতী হরিমতীর সঙ্গে আমার ভজন ডুয়েট। হঠাৎ সারা দেশের শ্রোতাদের মনে, আন্দোলন জাগলো। গান দুখানি হচ্ছে 'সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম জপ মন' ও 'মন আসল ফাঁকিরে'।

গ্রামোফোন কোম্পানির চারিপাশ ঘিরে নতুনত্বের ঢেউ খেলে গেল। কাজীদার বাংলা গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' আর আমার 'শেফালি তোমার' গান দুখানি সারা বাংলার ঘরে ঘরে গানের নতুন ধারা এনে দিল।

এই সালে রেকর্ডিং সেশনের রেকর্ডিস্ট ছিলেন জর্জ সাহেব আজ যিনি হিজ মাস্টারস্ ভয়েসের হর্তাকর্তা বিধাতা।

প্রভাতে আশ্রমদৃশ্যের রেকর্ডখানি শুনে একদিন নৃপেন মজুমদার মশাই আমায় বললেন,—রেডিওতে একটা এমনি পবিত্র প্রোগ্রাম ভোরে করলে হয় না। বলার অপেক্ষা মাত্র, উঠে পড়ে লেগে গেলাম।

প্রোগ্রামের আগের রাত্রে সবাই মিলে রেডিও স্টেশনে (১নং গারস্টিন প্লেসে) শুয়ে রইলাম। অর্থাৎ কর্মীরা। ভোর না হতে অর্থাৎ রাত সাড়ে চারটার সময় ঝুলানো মাইকটা জানলা দিয়ে বার করে দিলাম, পাশের চার্চের বাগানের দিকে। জানলার কাছ ঘেঁষে ছিল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। বটগাছের উপর শত শত পাখিদের কিচিমিচি শুরু হলো ভোরের হাওয়ার স্পর্শে!

আমাদের প্রোগ্রামও শুরু হয়ে গেল পাখির কাকলী আর নহবতের সুললিত তানে। তারপর স্তোত্রের পর স্তোত্র উচ্চারিত হতে লাগলো। টালার জমিদারদেব বাড়ি থেকে একটা মিউজিক বক্স আনিয়েছিলাম—তাতে প্যারি থেকে তৈরি করা স্টিলের রেকর্ডে সংগীত বাজে। ভৈরবী, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি কয়েকটি ভারতীয় রাগিণীর রেকর্ড এঁরা স্বরলিপি পাঠিয়ে কাটিয়ে এনেছিলেন। কাঁটার মতো বার হয়ে থাকে তার রেকর্ডিং। এর উপর দিয়ে একটা রোলার চলে যায় ধীরে। যে কাঁটাটি রোলারের নীচে থেকে ছাড়া পায়, সে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠে তা থেকে সুর বার করে। এই অদ্ভুত যন্ত্রটি সেদিন প্রভাতী আসরে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। গায়িকা ও গায়ক মণ্ডলী চারটা সাড়ে চারটায় উপস্থিত হয়ে, সুরে, গানে, স্তোত্রে সেদিনের প্রভাতকে শ্রোতাদের কাছে সুপ্রভাত করে গড়ে তুলেছিল। শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে ভোরের প্রোগ্রামের একটি করে বাৎসরিক অধিবেশন শুরুর কল্পনা করা হলো।

এরই ফলে প্রতিবছর মহালয়ার দিনে চণ্ডীর অংশ, গানে ও স্তোত্রে শ্রোতাদের সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে।

রেকর্ডের আশ্রমদৃশ্যে অংশ নিয়েছিল সরস্বতী। রেডিওর প্রোগ্রাম শুনে

হঠাৎ আমায় ফোন করে সংবর্ধনা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করলো তার বাড়িতে। বুঝলাম, এ সংবর্ধনা শুধু রেডিও প্রোগ্রামের নয়, এ আনন্দ নিমন্ত্রণ তার নিজের মধুসূদনদাদার জটিলের অভিনয়ের সাফল্যে।

সরস্বতী সুন্দরী, ভদ্র, মিষ্টভাষিণী!

ওর অমায়িক ব্যবহারে ও বহু শিল্পীর মনই আকৃষ্ট করেছিল। তাই ধীরেন থেকে শুরু করে বহু শিল্পীই ওর বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতাম। সবার মুখ দেখে মনে হতো সবাই আকৃষ্ট, কিন্তু সরস্বতী সবাইকে মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট করে বাড়ি পাঠিয়ে দিত। আমার নিমন্ত্রণের দিনে গিয়ে দেখলাম যে নিমন্ত্রিত কেবল আমিই।

গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম জানিয়ে বলেছিল,—আমাদের রেকর্ড খুব ভাল হয়েছে। তারপর গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া, যত্ন-আত্তির এতটুকু ত্রুটি হলো না। ওর কাছে আমার আকৃষ্ট মনের খবর কিন্তু পৌঁছে গিয়েছিল। ও নিজেই আমায় সেদিন বলেছিল,—আপনাকে আমার বড় ভালো লাগে। আপনি তাই আমার বড় প্রিয়। প্রিয়জনকে ভাগাড়ে ঠেলে দিতে চাই না, সেজন্যে আপনাকে আমার সনির্বন্ধ মিনতি যে, এ পথে পা বাড়াবেন না। আমরা যে পঙ্কের পঙ্কজ, তার আকর্ষণে, কাছে এগুলে পদ্মের মধুগন্ধ লোপ পেয়ে পাবেন ঘাঁটা পাঁকের দুর্গন্ধ মাত্র!

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে ছিলাম। সরস্বতী আবার আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে হেসে বলেছিল,—আপনি আমার দাদা হন। তাই বোনকে দেখতে বার বার আসতে হবে, বোনের সেবা-যত্ন নিতে হবে এবং বছর বছর আপনাকে ভাই ফোঁটা দিয়ে, আমার অন্তর আত্মাকে তৃপ্ত করবো। পরবর্তীকালে সে তার কথার মর্যাদা রেখে প্রীতির সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

তখন আমি পোস্ট অফিসে কাজ করি। হঠাৎ দুপুর বেলায় রেডিও স্টেশনে নৃপেনদার আহ্বানে এসে হাজির হলাম। মিঃ স্টেপলটনের কাছে নিয়ে গিয়ে নৃপেনবাবু আমায় 'বেতার নাটুকেদল' খোলার ব্যবস্থাপনা দিলেন।

এই বেতার নাটুকে দলের প্রথম বই হল 'শ্রীরাধার মানভঞ্জন' আমারই লেখা, আমারই সুর। শ্রীমতী বীণাপাণি—রাধা অন্যান্য নায়িকারা, সখিবৃন্দ। আমি শ্রীকৃষ্ণ, ধীরেন দাস—সুবল ইত্যাদি ভূমিকায় যথাক্রমে এই বেতার নটুকে দলের উদ্বোধন করেন।

এরপর হলো আমারই লেখা 'আশমানী' (শব্দ সংবলিত নাটক), ওমর খৈয়াম, ফাগুয়া ইত্যাদি নাটক ও গীতিনাটিকা। শব্দযোজনার জন্যে আমার আপ্রাণ চেষ্টার অনুপ্রেরণায় নৃপেনদা সর্বদা আমায় সাহায্য করতেন। ওমর খৈয়াম গীতিনাট্যটি সম্পূর্ণভাবে ছাপা হয় সে সময় কল্লোলে।

এই সময় কল্লোল-পত্রিকায় শ্রী—দেব বসু মহাশয় হঠাৎ সমাজ বিরোধী সেক্স নিয়ে কী লিখে বসলেন। কঠোর সমালোচনা করেন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীদা। ফলে তু'দলের ঘোরতর বিতণ্ডা গড়ে উঠলো। সে সমস্যার সমাধান করতে তু'দলের বিচারপতি নির্বাচিত হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

যথাক্রমে তুই দলই বোলপুর যাত্রা করলেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়ে গেস্ট হাউসে রেস্ট নিয়ে 'শ্যামলীর' দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। কিন্তু গুরুদেবকে 'শ্যামলী'তে পাওয়া গেল না। শুনলাম সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি ছাতিমতলায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেন। আজও বোধ করি সেইখানেই তিনি গেছেন।

আমাদের কয়েকজন তাঁর অপেক্ষায় ঘরে না বসে ধীরে ধীরে ছাতিমতলায় এসে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, ছাতিমতলায় ধ্যানমগ্ন ঋষি সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে। এ যেন প্রস্তর মূর্তি—বাহ্যজ্ঞান রহিত। শুধু হাওয়ায় তাঁর শ্বেত শ্মশ্রু ও শুভ্র কেশ মৃত্নু মৃত্নু দোল খাচ্ছে। পরনের সিল্কের আংরাখাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু যাকে অবলম্বন করে এগুলি অচেতন হয়েও সচেতন সেই অবলম্বনের আধার সত্যিই যে প্রস্তর মূর্তির মতোই নিশ্চল নিস্তব্ধ তা না দেখলে বোঝা যায় না। আধঘণ্টা কাটতে চলেছে, দাঁড়িয়ে বসে হাঁপিয়ে উঠেছি। কিন্তু যাঁর প্রতীক্ষায় এ উদ্বেগ তাঁর সাড়াশব্দের লেশমাত্র নেই।

মহান ঋষিকে প্রণাম জানালাম অন্তরের সমস্ত আবেগ নিঙড়ে।

তিনি প্রতিনমস্কারান্তে মৃত্নু হেসে বললেন;—কখন এলে তোমরা?

সজনীদা বলেন,—তা আধঘণ্টার উপর।

'শ্যামলী'তে ফিরে বসেছে দায়রার আদালত। তু'পক্ষই হাজির। ফরিয়াদী বাদীকে আক্রমণ না করে করলেন বিচারককে! শ্রী—দেব বসু বললেন,—যে সাহিত্য বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতে ভয় পায়, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়—ইত্যাদি বহুতর যুক্তি।

তর্কাতর্কির মাঝখানে খেই হারিয়ে তিনি উত্তেজিত স্বরে বললেন,—আপনিই তো বিনোদিনীর আঁচল ধরতে প্রথম শিখিয়েছিলেন বাংলাদেশকে! বুঝলাম 'চোখের বালি'র ইঙ্গিত করছেন শ্রীবসু।

গুরুদেব প্রথম নিরুত্তর, ক্রমে তাঁর মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠলো। আত স্নিগ্ধ মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন,—আমি বিনোদিনীর আঁচল ধরতে শিখিয়েছি বটে, তবে তাকে নগ্ন করতে শেখাই নি! সাহিত্যে নগ্নতা পাপ।

উত্তেজিত ফরিয়াদীর মুখে জবাব নিঃশেষিত হলো। হয়তো সেই পরাজয়ই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে তাঁকে আজো উদ্দীপিত করে তোলে।

পবিশেষে প্রতিমা দেবীর মিষ্টি পরিবেশনে সভার সমাপ্তি ঘটে।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু বলেন,—বাঃ, অদ্ভূত কথা! এ শুধু গুরুদেবের মুখেই শোনা যায়।

১৯৩০ সালে বেতার নাটুকে দলে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীব সঙ্গে রেডিওর আর্টিস্ট মিলিত হয়ে পূর্ণ নাটকাভিনয় শুরু হলো। কাজেই দানীবাবু (৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র) থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মিলিত অভিনয় করে যেতেন আমার তত্ত্বাবধানে—বেতার নাটুকে দলে।

ধীরে ধীরে থিয়েটারের প্রত্যেকটি যশস্বী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেব সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলাম। অহীনদা, দুর্গাদা. ভূমেন, ববি রায়, শৈলেন চৌধুরী, সন্তোষ দাস, সন্তোষ সিংহ, প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা যেমন সবাই সমৃদ্ধ করতো এই বেতার নাটুকে দলটিকে, তেমনি সমৃদ্ধ করতো অবৈতনিক যশস্বী শিল্পীবৃন্দ। খালি ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন শিশিরদা।

মাসে দু'দিন করে এই নাটকাভিনয় হতো। চারটি বড় নাটক চারিটি শুক্রবারে আর দুটি গীতিনাট্য পাক্ষিক মঙ্গলবারে। ১৯২৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আমায় এই বেতার নাটুকে দলের নেতৃত্বের ভার বহন করতে হয়েছিল। ১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান ব্রড কাস্টিং কোম্পানি হঠাৎ আই. এস. বি. এস (ইণ্ডিয়ান ব্রড কাস্টিং সার্ভিস) নাম ধারণ করে সরকারের তত্ত্বধানে চলে যায়।

শিল্পীদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে বুঝেছিলাম যে শিল্পীরা চাইতেন তাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে। টাকার চাহিদা সেদিন কারোও মন আজকের দিনের মতো কলুষিত করে নি। তাই আমাদের এই নাটুকেদলের কাজকর্ম ও তার আবেষ্টনীর মাঝে ছিল সকলের সম্প্রীতি এবং সকলের পরস্পরের প্রাণময় আদান-প্রদান। তাই সেদিনের অভিনয় হতো প্রাণবন্ত, যা আজকের দিনে পাওয়া দুর্লভ।

কাগজ কলমের ঘটা অপেক্ষা শিল্পচর্চার মহৎ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেদিনের রেডিও স্টেশন।

১৯৩৪ সালের প্রথমে গ্রামোফন কোম্পানির সংগীত সম্পদ ফলে ফুলে এমনই বিস্তার লাভ করেছিল। সেখানেও ছিল এক অখণ্ড প্রীতির বিনিময়।

মনে পড়ে প্রত্যেকেই স্ব স্ব আত্মপ্রসাদ ছেড়ে যৌথ প্রচেষ্টায় তাকে বড় করার উপায় খুঁজতেন। মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে আমরা তখন গীতিকার, সুরকার ও শিক্ষকের কাজ করেছি অম্লানবদনে। নিজের জন্যে নির্বাচিত গান অনায়াসে অপরের উন্নতির মঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছি অকাতরে।

বেশ মনে পড়ে আমার রচিত ও সুরযোজিত 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে' আর 'আজ আগমনীর আবাহনে' গান দুখানি আমি গাইব বলে যখন প্রস্তুত হচ্ছি, হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে পৌছলেন প্রঃ বিমল দাশগুপ্ত আর শ্রীযুত তুলসী লাহিড়ী মশায়।

কি সমাচার?

বিমলবাবু বলেন,—জানো ভাই, ধীরেন দাসের সমূহ বিপদ। তাকে তোমার সাহায্য করতে হবে।

আমি বললাম,—আমার সাহায্য? নিশ্চয়ই করব, বিশেষ করে ধীরেনকে।

তুলসীবাবু বলেন,—কুপার সাহেব ধীরেনবাবুকে নোটিশ দিয়েছেন যে এইবারেই তার শেষ রেকর্ড হবে কারণ পূর্বের রেকর্ডটি তাঁর মোটেই বিক্রি হয় নি। কাজেই তোমায় দুখানি গান ধীরেনবাবুর জন্যে লিখে দিতে হবে, এবং তার সুর যোজনা তোমাকেই করতে হবে।

আমি রাজী হয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু বিমলবাবু বললেন,—না, তা হবে না, তোমার নিজের প্রস্তুতি গান দুখানি তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে ধীরেন দাসের জন্যে।

আমি বলি,—সে কি রকম?

বিমলবাবু বলেন,—ঐ যে 'শঙ্খে শঙ্খে' আর 'আজ আগমনী' গান দুটি ওকে দিয়েই গাওয়াতে হবে।

আমি বলি,—কি সর্বনাশ! ওযে আমায় চারদিন পরে রেকর্ড করতে বলেছেন ভট্চাজ্জিমশাই!

কিন্তু বিমলবাবু ও তুলসীবাবু ধীরেনের জন্যে আমায় আবার অনুরোধ জানালেন। আমারও মনে হলো এটুকু না করলে বন্ধুত্বের দাম কোথায়? বন্ধুর

যখন ক্ষতি হবে তখন ওটুকু আমার করা কর্তব্য। আমি সে দুখানি গান ধীরেন দাসকে তারপর দিনই তুলিয়ে দিলাম। ধীরেনবাবু তাঁর পূর্ব সুনাম পুনরায় দ্বিগুণ করে ফিরে পেলেন।

এই ছিল তখনকার সম্প্রীতির নমুনা। আজকাল কোনো শিল্পীর মঙ্গল কোনো শিল্পী সহ্য করতে পারেন না, বরং চেষ্টা করেন যে কি করে অপর শিল্পীকে বেইজ্জত করা যায়।

বোম্বাই থাকাকালীন একবার এইচ-এম-ভির বিখ্যাত গাইয়ে মিঃ মিত্র বোম্বাইএ নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় গিয়েছিলেন এবং সব দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে আমারই বাড়ির পাশে আমার ছোট ভাইয়ের মতো মজুমদারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মিত্তিরমশাই, রোজ আমার কাছে এসে তাঁর জীবনের ব্যর্থতার দুঃখ জানাতেন। এমন সময় একটি ছবির সংগীত পরিচালনার ভার আমার হাতে এল। তিনি আমায় তাকে ছবির প্রধান ভূমিকার সমস্ত গানগুলি গাওয়াবার প্রতিশ্রুতি চাইলেন। তাঁর স্বগোষ্ঠী একটি প্রখ্যাত শিল্পী মিঃ মুখোপাধ্যায় সে সময় বোম্বাইতে সংগীত পরিচালক হয়ে গেছেন। নিজের এই উচ্চ প্রতিষ্ঠাতেও তিনি গর্বিত না হয়ে মিত্তিরমশাইয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং তাঁর জন্যে সবাইকে অনুরোধ জানাতেন।

হঠাৎ মজুমদার ভবন থেকে মিত্তিরমশাই উঠে যাচ্ছেন গোরেগাও (বোম্বাই-এর সুবার্ব)! মুখোপাধ্যায় তার নিজের মোটর এনেছেন মিত্তিরমশাইকে লিফ্ট দেবার জন্যে। অমায়িক মুখোপাধ্যায় মিত্তিরমশাই-এর ট্রাঙ্কটি পর্যন্ত বহন করে তিনতলা থেকে একতলা পর্যন্ত নামিয়ে গাড়িতে ভরে নিচ্ছেন। নীচের তলায় গাড়ির কাছে আমি দাঁড়িয়ে। আমি বললাম,—ওহে মুখুজ্জ্যে, আমি একটা ছবিতে সংগীত পরিচালনা করছি। মুখুজ্যে বলে,—দাদা, মিউজিক ডাইরেক্টার হয়েছি, কিন্তু প্লেব্যাক আর্টিস্ট হিসাবে কেউ নিতে চাচ্ছে না, আপনি যদি চান্স দেন।

আমি বলি,—তাই তো তোমায় বলছি, দেখা কোরো।

মুখোপাধ্যায় বলে,—আরও একটা অনুরোধ দাদা, মিত্তিরদাকেও চান্স দেবেন, উনি বড় কষ্টে আছেন। কলকাতার অতবড় নামকরা লোকটা কি সাফারই না করছেন।

আমি মিত্তিরের কাছে বিদায় নিতে উপর তলায় গেলাম। নীচে মুখুজ্যে-মশাই কি সব বাঁধাবাঁধি করছেন। মিত্তির এক ঝোঁকে সেটুকু দেখে নিয়ে বললেন,

—দাদা, মনে থাকবে তো, এ বইয়ের সব গান কিন্তু আমার। আর মুখুজ্যে কি বলছিলো আপনাকে? ওকে যেন ঢোকাবেন না, বুঝলেন না ওরা সব ক্লিক্‌বাজ।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম মিত্র মহাশয়ের কথা শুনে। এত ঈর্ষা, এত নীচ আধুনিক শিল্পীর মন?

আমি উত্তর দিলাম না।

পরে সংগীত পরিচালনার সময় আমি চোদ্দখানি গান সমস্ত মুখুজ্যেকে দিয়ে গাওয়ালাম, মিত্তিরকে সম্পূর্ণ বাদ দিলাম।

মুখুজ্যে দুঃখিত স্বরে বলে,—আমার থেকে দু-চারখানা কেটে না হয় মিত্তিরদাকে দিন না দাদা। আমার এ অনুরোধ রাখুন!

আমি বলি মিত্তিরদার মহানুভবতার কথা।

উত্তরে মুখুজ্যে তবু বলেছিল,—জানি দাদা, উনি আমায় হিংসে করেন। তবু উনি আমাদের শ্রদ্ধেয় তাই ওঁর জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর এই সম্প্রীতি না থাকলে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে না, তাই শিল্পী গোষ্ঠী আজ ব্যহত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা কারো জন্যে কেউ আজ সমব্যথী নন। জগতের সব কর্ম্মগুলোর আছে নিজেদের এ্যাসোসিয়েশন, নেই খালি শিল্পী গোষ্ঠীর।

আমাদেব সময় ছিল, বড় শিল্পীদের, ছোট শিল্পীদের তৈরি করার দায়িত্ব। যাতে নবাগতরা তাদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে তাঁদেরই পদানুসরণ করতে পারে। নিজের ছোট ভাইয়ের মতো তাঁরা এই নবাগতদের বুকে জড়িয়ে নিতেন।

আজ এক শিল্পীর অবমাননায় অপর শিল্পী আনন্দিত হন। মুখে বলেন আহা, কিন্তু পেছনে বলেন, বেশ হয়েছে। আজকের শিল্পলোকের মানদণ্ড হয়েছে টাকা এবং তা উপার্জনের ডিভাইস হয়েছে পলিটিক্স।

আজ প্রকৃত গুণীরা তাই অন্নহারা অথচ এই সব ধাপ্পাবাজ পলিটিসিয়ানরা শিল্প জগতের রথী মহারথী। রূপ বেসাতিরাও এভাবে পয়সা উপার্জন করতে লজ্জা বোধ করতেন কিন্তু আজকে বালাই নেই! রূপবান বা রূপবতীরা স্ব স্ব প্রতিষ্ঠার প্রশংসায় অন্য শিল্পীদের পায়ের তলায় পিষে মারতে চান।

কিন্তু, আমাদের সময় এক শিল্পী অপর শিল্পীর সমাদরে রঙ্গমঞ্চে বেনিফিট নাইট রচনা করতেন। বন্ধু শিল্পীর অবদান গ্রহণটুকু অকুণ্ঠ চিত্তে সবার সামনে স্বীকার করে তাঁকে সম্মানিত করতেন ও নিজের সম্মানও অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

আজ শিল্পী শিল্পীর শিল্পচাতুর্য চুরি করেন।

এ নিদারুণ ব্যথা বহু গুণীকেই পেতে হয়েছে। বহু গানের বহু সুর সৃষ্টি করে তাঁকে অপরের বেদীতে সে সুরগুলিকে বলি দিতে হয়েছে। এই চৌর্যবৃত্তির জ্বালা বহু গুণী মুখ বুজিয়ে সহ্য করে নিজের মনে প্রাণে ঘুন ধরিয়ে বসেছেন সেও আমি জানি। এখন দেখি বহু প্রখ্যাত বাঙালী সংগীত পরিচালকও রবীন্দ্র সংগীতের সুর হুবহু হিন্দী গানে অর্পণ করে নিজেদের কৃতিত্ব কৌশলে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন। এর জন্যে এতটুকু স্বীকৃতি তাঁরা প্রকৃত সুরকারকে জানান না বা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন না—এইটাই আজকালের বাহাদুরী। অপরের চারুকলা চুরি করে নিজেদের জয়ঢাক নিজের স্কন্ধে তুলে নিজেরাই দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বাবার বন্ধু প্রতিবাদ জানান,—টাকা দিয়ে শিল্প ক্রয় করার পদ্ধতি সব দেশেই প্রচলিত আছে তো।

আমি বলি,—তবু সে অর্থ বিনিময়ে, কিন্তু এযে শুধু শিল্পীর শিল্প চাতুর্যে অনর্থ ঘটানো! আজকাল গুরুর কাছ থেকে বিদ্যা আহরণ করে সে গুরুকে চিনতে না পারাই বাহাদুরী বা কৃতিত্ব। তাইতো এরা আজ সবাই নিজের নিজের পকেট সামলাচ্ছেন পাছে পাশের শিল্পী মেরে দেন!

ষোল

এইচ-এম-ভির সেশন বসেছে। নতুন লোকের মধ্যে দেখা পেলাম আপ্তাবউদ্দিন খাঁ সাহেবকে।

ফকির আপ্তাবউদ্দিন খাঁ হচ্ছেন প্রখ্যাত আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সহোদর ভাই—অর্থাৎ বড়দাদা।

আপ্তাউদ্দিন ফকির হলেও অদ্ভুত বাঁশি বাজান। নাক দিয়ে সমানে বাঁশি বাজাতে পারতেন। নিশ্বাসের রেচকের এক টানা শ্বাস রাখা সহজ নয়! যিনি প্রাণায়ামে সিদ্ধ তিনিই পারেন।

এঁর সঙ্গে আলাপ জমালাম। ইচ্ছে, মুসলমানী আউলিয়া ফকির আর বাউল সম্প্রদায়ের সম্বন্ধটা কি তাই জেনে নেওয়া।

গ্রামোফোন ক্লাবের গণ্ডির সীমানা পার হয়ে গিয়ে পৌছলাম তাঁর আস্তানায়। নৈহাটির কাছেই তাঁর আস্তানা। পাড়াগাঁয়ে সবুজ গাছপালা ঘেরা একটি কুটিরেই তিনি পড়ে থাকতেন।

বড় খাতির করেই অতিথি সৎকারে তৎপর হলেন। বরং আমি খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

নারিকেলের মালায় চা পান করে গল্প শুরু হলো। ছোট্ট একটু ঘর, মেঝেয় চেটাই পাতা। একপাশে বৈরাগীদের অঙ্গবাস ঝুলছে। কোণের দিকে দুটো একতারা আব গুপীযন্ত্র। একটা কাঠের তক্তা দেয়ালে দড়ি দিয়ে ঝুলানো, তার উপর রয়েছে সব রকম বাঁশি। সব রকম বলছি এইজন্যে যে সেখানে এমন কি সাপ খেলানো তুম্বুর বাঁশিটিও শোভা পাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম,—ফকির সাহেব, এতগুলো বাঁশি নিয়ে আপনি কি করেন?

হেসে উত্তর দেন,—সব কটাই কাজে লাগে যে তাই ফেল্‌তি পারি না!

আমি বলি,—কেন, আপনি কি সাপও খেলান নাকি?

উনি একটু চুপ করে থেকে বলেন,—না, ওটাতে আলেকের খেলা চলে।

আমি কিছু বুঝলাম না তাই চুপ করে থাকি। কিন্তু 'আলেক'টা কি জিনিস জানবার অসম্ভব কৌতুহল হলো।

ধীরে ধীরে বললাম,—আলেক ? সেটা কি জিনিস ?

উনি হেসে বলেন,—ওসব আপনজন ছাড়া কইতে নাই।

মনে মনে ভাবলাম—বটেই তো আজ এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তো তাঁর আপনজন হয়ে উঠেনি ! তাই অভিমান হলো না বরং চুপ করে রইলাম।

উনি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। পরে বলেন,—আধার ভালো। আপনারে কইতে মনের মানুষ আজ্ঞা দিছেন।

আমি কিছুই বুঝলাম না। শুধু হাঁ করে তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকি।

ফকির সাহেব একটু চুপ করে থেকে শুরু করেন,—কি জানেন বোসজা মশায় আমরা হচ্ছি আউলিয়া সম্প্রদায়। মানে আউল ঠাকুর ছিলেন আমাদের কর্তা। আমাদের ধম্মের নিগূঢ় কথা যারে তারে কওয়া যায় না। আধার দেখে কথা কইতে হয়। অপর ভাবের ভাবুকের সঙ্গে ধম্মচচ্চা করলি হয়, 'প্রত্যব্যয়'। তাই মনের মানুষেরে জিজ্ঞেস করি নিলাম। তিনি সম্মতি গ্যাছেন। তাই বলি—আলেক মানে কি জানেন—'অ-ল-খ' মানে যাঁরে চোক্ষে দেখা যায় না। এই অলখলতা জড়িয়ে আছে আমাদের শিরদাঁড়ার ভিতরকার তিন মা-কে নিয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করি,—তিন মা কি রকম ?

তিনি বলেন,—তিন হচ্ছেন ইড়া মা, পিঙ্গলা মা, আর সুষুম্না-মা, এই তিনটি মায়ে মিলেই বাপেরে চিনিয়ে দেন। কথায় বলে, বলে' গেয়ে ওঠেন—

'তিন মায়েতে জন্ম দেছে, বাপের নাম জানে না'—এই তিন মায়ের খেলাই হচ্ছে আলেকের খেলা।

তিনটি সুর—আগু, মধ্য আর উত্তর। এই তিনটি সুরের একত্র বাঁশিতেই কুণ্ডলিনী সর্পিনী মা আমার নড়ে উঠেন—তাই বাজাতি হয় তুবড়ি বাঁশি, ঐ যারে সাপ খেলানো বাঁশি কইলেন। ওই বাঁশিতে তিন মায়ের জাগরণ। কিন্তু খাড়া হইতি পারেন না।

সাপের শিরদাঁড়া নেতব্যাতে, সিধে খাড়া হয় না, মাটিতে শুয়ে শুয়ে চলে, কিন্তু বাঁশি শুনলি লাগকা করি উঠে দাঁড়ায়, সিধে করে মাথা তোলে। তখন আবার তুম্বুর বাঁশি ছেড়ে বেণু ধরি। আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাবস্থায় বেণু বাজায়ে ছিলেন। এই বেণুতে কুণ্ডলি মা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়ে দুলতি থাকেন —দুলতি দুলতি আরও চেস্তা খেয়ে ওঠে দাঁড়ায়ে মণি পদ্মে মাথা ঠেকান। তাই বেণুতে থাকে চারিটি মাত্র ফুটো, সুরের অব্যক্ত অধ্যায়—স-র, গ-ম। ব্যস খতম।

আমি বলি, আর বাকী সুর ?

উনি উত্তর করেন,—ওইতেই সাত সুরের প্রকাশ ! এই ধরুন, "স ঋ র জ্ঞ গ ম ক্ষ।"

সাত প্রকাশ হলো কিনা ? তাই বেণু লইয়ে সুরের মা সিধে হয়ি দাঁড়িয়ে ওঠেন অথচ সবই রয়ে যাবে অব্যক্ত। সাত প্রকাশ থেকেও অপ্রকাশ কারণ বৈচিত্তির কৈ ? আপনি এই সাতটি সুর নিয়ে কোনো রাগিণী তৈয়ার করতে পারবেন না অথচ আপনাকে সাত গাঁট সুরই ছাড়ি দিলাম। তাই এ হচ্ছি সুরের অব্যক্ত প্রকাশ—তাই শ্রীকৃষ্ণ তেনার অব্যক্ত বাল্যলীলায় এটিকে বাজায়ে ছিলেন।

আমি বলি,—আপনারা শ্রীকৃষ্ণ মানেন ?

তিনি হেসে উত্তর দেন,—মানা না-মানার দরকার কি ? শ্রীকৃষ্ণের বেণুর কথা কইছি ; বেণু, বাঁশি, তুম্বুর সবই তো হচ্ছি হাওয়ার খেলা। এই হাওয়াই তো প্রাণ রাখে আর প্রাণে মারে বোসজা মশায় ! এই হাওয়ার সঞ্চার করে শুষির যন্ত্র মাত্রই। তাই শুষির যন্ত্র বাজালেই প্রাণায়াম করার কাজ সাঙ্গ হয়। বেণু বাজালি তাই চার ফুটায় চারিটি গাঁট সাফ হয়ি যায়। মানে বুঝলেন না, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান আর মণিপুর এই হলো তিন পদ্ম আর শুরুর অর্ধমাত্রা অধিষ্ঠান আর শেষের অর্ধমাত্রা অধিষ্ঠান মিলে চার হলো।

আমি কেমন গুলিয়ে গেলাম। বিস্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

ফকির সাহেব বলেন,—মণিপুর পদ্মের মাথায় মা যখন ঢুঁ মারতি থাকেন তখন আবার ধচ্ছি মুরলী। মুরলী আবার (অব্যক্তের ৪ ফুটো, ব্যক্তের ৩ ফুটো কিংবা অব্যক্তের সাড়ে তিন আর ব্যক্তে সাড়ে তিন—ব্যক্তে অব্যক্তে ৭টি এই সপ্ত সুরে আহ্বান জানায়। কারে আহ্বান জানায় না সারা দেহের ষোল হাজার গোপন নাড়ীদের হাওয়ার সঞ্চারে উদ্দীপ্ত করি তোলে। আপনাদের শ্রীকৃষ্ণ তাই এই মুরলীর ধ্বনি তুলি গোপিনীদের আহ্বান জানাতেন। এই আহ্বানে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ল্যাজের উপর ভর দিয়ে। আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিস্তার করি তখন সেখানে ছোবল মারতি থাকেন। যত ছোবল মারতি থাকেন মানুষ তত ভূত ভবিষ্য বলতি পারে। রোগ ভাল করতি পারে, দশের সেবা করতি পারে। মানে, বিভূতি-ন্যাখে, অজ্ঞানতা ঘুচি গিয়ে জ্ঞানের আলো ন্যাখে।

তখন আবার মুরলীটিকে বদলে নিয়ে শুরু করি বাশরী। এবারও সাতটি ফুটো, সর্পিনী মা তখন চক্র খাড়া করে সহস্রার ভেদ করে দুধ সাগরে অমৃত খাতি থাকেন। একেই আপনারা বলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন। তাই কৃষ্ণঠাকুর শ্রীরাধার সাথেই বাঁশরী বাজাত্যান।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনি। ভাবি গানবাজনার মাঝে এত তথ্য লুকিয়ে থাকে তাতো আজ পর্যন্ত জানা ছিল না।

ঘণ্টা দুই কেটেছে। কি আনতে আমায় বসিয়ে রেখে এক দৌড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ফকির সাহেব। অবসর বুঝে সামনের কুলঙ্গির লাল সালুখানা একটানে সরিয়ে ফেলি। দেখি রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিই তাতে সযত্নে রাখা। নিত্য পূজায় উপচারে তা পরিপূর্ণ। অবাক হয়ে ভাবি মুসলমান ফকিরের আস্তানায় পীরের বদলে রাধা-কৃষ্ণ কোথা হতে এল?

খাঁ সাহেব এসে ঘরে ঢোকেন। বলেন,—নিন মুড়ি নারকেল সেবা করেন!

চমকে উঠি। দেখি উনি হাসছেন।

বলেন,—ভিতর খুলে দেখি নিলেন? তা নিন। এ সব কথা কারেও কইবেন না, 'প্রত্যব্যয়' হবে।

আমি নিঃশব্দে মুড়ি-নারিকেলের সদ্ব্যবহার করতে শুরু করলাম।

তিনি কাঠের সেলপো থেকে গুপী যন্ত্রটি নিলেন তারপর আমারই রচিত এবারের নতুন রেকর্ডের গানখানি আমারই সামনে মহলা দেবার ছলনা করে গেয়ে ওঠেন—

সুদর্শনের চাকের পাকে জড়িয়ে থাকে যে তিন তার।

তারই আড়ে সৃষ্টিরাখা—তিন স্বর্গের তিন দুয়ার॥

থেমে গিয়ে ভাবস্থ হয়ে বলে ওঠেন,—মা আপনারে দিয়ে এই সত্যিটুকু লিখিয়ে নিয়েছেন তাই তো আপনার সাথে মনের মানুষ কথা কইতে সম্মতি দিল। চুপ করে থেকে বলেন,—মূল আধার মূলাধার। এর আড়েই তিনটি নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না এই তিনটি 'তার' বিরাজমানা।

এতেই হচ্ছে সৃষ্টি আবার এতেই হচ্ছে লয়। আর বেণু, মুরলী আর বাঁশরী সব কটি বাজালি তিনটি স্বর্গের দুয়ারে ঘা দেওয়া হয়! কর্তার হুকুমেই বাজাই। বাজাতি বাজাতি আজ্ঞা হলো—রেচক-পূরক-দুই এক

সঙ্গি না করে শুধু রেচকে বাজা। তাই নাক দিয়ে সব নিশ্বাসটুকু উজাড় করি ভিতরটা শূন্য করি দি। পূর্ণ উজাড় না হলি রং আসে না। রং না এলে রসিক হব কেমন করে? তখন রসে ডগোমগো। রস সঞ্চারি হলি —একদিন, দুদিন, তিনদিন, কখনও কখনও সাত দিন কেটে যায়। বাইরের জগতের সন্ধান থাকে না। শুধু অন্তরে অন্তরে চোখ খুলে মায়ের খেলা দেখি।

তা বোসজামশাই আপনার চাকতির ওপর পিঠের গানখানিও মা আপনারে দিয়ে সত্য প্রকাশ করি দ্যাছেন।

আবার গান ধরেন—

ওরে সঙ্গ হারা মন বাউল!

তোর নিঃসঙ্গের অন্তরালে আলেক লতার ফুট্‌লো ফুল।

সেই সুরে আজ সাজলো রাধা উদ্ভাসিত দেব দেউল!

গান থামতে বাশি শুনতে চাইলাম।

তিনি বলেন,—না আজ থাক! দুটো কথা কইছি, বেশ আছি। যদি বাজাতি বাজাতি একবার সটকান দেই, আপনি মুশকিলে পড়ি যাবেন।

বিকেল হয়ে আসছে। উঠি উঠি করছি এমন সময় খাঁ সাহেব বলেন,—রাত আটটার ট্রেনি যদি যান একটা মজার ব্যাপার দেখাতি পারি। এই একটু পরেই এসে যাবেন'খন। তারপর তার সঙ্গি দেখা করে, কথাবার্তা কয়ে যাবেন খনে।

জিজ্ঞেস করলাম,—কি মজা? কে আসবেন!

আপ্তাবউদ্দিন সাহেব বলেন,—রোজই জোট হন। আজও আসি যাতি পারেন। বড় ভাল গলা একখানা গান শুনলেই খুশী হয়ে যাবেন। তবে আপনারেও গাইতে হবে নইলে তিনি গাইবেন না। তিনি বলেন—শুনতি হবে তবে শোনাতি হবে। হা-হা করে হাসেন ফকির সাহেব।

দূরের মাঠটায় সূর্য ঢলে পড়েছে, বাগানের গাছের নীচে দিয়ে তার রেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার দিকে চেয়ে আছি। ভাবছি আমারও এই অবস্থা, এমনি এক আলোছায়ার মায়াজালে আবদ্ধ। কোথাও আলোর ছটা, কোথাও অন্ধকার!

খাঁ-সাহেব বলে ওঠেন,—রোজ পাটে যাবার সময় আমার আস্তানায় এক ঝলক আলো দেন। জীবনে গানবাজনা করার বড় শখ হয়েছিল। নাম করবো বলে মনে উত্তেজনাও উঁকি মেরেছিল। কর্তার ইচ্ছা নয়। ঐ সূয্যি দেবতার মতো এক ঝলক নাম ছড়িয়ে পড়েছিল তারে গুটিয়ে নিতেই এই আস্তানা গড়েছি।

হঠাৎ মুশকিল আসানের মতো এক বিরাট পুরুষ গালভরা দাড়ি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। পরনে ফকিরের আংরাখা, হাতে আঁকাবাঁকা সাপের মত একটা বাঁশের লাঠি। অপর হাতে একটি একতারা। বলে ওঠেন,—খাঁ সাহেবের ঘরে নতুন অতিথি যে।

আমি নমস্কার জানালাম।

আপ্তাবউদ্দিন সাহেব বলেন,—আসুন ফকির সাহেব, আপনার অপেক্ষায় এনারে ধরি রাখছি। আলাপ করিয়ে দি। মস্ত বড় গুণী। আধার ভাল।

ফকির সাহেব আমার মুখের পানে চেয়ে কি যেন দেখলেন।

আমি বলি,—হ্যাঁ, আপনার জন্যেই আমায় ধরে রেখেছেন। বসুন।

তিনি আসন নিলেন।

আপ্তাব সাহেব বলেন,—বড় মিঠে গলা! গান শুনলে আর ছাড়তে চাইবেন না।

ফকির সাহেব আমার দিকে চেয়ে বলেন,—তব্ শুরু কিজিয়ে।

আমি যেন অপ্রস্তুত। তবু একটু স্থির থেকে গলায় সুর আনি।

খুব মনোযোগ দিয়েই গান শুনছিলেন ফকির সাহেব। গান শেষ হলে বলেন—দ্বিশ্রুতির 'সা'-এ জন্মগ্রহণ করেছেন আপনি। অর্থাৎ, শুক্রের ছেলে। আর তার তাল হচ্ছে—অনাঘাত। তাই আপনি স্বভাবকবি, আর দার্শনিক। দ্বিশ্রুতির 'সা'-এ জন্ম নিলে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত মা-কুণ্ডলিনী অবাধে যাতায়াত করতে পারেন। তাই আপনার মন্ত্রানুভূতি স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ আপনি স্বপ্নে মন্ত্র পাবেন। ধর্মকে আপনি না ধরলেও ধর্ম আপনাকে ধরে রাখবে। কাজেই ধর্মালোচনায় আপনি স্বতঃস্ফূর্ত। যাকে বলে না পড়ে বিদ্বান। ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু নিগূঢ় তত্ত্ব আপনার কাছে নিজেই স্বপ্রকাশিত হবে। বহু সূক্ষ্মজ্ঞান ও সূক্ষ্মানুভূতি আপনার আয়ত্তে থাকবে। গান বাজনা, নাটক, চিত্রাদি আপনার করায়ত্ত হবে। শেষ পর্যন্ত আপনি বাড়ি গাড়ি ইত্যাদিরও অধিকারী হলেও ধর্ম আপনাকে অন্তরে প্রকাণ্ড দার্শনিক করে তুলবে, ফলে আপনি হবেন গৃহী সন্ন্যাসী।

শুনতে বেশ লাগছিল। চুপ করে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বলি,—এতো জ্যোতিষ, এর সঙ্গে সংগীতের দ্বিশ্রুতি 'সা'র সম্বন্ধ কি?

তিনি মৃদু হেসে বলেন,—হ্যাঁ। সংগীতই আদি এবং সংগীতই অন্ত। সৃষ্ট জীব জড় সবই সংগীতের বিভিন্ন পরিস্ফূর্তি। তাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সবই এই সংগীতের দান মাত্র। সংগীতজ্ঞ যে, তার কাছে তাই বিশ্বের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

এসব নিয়ে আলোচনা করতে সময় লাগে। তবে জানবেন সংগীতে জ্যোতিষের অংশও কম কিছু নেই। অন্য দিন আবার হবে, এখন গান গাই শুনুন। গাইব আপনাদের ঘরের কবিরই লেখা গান, আমাদের বাউলিয়া নয়—অতুলপ্রসাদবাবুর লেখা। ধীরে ধীরে একতারা বাজিয়ে তিনি গান ধরেন—

"মিছে তুই ভাবিস রে মন,
শুধু গান গেয়ে যা—গান গেয়ে যা,
গান গেয়ে যা অকারণ!"

গান সমাপ্তে বলেন,—গান শুনে গান না শোনালে ঋণী হয়ে থাকতাম, তাই শুনিয়ে দিলাম। এই গান গাওয়াই হচ্ছে জীবের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রে যখন দীক্ষিত হয়েছেন তখন জীবনে আর ভয় কি?

সন্ধ্যে উতরে গেছে। উঠে দাঁড়ালাম। খাঁ সাহেব আর ফকির সাহেবকে প্রণাম জানিয়ে বললাম,—আজ সারাটা দিন কোন্ স্বপ্ন রাজ্যে কাটিয়ে গেলাম কিছুই বুঝতে পারলাম না, তবে এটুকু কেবলি মনে হচ্ছে যে না বুঝলেও এর মধ্যে বোঝার বহু জিনিস আলেখ লতার মতোই অলখ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আবার আসব, সেদিন কিন্তু এই অলখকে লক্ষ্যের মধ্যে এনে দিতে হবে!

আপ্তাবউদ্দিন খাঁ সাহেব হেসে উত্তর দেন,—এইটুকু বুঝিয়ে দেবার ভার আপনার নিজের মনের মানুষের। সে যখন আপনারে আমাদের আখড়ায় টেনে আনি ফেলেছেন তখন ধীরে ধীরে সবই বুঝিয়ে দেবেন।

ট্রেন ছেড়ে দিল। দুটি আউলিয়া ফকির স্টেশনে দাঁড়িয়ে আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। আমি শেষ দৃষ্টি ফেলে বেঞ্চিতে বসে ভাবতে লাগলাম—এ যেন ভিন্ন জগতেই এসে পড়েছিলাম, এ জগতের সবই অজানা, তবু বড় ভাল লাগলো, না বুঝেও ভাল লাগলো!

বাবার বন্ধু বলেন,—আবার কবে নৈহাটি গিয়েছিলে।

আমি বলি,—ওদের কথায় বলতে গেলে—আমার মনের মানুষ আর কোনোদিনই ওখানে যাবার সুযোগ করে দেন নি, তবে তিনি নিজের মধ্যেই সজাগ হয়ে ওঁদের আখড়ার নিগূঢ় তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণ করে দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে আমি সঙ্গীত ও জ্যোতিষ, সঙ্গীত ও আয়ুর্বেদ নিয়ে বহু চর্চাই করেছিলাম।

সতেরো

রেডিও, গ্রামোফোনের মাঝে আমার আরও একটা অদ্ভুত নেশা দিনের পর দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল—সেটি হচ্ছে ম্যাজিক। ম্যাজিক বলতে শুধু যে চুটো তাসের ম্যাজিক বা সামান্য রুমাল, বল ইত্যাদির ম্যাজিক করা, তা নয়, পুরোদস্তুর হোয়াইট্ আর্ট এবং ব্ল্যাক আর্ট (White Art & Black Art)।

বাল্যের এই নেশাটি নতুন করে জেগে উঠলো স্বর্গত মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের সান্নিধ্যে। গিরীন্দ্রবাবুর ভাগ্নীর বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ান রাজা বসুর সঙ্গে। স্বয়ং গিরীন্দ্রবাবুও বরাবর মেডিক্যাল কলেজের রি-ইউনিয়নে ব্ল্যাক আর্ট দেখিয়ে লোককে অভিভূত করতেন।

শ্রীরাজা বসু তখন সারা পৃথিবী ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর যাবতীয় জিনিসপত্তর গিরীন্দ্রবাবুর ভাগ্নী অর্থাৎ ওঁর স্ত্রীর জিম্মার রেখে গিরিডিতে কি সব খনিজ ব্যবসায় মেতে উঠেছেন। গিরীন্দ্রবাবুর ভাগ্নে মিঃ পিক্‌লু রাজাবাবুর এইসব ম্যাজিক অ্যাপারেটস নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছিল। আমিও সেই দলে ভিড়ে গেছিলাম। রাজাবাবুর হোয়াইট্ আর্টসের জিনিসপত্তর ও গিরীন্দ্রবাবুর কাছে শিক্ষা করা ব্ল্যাক আর্ট সংযোগে আমাদের দলের বেশ প্রতিপত্তি গড়ে উঠলো।

হঠাৎ পেলাম হাওড়া টাউন হলে ম্যাজিক দেখাবার আমন্ত্রণ, কি একটা উপলক্ষে। সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে আসছেন শ্রীশরৎচন্দ্র। আমার ব্যক্তিগত আশা যে এই উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের সান্নিধ্য পাবো।

শো আরম্ভ হবার পূর্বক্ষণে শ্রীশরৎচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। আমরা ম্যাজিক শুরু করলাম। হোয়াইট্ আর্ট সমাপন করে ব্ল্যাক আর্ট দেখাতে লাগলাম। স্টেজের সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল; একসঙ্গে হু'দুজন স্টেজ থেকে উবে গেল, হঠাৎ আকাশে তারকা ফেটে একজন বেরিয়ে এল। একজনকে বাঁধনে বেঁধে রাখা হয়েছিল সে তিরোধান করলো, তার বদলে আর একজন বাঁধা পড়েছে ইত্যাদি করে অঘটনগুলি একই সঙ্গে ঘটে গেল।

দর্শকদের আনন্দের সীমা নেই। উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতিতে শ্রীশরৎচন্দ্র আমাদের

কাছে ডেকে পাঠালেন। একে একে পরিচয়ান্তে আমার সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি যে রেডিও ড্রামা চালাই সে খবর পেয়ে তিনি বলে ওঠেন,—পাণিত্রাসে বসে তোমাদের সব নাটকই শুনি। শুধু কি তাই, সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে নাটক শুনতে। সেদিন তোমার মীরাবাঈ নাটকে রানা কুম্ভের ভূমিকা শুনলাম। কখনো কখনো তুমি শিশিরকেও অতিক্রম করে যাচ্ছিলে।

আমি তো অবাক। বুঝলাম কারো সুখ্যাতি করতে গিয়ে শরৎদা হিতাহিত জ্ঞান হারান, নইলে কোথায় শিশিরদা আর কোথায় আমি! যাই হোক আমি যে তাঁর কাছে এভাবে আদৃত হবো ভাবতেও পারিনি, ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে আনন্দের আতিশয্যে ভরে গেল। ক'মিনিটের আলাপের পর বললেন,—এসো না সময় পেলে আমার কাছে। পাণিত্রাসে না যেতে পারো আমি সামনের সপ্তাহে মণির বাড়িতে আসছি, সেখানে তুমি আসতে পারো।

মণি লোকটি কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন,—বেহালার মণি রায়, চেনো না?

আমি বলি,—হ্যাঁ, তিনিও তো প্রায়ই রেডিও স্টেশনে আসেন। আমাদের বিশেষ গুণগ্রাহী। বেশ, নিশ্চয়ই আসবো সেখানে সামনের রবিবার।

এরপর সভা ভেঙ্গে গেল, সবাই চলে এলাম।

শরৎদার সম্বন্ধে আশাতীত ফললাভ হওয়ার পরে থেকেই মনের মধ্যে একটু দুষ্টবুদ্ধি খেলতে লাগলো। ভাবলাম ওঁর লেখা একখানি বইও নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে রেডিওতে প্লে হয়নি। এই সুযোগে যদি সেটি করিয়ে নিতে পারি।

বাড়িতে বসে, পাড়ার থিয়েটার করব বলে তখন 'বৈকুণ্ঠের উইল'খানিকে নাট্যরূপ দেবার চেষ্টা করছিলাম। মাঝের এক সপ্তাহ সময় পেয়ে দিবারাত্র খেটে তাকে প্রায় শেষ করে ফেললাম। ভাবলাম মণি বাবুর বাড়িতে গিয়ে যদি একবার তাঁকে শুনিয়ে নিয়ে মতটা লিখিয়ে নিতে পারি তবেই তো।

যথাসময়ে মণিবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম রবিবার সকালে। মণিবাবুর মেয়েরা আমার গানের অনুরাগিণী ভক্ত। কাজেই মণিবাবু আমাকে যথাযথ খাতির করলেন। এবং আমার মুখে যখন শুনলেন শরৎদা আমায় আসতে বলেছেন তখন অধিকন্তু সুখী হয়ে উঠলেন।

শরৎবাবুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম ভিড় জমবার পূর্বেই। এবার একটু বেশী হবারই কথা কারণ শ্রীশরৎচন্দ্রের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন হচ্ছে। বাংলার রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমস্ত সাহিত্যিকই এই সংবর্ধনায় তাঁদের নিজস্ব রচনার মাধ্যমে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করবেন। টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকেও 'শরৎ-বন্দনা' নামে একটি রচনা সংকলন তাই প্রকাশিত হবে যাতে রবীন্দ্রনাথ হতে শুরু করে বিশিষ্ট সমস্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিকই লিখবেন। এই অভিনন্দন সম্ভারের সমস্ত ব্যবস্থাপনা শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ-স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর আমার কাছে শরৎবাবু রইলেন না—হলেন 'শরৎদা'। দেখলাম এ ডাকে তিনিও বেশ খুশী হলেন।

সব ব্যপার দেখে শুনে, আমার নাট্যাকারে পরিবর্তিত 'বৈকুণ্ঠের উইল' বার করে তাঁর সামনে ধরলাম। তিনি হেসে বললেন,—ব্যাপারটা কি?

আমি বলি,—আপনার 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসটির নাট্যাকৃতি দিয়েছি অভিনয় করবো বলে, তাই অনুমতি অপেক্ষায়।

শরৎদা বলেন,—কবে করবে?

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। হঠাৎ বলে ফেললাম,—টাউন হলের অভিনন্দন দিনে আমরা বেতার নাট্যকে দল করবো 'শরৎ-শর্বরী', কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে। কাজেই সেই রাত্রেই আমরা এটির অভিনয় করতে চাই এবং আপনাকেও একবার সময় করে সেখানে উপস্থিত হতে হবে।

শরৎদা হেসে ফেললেন, বললেন,—বর চাইবার আগেই ঠিক করে এসেছো কি কি বর নেবে! অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দুই-ই চাই?

আমি সে হাসিতে যোগ দিয়ে বললাম,—দেবতা যখন তুষ্ট তখন দুটির জায়গায় তিন চারটে বর চাইলেও দেবতা মুখ ফেরাবেন না তা জানি!

গুড়গুড়িতে টান দিয়ে একটু স্তব্ধ থেকে বললেন,—না বাপু, রাজকন্যে পাবে কিনা জানি না। কারণ সে দিনটা আমি অপরের হাতে পড়ে থাকবো। তারা যেমন প্রোগ্রাম করবে আমায় মেনে চলতে হবে, তাই তোমার বেতারে উপস্থিত হতে পারবো বলে কথা দিচ্ছি না। তবে বৈকুণ্ঠের উইল নাটক নিশ্চয়ই করবে।

আমি বললাম,—তবে এই লেখাটা যে অনুমোদন করে দিতে হবে। তিনি আমার হাত থেকে 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর নাট্য রূপটি নিয়ে লিখে দিলেন,—আমি অনুমতি দিলাম। ইতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমি বললাম,—পড়া হলো না যে!

শরৎদা আমার পিঠে মৃদু আঘাত করে উত্তর দেন,—তোমার অভিনয় চাতুর্য আমায় সত্যিই মুগ্ধ করেছে। তুমি যখন বেতার নাটুকে দলের পরিচালক তখন তোমায় শুধু বৈকুণ্ঠের উইল কেন আমার সমস্ত উপন্যাসগুলিকে নাট্যাকারে পরিবর্তন করার অনুমতি দিলাম। কিন্তু এ অনুমতি আমি তোমায় ব্যক্তিগতভাবে দিলাম।

এর পরে কাগজে লিখে তাঁর অনুমতি পত্র আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কল্যাণীয় শ্রীমান বোস,

তুমি আমার বই থেকে radio-তে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে অভিনয় করতে পারো। কিন্তু এ অনুমতি শুধু তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে দিলাম। শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড—কালীঘাট কলিকাতা। ৩-১১-৩৬

শরৎদার সেদিনের আত্মীয়তা, স্নেহ, ভালবাসা আমার প্রতি অহেতুক শিল্প-বিশ্বাস আমায় অভিভূত করেছিল। ওঁর দুপায়ে মাথা ঠেকিয়ে শুধু প্রণাম জানিয়েছিলাম।

শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশাই ছিলেন আমার গানের গুণগ্রাহী তাই তিনি যথেষ্টই আমায় ভালবাসতেন। আমার সঙ্গীত সাধনাই তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল কারণ নিজেও তিনি শুধু সঙ্গীতজ্ঞ বা সঙ্গীত সমঝদার ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং গায়ক। মৃত্যুর দিনের আগেও তিনি গান গেয়েছেন।

উপেনদা ছিলেন শরৎদার মামা। কাজেই শরৎদা ও আমার কথাবার্তাটুকু হয়ত তাঁর কানে পৌঁছতে দেরি হয় নি। উপেনদার কাছ থেকে আমার ডাক এল। আমি তাঁর ফড়েপুকুরের বাসায় উপস্থিত হলাম।

তিনি বললেন,—শুনলাম শরতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তার ইচ্ছা যে টাউনহল সম্বর্ধনায় তুমি একটি গান করো। তোমার গলা তার বড় ভাল লাগে।

—কি গান করব ?

—পঙ্কজ উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবে। তুমি শেষ সঙ্গীত বিতরণ কোরো।

—তবে গান ঠিক করে দিন।

—গান তুমি নিজেই ঠিক করে নাও। তোমার নিজের লেখা হলেই ভাল কারণ শরৎ তোমার স্বরচিত গানের খুব সুখ্যাতি করছিল।

গান লিখে সুর করে যথা সময় উপেনদাকে শুনিয়ে এলাম। গানখানি স্বরলিপি সমেত উপেনদা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে টাউনহলের নিমন্ত্রণ পত্র হাতে তুলে দেন। বলেন,—ঠিক সময় উপস্থিত থেকো।

টাউনহলে যথাসময় উপস্থিত হলাম। উপেনদার কানে কানে বললাম, —আজ রেডিওতে শরৎ-শর্বরী অনুষ্ঠান রচনা করেছি কাজেই শেষ গান না করে মাঝেই গাইয়ে দেবেন। রাত আটটায় আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হবার কথা। আরও বললাম যে টাউনহলের ফাংশন শেষ হলে শরৎদাকে নিয়ে একবার কয়েক মিনিটের জন্যেও রেডিও স্টেশনে উপস্থিত হতে।

শরৎদা এসে উপস্থিত হলেন।

জোড়া শঙ্খ-নিনাদ উঠলো। সহস্র জনমণ্ডলীর হর্ষ-ধ্বনির মাঝে টাউনহলে তিনি প্রবেশ করেন।

উপেনদা ছুটে এসে বলেন,—তোমায় উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইতে হবে, পঙ্কজ আসেনি।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমায় টেনে নিয়ে ডাইয়াসে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এনাউন্স করে দিলেন। সামনে টেবিলের উপর হারমনিয়াম রাখা। নিজে বাজিয়ে গান ধরলাম—

শরৎ আলো, প্রাণের আলো, এলো- এলো এলোরে—

সমস্ত জনমণ্ডলী স্তব্ধ। শরৎদার মুখখানি একটি অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল, আমি হলাম তৃপ্ত।

আশ্চর্য হলাম। উপেনদা একখানি ছাপা 'শরৎ-বন্দনা' বই আমার হাতে তুলে দিলেন শরৎদাকে দিয়ে। এতেই লিখেছেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক। পাতা উল্টে দেখি শরৎ-বন্দনার শেষ পৃষ্ঠায় আমার লেখা গানখানিও স্থান পেয়েছে। অনেন্দে অধীর হয়ে প্রণাম জানালাম। বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক লেখনীর পুষ্প স্তবকের এ যেন শেষ বন্দনা।

রাত আটটায় বেতার নাটুকে দল বেতার কেন্দ্রে অভিনয় শুরু করেছে—বৈকুণ্ঠের উইল। শ্রীবীরেন ভদ্র—রায় মশাই, ধীরেন দাস—বিনোদ; ভুবনেশ্বরী—নিভাননী, রমা,—বীণাপাণি, আমি—গোকুল ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ, রাত নটার সময় শরৎদা রেডিও স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে বিশিষ্টদের মধ্যে বিশেষ কেউ নেই। উপরে উঠে স্টুডিওতে ঢুকে এসেছেন নৃপেনবাবুর সঙ্গে। আমার কাঁধটি ধরে নিতান্ত অগ্রজের মতো বললেন,—শুধু তুমি মনে কষ্ট পাবে বলে পালিয়ে এসেছি এক মিনিটও থাকতে পারবো না, চললুম।

ফিরে চলেন—এক পা এগিয়ে আবার বলেন,—আজ অভিনয় শোনা হলো না। আর একবার করো। পাণিত্রাসে বসে শুনবো।

চোখ দুটো আমার কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে উঠলো।

এই সহৃদয় বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুটি ধীরে ধীরে অন্তরালে মিলিয়ে গেলেন। আমরা অভিনয় করতে লাগলাম।

গ্রামোফোন কোম্পানিতে গীতিকার ও শিক্ষক হিসাবে কাজীদাই সবপ্রথম আইন-আদালত করে 'রয়্যালটি' আদায় করে নিলেন। ফলে কাজীদাকে সাময়িকভাবে এইচ. এম. ভি. ত্যাগ করতে হলো। কাজীদার কর্মপদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরাও বেচা গান আর কাজ পুনরুদ্ধার করতে না পেরে এইচ. এম. ভি. ত্যাগ করার কঠিন পণ মনে মনে বরণ করে নিলাম।

কাজীদা হঠাৎ একদিন আমাকে আর ধীরেন দাসকে নিয়ে চললেন হ্যারিসন রোডে শ্রীযুত জিতেন ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের কাছে। জিতেনবাবু গ্রামোফোন গিল্ডের মেম্বর। সারা ভারতবর্ষে 'টুইন মার্কা' রেকর্ড সেল্‌সের একচ্ছত্র ব্যবসায়ী। তাঁকে তাই সে সময় রেকর্ড ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'কিং'ই বলা হতো। জিতেনবাবু সদাশয় লোক। ইনি 'মেগাফোন কোম্পানি' নামে একটি রেকর্ডিং কোম্পানি খোলার ব্যবস্থা করেছেন। কাজীদা তাই তাঁরই কাছে আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে আধুনিক মেগাফোন কোম্পানির পিছনের বাড়ির দোতলার ঘরে এক সন্ধ্যায়, মেঝেতে শতরঞ্জি চাদর পাতা শুরু হলো। শতরঞ্জির চারি কোণ ধরলাম, আমি, কাজীদা, ধীরেন দাস আর স্বয়ং জিতেনবাবু। এই হলো মেগাফোনের উদ্বোধন। যার যত নতুন জানা গায়ক-গায়িকা ছিল নিয়ে এসে জড় করা হতে লাগলো। আমি নিয়ে এনে তুললাম আমার

চেনা ম্যাডান কোম্পানির হিরোইন শ্রীমতী কাননকে। ধীরেন দাসও কাকে যেন নিয়ে এলেন। কাজীদার জন্যেও বহু নামী আর্টিস্ট যোগ দিলেন মেগাফোনে।

মেগাফোন কোম্পানির বিশেষত্ব গড়ে উঠতে লাগলো জিতেনবাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে। তাঁর দূরদৃষ্টিটুকু সত্যিই প্রশংসনীয়। সঙ্গীত আসর ছাড়াও তিনি রেকর্ড-নাটকেব বিশিষ্টতায় মনোযোগী হলেন। পূবে প্রহসন, গীতিনাট্য বা ধর্মমূলক নাটিকাই রেকর্ড করা হতো কিন্তু জিতেনবাবু শুরু করলেন সামাজিক নাটক। শ্রীযুত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু কবে বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীর সম্মিলন ঘটালেন। এছাড়া ডাকলেন ওস্তাদ মহলকে—আখতারি বাঈ, ফয়েজ খাঁ সাহেব, ভীষ্মদেববাবু থেকে শুরু কবে গাঁযের স্বভাব শিল্পী, বৈরাগী বৈরাগিনীদের পর্যন্ত।

মেগাফোনের কথা স্মরণ হলে জিতেনবাবুর ভোজন প্রিয়তাব আর অপরকে ভূরিভোজনের ব্যবস্থাপনাব কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া তাঁর সান্নিধ্যে বড় বড় ব্যবসাদার থেকে শুরু কবে সাধু সন্ন্যাসীর পর্যন্ত সমাবেশ হতো। জিতেনবাবু ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে প্রকাণ্ড দার্শনিক ছিলেন। হিন্দু দর্শন, গীতা ইত্যাদিব অশেষ জ্ঞান আহবণ করেছিলেন এবং পুরাণ, বেদান্তের সারাংশটুকু তিনি তাঁর বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করবার দুর্বার চেষ্টা করে গেছেন আজীবন। মাঝে দু-চার বছর তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশুনা হয়নি কারণ তখন আমি কলকাতা ছেড়ে বিদেশে গিয়েছি। তা না হলে আমৃত্যু তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে এইটুকুই আমি বুঝেছিলাম যে শুধু ব্যবসাবুদ্ধিতেই তিনি শিল্পীদের আদর অভ্যর্থনা করতেন না, হৃদয় থেকে তাঁদের সমাদর করতেন। এছাড়া সমাদর করতেন গুণী, জ্ঞানী, সন্ত, সন্ন্যাসীদের।

আমার লেখা. রবীন মজুমদারের গাওয়া, 'আঁধার ঘরের প্রদীপ' 'চলে রাতের রজনীগন্ধা', শ্রীধীরেন মিত্রের গাওয়া 'ঘুমাও ঘুমাও তুমি প্রিয়', 'ওগো প্রিয়ে আমারই তরে' বা 'পূর্ণিমা শ্রাবণী', সিদ্ধেশ্বরের গাওয়া 'বৃন্দাবন পথ যাত্রী' ইত্যাদি গান মেগাফোন কোম্পানির সৌজন্যে আজও জীবিত।

ওঁকে দেখেছি স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দিনের পর দিন বেদান্ত আলোচনা করতে। এঁর সান্নিধ্যে আমিও স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গ পেয়েছিলাম। একবারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে, সেটা যদিও শিল্পলোকের কথা নয় তবু আপনাকে না বলে থাকতে পারছি না।

আঠারো

স্বামীজীর একটা অবিস্মরণীয় কথা। সেটি এতোই অবিশ্বাস্য যে নিজে চোখে না দেখলে কাউকে গল্প বলে বিশ্বাস করানো খুবই কঠিন। একবার স্বামী অভেদানন্দের পিঠে কার্বাঙ্কল হয়েছিল। জিতেনবাবু স্বামীজীকে সেটির অপারেশনের জন্যে পেড়াপীড়ি করেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে রাজী করিয়ে ছাড়েন। স্বামীজীর শর্ত হলো যে তিনি হাসপাতালে যাবেন না, নার্সিংহোমে যাবেন না, ডাক্তারের চেম্বারে যাবেন না, তা সত্ত্বেও যদি অপারেশন সম্ভব হয় করাতে পারেন। অথচ তাঁর আশ্রমেও এটি সম্ভব নয়।

জিতেনবাবু বললেন,—বেশ, আমার এই হলঘরে আপনার অপারেশন হবে। ডাক্তার-টাক্তারের ব্যবস্থা আমার। খালি বলুন কবে আপনি অপারেশনের জন্যে তৈরী হতে পারবেন। কাল, পরশু?

স্বামীজী হেসে বললেন,—তাহলে তুমি দেখছি অপারেশন না করিয়ে ছাড়বে না! বেশ, পরশুই আমি প্রস্তুত হয়ে আসবো।

জিতেনবাবু বলেন,—কালও আপনাকে একবার আসতে হবে। ডাক্তারবাবু আপনাকে যথারীতি একবার একজামিন করে নেবেন।

কথামত স্বামীজী তার পরদিন দিনের বেলায় এসে হাজির হলেন। ডাক্তারবাবু ভাল করে একজামিন করে বলেন,—এটার প্রায় পাঁচ শো থেকে সাত শো মুখ হয়েছে। কাজেই এখানে এটার অপারেশন না হয়ে, আমার ওখানে হলেই ভাল হতো, কারণ পিঠটাকে চার ফালা করে চিরতে হবে।

স্বামীজী বলেন,—ওটি হবে না বাপু।

জিতেনবাবু বলেন,—না। আমার লোকজন যায় লরী পর্যন্ত যাবে। আপনি আপনার অপারেশন টেবিল থেকে স্টেরিলাইজিং মেসিন পর্যন্ত এনে আমার হলে ফিট্ করুন। তারপর আপনার অ্যাসিস্টাণ্ট নার্স, অ্যানেস্থেসিয়া সব নিয়ে ওঁর অপারেশন কাল সাঙ্গ করুন।

সেই রকমই ঠিক হলো।

পরদিন আমরা সবাই যখন উপস্থিত হলাম, দেখলাম স্বামীজী অফিস ঘরের চেয়ারে বসে জিতেনবাবুর সঙ্গে উপনিষদের এক ব্যাখ্যায় আলোড়ন

তুলেছেন। পাশের ঘরে ডাক্তারবাবু সমস্ত প্রস্তুত করে ডাকতে এলেন। বললেন,—চলুন, উঠুন আমি প্রস্তুত।

স্বামীজী বলেন,—তুমি জ্বালালে ডাক্তার! এই তো বেশ আছি, আবার ওঠাওঠি ভাল লাগে না। তোমার অপারেশন এখানে হয় না?

ডাক্তারবাবু বলেন,—এখানে! পিঠটাকে চার ফালা করতে হবে যে। তার আগে ক্লোরোফর্ম করতে হবে, কাজেই টেবিলে না শুলে—

কথা কেটে স্বামীজী উত্তর করেন,—ও শুতেটুতে পারব না আমি। তুমি বরং তোমার ছুরি নিয়ে এইখানেই চারফালার জায়গায় আটফালা করো। আমি জিতেনের সঙ্গে যখন খুব গল্পে মেতে যাবো তখন তুমি ছুরি চালাতে শুরু করবে। তাহলে আর ওসব ক্লোরোফর্ম-টর্মের দরকার হবে না।

কথা শেষ করেই বলেন,—বুঝলে জিতেন, মানুষ মানুষকে নির্জীব করে চলেছে। অর্থাৎ ভগবান মানুষকে অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষকে অন্তত ত্রিশগুণ চল্লিশগুণ শক্তি, দরকার অপেক্ষা বেশী দিয়েছেন। যেমন ধর এক গৃহস্তের ঘরণী তাঁর নিজের রান্না করে খাওয়ার অধিকার রাখে। তাঁর এই একক শক্তিই তাঁর জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন, অথচ তিনি হয়ত পঞ্চাশজনের রান্না করে প্রতিদিন খাওয়াতে পেরেছেন অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রয়োজনের অধিক পঞ্চাশগুণ শক্তির অধিকারিণী। তার মানে ভগবান তাঁর প্রয়োজনেরও অধিক এই পঞ্চাশগুণ শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ এই শক্তির অপব্যয় করে, নিঃস্ব হয়ে, একক শক্তি অর্থাৎ নিজের রান্নাটুকু করতেই অপারগ হয়ে বলে—ভগবান আমায় এমন শক্তিও দেন নি যে আমি নিজেরটুকুও করে খাই। শক্তির সংরক্ষণ করলে শক্তি বেড়েই চলে। প্রথম অবয়বে, পরে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে আসে মনে, তারপর যায় আত্মার অভ্যন্তরে যা নিয়ে যায় পরমাত্মার সন্ধানে।

ডাক্তারবাবু সময় মতো পিঠে ছুরি চালিয়ে দিয়েছেন। পিঠটাকে চার চির করে, চারপাশের চামড়াগুলোকে ক্লিপ দিয়ে আটকে রেখে যেন কুরে কুরে পুঁজগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু, স্বামীজী নির্বিকার।

জিতেনবাবু কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ধমক দিয়ে বলছিলেন,—বুঝলে হে, অন্যমনস্ক হয়ো না। এটা বুঝতে গেলে মনের সংযোগ দরকার, নইলে হালকা মনে এটার গভীরতা বুঝবে না। তাই বলছিলাম, মানুষ নিজের বুদ্ধির দোষেই নিজেকে অসহায় করে তোলে—ইত্যাদি।

ডাক্তারবাবু এবার ব্যাণ্ডেজ শেষ করছেন। বার বার ওঁর বুকে পিঠে হাত

. ঘুরাতে গিয়ে ওঁকে বিরক্ত করে তুলেছেন। স্বামীজী হঠাৎ বলে ওঠেন,—আঃ, কি করছো ডাক্তার! বার বার মুখের সামনে দিয়ে অমন হাত ঘোরাচ্ছ কেন বলতো?

ডাক্তারবাবু বলেন,—ব্যাণ্ডেজ করছি যে।

উনি বলেন,—অপারেশন হয়ে গেল?

ডাক্তারবাবু উত্তর দেন,—আধঘণ্টা ধরে আপনার পিঠের উপর দিয়ে কসরত করলাম আর আপনি কিনা বলছেন অপারেশন হয়েছে কিনা? আশ্চর্য।

স্বামীজী বলেন,—মনটা জিতেনের দিকে ছিল কিনা।

জিতেনবাবু জিজ্ঞাসা করেন,—আপনার লাগে নি? আপনি কি সত্যিই অনুভব করতে পারেন নি!

স্বামীজী বলেন,—হ্যাঁ মনে হচ্ছিল যেন মাঝে মাঝে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। মনটাকে যে সরিয়ে রেখেছিলাম তোমার দিকে। মনের লাগে, দেহের নয়। মনের সংযোগী হলে যার সঙ্গে সংযোগ, সেইখানে বিভোর থাকে। অপরাপর বোধ কমে যায়। তারই নাম যোগ। ভগবানের বা অন্য যে কোন চিন্তায় মন যখন যোগে থাকে তখন অপর সবকিছুই পড়ে থাকে তার বিয়োগাধ্যায়ে। তাই তো মড়ার বোধশক্তি নেই। বলে হাসতে লাগলেন।

ডাক্তারবাবু ওঁর পায়ের ধুলো নেন। জিতেনবাবু উঠে এসে তাই করলেন। তাঁকে অনুগমন করলাম ঘরের আমরা সবাই।

মানুষের সাধনা যে কতদূর উচ্চে যেতে পারে সেদিনই তার চাক্ষুষ প্রমাণ ও পরিচয় পেলাম।

সবার দিকে প্রীতিদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে স্বামীজী আবার বলেন,—যোগসাধনা বড় সোজা হে! পূর্ণ মনঃসংযোগ করলেই মানুষ যোগী হয়ে ওঠে। আর তুমিই বল ডাক্তার—খাওয়া, নাওয়া, শোয়া, বসা, চলা ছাড়া মানুষ স্থূলদেহে কতটুকুই বা থাকে। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে হয়তো তাকে বড় জোর আট ঘণ্টা থাকতে হয় স্থূলদেহে, বাকী বার ঘণ্টা তো থাকে সূক্ষ্মদেহেই। মনের সূক্ষ্মদেহের অবস্থানের নামই হলো যোগ। যেমন আমি ডাক্তার কি করছে টের পেলুম না, তেমনি ডাক্তারও আমি কি বলছিলাম জিতেনকে, টের পায়নি। বলুক ও ঠিক কিনা!

ডাক্তারবাবু অনুমোদন করেন। বলেন,—সত্যিই ওঁর একটা কথাও আমার কানে যায় নি, কারণ পাছে ওঁর বোধশক্তি ফিরে এসে যায়, তাই

তাড়াতাড়ি ব্যস্ততায় নিজের দক্ষতার প্রতিই দৃষ্টি ছিল, কিছুই তাই আমার কানে প্রবেশ করছিল না।

আবিষ্টচিত্তে স্বামিজী বলেছিলেন সেদিন—

সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো
আকুল করিল মনপ্রাণ।

—মন আর প্রাণ দুটিতে যোগ হলেই সব বাস্তবতার সমাধান।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে কথা কইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার সঙ্গে আর কোনো সাধুর সাক্ষাৎ বা সান্নিধ্য ঘটেনি?

আমি বলি,—হুঁ, দু-চারজনের কথা আমার বেশ মনে আছে। কলেজে পড়ার সময় আমরা তিন বন্ধু মিলে হেঁটে একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে ঘোড়ার গাড়ি বা নৌকা ছাড়া দক্ষিণেশ্বরে যাবার অন্য কোনো যানবাহন ছিল না। তাই আমরা হেঁটেই গিয়েছিলাম। যাবার পথে দেয়ালে বহু কাগজের উপর বড় বড় হরফের লেখা পড়লাম—পাগল হরনাথের জন্ম উৎসব উপলক্ষে।

ফেরার পথে এক বাগানবাড়ির চারিধার ঘিরে বহু জনসমাগম দেখলাম। ভিড় ঠেলে বাগানের গেটের মাঝে ঢুকে গেলাম। দেখলাম—হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, শিখ, জৈন এমন কি ইংরেজ পর্যন্ত তাঁর দর্শন অভিলাষে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন অপেক্ষায়। সবাই স্থির, সবাই নির্বাক। নিঃশব্দে একে একে বাগান-বাড়ির হল ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

দূরে কয়েকজন ভক্ত পুরুষ মহিলা মিলে বড় বড় হাণ্ডায় ভোগ রান্না করছেন। আমরা উৎসুক হয়ে এগিয়ে চলি ঘরের দিকে।

দরজার কাছে এসে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি যে একটি গৌরাঙ্গ ভদ্রলোক সোনার গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়াটি দরজার পাশেই রক্ষিত কিন্তু তার জরিজড়ানো নলটি সারা ঘর অতিক্রম করে তাঁর নিকটে পৌঁছেছে।

ভদ্রলোকের পরনে শান্তিপুরের সরু ধুতি, গায়ে আদ্দির লক্ষ্ণৌ ঢঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি। তাতে হীরের বোতাম লাগানো। সারা ঘর গোলাপ জলের গন্ধে ভরপুর।

ভক্তেরা দলে দলে এসে ফুলের রাশি তাঁর পায়ে ঢেলে দিচ্ছেন। সে ফুল

গ্রহণ করার জন্যে তাঁর পা দুখানি সামনেই ছড়ানো, একটি রূপার থালায় সযত্নে রক্ষিত। কেউ কেউ গঙ্গাজল দিয়ে ওঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছেন।

দরজার ধারটিতে উঁকি দিয়ে তিন বন্ধুতে দাঁড়িয়ে। আমাদের দিকে নজর পড়ে যেতে তিনি বললেন—এসো, ভিতরে এসো তোমরা !

আমরা ভিতরে দাঁড়াতেই বললেন,—তোমরা কোথা থেকে আসছো ?

আমরা অকপটে নিজেদের কথা জানালাম।

তিনি বললেন,—কিছু জিজ্ঞাসা করবে ?

দুই বন্ধু বললো,—না।

আমি উত্তর দেই,—একটা প্রশ্ন আছে।

তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে জিজ্ঞেস করলেন,—বল, কি জিজ্ঞাসা।

আমি বললাম,—আপনি সাধু, আপনি সন্ন্যাসী, অথচ এ রাজোচিত পারিপার্শ্বিকী ! কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে !

সমস্ত ভক্ত যেন অগ্নিদৃষ্টি করলেন আমার দিকে।

উনি মৃদু হেসে বলেন,—সত্যিই আশ্চর্য ! তোমরা তো এযুগের ছেলে। গত যুদ্ধে এরোপ্লেন তৈরি হয়েছে জানো ?

আমি বলি,—হ্যাঁ, এক আধটা দেখেছিও !

উনি তেমনি মৃধু হেসে বলেন,—চড়ো নি তো ? চড়লে বুঝতে পারতে যে এরোপ্লেন যখন উপরে উঠে যায় তখন নীচের উঁচু নীচু বাড়িগুলো সব দেশলাইয়ের বাক্স হয়ে ক্রমে সব একাকার হয়ে যায়।

আমার মনে হলো—তৈলঙ্গস্বামী বিষ্ঠা খেয়ে যে সমন্বয়ের প্রমাণ দিয়েছিলেন ইনি কি তা পারেন ?

তিনি আবার বলেন,—কি বিশ্বাস হলো না ? তুমি ভাবছো তৈলঙ্গস্বামী যেমন প্রমাণ দিয়েছিলেন তেমনি কি দিতে পারব ?

আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই।

তিনি আমায় কাছে ডেকে পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন,— এঁরা আমায় যেমন সাজিয়েছেন তেমনি সেজেছি। আমি পাগল মানুষ। কিন্তু এঁরা আমার সে পাগল উলঙ্গ বেশ, হাতে পায়ে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো বাঁধা দেখতে চান না, ধরে এনে তাই এই দেহটাকে রাজা সাজিয়েছেন। অন্তর যার ফকির হয়ে গেছে তার কাছে সাজসজ্জা বহিরাবরণ সবই তুচ্ছ হয়ে গেছে। যে বিধবা স্বামীর জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাঁর আবার কস্তাপাড় আর থান !

আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হইনি, তবু যেন শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে পড়লো। প্রণাম জানালাম তাঁর পায়ে। তিনি আবার আমার মাথায় হাত রেখে বললেন,—ভাল হবে তোমার !

দুই বন্ধু এসে ওঁর পদধূলি নিল।

তার পর বিদায় নিয়েছিলাম।

মন আমার কিছুই মানতে চাইতো না তবু যখনই সাধুদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি তখনই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। জানি না সে তাঁদের গুণে বা নিজের দুর্বলতায়।

সেবার মধুপুরে মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। ভারতী মহারাজ মধুপুরে কুসুমা মৌজায় আশ্রম করেছিলেন। ঐ মৌজায় আমারও একটা বাড়ি ছিল। বাড়িতে বসে বসে শুনতাম যে তিনি ব্যভিচারী। বয়স হবে ষাট পঁয়ষট্টি, বলে বেড়ান একশ দশ ইত্যাদি। পাড়ার কেউ ওঁর আশ্রমের ত্রিসীমা মাড়ায় না।

মা আমার বুড়ী মানুষ। সাধু-সন্ন্যাসীদের খাওয়াতে ভালবাসেন। তাই একাদশী বা কোনো পুণ্যতিথিতে রান্না করে আমার স্ত্রীকে দিয়ে চুপিচুপি পাঠিয়ে দিতেন তাঁর কাছে। ভারতী মহারাজ খুব আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন।

একদিন মালী এসে খবর দিলো—সাধুবাবা আমাকে ডেকেছেন। মাকে জানালাম। মা বললেন,—যে যা বলে বলুক, সাধুজীকে আমি দেখিনি বটে তবে তিনি যে খুব উঁচু স্তরের তা আমার মন বলে।

গিয়ে উপস্থিত হলাম তাঁর কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কি আমায় ডেকেছেন ?

তিনি বললেন,—যার মার হাতের পায়েসান্ন অমৃতের মতো তার ছেলের সঙ্গে আলাপ না করলে অপরাধ হয়ে যাবে।

আমি বৃদ্ধ ভারতী মহারাজের কথায় বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

তিনি বলেন,—আপনাকে আমি তুমিই বলবো, কিছু মনে কোরো না বাবা।

আমি বলি,—বিলক্ষণ! আপনার বয়েস শুনি একশ' পার হয়ে গেছে।

তিনি বলেন,—হ্যাঁ, সেটা বার বছর আগেই পার হয়েছে। সারা হিমালয় ভ্রমণ সারতে সারতেই বুড়ো হয়ে গেলাম, তাই তো মরবার আগে নিরালায় এখানে বসে জিরুচ্ছি।

আমি বলি,—আচ্ছা, এই যে আপনারা সারাজীবন যোগাভ্যাসে কাটালেন এতে লাভ কি হলো? শুনি তো মৃত্যুর প্রাক্কালে নাম স্মরণ না হলে তাকে আবার জন্মাতে হয়—এটা কি সত্যি?

তিনি উত্তর দেন,—তাই তো ভাই আজকাল একটু ভয় হয় পাছে ঐ কাণ্ড না আমার ঘটে। তবে যোগাভ্যাস মানে, অভ্যাস করা থাকলে ফট্ করে নামটুকু মনে পড়ে হয়ত যাবে।

আমি বলি,—মনে পড়ে যাবেই যখন তখন হয়ত কেন?

তিনি কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলেন,—সেটুকু শুধু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তাই তো হয়ত বললাম। ওখানে কোন সাধু-সন্ন্যাসী বা যোগীর হাত নেই। তো ভাবি এত যে পড়লাম, এত যে বুঝলাম, এত যে যোগাভ্যাস করলাম তার ফল কি শেষ পর্যন্ত পুনর্মূষিকো ভব ঘটবে। তাই সর্বদা ভাবি।

আমি বলি,—তুলসীদাসজী বলেছেন, 'বিস্মরণ স্মরণ পহুঁছায়ে—তুলসীশ্রীপতি পায়ে'।

উনি আমায় জড়িয়ে ধরেন। তারপর বলেন,—আমি তোমাকে ডেকেছিলাম তোমার গান শুনতে, কারণ তোমার নাম শুনেছিলাম, এবার গান শুনবো।

নিজে নিজেই হোহো করে হেসে উঠে বলেন,—এখনও তাকে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি। তোমার নাম শুনেছি, গান শুনি নি।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে ওঁকে গান শোনালাম হিন্দী দোঁহা।

গান থামিয়ে বলি,—আচ্ছা মহারাজ, যোগ করলে কি ভূত ভবিষ্য জানা যায়?

তিনি মৃদু হেসে উত্তর দেন,—ভূত ভবিষ্য বলেন জ্যোতিষীরা। আমরা কি আর তা পারি। তবে আমাদের কথা ফলে যায় শুধু যোগাভ্যাসে একানুবর্তী মনের বৈদ্যুতিক আকর্ষণীর জোরে। যাকে বলে—সেল্‌ফ ম্যাগ-নেটিজম্।

আমি বলি—তবে ঈশ্বর কি?

অম্লান বদনে তিনি উত্তর করেন,—ভাষাহীন ভাবানুভূতি। ওর ব্যাখ্যা চলে না।

—সে তো সবারই কিছু কিছু রয়েছে।

—তাই তো সবাই-ই কিছু কিছু পেয়েছে। তাই তো বলে সর্ব ভূতেই তিনি বিদ্যমান।

—তবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর নাম স্মরণের দরকার কোথায়? তিনি তো বিস্মরণেও বিদ্যমান রয়েছেন।

—বিদ্যমান তো বটেই তবে মনের মধ্যে স্মরণ না এলে, মন সংস্কারের বিকারে আচ্ছন্ন হয়। মন নিয়েই তো যত কিছু ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রেম অনুরাগ, ভগবান দর্শন সবই। মন বিশুদ্ধ হয় নামে—সেই নাম মনে না পড়লে মন বিক্ষুব্ধ হয়। বিক্ষুব্ধ মনের মৃত্যু ঘটলে আবার পুনর্জন্ম ঘটে। শান্ত মন নিয়ে মরলে তার হয় নির্বাণ।

তারপর মৃদু হেসে আবার বলেন,—বেদান্তে তাই বলে, তবে না মরে কি করে মরণের পর মনের উপলব্ধির কথাটুকু বলি?

এমনিতর অনেক কথা হলো। আমার কাছে গান সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য অনুশীলন জিজ্ঞাসা করলেন। সব শেষে বললেন,—গানের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভই সবচেয়ে সহজ পথ।

—ভগবান বস্তুকে কেউ কি লাভ করেন? না, নিজেই ভগবান হয়ে যান, যাকে বলে সোঽহং।

—অহঙ্কার উল্টে গেলেই হয় ওঙ্কার। তেমনি সোঽহং উল্টলেই হয় হংস। এই হংসই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রতীক। অর্থাৎ অহম স—অহমটুকু আগে এলেই ঘটে অহমিকা। কিন্তু শেষে যোগ দিলে হয়—সো-হ-হং অর্থাৎ তিনিই আমি। ভাল করে বুঝতে গেলে বলা যায় সর্বত্রই তিনি, কাজেই আমার বিকাশের মূলও তিনি।

এমনিতর কত কথা।

আমি বলি,—ওসব পুঁথিতেও পাওয়া যায়, আমাকে ছুঁয়েটুয়ে কিছু দেখাতে পারেন?

তিনি হেসে বলেন,—কি, ম্যাজিক? ওর আর এক নাম বিভূতিযোগ। যদি প্রাকটিস্ করো তুমিও দেখাতে পারো।

—প্রাক্টিস করলে যোগীও তো হতে পারি কিন্তু আমার অত ধৈর্য নেই। যদি হঠাৎ কিছু পাইয়ে দিতে পারেন তাহলে বুঝবো আপনি প্রকাণ্ড যোগী।

তিনি হোহো করে হেসে ওঠেন। তারপর বলেন,—আমায় পরীক্ষা করতে চাও? কিন্তু আমি পরীক্ষায় পাস করলেও, ফেল হয়েই বসে থাকবো। অর্থাৎ নিজের শৌচ যেমন নিজেই করতে হয়, মেথর দিয়ে পরিষ্কার হয় না তেমনি এসব কাজ নিজে অভ্যাস করলে পরের ছোঁয়াছুঁয়িতে কিছু হয় না। সাময়িক

ভেল্কি দেখালে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আমি দেখেছি তুমি তোমার সঙ্গীত দিয়েই ও পথের পূর্ণ দর্শন পাবে কাজেই আমার ভেল্কি দেখাবার দরকার হবে না, কিম্বা আমার মতো কোনো সাধুরই দরকার হবে না।

—গুরু ছাড়া কি পথ চেনা যায়?

—যারা পথ বানিয়েছে তাদের দেখা পেলেই পথ-যাত্রী অপেক্ষা বেশী জানা যায়। সঙ্গীত হচ্ছে এ পথের নির্মাতা কারণ সে যে ছন্দময়—আর ছন্দই গায়ত্রী, ছন্দই ওঙ্কার আবার ছন্দই পরমেশ্বরের জ্যোতিপ্রকাশ।

—ছন্দের মধ্যে বারমাত্রিক ছন্দই কি সব চেয়ে বড়; না দশমাত্রিক বা আটমাত্রিক?

—সঙ্গীত কি বলে?

—সঙ্গীত বলে বারমাত্রিক ছন্দই শ্রেষ্ঠ ছন্দ।

উনি অন্যমনস্ক হয়ে বলেন,—ঠিক তাই, গায়ত্রী বারমাত্রিক। তারপর কোন ছন্দ বড়?

—দশমাত্রিক, কারণ ঝাঁপতালের রয়েছে বানরী-গতি।

উত্তরে উনি বলেন,—হ্যাঁ মাতৃমন্ত্রের ছন্দ। মা কুণ্ডলিনীর তাই তো বানরী-গতি।

আমি চুপ করে থাকি।

তিনি বলেন,—চুপ করলে কেন? আটমাত্রিকও কম ছন্দ নয়, সেই তো স্বচ্ছন্দ অর্থাৎ গণেশ মন্ত্রের ছন্দ, নিজের ছন্দ। গণ+ঈশ=গণেশ, এই হচ্ছে অতিমানবীয় ছন্দ। এর ডবল করলে হয় রাধার ষোড়শদশী ছন্দ, যা না হলে প্রেম জন্মায় না। এ হচ্ছে অভিনবত্বের প্রতিছন্দ।

ভারতী মহারাজের জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা সেদিন থেকে আমায় বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলে। হোন ব্যভিচারী, হোন ভণ্ড তবু মহাজ্ঞানী তা বুঝতে এতটুকু দেরি হয় না।

আমি উঠে দাঁড়াই। বলি,—আজ উঠি।

—আবার আসবে তো?

—সময় পেলে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। অন্যায় হলে ক্ষমা করে বুঝিয়ে দেবেন?

উনি হাসলেন। বললেন,—বল?

আমি বলি,—তবে এখানে আপনার এত বদনাম কেন?

উত্তর দেন,—বদকাজ করি বলে। মদ খাই, মেয়েদের সঙ্গে মিশি এই তো?'

আমি বলি,—মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে কালো মেয়েকেই বা চিনবো কেমন করে? কি বলেন! মেয়েদের সঙ্গে আমিও মিশি। সত্যি, সত্যি, ওদের সঙ্গে না মিশলে আমি তো ইম্পেটাসই পাই না।

উনি হেসে ওঠেন। বলেন,—ওইটুকু নিয়েই তো বীরাচারীদের শক্তিপূজা। সামনে থাকবে তবু ভোগ করতে পাবে না। পাশে বসে, কাছে বসে, কখনও বা কোলে বসিয়ে শব সাধনা তাঁরা করেন। অথচ সেই অবস্থায় তাঁদের হয়ত লক্ষাধিক জপ সমাধা করতে হয়। শবের উপর বসে সাধনা অথচ সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে জীবন্ত কামনা। চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টিটুকু নিজেই তৈরি করে নিজেকেই এড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় বলেই বীরাচার বলে।

আমি বলি,—হিন্দুধর্মটি যেন কি, যত সব অনাসৃষ্টি!

তিনি বলেন,—হিন্দু ধর্ম বলে কিছু নেই, আছে শুধু হিন্দুদের দর্শন। হিন্দু মুনি-ঋষিরা নিজেদের চোখে, নিজেদের অনুভূতিতে যত পথ দর্শন করে গেছেন সেই দর্শনটুকুই বিশ্লেষণ করে হিন্দুদর্শন তৈরি হয়েছে।

যার যেমন অনুভূতি সে সেইরকম ধর্মজ্ঞ। তাই তো তেত্রিশ কোটি লোকের তেত্রিশ কোটি অনুভূতির রূপ নিল তেত্রিশ কোটি দেবতা। সবাই এক অথচ বিভিন্ন অনুভূতির মূর্তি রূপ ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন। মতবাদও হয়ে পড়েছে আলাদা তবে প্রত্যেকটিই সত্য। তাই, যত মত তত পথ।

—আচ্ছা, এঁরা যদি এতই বোঝেন তবে সব আশ্রম করে বসেন কেন? আশ্রম দেখলেই মনে হয় এ যেন রিটায়ার্ড লাইফের সুখকর আস্তানা গড়েছে, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে।

—ঠিক তাই। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙাই হয়। আস্তানা না রাখলে মতবাদের বংশবৃদ্ধি হয় না। সব মতবাদ সবার গ্রাহ্য বা সহ্য হয় না, তাই বিভিন্ন আশ্রমের প্রয়োজন। যার যেটা সুবিধা বা সুখকর বা সহজসাধ্য পথ, সে তা বেছে নিতে পারে। পরের সম্পদ দিয়ে গড়া আশ্রমগুলি পরের সুখ-সুবিধারই জন্যে ফেলে চলে যাবে। তবে নিজেদের গোষ্ঠী পোষণ মতলব হলে তা অন্যায় সেটা অস্বীকার করার জো নেই। আমার অবস্থা দেখে কি মনে হয় তোমার? বলে হোহো করে হাসতে থাকেন।

আমি বলি,—ভেল্কিবাজী দেখান না কেন?

—ঐ দেখাতে গিয়েই তো এত বদনাম কিনেছি! আশ্রম না গড়ে

হিমালয়ের তুহীন বরফে জমাট হয়ে দেহাবসান ঘটালে বদনাম হতো না। কিন্তু অন্তর দেবতা সাড়া দেয় নি, বরং বলেছিলেন যতটুকু সংসারের জন্যে পারিস্ করে যা, তাই এ আড়ম্বর।

আমি উঠে পড়েছিলাম। পায়ে প্রণাম জানালাম। তিনি আশীর্বাদী হাতে বলেছিলেন,—আচ্ছা এসো। এসো কিন্তু।

এমনি করে বহুবারই ভারতী মহারাজের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। যদি খবর পেয়েছেন যে আমি মধুপুরে এসে পৌঁছেছি অমনি দেখা করার জন্যে খবর এসেছে।

কলকাতার বেণ্টমহাটার কাছে অশোক অ্যাভিনিউতে আর এক সাধুজীর সাক্ষাৎ পাই। উনিও নাকি একশো পার হয়েছেন। ওর কর্মপদ্ধতি ছিল অন্যরকম। লোকের রোগ ভাল করতেন। উনি নাকি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্বচক্ষেই দেখেছেন।

সাধুদের সন্নিকটে গেলেই আমার কেবল মনে হতো ওঁরা সর্বজ্ঞ। তাই কথা বলতাম না। ভাবতাম বলবো কেন, ওঁরা তো সবই জানতে পারছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতাশ হয়েছি। দেখেছি সবাই যেন আজীবন হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

সেবারে কেঁদুলির উৎসবে গিয়েছিলাম নিজের কাজে। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মহন্তের সঙ্গে অনেক কথা হলো, মনে হলো শুধু কথা মাত্র। মেলায় বহু সাধুর সমাগম হয়েছিল। তারাপীঠ থেকে এসেছিলেন এক শ্মশান যোগী। আমি তাঁর প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু সন্ধান করতে গিয়ে পেলাম কেবল বিভূতিযোগের কথা। যা কিছু করেছেন সেই কথাটাই তাঁর শিষ্যবৃন্দেরা ফলাও করে যথেচ্ছা বলে যাচ্ছেন। কখন কখন মাত্রাজ্ঞানও হারাচ্ছিলেন। ভাবতাম—এঁরাই বা শুধু শুধু এত সুখ্যাতি করেন কেন? ভদ্রলোক বামাচারী। বামচারীরা ষোড়শী নিয়ে কাজ করেন। আমায় বলেন,—আমার সঙ্গে শ্মশানে চল না মজা দেখাব!

আমি বলেছিলাম,—কি মজা দেখাবেন? আমিও যে বামাচারী। দিনরাত বামাদের সঙ্গে সঙ্গ আর রঙ্গ করছি তাই মিনিটে মিনিটে কত মজাই না দেখি! কেউ ভালবাসে, কেউ প্রেমে পড়ে, কেউ হাপুস নয়নে কেঁদে পা ভাসায়, কেউ আবার মুখ টিপে হেসে চলে যায়। তাই এতটুকুই বুঝেছি ওদের নিয়ে মজাও যতদূর, মজে যাওয়াও ততদূর। দূর থেকে সীমান্তের চক্রবাল নিকটের কণ্টকবন

ছাড়া যে কিছু নয়। আমি যাইনি বরং পালিয়ে এসেছি। বুঝেছিলাম ওপথ আমার পথ নয়।

এখান থেকে ভাব হয়েছিল এক বোষ্টমীর সঙ্গে। বয়সে যুবতী নন প্রৌঢ়া। তবু সাজালে গোজালে এখনও যুবতীর পর্যায়ে ফেলা চলে।

তাঁর আখড়ায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন! তিনি পরকীয় সহজিয়া পন্থী। এসেছিলেন জয়দেবের মেলায়।

আখড়ায় আরও দুচারটি নবীনা যুবতীকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন। আশ্রমে ঢুকেই তিনি তাঁর সহচরীদের ডেকে, হেসে বলেছিলেন,—কুঞ্জে আজ কৃষ্ণ-ঠাকুরের উদয় হয়েছে! ও ললিতা, ও বিশাখা দেখবি আয়।

থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম।

রসকলি নাকে যুবতীরা ছুটে আসে বোষ্টমীর কৃষ্ণ দেখতে। সবার উৎসুক দৃষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে আমার দৃষ্টি মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছিল। সারাদিন কাটিয়েও আমায় তাঁরা ছুটি দিলেন না,—বললেন, আজ রাতটা থেকে যাও, দেহতত্ত্ব শোনাব। শোনাব আলেকলতার ওঠা নামার খেলার কথা আর নালিশ জানাব আমাদের বংশীধারীর কাছে।

আমি, অতএব সেখানে রাত কাটিয়ে দিলাম। একা কৃষ্ণ—বার, তেরোটি গোপিনীর মাঝে বেষ্টিত হয়ে রাত্রি যাপন করতে গিয়ে সংযম রক্ষার চেয়ে ভয়ই বেশী হয়েছিল।

বোষ্টমী হেসে গালটা টিপে দিয়ে বলেছিলেন,—ওগো কেষ্ট ঠাকুর ভয় নেই, আমরা তোমার দেহ নিয়ে খেলব না, শুধু রূপসুধা পান করবো।

এও একরকম সাধু সঙ্গ ঘটেছিল।

ওদের আখড়া থেকে ছুটি পেয়ে প্রায় একমাস যাবৎ আমার কেমন মোহ ঘটেছিল। ঘৃণা আনতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বার বার আসছিল এক অদৃশ্য টান। সংসারের ধাক্কায় মনে বার বার উদয় হয়েছে যাই পালিয়ে—যাই ওই বোষ্টমীর আখড়ায়।

ওরা কৃষ্ণভজনা করে।

ওরা বাইরের মানুষকে মনের মানুষ বানায়।

ওরা নাকি এক যুগ আগে ছিল বীরাচারী তান্ত্রিকের দল। সমাজের অনুশাসনে সহজিয়া সাধন করতে করতে, হতে চেয়েছিল নবদ্বীপচন্দ্রের সমাজ-ভুক্ত! কিন্তু সেখানেও স্থান না পেয়ে ওরা নিজেদের ধর্ম নিজেরা গড়েছে।

তান্ত্রিক শবাসনে বসে বামাচারী হয়ে শক্তি সংগ্রহ করে, আর এরা মনের মানুষের সঙ্গ নিয়ে নিঃসঙ্গে বসে করে কৃষ্ণ আরাধনা! তবে এদের সাধনা গান মাধ্যমে। রাত্রিবাস কালে বোষ্টমী আমায় গান শুনিয়েছিলেন। আমায় তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে উত্তর দিতে হয়েছিল গানে গানে। সে গান ওঁদেরই গান —ওঁদেরই নিভৃত মন্ত্র।

'ওরে সঙ্গ-হারা মন বাউল!

তোর নিঃসঙ্গের অন্তরালে, আলেকলতায় ফুটল ফুল,

সেই সুরে আজ সাজলো রাধা—

উদ্ভাসিত দেব-দেউল!'

এ গান ওদের বড় ভাল লেগেছিল। সখিবৃন্দেরা বোষ্টমীকে বলেছিল,—সত্যিকারের কেষ্ঠাকুর ধরে এনেছিস বোন, থাকে তবে তো? এসেই বলে যাই-যাই!

বোষ্টমী হেসে উত্তর দিয়েছিল,—তোদের টানে বেঁধে রাখতে পারিস তো রাখ না, কে মানা করছে?

মানে বুঝি কিন্তু দেহী হয়ে দেহটার প্রবল টানের স্রোতকে কি রুদ্ধ করে রাখা সম্ভব? এই ভাবনা ভেবেই, পালিয়ে এসেছিলাম।

এরপর পেয়েছিলাম এক অদ্ভুত সাধুর সঙ্গ। তিনি গৃহী ছিলেন পুত্রাদি নিয়ে সংসার করতেন। থাকতেন কলকাতায় ঝামাপুকুরে। নাম ছিল তাঁর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে।

অদ্ভুত তাঁর উপদেশ। সরল, সোজা ঘোরপ্যাঁচ নেই। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। তিনিও নাকি এককালে বিভূতি দেখিয়েছিলেন কিন্তু আমায় তিনি নিজের মুখে যা বলে গেছেন তা বাস্তব জীবনে ভগবানে প্রাণ সমর্পণ করার মন্ত্র। তাতে আর কি হয় জানি না তবে শান্তি পাওয়া যায়, অস্থিরতা কমে।

যে ভগবানকে সবাই 'নেতি নেতি' করে খুঁজে বেড়ান—বোঝাতে গেলে এক অবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করেন ইনি তাঁর একটা রূপ দিয়েছিলেন,—লাল, নীল, সাদা ইত্যাদি জ্যোতিতে। চোখ বুজে তাই সব রংগুলি চিন্তা করতে গিয়ে দেখেছি মন শান্ত হয়ে আসে। অবলম্বন পেয়ে মনের দৃঢ়তা বাড়ে।

জ্যোতি?

জ্যোতিই তো ভগবান। আমার গানের অধ্যায় আছে, আছে ছন্দ আর ওঁর অধ্যায় রয়েছে জ্যোতি সবই ভাইব্রেশনের কাজ। আজ টকি ফিল্মের

যুগে বুঝি শব্দ আর আলো রূপান্তর মাত্র। আলোয় ফোটোগ্রাফী দিয়ে মূর্তির ছবি তুলি আর শব্দকে আলোতে রূপান্তরিত করে ফোটো তুলি ভাইব্রেশনের। আবার তাকে ফোটোসেলের মাধ্যমে শব্দে পুনঃ রূপান্তর ঘটাই।

তাই ভাল লেগেছিল তাঁর কথাগুলি। তাঁকেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলাম। দেহের নিঃশেষ হবার পূর্বক্ষণে এই জ্যোতিই আমায় আমার ব্যাধির যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বেশ মনে আছে।

ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, জগৎ এগিয়ে গেছে আর আমি পেছিয়ে পড়েছি। দেহটা বিদেহ হয়ে আবার ছোট্ট হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু স্মরণে রয়েছে সব।

বাবার ঐতিহাসিক বন্ধুর হাতের কলম বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে রয়েছেন। হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলেন,—এও কি সম্ভব হয়? কি জানি!

আমি বলি,—হিসাব-নিকাশের খাতায় বিজ্ঞান কতটুকুই বা মানুষকে জানবার অবকাশ দিয়েছে। প্রকৃতির বিজ্ঞান ভাণ্ডারের কণা মাত্র আবিষ্কার করে মানুষ তাই দিয়ে প্রকৃতির সবটাই বিশ্লেষণ করতে চায়। একি সম্ভব? বলুন। জড় পৃথিবীর তত্ত্বের শেষ সীমা রেখা আজও বৈজ্ঞানিক টানতে শেখেন নি তারা সূক্ষ্মের খবর কতটুকুই বা রাখবেন!

তবে নিষ্ঠা! নিষ্ঠাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় প্রকৃতির গুপ্তদ্বারের সন্ধানে। সে দ্বার একবার খুলে গেলে জড় সূক্ষ্ম সব একসঙ্গে একাকারে বিশ্লেষণ করে ফেলেন, যেমন করে ফেলেছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

এই নিষ্ঠাটুকুই জীবনে সর্বপণে পুঁজি করতে চেষ্টা করেছিলাম। হয়ত সেই আমায় বাঁচিয়ে নিয়ে গেছে মনের স্খলন থেকে। দেহ অশুদ্ধ হলেও মন শুদ্ধ থাকলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মন নির্লিপ্ত হলে দেহের শুদ্ধি অশুদ্ধিতে কিছু এসে যায় না। পুরাণে এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ম্যাডান কোম্পানিতে ছবিতে সুর দিতে গিয়ে আর গান গাইতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম শ্রীমতী হিরোইনের প্রেমে। খেলা করে পাশ কাটাতে আর পারা যায় নি। মনে সুখ ছিল যে, সে যথার্থ শিল্পী। আমার শিক্ষাকে মর্যাদা দিতে সে এগিয়ে এসে আমায় বরণ করেছিল। আর আমিও দিয়েছিলাম তার শিল্পী অনুপ্রেরণার অবদান।

মাস কাবারে যখন কঠিন বাস্তবে এসে পৌঁছলাম তখন শ্রীমতী একদিন আমার হাতে পঁচাত্তরটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলেছিল,—যাও মাকে এটা দিয়ে এসো।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম,—কেন? তোমার টাকা, তুমি নিজেই তো তোমার মার হাতে দিতে পারো!

শ্রীমতী বলেছিলেন,—এখানে এসে মাকে টাকা দিতে হয় যে, তা তুমি পাবে কোথায়? তাই আমিই তোমার হয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

কথাটা মানে এসে লেগেছিল। টাকা কটা ফিরিয়ে দিয়ে ম্যাডান কোম্পানি থেকে সন্থ পাওয়া টাকা থেকে একশ টাকার একখানি নোট তার মার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম,—এটা রাখুন।

তারপর নীচে নেমে এসে শ্রীমতীকে বলেছিলাম,—তোমার কথা রেখেছি এবার বিদায় দাও! গেরস্তের ছেলে মাসে মাসে তো পারবো না। আচ্ছা চলি, আমায় যেন ভুল বুঝো না।

তারপর ছেড়ে দিয়েছিলাম সে রাস্তা। মন টানতো কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মনকে প্রশ্রয় দিই নি। এইটুকু মনের সংযমে চিরটা কালই শ্রীমতীর চোখে আমার জন্যে উচ্চাসন রচনা করেছিল।

মেগাফোন কোম্পানির কাজে উঠে পড়ে লেগেছিলাম কিন্তু যেন রসাল হয়ে গড়ে উঠছিল না! এমন সময় একদিন জিতেনবাবু বললেন,—আমি শুনেছি আপনার ম্যাডান কোম্পানির 'ঋষির প্রেম' ছবিতে একটি নতুন হিরোইন এসেছেন, তিনি নাকি সুন্দর গায়িকা? আপনাকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন! যদি তাঁকে নিয়ে আসতে পারেন!

'ঋষির প্রেম' বাংলা সবাক চিত্র জগতের সর্বাঙ্গীন প্রথম ছবি—পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র। এ ছবিতেও আমি ছিলাম সংগীত পরিচালক তার সঙ্গে সেজেছিলাম হিরো। হিরোইনের ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী কাননবালা পরোক্ষে কানন দেবী এবং শ্রীমতী সরযুবালা।

বাবার বন্ধু বলেন,—তাই নাকি? তাহলে তুমি গান-বাজনার লাইন থেকে চিত্রজগতেও সরে এসেছিলে?

আমি বলি,—সে ইতিহাস ভাবছেন আরও চমকপ্রদ, কিন্তু তার ইতিবৃত্ত আমার মনে নেই। এইটুকু খালি মনে পড়ে আমার মৃত্যুর পর যখন বিদেহী হয়ে ছিলাম তখন বছরের পর বছর ঘুরে বেড়িয়েছি এই চিত্রজগতের মোহে। সে আর এক অনাড়ম্বর সত্য। মানুষের জন্মান্তরের মাঝে যে বিদেহী জন্ম সে যে কত অদ্ভুত তা উপলব্ধি হয়েছিল।

তিনি বল্লেন,—থাকথাক তবে, ওরকম মাঝখান থেকে থামচে শুনলে রসভঙ্গ হবে। তারপর বল!

মেগাফোন কোম্পানীতে শ্রীমতী কাননবালাকে এনে জিতেনবাবুর হাতে তুলে দে'ওয়া হলো। কাননবালার প্রথম রেকর্ডটির গীতিকার হলাম আমি। একদিকের শিক্ষক ধীরেন দাস অপরাংশের শিক্ষকতা আমার নিজের। কানন-বালার কণ্ঠ সুমধুর ও সুরেলা তা আমি 'ঋষির প্রেম'-এর গানেই উপলব্ধি করেছিলাম এবং আশা করেছিলাম যে ইনি পরবর্তী কালে প্রখ্যাত শিল্পী না হয়েই পারেন না।

মেগাফোন কোম্পানির জিতেনবাবুর সস্নেহ বন্ধন আমায় কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না মেগাফোনে। কারণ, আমার পুরাতন মনিব শ্রীযুত নৃপেন মজুমদার মশাই হঠাৎ নিলেন কলোম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মভার। আমার ডাক পড়লো। শুনলাম এইচ. এম. ভির বিপক্ষে কলোম্বিয়া কোম্পানি ভারতীয় রেকর্ডের অভিযান চালাবেন। সেই অভিযানের কর্ণধার হবেন মজুমদার মশাই, সেনাপতি হবো আমি! পুরানো আক্রোশ মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠলো, এইচ. এম. ভির বিপক্ষে।

রিহার্সল-রুম-ইন্‌চার্জ হয়ে সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমি গিয়ে বসলাম ১নং গরাণহাটা স্ট্রীটের দ্বিতলে। শিশির সরকার কর্মাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হলেও নৃপেনদাই সর্বময় অধ্যক্ষ।

নিত্য নতুন আর্টিস্ট রিক্রুটমেণ্ট চলেছে।

এল লীলা (ফক্স), গামাসাহেব, পারুল, আশালতা, রাণীবালা, আভাবতী, প্রফুল্লবালা, নলিনী এমনি কত। অ্যামেচার শিল্পী হয়ে এলেন, নীলিমা বসু, উত্তরা দেবী। পঙ্কজ মল্লিক, আমি, নলিনী সরকার, সুশীল বসু ইত্যাদিতে কলোম্বিয়ার নৈবেদ্য রচনার কাজ চলতে লাগলো।

প্রতিদিন সকাল আটটায় রিহার্সল রুমে আমি গিয়ে বসি এবং ফিরি সন্ধ্যায়। বাড়ি থেকে খাবার আসতো। ওখানেই খাওয়া, ওখানেই বিশ্রাম।

সেদিন পরেশনাথের প্রোসেসন যাচ্ছে চিৎপুর দিয়ে।

আমাদের রিহার্সল ঘরের সামনের বারান্দায় তাই আমাদের শিল্পীদের ভিড়। তাদের সঙ্গে এসেছেন তাঁদের পাড়া প্রতিবেশী সঙ্গিনীরা এদের মধ্যে এসেছে দুটি তন্বী। পরেশনাথ দেখতে এরা ব্যস্ত, কিন্তু এদের দেখতে আমি ব্যস্ত!

পরেশনাথ চলে গেল, আমি ফিরে এসে ঘরে আসনে বসি। তন্বীদের মধ্যে যিনি বেশী বোল্ড্ তিনি এগিয়ে আসেন আমার কাছে। বলেন,—আমার গান বার করে দেবেন?

আমি বলি,—তোমরা গান জানো?

ওদের মধ্যে একটি কালো—একটি শ্যামবর্ণ সুন্দরী।

সুন্দরী, কালো মেয়েটিকে ঠেলা মেরে বলে,—ও বেশ গায়!

—আর তুমি?

আমি জানি, তত ভালো না।

—কত ভালো, বেশ শোনা যাক।

ও বলে,—বেশ, তবে হারমনিয়ম বাজান।

হারমনিয়মে বসি। ও গেয়ে চলে, যেমন চড়া, তেমনি সুরালো, ভালো লাগলো।

পরিচয় পেলাম।

ওর নাম শ্রীমতী রাণীবালা। শ্রীযুত প্রবোধ গুহ মহাশয়ের থিয়েটারে ব্যালে গার্ল। ওকে আমার পার্টনার করে নিলাম। এইচ এম. ভির হরিমতীর সঙ্গে ছিল ভজন ডুয়েটের শার্টনার-শিপ্। কলোম্বিয়ায় হলো রাণীবালা। ভজন ডুয়েট বেরুলো, সবার কাছে সমাদৃত হলো—'এসো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী' আরো অনেকগুলি। রাণীর নিজের গান প্রত্যেকটি শেখালাম আমি। ওর গাওয়া, সুর ও লেখা 'আমার আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল' ওকে বিখ্যাতা করে দিল।

অপরটির নাম আশালতা। মিষ্টি পাতলা গলা। লেখাপড়া জানে না, গান লিখে নিতে পারে না। মুখে মুখে শেখাই। 'মলয়া শোনরে তোরে বলি'র জায়গায় ও বলে—ময়লা শোন্রে তোরে বলি। তবু ওর গান হিট্ করলো।

শ্রীমতী কাননবালা হঠাৎ মেগাফোন ছেড়ে কলোম্বিয়ায় আমার কাছে এসে হাজির হলেন। আমার শিক্ষাধীনে রেকর্ড করলেন—'রিণিকি ঝিণিকি ঝিনী পায়েলা বাজে'। হিট্ হলো!

জিতেনবাবু কাননের আসাতে আমায় ভুল বুঝলেন। জিতেনবাবুকে আমি দাদার অধিক শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু পার্টি পলিটিক্সে পড়ে গেলাম। সেদিনের খেসারত দিতে আমায় পরবর্তী কালে দুটি বৎসর মেগাফোনের সেবা করতে হয়েছিল। তখন কিন্তু শ্রীমতী কানন দেবী আবার মেগাফোনে ফিরে এসেছিলেন।

বাবার বন্ধু বললেন,—এই কলোম্বিয়ার শিল্পীবৃন্দ তোমার জীবনে কিছু কি দাগ কাটেনি ?

আমি বলি,—বিলক্ষণ। যে দাগা এখানে পেয়েছিলাম সে আমার শিল্প-মনের শিল্পান্বেষণের পূর্ণচ্ছেদ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে যেমন বিস্ময়কর তেমনি নীচের মহলের এক পূতি গন্ধময় পরিস্থিতি। যার ফলে আমি এ-দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচি।

কি রকম ?

—হ্যাঁ, সে এক গরুর গাড়ি চাপা যাওয়ার ইতিবৃত্ত।

উনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন,—গরুর গাড়ি চাপা পড়েছিলে, সে কি ?

আমি ম্লান হেসে বলি,—হ্যাঁ, গরুর গাড়ি চাপা পড়ে, পথের সব চেয়ে হুঁশিয়ার পথিক ? চুপ করে থেকে শুরু করি—আমার শিক্ষাধীনে আসতো একটি মেয়ে, নাম তার নলিনী। নলিনীর শোভা তার ছিল কিনা জানি না, তবে ভ্রমর আকর্ষণের ছিল অদ্ভুত চুম্বকী-শক্তি। সে শক্তির টানে আমায় ফেলেছিল আমি জানতাম তাই খুব সাবধানেই তার থেকে নিজেকে তফাত রাখতাম। মুখে হয়ত অনেক কম বর্ণচ্ছটায় দুজনের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটতো কিন্তু সে জানতো যে অপর ভ্রমরের মতো খপ্ করে একে বন্দী করা যাবে না। তাই তার আকর্ষণ যতই কঠিন হোক না কেন ভ্রমর পুষ্পকোরকের নীচের কোটরে কখনও প্রবেশ করার স্পর্ধা রাখেনি।

নলিনীর গলা ছিল যেমন দরাজ, জুয়ারীপূর্ণ তেমনি মধুর আর সুরেলা। ওর সঙ্গে ডুয়েটে ভজনও গেয়েছি।

রেকর্ডিং সেশন এক প্রস্থ শেষ হলো। স্যাম্পলগুলি আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমি সব শিল্পীদের আহ্বান করে যার যার গান তাকে তাকে শোনালাম ! আসেনি কেবল নলিনী, তার বদলে এসেছে ছোট্ট একটি চিঠি—

'আমার মা মৃত্যুশয্যায়। হয়ত আমার রেকর্ড বাজারে বার হওয়া পর্যন্ত তাঁর তর সইবে না। তাই অনুরোধ করি যে স্যাম্পল কখানি এই লোক মারফত পাঠিয়ে দিলে বাধিত হব।' ইতি—নলিনী।

স্যাম্পলগুলি রেকর্ড কোম্পানি থেকে সরানোর অধিকার আমার ছিল না। কাজেই আমি লিখে দিলাম—'আজ আমি ফেরার পথে রেকর্ডগুলি তোমার মাকে শুনিয়ে নিয়ে বাড়ি যাবো।'

সাড়ে ছটার পর রেকর্ড কটিকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম নলিনীর বাড়িতে।

আমায় দেখে নলিনী খুশী হয়ে তার ঘরে নিয়ে বসালো। জল মিষ্টি এনে দিয়ে বললো,—খেয়ে নিয়ে ওঘরে গিয়ে ওগুলো বাজাবেন, মা ওঘরেই আছেন। উঠতে পারেন না তো!

খাওয়া সাঙ্গ হলে একথা সেকথার পর প্রায় সাড়ে সাতটার সময় অপর ঘরে উপস্থিত হলাম। দেখলাম মেঝেতে বিছানা করে, তার উপর কঙ্কালসার তার মার দেহখানি। চোখদুটি বেরিয়ে আসছে, হাঁফাচ্ছেন।

আমায় দেখে হাত তুলে নমস্কার জানালেন। আমিও প্রতি-নমস্কার জানিয়ে একটি চেয়ারে বসলাম। পাশেই গ্রামোফোন মেসিনটি একটি ছোট টেবিলে রক্ষিত। আমি বাক্যব্যয় না করে একটি করে স্যাম্পল রেকর্ড বাজাতে শুরু করলাম।

গানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখখানি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। মেয়ের কণ্ঠস্বরের দরদ তাঁকে যেন সংগীত দরদী করে তুললে, এক অসীম তৃপ্তিতে তিনি চোখ বুজে গান শুনতে লাগলেন।

গানগুলি শেষ হতেই তিনি ইশারা করে আমায় তাঁর নিকটে ডাকলেন। আমি বুঝিনি। নলিনী আমায় ওঁর বিছানায় বসতে বললো। আমি বিছানার একধারে অতি কুণ্ঠার সঙ্গে বসে পড়লাম। নলিনী ওর মায়ের শিয়রের পাশটিতে বসলো।

হঠাৎ ওর মার চোখদুটি যেন প্রদীপ্ত হয়ে ঠিকরে বেরুতে চাইছে এমন ভাবে চোখ মেলে উঠে বসলেন। তারপর আমার হাতখানি টেনে ধরে বললেন,—আপনার হাতে নলিনীকে তুলে দিয়ে গেলাম। ওকে আপনি দেখবেন, ওর আর কেউ রইলো না। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি।

কটা কথা বললেন কিন্তু শেষের লাইনটি বার বার উচ্চারণ করতে করতে তিনি কেমন নেতিয়ে পড়লেন। নলিনী তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে শুইয়ে দিতে গেল কিন্তু যাকে শোয়ালো সে মৃতা, জীবনের এতটুকু চিহ্নও তার মধ্যে আর অবশেষ তখন নেই।

চীৎকার করে নলিনী কেঁদে উঠলো। ছুটে এল বাড়ির আর সব প্রতি-বেশিনীরা। সবার মুখেই 'কি হলো'—তখনি নির্বাক নলিনীর গগনভেদী চীৎকার যেন আমায় আরও হতচেতন করছে।

হঠাৎ সবার সামনে নলিনী আছড়ে পড়ে আমার পায়ের উপর। বলে—একি হলো গো! আপনাকে বিশ্বাস করে আমায় আপনার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন আপনি আমায় এ বিপদের মুখে ফেলে পালাবেন না।

আমি সংবিতে ফিরে এসে বলি,—ডাক্তারকে খবর দেবো ?

নলিনী তেমনি হাউ হাউ করে কেঁদে বলে,—আর ডাক্তার এসে কি করবে বলো।

বাড়ির অপর সঙ্গিনীরা নলিনীকে তুলে নিয়ে প্রবোধ দেয়। আমি ধীরে ধীরে পাশের ঘরে যাবার চেষ্টা করি।

পাশের ঘরে পা রেখে রেকর্ডের স্যাম্পলগুলো প্যাক করছি, নলিনী ছুটে এসে আবার আছড়ে পড়ে। বলে,—এখন কি উপায় হবে গো।

আমি শান্ত স্বরে বলি,—এ সময় ধৈর্য হারাতে নেই নলিনী, স্থির হও। সৎকারের ব্যবস্থার জন্যে বলো তো রামকৃষ্ণ মিশন বা কোনো সংস্থাকে খবর দিই। ভয় কি ?

নলিনী কিছুটা শান্ত হয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না, তা আমাদের রীতি নয়, ওরাই শ্মশানে নিয়ে যাবে। তবে আপনি আমায় একলা ফেলে চলে যাবেন না। আমার ঘরে একটা কানাকড়িও নেই।

আমি বলি,—ভয় নেই, আমায় যেতে দাও। আমি এগুলো রেখে এখনি আসবো টাকার ব্যবস্থা করে।

—আপনি আমায় মিথ্যে বুঝিয়ে ডুব দেবেন না তো ?

—ছিঃ, এ সময় মানুষকে তুমি এমনি ভাবতে পারো !

—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এই সময়ে সবাই ফেলে পালায়, তাই ও-কথা বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াই। পথে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে আসি। বাড়িতে রেকর্ডগুলো রেখে, আলমারি থেকে কিছু টাকা নিয়ে আবার ফিরে চলি নলিনীর ডেরায়।

বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভেতরে নলিনীর ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম বাইরের দালানে নলিনীর বাড়ির মেয়ে সঙ্গিনীগুলি গাছ কোমর বেঁধে, গামছা জড়িয়ে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছে। খাট, ফুল, সবই এসেছে, আর এসেছে দিশী বোতল ডজন দু'এক, বারান্দায় বসে তারই আত্মশ্রাদ্ধ করা হচ্ছে।

আমায় দেখে নলিনী উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। চোখ দুটো তার করমচার মতো রাঙা টকটকে। আমায় বললো,—টাকা এনেছো ?

আমি হতভম্ব হয়ে ভাবছি—এ রাঙা চোখ কিসের ? কেঁদে কেঁদে রাঙা হয়েছে না আর কিছু ?

আমার মুখের উপর মুখ এনে নলিনী বলে,—কি গো কথা কইছো না কেন? টাকা এনেছো?

বুঝলাম এবার রাঙা চোখের কারণ কি!

মুখটা একটু তফাত করে নিয়ে বললাম,—কত চাই এখন?

—কত এনেছো?

—একশ।

—দাও আমাকে, আরও নিয়ে এসো বাড়ি থেকে। ঘাটের কাপড়-চোপড় সব কিনতে হবে না! মা যে তোমার উপরই আমার সব ভার দিয়ে গিয়েছে।

টাকা কটা হাতে গুঁজে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে এলাম। দরজা দিয়ে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম। পাশটিতে দাঁড়িয়ে ওর মা। সেই ঠিকরে পড়া চোখদুটি। আবার বলছে—ওর উপর রাগ করো না বাবা, ও বড় ছেলেমানুষ—সংসারে ওর কেউ নেই।

আমার এক বন্ধু এসে আমায় ধরে ফেলেছে। ও নাকি আমায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে টলে পড়তে দেখে ছুটে এসে আমায় ধরেছিল।

বাড়ি গিয়ে টাকা নেবার আগে, পাশের বাড়ির বন্ধুটিকে অনুসন্ধান করেছিলাম সঙ্গে নেবার জন্যে কিন্তু সে বাড়ি ছিল না। তার বাড়িতে বলে এসেছিলাম—ও যেন চন্দ্রমোহন সুর লেনের মোড়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করে।

আমার কথানুসারে ও এসে দাঁড়িয়েছিল মোড়ের মাথায়। সামনে ট্যাক্সি রাখা, তাকে জিজ্ঞেস করায় জেনেছিল—একটি বাবু ঐ বাড়িতে ঢুকেছেন। তাই, সে তারই অনুসন্ধানে এগিয়ে এসে আমায় টলে পড়তে দেখে ধরে ফেলেছে।

মোটর গাড়িতে চড়িয়ে বন্ধুবর ট্যাক্সিটিকে নিয়ে হেদোর পাশটিতে এসে দাঁড় করায়। বলে,—কি হয়েছে তোমার?

আমি বলি,—কিছু না, আরও টাকা চাই। ঘাটের কাপড়-চোপড় সব কিনতে হবে।

গাড়ি বাড়ির দিকে চলেছে। আমি ভাবছি মরণোন্মুখ আত্মা হঠাৎ আমাকেই বা ওর সকল ভার দিয়ে গেল কেন? শুধু একটা অবলম্বন মাত্র কি? না অন্য কিছু?

অবলম্বন যদি হয় তাহলে সেই মৃত আত্মার শেষ ইচ্ছা ঠেলে ফেলে বাড়িতে বসে থাকলে অন্যায় হবে।

গাড়ি বাড়ির দরজায় পৌঁছেছে।

উপরে উঠে এসেছি তরতর করে। আলমারির চাবি বন্ধুকে দিয়ে বললাম,—তুই আলমারির ড্রয়ার খুলে আর একশ টাকা রাখা আছে, নিয়ে নে।

ও বলে,—মোটর ছেড়ে দিয়েছি, ওখানে আর যেতে হবে না।

—না রে, আমায় যেতেই হবে। উপায় নেই।

—ও কি তোমার রক্ষিতা?

বন্ধু কোনো দিনই আমায় ও সব অঞ্চলে যেতে দেখেনি কাজেই এতক্ষণ বাদে নিরালা পেয়ে কথাটা সন্তর্পণে পেড়েছে।

আমি চমকে উঠি। বলি,—বলিস কি? ও আমাদের কলোম্বিয়ার শিল্পী!

বন্ধু অবাক হয়ে বলে,—তা তোমার এত মাথাব্যথা কেন? কেনই বা জলের মতো খরচ করতে চলেছো।

—এ আমার দায়িত্ব আমায় করতেই হবে। কেন তার জবাব পরে দেবো।

টাকা নিয়ে বন্ধুকে সঙ্গে করে, ফিরে চলি নলিনীর বাড়ির পথে।

ওরা মড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

আমাদের মোটর ওদের পাশে ফেলে রেখে এগিয়ে চলে নিমতলার ঘাটে।

দশ পনের মিনিট মোটরে বসে নিশ্চুপ কেটেছে।

বন্ধু বললো,—ওরা এসে গিয়েছে।

নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম নলিনীর কাছে। তার একহাতে একটা জলন্ত সিগারেট আর হাতে একটা ফর্দ। ফর্দটা হাতে গুঁজে দিয়ে বললো—বড়বাজারের দোকান এখনও খোলা পাবে, কাপড়-চোপড়গুলো কিনে নিয়ে এসো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আমি বিস্ময়ে চমকে উঠি। ফর্দ হাতে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াই।

বড়বাজারের দোকানে নেমে বন্ধুই সব ফর্দ মিলিয়ে কিনে নিয়ে এল। একরাশ কাপড়!

আমি একা ট্যাক্সিতে বসে ভাবছি—একি হলো! ভাবছি কি, না ভাবনাশূন্য! দিক হারিয়েছি, হারিয়েছি দিশা—মনের দিশা, জীবনের দিশা। এ যেন এক অসীম সমুদ্রে গা ভাসিয়ে বেঁচে থাকা।

কাপড় কিনে ট্যাক্সিটাকে হাওড়ার পুলের পূর্বের পাশটিতে দাঁড় করিয়ে দিতে বললাম।

ঠাণ্ডা হাওয়া এসে গায়ে মাথায় লাগছিল। তৃপ্তি পাচ্ছিলাম।

নেমে পড়ে পনটুন ব্রীজের পাশ-পথ ধরে একটু বেড়াতে শুরু করলাম। মাথাটা যেন কিছু হাল্কা হয়েছে।

বন্ধু আবার প্রশ্ন করল,—শিল্পীর হয়ে এতগুলো টাকার কাপড়-চোপড়? সত্যি বলো না, ওকি তোমার রক্ষিতা?

আমি শান্তস্বরে বললাম,—রক্ষিতা ছিল না, আজ থেকে হলো!

—আজ থেকে হলো মানে?

—আজ থেকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার পেয়েছি তাই রক্ষিতা বলতে পারিস!

—আচ্ছা এটা কি তোমার ঠিক হচ্ছে?

আমি চুপ করে থাকি।

ভাবি—সত্যি কি এগুলো ঠিক হচ্ছে? যে সংস্কারে আমি মানুষ হয়েছি, বড় হয়েছি তার ঠিক বিপরীত ঘটিয়ে চলছি না আজ? কিন্তু উপায়—এযে এক মরণোন্মুখী আত্মার নির্দেশ! কৈফিয়ত দেবার কিছুই ছিল না সেদিন। কোথায় যেন কিসের খেই হারিয়েছি। প্রাক্তনের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি তাই।

কাপড় নিয়ে ঘাটে পৌছলাম যখন, তখন ভোরের হাওয়া ছেড়েছে। নলিনীর কাছে ছুটি পেলাম সে রাত্রের মতো। বললো,—কাল একবার এসো।

ঘরে ফিরে, স্নান করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না চোখে তিলার্ধ। ভাবনা শূন্য মন তবু যেন ভাবনায় চূড়ান্ত ভারাক্রান্ত। মনের এ অবস্থা বোধকরি জীবনে আর কখন ঘটেনি!

নলিনী মদ খায়? না শোক ভোলবার জন্যে ওর সঙ্গিনীরা ওকে ধরে খাইয়ে দিয়েছে—তাই হবে! আর সিগারেট? সবার পাল্লায় পড়ে হয়তো ফুঁকেছে। এটা কি শুধু টাকা বাগাবার একটা খেলা। কিন্তু মায়ের মৃত্যুটা তো আর খেলা নয়! তাঁর ভার দেওয়ার কথাগুলো তো পূর্ব রচনা বা শেখানো নয়! তবে?

ঠিক করেছি!

নীচের মহল?

হোক নীচের মহল। ওরাও মানুষ, ওদের পাশে দাঁড়িয়ে শ্মশান-কৃত্যে সাহায্য করা কখনও পাপ হতে পারে না।

বদনাম ?

সুনামের প্রত্যাশী নই। যাদের ঘিরে আমাদের শিল্পজগৎ, শিল্পচর্চা, শিল্পাণুধ্যায় সে জগতের সঙ্গেই তো আমার আত্মীয়তা। সুখে, দুঃখে, ব্যসনে, শ্মশানে —সর্বত্রই। সব ঠিক করেছি, বলুক নলিনীকে আমার রক্ষিতা।

নলিনী বলেছিল—এই সময়ই সবাই ফেলে পালায়।

আমি বলেছিলাম—ছিঃ, তুমি মানুষকে এত নীচ ভাবতে পারো?

তাই মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে সংস্কারকে বলি দিয়েছি আজ মাসাবধি।

প্রায় প্রতিটি দিন ওর তত্ত্বাবধান করা, দরকার অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করা সবই যথাযথ হয়ে আসছিল। নলিনী সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে আমার কথায়। তৃপ্তি পেলাম।

শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা ও টাকাকড়ির সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছি। শ্রাদ্ধের দিন রাত্রে ওর বাড়ি গিয়ে দাঁড়াতে হলো। ওর অবস্থা আবার সেই পূববৎ। চোখ দুটো রক্তবর্ণ, অকারণ হা-হা করে হাসছে। আমার সামনে গোল্ডফ্লেকের টিন থেকে সিগারেট নিয়ে নিজে ধরিয়ে সিগারেটটা আমার মুখে গুঁজে দিযে নিজে আর একটা ধরালো।

আমি আমার নিজের মুখের সিগারেটটা ওরই সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ও খিলখিল করে হেসে বলে উঠলো,—উঃ, আবার বাবুর রাগ দেখো!

আমি কথা বললাম না, শুধু চেয়ে রইলাম। ও হাসি সামলে বলে ওঠে, —তোমার কথায় সব ছাড়তে হলে বাবু করাও ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে কি নিয়ে থাকবো বলো? এক বাবু হও না-হয় আমায় সব করতে মত দাও।

আমি বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলাম,—এতদিন কি আমার মতেই সব ঘটাচ্ছিলে?

ও সটান উত্তর দেয়,—এতদিন মা তো আর ভার দেয় নি। আজ যে আমি তোমার! কাজেই ভার নাও নইলে বয়ে যাব দাঁড়িয়ে চোখে দেখো।

কি বুঝলাম জানি না।

হঠাৎ যেন আমার মনে হলো আমার দায়িত্বের সব ফুরিয়ে গেছে। আমি কথার উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ির পথ ধরলাম। বন্ধু সঙ্গে ছিল, সে পথে বললো—কথায় বলে রাঁড়ের মার শ্রাদ্ধ।

কদিন আর যাই নি।

রিহার্সাল ঘরের চাকর কালী এসে খবর জানালো যে নলিনী তিন দিন

বাড়ি নেই। চামেরিয়া বংশের কোন এক দুলালের সঙ্গে বাগানবাড়ি করতে গেছে।

নিশ্চিন্ত হলাম।

এক মাস পরে—রাত তখন বারোটা। বাড়িতে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছি হঠাৎ বন্ধু এসে বললো,—এই মুশকিল হয়েছে, নলিনী নীচে মোটরে বসে আছে, তোমায় ডাকছে।

ঘুম চোখেই নীচে নেমে গেলাম।

মোটরে বসে নলিনী, সঙ্গে তার পূর্বপরিচিত একটি সঙ্গিনী। দুজনেই মদে চুর।

বললো,—যাও না কেন? রাগ হয়েছে?

আমি রুক্ষ কথায় উত্তর দিই,—তুমি এবাড়িতে আর কোন দিন এসো না, দরকার হলে অপমান করে তাড়িয়ে দেবো।

না দাঁড়িয়ে উপরে উঠে এলাম।

পরে খবর পেয়েছিলাম যে আমার হিতৈষী বন্ধু ধীরে ধীরে নিজেই আমার কাঁধের বোঝা নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে আমায় রেহাই দিয়েছেন।

বাবার বন্ধু বললেন,—তোমার boldness এর তারিফ করি।

আমি বলি,—বোল্ড না হলে হতাম treacherous.

তিনি বলেন,—তবে তোমার শিল্পী মনের চরম ঠিকানাটুকু সবাই কিন্তু সুনজরে দেখবে না।

আমি বলি,—কি জানেন! শিল্পী মন যার তার কাছে এর দামও কিছু নেই। যারা অর্থের মোহে শিল্পচর্চা করে তারা এ নিয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সে শিল্পের মোহে নয়, নামের মোহে। এই ঘটে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তাছাড়া শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রে শিল্পান্বেষণের ছলে নিজেদের অভ্যাসের দাস করে ফেলে। এই নলিনী শিল্পী নিশ্চয়ই কিন্তু এর পারিপার্শ্বিক অভ্যাসগুলি ওর শিল্প প্রেরণাকেও অতিক্রম করে গিয়েছে। তাই ওর আনুসঙ্গিকই আমায় সুনজরে প্রতিষ্ঠিত হতে দিল না।

তবু আমাদের এদের ভালবাসতে হবে শিল্পীর দায়ে না হলেও শিল্পের দায়ে। যে শুক্রাচার্য তাঁর সূক্ষ্মানুভূতিটুকু দিয়ে তাঁদের শিল্পী করে গড়ে তুলেছেন সেই আদর্শই তাদের সমাজদ্রোহী করে তোলেন। তাই সময় সময় শিল্পীর দেহগত অভ্যাসটুকুকে ক্ষমা না করলেও যে চলে না।

বাবার বন্ধু বললেন,—একথা আমি মানি। তবে লোকাচারে কিছু দোষারোপ সইতে হয়।

—সে দোষারোপটুকু পদ্মের পরিস্থিতির মতোই নয় কি?

—সেটা কি রকম?

আমি বলি,—পদ্ম দিয়ে দেবতার পূজা হয় অথচ তার জড় ধরে টানলে পাবেন পঙ্ক মাত্র। পদ্ম থেকে উদ্ভূতা হচ্ছেন লক্ষ্মী আর সরস্বতী। বাইরের রূপে একজন হচ্ছেন 'শ্রী' অর্থাৎ আমদানিতে, টাকায়, সম্পদে, সম্পত্তিতে অথচ জড় ধরে টানলে দেখবেন এই অর্থবান হওয়ার নীচে কতই না হীনবৃত্তি জড়িয়ে রয়েছে। অপরজন সরস্বতী—বাইরের চাকচিক্যে বিদ্বান বা গুণী শিল্পী, জড় ধরে টানলে তখন বেরিয়ে পড়ে যা বলে এলাম তাই। তাই শিল্পীকে বিশ্লেষণ না করে, তার শিল্পটুকুই নেওয়া ভাল।

নলিনীর সঙ্গ তাই আমার জীবনের সব শুভ্রতায় যে মালিন্যের ছাপ ধরিয়েছিল একথা আমি অকপটে বিশ্বাস করি। সে দোষ তার, কি আমার নিজের, সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ বৃথা। কারণ যা জীবনের ওপর দিয়ে ঘটে গেল তার জড় মারতে আমার গত জীবন নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

এই সংঘটনের পরই আমায় কলোম্বিয়া ত্যাগ করতে হয়েছিল, কিছু নামের দায়ে কিছু মানের দায়ে। রেডিওতেও মনোযোগ বেশী করে দিতে পারছিলাম না। সেই সময় কলকাতার আশেপাশে জলসা দিতেই বেশী করে যেতে উঠলাম।

তখন বড় বড় সঙ্গীত সম্মিলনী হতো বড় বড় শিল্পীর স্মরণে। এর জন্যে শ্রোতাকে কোনোদিন পয়সা দিতে হতো না, বা শিল্পীরাও সম্মান রক্ষায় পয়সাও নিতেন না।

সেবার মুরারী সম্মিলন হচ্ছিল শিবনারাণ দাস লেনে শ্রীযুক্ত যদু বরাটের বাড়ির উঠোনে। 'মুরারীবাবু ছিলেন বিখ্যাত পাখোয়াজী। তাঁরই প্রমুখ ছাত্র ছিলেন শ্রীযুত দুর্লভ ভট্টাচার্য মশাই। দুলীবাবুর প্রচেষ্টায় এই সম্মিলন গড়ে উঠতো। ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়কদের ঘটতো মিলনবাসর। বিতরিত হতো শ্রেষ্ঠ শিল্পের পরিবেশনা। দূর হতে আসতেন—আবদুল করিম খাঁ, ফৈজ খাঁ, শিবা পশুপতি, গোপালবাবু, বিশ্বনাথ রাও, অঘোরবাবু, কুকুব খাঁ, পর্বত সিং—এমনি বহু গুণী শিল্পী। আবার হয়ত অখ্যাত অজানারাও এই সঙ্গীত আসরে স্থান পেয়ে প্রখ্যাত হয়ে উঠতেন।

যে সম্মিলনের কথাটুকু বলছি সেখানে জুতো রাখার জায়গায় সন্ধ্যা থেকে

ঘুমুচ্ছিলেন লুঙ্গিপরা এক মুসলমান সন্তান। রাত চারটের সময় তাঁর খোঁজ পড়লো। তিনি নাকি রাজাবাজারের কাফিখানায় মদ খেয়ে পড়ে থাকেন, নাম 'রমজান'। টপ্পায় এঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! জুতার রাশির পাশে শায়িত লুঙ্গি-পরা ব্যক্তিকেই রমজান বলে সনাক্ত করা হলো। তাঁকে ঠেলেঠুলে তুলে নিয়ে গিয়ে আসরে বসানো হলো। অতিকষ্টে চোখ ত্নটি খুললেন। চোখত্নটি যেন জবাফুল। মদের গন্ধে তাঁর পাশে বসা যায় না।

একটি হারমোনিয়ম তাঁর কোলে তুলে দেওয়া হলো। তিনি হারমোনিয়মের শুরুর পর্দার প্রথম স্বর টিপে গলা দিলেন—'সা'। তারপর সারা হারমোনিয়মের পর্দা ফুরিয়ে গেল কিন্তু তাঁর গলার মিষ্ট-ভরাটি আওয়াজ ফুরলো না। শেষে হারমোনিয়মটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললেন,—তানপুরা লে আও।

তানপুরা হাতে তুলে সুর ছেড়ে ছেড়ে যেন সংবিতে ফিরে এলেন তারপর শুরু করলেন— শোরী-মিঞার আসল টপ্পা। সারা আসরের গুণীরা ভুলে গেলেন রাজাবাজারের কাফিখানার মদেচুর লুঙ্গিপরা ঐ দেহটাকে—শুধু তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন তাঁর সুরের ফুয়ারা, তানের ফুয়ারা আর গায়কীর তরকীফ। সারা সভা গমগম করতে লাগলো। রাত চারটেয় শুরু হয়ে শেষ হলো বেলা দশটায়, তবু যেন শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়নি।

'শোরী আর মিঞা'—এঁদের গান শুনিনি, এঁদের ইতিহাস পড়েছি। এঁদের প্রেমের উপাখ্যানের নিগূঢ়তম রহস্যটুকু যেন সেদিন ধরা পড়েছে রমজানের গানের টপ্পায়! গাইছেন—

"কাগা তুম্ সব খা-ও, খা-ও চুন্ চুন্ মারো
মেরা নজর্ বাঁচাকে পিয়াকো দেখ্‌নে আশ"—

'হে কাক তুমি আমার দেহের সবটি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাও কিন্তু নজরটুকুকে অর্থাৎ চোখ ত্নটোকে বাঁচিয়ে রেখো, তার প্রিয় দেখবার সাধ আজও জীবিত।'

মিঞার বাবা ছিলেন লক্ষ্ণৌ—ধ্রুপদিয়া 'বড়ে মিঞা'-সাহেব। ছেলে ছোটে মিঞা ধ্রুপদ শিখেও ধ্রুপদে অনুরক্ত নন। তাঁর সদাই কানে বাজে 'খাইবার আর বোলান' পাশের উটের উপরকার যাযাবর যাত্রীদের উদাত্ত সুরের আহ্বান। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে তাই ছোটে মিঞা এই পথের সন্ধানে পথ ধরেন। পাহাড়তলির কাঁকর পথে হঠাৎ দেখা পান শোরী সুন্দরীর।

উটের পিঠে বেণী ত্নলিয়ে 'আহীর ভৈরবী'তে গলা ছেড়ে সুর তুলছিলেন।

এ গান এ সুর, এ রূপ মিঞা ভুলতে পারেন না। পাগল হয়ে ছুটে চলেন এই যাযাবর সুন্দরীর সন্ধানে। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, শুধু পড়ে থাকে পথ চলা।

তারপর, একদিন লাহোরের রূপ মহলে শুনলেন আবার সেই কণ্ঠ। হ্যাঁ, সেই তো—এই সে আজানা যাযাবর সুন্দরীর কণ্ঠ। দ্বারে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন আর রাত্রিকালে জলসা থেকে ভেসে আসে সেই কণ্ঠ। পারিপার্শ্বিক থেকে শুনলেন উপরের তলায় থাকেন শোরী সুন্দরী। অপূর্ব রূপসী, আরও অপূর্ব তাঁর সঙ্গীত।

মিঞা গিয়ে দাঁড়ান ওপর তলায়। বলেন,—'এক নোক্‌রি কী ওয়াস্তা।'

মিঞা এখন শোরীবিবির খাস চাকর। নিয়ে আসেন মজলিসের জন্যে তরকি পান জরদা। বাকী সময় দরজার পাশটিতে চুপটি করে বসে গান শোনেন।

বড় মাইফিল সেদিন শেষ হলো রাত দুটোয়। সেদিনের সঙ্গীতে মিঞা মাতাল হয়ে গেছে। মদ খেয়ে নয়—শোরীর গাওয়া, মাদক-সঙ্গীতে।

সবাই চলে গেছেন। দরজায় চাবি লাগিয়ে নেমে আসেন নীচের সিঁড়ির তলার ঘরে। এই তাঁর নির্দিষ্ট অবসর গৃহ। দরজায় খিল চড়িয়ে, গেয়ে ওঠেন শোরীর সুরের গীত লহরীটুকু উদাত্ত সুরে।

তিনতলার ঘরে সুখশয্যায় শুয়ে শোরী সবে নিদ্রালু। হঠাৎ কানে আসে তাঁর, পুরুষকণ্ঠের তানের লহরী। উঠে বসেন, পরে ধীরে ধীরে নেমে চলেন সিঁড়ি বেয়ে তাঁর নীচের তলায়। পায়ের চটির ফট্‌ফট্‌ শব্দে থেমে যায় সে সঙ্গীত লহরী। চাকর মিঞাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—কৌন গাতে থে? চাকর বলে—মুঝে ক্যা মালুম!

শোরী ফিরে চলেন আপন কামরায়।

আবার একদিন বসেছে মজলিসি জলসা। শোরী গাইছেন—'কাগা তুম্‌ সব খাও—খাও চুনচুন্‌ মারো স্রিফ্‌ নজর বাঁচাকে—পি-কে দেখ্‌নে আশ।'

সেদিন রাতেও ফিরে এল সে গানটুকু পুরুষ কণ্ঠ থেকে। শোরী চপ্পল ছেড়ে খালি পায়ে গিয়ে দাঁড়ান সিঁড়ির ঘরের পাশটিতে। শোনেন ওরই ভেতর থেকে ভেসে আসা গানখানি হুবহু তাঁর নিজের গাওয়ার অনুকরণ মাত্র।

দরজায় ধাক্কা পড়লো। বেরিয়ে এলেন মিঞা। শোরী তাঁর হাতটি ধরে তাঁকে তুলে নিয়ে যান ওপরতলায়। তারপর বাঁদীকে ডেকে বলেন—ইনকো গোসলখানামে লে যাও, হামাম দিলাও।

স্নানান্তে মিঞা এসে পরেন লক্ষ্ণৌ চুড়িদার পায়জামা আর ঢিলেহাতা কুর্তা।

শোরীর পাশে বসে তাঁকে গাইতে হয় আবার সেই গান—কাগা তুম্
ব খাও।

শোরীর পাশটি থেকে মিঞাকে আর জীবনেও উঠে যেতে হয় নি, বরং
নবিড় প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করতে হয়েছিল 'শোরী-মিঞার টপ্পা'।

এই সেই গান, আজ রমজান শোনালেন। যেন মনে হতে লাগলো—
শারী আর মিঞার প্রেমকম্পনের এ শুধু সুধাক্ষরণ! এর পর আর গান
লে না। তাই সভা ভঙ্গ হলো।

বাবার বন্ধু উত্তর করেন,—হ্যাঁ, এমনি কতই না গুণী শিল্পী অনাদৃত
অবস্থায় হয়তো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন—কেউ জানে না।

—হ্যাঁ, ধরুন না সাইগল সাহেব। লালাবাবুর বাড়িতে গিয়ে পড়েছিলেন
তাই তাঁর গুণাপনা শুনে লালাবাবু পাঠিয়েছিলেন আমাদের বেতার কেন্দ্রে
নৃপেনবাবুর কাছে। শ্রীযুত নৃপেন মজুমদার মশাই তাঁকে নিয়ে নিউ থিয়েটার্সে
তুলে ধরেন।

বাবার উপস্থিতিতে হঠাৎ থেমে যাই।

বাবা বলেন—কিছু খোঁজ পেলেন?

উনি বলেন,—হ্যাঁ। খুঁজে পেতে দুখানা কাগজ হস্তগত করে এনেছি,
এবং তাঁরা বলেছেন যে আরও খুঁজে দেখবেন যদি কিছু পাওয়া যায়।

বাবা বলেন,—খোকা তুমি ভেতরে একটু যাও তো।

চলি ভেতরের বাড়িতে কিন্তু কান খাড়া আছে বাইরের আলোচনায়।

শুনতে পাচ্ছি বাবা বলছেন,—সত্যি তাহলে ওঁদের বাড়িতে এ ধরনের
কোন শিল্পী ছিলেন?

বাবার বন্ধু বলছেন,—হ্যাঁ ছিলেন এবং যে দুখানি কাগজ সংগ্রহ করে
এনেছেন তাতে এ বিষয়টি পূর্ণ প্রমাণিত হয়। একটি হলো শ্রীশরৎচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বহস্তে লিখিত চিঠি যাতে তিনি লিখেছেন যে, তুমি আমার
বই থেকে Radioতে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে অভিনয় করতে পারো।
কিন্তু এ অনুমতি শুধু তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে দিলাম।

অপরটি রেডিওর তৎকালীন নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি সার্টিফিকেট—
যাতে প্রমাণিত হয় খোকা সত্যই রেডিওতে যা যা করেছে বলেছে তা উল্লেখিত
রয়েছে।

কান পেতে আড়াল থেকে শুনছিলাম।

হঠাৎ বাবার পায়ের আওয়াজ পেয়ে সরে যাই। বাবার হাতে রাখা দুখানি চিঠি নিয়ে বাবা মার সন্ধানে চলেছেন।

একটা নিদারুণ স্মৃতির ব্যথাতে সারা মনটায় আমার মোচড় দিচ্ছিল। হ্যাঁ, ঐ চিঠি শরৎদা নিজে হাতে লিখে আমায় সস্নেহে উপহার দিয়েছিলেন আমার নাট্য প্রতিভার জয়পত্র হিসেবে। এই তো সেদিন নৃপেনদা নিজে থেকে সার্টিফিকেট লিখে আমায় দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম—সার্টিফিকেটে আমার কাজ নেই। উনি বলেছিলেন—তবু দিচ্ছি রেখে দাও। হয়তো কোনোদিন দরকার হতে পারে। বিগত দিনের কথা হলেও, মনে হচ্ছে এতো সেদিনের কথা। আজ কৈ তো সে কালে আর পৌছতে পারছি না! কেউ কি ওই সব দিনে ফিরে যেতে পারে না?

আর, ফিরে গেলেই বা কি হবে? হয়তো উপেক্ষিত করে রেখে দেবে আধুনিক পৃথিবী, যেমন পুরাতন শিল্পীগোষ্ঠীকে ফেলে রেখেছে অতীতে ধুলোপড়া পাতার আবেষ্টনীতে। এ যেন, গরুগুলোর পিঞ্জরাপোলে বাস! ভালই হয়েছে মরে গিয়ে।

সংবিত ফিরে এলো মার গলার স্বর শুনে। মা বলছেন,—তাহলে তো সব সত্যি বলে থোকা। তবে আজ থেকে ওর ওসব আলোচনা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। দেখছো না ওই সব কথা কইতে কইতে ও কেবলই রোগা হয়ে যাচ্ছে।

বাবা চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। পরে যেন সমস্যার সমাধান করে বলেন, —আমি ভাবি কি জানো? ওর মন থেকে ওগুলো বেরিয়ে যাক, নইলে শুধু চিন্তা ওকে দিবারাত্র পীড়ন করবে। তার চেয়ে ওর গত জীবনের কথা সব ফুরিয়ে গেলে তখন ইহজীবন নিয়েই মেতে উঠবে।

আমি পা টিপে টিপে বাইরে বাবার বন্ধুর পাশটিতে এসে বসি।

তিনি বলেন,—তুমি যে রেডিওতে সঙ্গীত শিক্ষা আসর স্থাপন করেছিলে তা কৈ আমায় বলনি তো? আজ নৃপেনবাবুর একটি সার্টিফিকেটে তার কথা লেখা দেখলাম।

আমি বলি,—সে এক ভগবান ঈপ্সিত আবিষ্কার।

আমার সঙ্গীত শিক্ষাধীনে ছিলেন এক দৃষ্টিহীন ছাত্র। তাকে গান শেখাতে শেখাতে হঠাৎ একদিন মনে হয়েছিল যে, শুধু শ্রবণ দিয়েই যদি এঁর শিক্ষার

প্রশস্ত হতে পারে তবে মাইক্রোফোন দিয়ে এ পথ প্রশস্ত হবে না কেন? তাই গিয়ে নৃপেনদাকে একদিন সে কথা জানাই। উনি প্রথমে বলেছিলেন—absurd. বলেছিলেন—তা কি সম্ভব হবে, তাদের জিজ্ঞাসাগুলোর সমাধান কি করে হবে?

আমি উত্তর করেছিলাম,—চিঠিতে আর নকল আসর গঠনে।

তিনি চিন্তা করে একদিন আমায় ডেকে এই বিভাগ খুলতে অনুমতি দেন। মহা আনন্দে সেদিন আমি আমার অগ্রজ শিল্পী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়কে দিয়ে এই বিভাগের ঘটস্থাপনা করাই।

আমি ছিলাম বেতার নাটুকে দলের কর্ণধার আর বীরেন ভদ্র মশাই ছিলেন বিষ্ণুশর্মারূপী মহিলা মজলিসে পুরোহিত। কেবল আমাদের সহৃদয় বন্ধু শ্রীযুত পঙ্কজ মল্লিকমশাই বিশিষ্ট কোন আসনে সমারূঢ় ছিলেন না। তাই আমরা নৃপেনদাকে অনুরোধ করে তাঁকেই এ আসনে অধিষ্ঠিত করি। এই হলো বেতার সঙ্গীত শিক্ষা আসরের ইতিবৃত্ত।

বাবার বন্ধু আবার প্রশ্ন করেন,—তুমি শব্দযোজনা না কি করে বেতারের নতুনত্ব করেছিলে?

আমি উত্তর দেই,—ঠিক তা নয়। ব্রডকাস্টিং স্টেশনের পূর্বতন স্টেশন ডিরেক্টর মিঃ চ্যাপম্যানই এর উদ্বোধন বা শুরু করে যান। আমি এ পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করি মাত্র।

—সে কেমন?

—নৌকায় গান গেয়ে মাঝি যাচ্ছে, তার পারিপার্শ্বিকীটুকু যাতে সজীব হয়ে ওঠে তাই হয়তো বালতিভরা জলে হাত চালিয়ে ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজ তুলেছি আর হোমিওপ্যাথি শিশির মুখের কর্ক মুচড়ে দাঁড়ের কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ উৎপাদন করে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছি। এমনিতর শব্দযোজনাতে গানখানি জীবন্ত বাস্তবের রূপ দেয়। প্রপাতের শব্দ বিস্কুটের কোঁকড়ানো পাতলা কাগজের লম্বা গুচ্ছ নাড়িয়ে আর বালতিভরা জলে ঘুঙুর সঞ্চালনে সৃষ্টি করেছি পাহাড়ী ছোট প্রপাতের অবিশ্রান্ত ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ আর কলকল ধ্বনি। এমনি করেই বজ্রপাত, মেঘ গর্জন, সমুদ্র সৈকতের সাগর তরঙ্গের আছাড়ি-পিছাড়ি—কত কি! এগুলোর দিকে আমারই বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল।

একবার বাণীকুমার প্রযোজিত শিবরাত্রির প্রোগ্রামে মন্দাকিনীর অবতরণ শব্দযোজনা এতই সুললিত হয়েছিল যে বার বার ফোন এসেছিল যেন এ শব্দ না থেমে যায়।

বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর বন্ধুকে বললেন,—চলুন একটু বেড়িয়ে আসি

শিক্ষাপথের পথিক আমি। পথ ধরে এগিয়ে চলা যায়, গুরুর পথে ফিরে যাওয়া বড় কঠিন। যাঁদের পথের পাশে দেখা পেলাম তাঁরা অতীতের পান্থশালায় পড়ে রইলো, সামনের সরাইখানায় পাই নিত্য নতুন অতিথি। তাদের সহবাসে জাগে নতুনের অনুপ্রেরণা এইটিই চিরন্তনী কিন্তু শিল্প-পথিকের কাছে শিল্পী সহবাস না হলে জাগে জীবনভরা ধিক্কার। দিন এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন শিল্পী সহযাত্রীদের সংখ্যা কমে যেতে দেখলাম। পথের যাত্রীর সব অতীত পথের মহীরুহ হয়ে পেছিয়ে পড়ে থাকেন। সামনের পথ দিনের দিন ধুধু প্রান্তরে পরিণত হয়। আগেকার শিল্প সাধনা, শিল্পী গোষ্ঠীদের যোগসূত্র যেন হঠাৎ কোথায় খেই হারিয়ে ফেলেছে, আগামীকালের কালচক্রে তা যেন উপলব্ধি করতে শুরু করেছি।

যে শিল্পনিষ্ঠাটুকু শত আবর্জনামাখা জীবনযাত্রায় আশার আলোক দেখাতো তা যেন আজ সামনে থেকে নিঃশেষিত হতে চলেছে। কোন শিল্প অনুপ্রেরণার অনুরোধে এই অধঃপতন তাও যেন দিনের দিন বুঝতে পারছিলাম। তাই নতুন করে সবুজ হবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘিরে শোনা যেতে লাগলো—ছড়াগান, ভাবহীন ভাষাহীন বাদ্যে সুরারোপ। ছেলেবেলায় ঠাট্টা করে গান গাইতাম 'অয় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে' —খেমটা সুরে। এরাও যেন প্রথম ভাগ ছেড়ে দিয়ে ধরে ফেলেছে পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ। রাগ, রাগিণী তান, লয়, মান-কে যেন ত্যজ্যপুত্রের মতো শিল্পাধ্যায়ীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে সব।

যে সমস্ত শিল্পপীঠ এই শিল্পসাধনার ভার নিলেন তাঁরা যেন তাঁদের পূর্বকৃতিত্ব ভুলে বসেছেন বা তাঁদের ওপরওয়ালার চাপে পড়ে তা জোর করে গলাটিপে প্রতিরোধ করে বসে পড়েছেন। আগামীকালের শিল্পানুরাগীরা একটা গান লিখেই যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েন তা প্রদর্শনীর জন্যে। তারা ছুটে চলেন জলসায়, বেতারে আর রেকর্ডে। আর যারা এদের মনোনীত করার কর্মাধ্যক্ষ, তাঁরা প্রকৃত শিল্পটুকুকে বোধকরি নিজে অনুধাবন করতে না পেরেই ব্যাকডেটেড আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন গুণী শিল্পাচার্যদের। আক্ষেপ নেই, হচ্ছে বিক্ষোভ!

প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছে।

উনিশ

তাই, সব ছেড়ে, সব ফেলে পালিয়ে এসেছি হরিদ্বারে।

সেখানে আজও 'হরকা পেউড়ি'র গঙ্গাবক্ষে বহু সাধকই সঙ্গীত মাধ্যমে সাধনা করেন। ভেবেছিলাম এই পথে এগুতে পারলে হয়তো হিমালয়ের কোনো গোপন গহ্বরে পাবো আবার যোগিনীর দেখা। তাঁর কাছে আমার শিল্প সাধনার পুঁজি এ জন্মের মতো জমা রেখে পরজন্মের পথটুকু চেয়ে নেবো।

বত্রিশ বছর বয়সেই হয়েছি বুড়ো, অন্তরে এসেছে এক নিবিড়-শিল্প-বিরাগ। আমাদের ভবিষ্যতের শিল্পীগোষ্ঠীরাই আজ আমায় পাঠিয়েছেন কৈবল্যের পথে—মহাপ্রস্থানে।

হৃষিকেশ পর্যন্ত যোগিনী মায়ের সন্ধান পাইনি।

লছমনঝোলার ঝোলা পুল পার হয়ে ওপারে স্বর্গদ্বারে দেখা পেলাম এক সাধুনীর। বয়েস বেশী নয় তবে মাথায় একমাথা জটা। ওখানকার সবাই তাঁকে ডাকে 'জটিয়া মা' বলে। জটিয়া সাধুনী গান করেন চিমটে বাজিয়ে। লোহার লম্বা চকচকে চিমটে এক হাতে, আর হাতে রাখা থাকে মহাদেবের ত্রিশূল।

মাটিতে ত্রিশূল পুঁতে, চিমটে বাজিয়ে গান করেন। বহু সাধু সন্তদের ভিড় জমে তাঁর গান শোনার জন্যে।

চক্‌চকে চিমটের মাঝখানে ছোট্ট একটি কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দেন, তারপর পা দিয়ে চেপে ধরেন চিমটের আগার দিকটা। চিমটের মাঝখানটা ধনুকের মতো ফুলে ওঠে। বাঁহাতের আঙুল দিয়ে তাতে চাপ দিয়ে সুরের ওঠা-নামা করান আর ডান হাতের লোহার বালা দিয়ে ঘা মারেন, চিমটের গায়ে—তাতেই সুর বেরোয়। অদ্ভুত তাঁর বাদ্যযন্ত্র। বলেন—এই হচ্ছে শিবের হাতের একতন্ত্রী বীণা। একতন্ত্রী বীণায় যখন ঘা পড়ে তখন সারা পাহাড়তলী প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে—এক অভূতপূর্ব সুরের ঝঙ্কার, যার অনুরণনের প্রতিটি শ্রুতিক্ষেপ যেন সারা বনস্থলীকে স্তব্ধ করে দেয়।

জটিয়া সাধুনীর গলাটি ভারী মিষ্টি। ভৈরব রাগেই সিদ্ধিলাভ করেছেন। যেদিন আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ওঁর গানে আসরে, সেদিন গান অবসানান্তে আমার দিকে এক চুম্বকী দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ওয়াকত্‌ হো গয়া।

প্রাণের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল! কিসের ওয়াকত্ হয়ে গেছে?

এই সেই কথা যা আবদুল করিম খাঁ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার পূর্বে তাঁর প্রিয় শিষ্যদের ইশারা দিয়েছিলেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এক মহারাজের দরবারে গান শুনিয়ে ফিরলেন খাঁ সাহেব ট্রেনে করে। হঠাৎ ট্রেনের কামরায় বসে খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, —ওয়াকত্ হো গয়া বেটা—সাজ উতার লো!

সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুচারজন শিষ্যবর্গ আর তাঁব মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত মেয়ে শ্রীমতী রোশেন।

গাড়ি এসে থামলো একটি ছোট্ট অখ্যাতনামা স্টেশনে। শিষ্যমণ্ডলী খাঁ সাহেবের হারমোনিয়ম, তানপুরা তবলাদি সব নামিয়ে নিলেন। রোশেনারা বাবার হাতটি ধরে স্টেশন প্রাঙ্গণে নেমে দাঁড়ালেন।

বৃদ্ধের ইঙ্গিতে, অদূরে একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় শতরঞ্জি বিছিয়ে খাঁ সাহেবকে বসানো হলো।

জোড়া তানপুরায় সুর বেজে উঠলো তবলা আর হারমোনিয়মের সঙ্গীত সেই অখ্যাত স্টেশন-অঙ্গনকে সুরে সুরে ছেয়ে ফেললে।

উনি বললেন,—রোশেনারা বেটি, শুরু হো যাও!

রোশেন সুর ধরলো। তারই সঙ্গে সঙ্গে খাঁ সাহেব তাঁর কণ্ঠ লহরীতে তুলতে লাগলেন সুরের বিস্তার আলাপন। সে আলাপনে আলাপনে নাকি সেদিনের সারা আকাশ বাতাসে এক যৌগিক ছন্দের আলোড়ন তুলেছিল। আলাপনের দ্রুত লয়ের ছন্দে সারা প্রাঙ্গণ থরথর করে কেঁপে উঠেছিল—তারপর সব নিস্তব্ধ! নিমেষে থেমে গেল সঙ্গীতের শতমূর্ছনা। খাঁ সাহেবের দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

যেদিন শ্রীমতী রোশেনারা নিজ মুখে তাঁর পিতৃবিয়োগের ইতিবৃত্ত আমায় শুনিয়েছিলেন, সেদিন আমারই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রীহরিশচন্দ্র বালি আব শ্রীদিলীপ বেদী। তিনজনেরই সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল —এ কি করে সম্ভব হয়? এতো সম্ভব হয় কেবল সাধুদের চরিত্রে, যাঁরা ভূত-ভবিষ্যকে তাঁদের আত্মচুম্বনী শক্তি দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন। বেদী সাহেব বলেছিলেন—এ সম্ভব শুধু গাইয়েদেরই। কারণ সারা জীবন তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে কেবল ছন্দেরই সঙ্গে আলাপ-বিলাপ, আহার বিহার করে গেছেন। এঁরা সব পুঞ্জীভূত বিশ্বছন্দের কণিকা মাত্র। তাই যখন তাঁদের নিজের অন্তর ছন্দটুকু

বিশ্বছন্দকে অনুধাবন করে তখন সেই ছন্দের সঙ্গে মিশে য'বার অনুপ্রেরণা আপনা-আপনিই হৃদয়ে উপলব্ধি করেন। তাই, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব ফেটে বিশ্ব-বিদ্যুতের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতোই এঁরা মিশে যান।

এই ছন্দানুভূতি নিজের দেহের মধ্যে উপলব্ধি যখন আসে তখনই খাঁ সাহেবের মতো বলে বসেন—ওয়াকত্‌ হো গয়া।

আজ সাধুনীর কথায় তাই চমকে ওঠে আমার অন্তর দেবতা!

তাঁর সঙ্গে সজ্ঞানে তিনদিন আর তিনরাত সঙ্গ করেছিলাম। এই তিনদিন তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন সঙ্গীতের যৌগিক ব্যাখ্যা। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন—শব্দ ব্রহ্মা হ্যায়, ইসি লিয়ে সুর-ভি ব্রহ্ম হ্যায়। ব্রু+অহম্‌ ইসি লিয়ে ব্রহ্ম। ব্রু অর্থে কথা বলা, তাই যে আমি কথা বলছি, সেই ব্রহ্ম।

কথা মানেই শব্দ। শব্দ মানে অনুরণন ঝঙ্কার (vibration & frequency)। অনুরণন থাকলেই তার ছন্দ থাকবে। সূর্য বিভিন্ন আধারে পরিগমন করে সৃষ্টি করছে বিভিন্ন ছন্দ-তরঙ্গ। কোটি কোটি তরঙ্গ জন্ম দেয়, কোটি কোটি শব্দ-তরঙ্গ। পরিমাপ ভেদে এই শব্দ-তরঙ্গ থেকেই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি হয়েছে। মাত্রা ভেদে কেউ প্রস্তর, পর্বত, কেউ উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ—আবার কেউ মানুষ। শব্দ-তরঙ্গের পরিমাপের তারতম্যেই বিভিন্ন আকার আর বিভিন্ন আকৃতি।

গাছের কাণ্ডে, ডালে, পাতায় সুর ভরা। শুকিয়ে তক্তা করলে সুর বেরোয় না! টেবিল, চেয়ার, আলমারি, দরজা, জানলা দিয়ে সুর বেরোয় না, কিন্তু তাকে পরিমাপে ফেললে কাষ্ঠ-তরঙ্গ জাইলোফন তৈরী হয়। সে তখন সা-রে-গা-মা হয়ে বাজতে থাকে। সুর আর ছন্দের অবিমিশ্রণ সম্বন্ধ রাখা আছে এই পরিমাপে, শুধু বৃক্ষ অথচ সুর তোলে না।

আজ যে সমস্ত শিল্পী জগতে প্রতিভা ছড়িয়ে গেলেন তাঁরা সব পরিমাপের কাষ্ঠ-তরঙ্গ। বাস্তব মহীরুহ থেকে যুগ যুগ কালের আবর্তনে পরিমাপ সৃষ্টি করে' এরাই বেজে উঠেছিলেন জাইলোফোনের পর্দার মতো।

যেমন বাস্তব গন্ড-সেবক মানুষেরা সব মহীরুহ। এরাই আবদ্ধ পরিমাপের উকোর মুখে ঘষা খেয়ে হলো পদ্য-সেবক। পদ্য-সেবকরা যখন সূক্ষ্ম পরিমাপের উকোর মুখে আবার পড়েন তখন তারা মার্জিত হয়ে গড়ে ওঠেন, গীত-সেবক। এমনি করে গীত-সেবক সঙ্গীত-সেবকে পরিণত হন। আবার সঙ্গীত-সেবক ছন্দ-সেবকের পর্যায় পর্যবসিত হন। এই ছন্দই সৃষ্টির আদি আবার এই ছন্দই

পৃথিবীর অন্ত। কাজেই যে শিল্পলোক আজ জ্যোতিষ্মান কাল সে হবে কালের পরিক্রমায় ম্লান। এ দেখে দুঃখ করিস না বেটা। ম্লান—সে আবার একদিন জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। এই প্রকৃতির ধারা। শিল্প আর শিল্পী দুইই এই পর্যায় বার বার ওঠা নামা করছে। এ শুধু যুগ পরিবর্তন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগ এসব তুমি মানো জটিয়া মা?

তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম,—আমি না মানলেও প্রকৃতি ছাড়বে কেন? তাই আমার মানামানির অপেক্ষা রাখে না প্রকৃতিমা। এ যে সূর্যের পরিক্রমা মাত্র। সত্য যুগ মানে স্বর্গ যুগ। অর্থাৎ এই যুগে সূর্যরশ্মি পরিক্রমার পরিমাপে স্বর্ণসৃষ্টি করার শক্তি প্রচুর ছিল, তাই তার নাম স্বর্ণযুগ। পরবর্তী পরিক্রমায় সেই রশ্মিই পরিমাপ ভেদে সৃষ্টিশক্তি বাড়ালো রজত অর্থাৎ রৌপ্যসৃষ্টি শক্তিকে. তাই তাকে রজতযুগ বলা হলো। তার পরের পরিক্রমায় জন্মেছিল প্রস্তর—প্রস্তর যুগকেই দ্বাপর যুগ বলা হতো। আজকের যুগাবর্তে সূর্যরশ্মি লৌহ সৃষ্টির প্রাচুর্য লক্ষ্য হয়, তাই সে লৌহযুগ। এ সবের জন্যে প্রকৃতি কারো মতামত, বিশ্বাস অবিশ্বাসের তোয়াক্কা রাখেন না। সূর্যরশ্মির অনুরণন প্রণালীর এই ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে প্রকৃতি নিজে তাই শিব নিজে লোহার ত্রিশূল আর লোহার চিমটে ধরে যুগান্ত দর্শন করিয়ে গেছেন। নইলে কি তাঁর সোনা-রূপার অভাব ছিল বেটা?

যুগ পরিক্রমায় আপনিই আসবে আবার সত্যযুগ। তখন তোমার কালোয়াতী সুর-শিল্প হয়ে যাবে আবার পূর্ব বৈদিকী সামগান অর্থাৎ absolute music. আজ শিল্প-জগতের প্রলয়ক্ষণে তাই আমি সব যন্ত্র ছেড়ে চিম্‌টে বাজিয়ে গান করে চলেছি, তুমি নিরূপায় হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। তাইতো বলছি বেটা আর বেশী দিন এসব সইতে হবে না—ওয়াকত্‌ হো গয়া অর্থাৎ প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। আবার এর অবসানেই শুরু হবে আভ্যুদয়িক সঙ্গীত, যে সঙ্গীত আত্মোন্নতির পরম আর চরম পথ।

অবাক হয়ে তিনদিন তিনরাত্রি তাঁর মুখের পানে চেয়ে শুধু ভেবেছি, অরণ্যবাসিনী এই জটাধারিণী সাধ্বীর এ জ্ঞান কোথা থেকে এল।

চারদিনের ভোর থেকেই খুব জ্বর হলো আমার। বিকেল পর্যন্ত জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছি। মাথার শিয়রে বসে জটিয়া-মা, গান গাচ্ছিলেন চিমটে বাজিয়ে আর আমি যেন কোন এক স্বপ্নালোকে বিচরণ করে বেড়াতে লাগলাম।

জ্ঞানে কিম্বা অজ্ঞানে সে বোঝার ক্ষমতা ক্রমেই যেন নিঃশেষ হয়ে তাঁর কোলে মাথাটা আমার ধীরে ধীরে তুলে নিলেন এইটুকুই যেন উপলব্ধি করলাম। তারপর আমার মনে নেই!

সাতদিন পরে চোখ খুলেছিলাম। শরীরে শক্তির অবলেশটুকুও ছিল না। মন যেন সারা অতীতে স্মৃতি হারিয়ে জবুথবু হয়ে পড়েছে।

জটিয়া-মা বলছিলেন,—ঘর ওয়াপস্ যাও। এখনও তোমার এ যাত্রার দেরি আছে। ভাঙা আসরেও শিল্পচর্চার তোমাব প্রয়োজন।

হরিদ্বারে ফিরে এলাম। একমাস কাটিয়ে ছিলাম হরিদ্বারে। মনটা দিনের দিন চাঙ্গা হয়েছিল। জটিয়া-মার সংস্পর্শে মনে হয়েছিল কলকাতার কালিমা বুঝি কিছুটা ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

হর্‌কা-পেউড়ির সিঁড়িতে বসে রোজই চেয়ে দেখি লোক সমাগম। বিকেলে এসে বসে কত না পাঞ্জাবী পরিবার। শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে গল্প করে আর টিফিন ক্যারীয়ার খুলে খায় খাবার।

সুদূর নীলান্তের পাহাড়ী দেয়ালের পাশ থেকে বেঁকে চলেছে নীলধারা। ওর স্রোতে ভাটা পড়েছে। নিকটের কাটাখালে জোয়ার নেমেছে—স্রোতের বিরাম নেই। জলে নামলে টেনে নিয়ে চলে যায়। আমার মনের সুদূর প্রসারী, নীলধারারই অবস্থার মত, আশে পাশের নতুন কাটা রঙিন ছবির খোঁজে চোখ অনবরত বিক্ষিপ্ত। অদূরের দুটি মহিলার একত্র ঘোরাফেরার দিকে চোখ বেধে গেছে।

প্রথম দিন ওর দিকে চাইতেই কি যেন কি শিহরণ ঘটে গেছে। চেষ্টা করতাম ওর দিকে না চাইবার তবু যেন চোখ টেনে নিয়ে যেতো ওর ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির দিকে। অপ্রতিভ হয়েছিল ও-ও প্রথম দিনে। ফরসা রঙের নিটোল গালে লালের ছোপ ধরেছিল। চার চোখের দৃষ্টির বিনিময় থেকে দুটো প্রশান্ত চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তবু যেন কটাক্ষে ছিল আমারই গতিবিধি লক্ষ্য করার প্রবল তাড়না।

ওর সঙ্গে থাকে একটি মাত্র দাসী। ওরা যেন দুটিতেই এক পরিবার। চাওয়া-চাওয়ীর উচ্ছলতা বোধ করি দাসীটির চোখ এড়ায় নি তাই ও চলে যেতো জল-কচুরি কিন্‌তে, তখন হয়ত ফিক্ করে একটু হেসে নিয়েছে আমার পানে চেয়ে। সে হাসিতে আমার বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মনে হয়েছে ওর সঙ্গে পরিচয় হলে বেশ হয়!

এ আবার কোন রাস্তায় নামাতে চান ভাগ্যবিধাতা। সুরের পিয়াসী হঠাৎ রূপ-প্রেমিকের খাতায় নাম লেখাতে চাইছে।

ব্রিজে ছোলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাছেদের খাওয়াচ্ছিলাম। ও এসে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অনুভবে বুঝতে পেরে আমার উদ্যম বেড়ে গিয়েছিল। ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবাই গঙ্গার স্রোতে দীপমালা, কলার ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে গঙ্গাজীকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

ওর দাসীর হাতে ধরা এমনি দুটি ভেলা।

আমার পাশটিতে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কিভাবে দুটি ভেলাই ওর মালিকানের হাতে তুলে দিয়ে দাসী অন্যত্র চলে যায়।

আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে, হঠাৎ ও বলে ওঠে,—ধর বাবুজী! এসো দুজনে একসঙ্গে ভাসিয়ে দি।

কথার উত্তর দিই নি। তবে তার হাত থেকে ভেলা নিতে গিয়ে তাকে স্পর্শ করেছিলাম। স্নিগ্ধ আকাশে চাঁদ উঠেছিল তবু সহসা বিদ্যুৎ চমকে গেল সারা শরীরটার মধ্য দিয়ে। হাতের ভেলা দুজনে পাশাপাশি ছাড়লাম। ওরটা এগিয়ে গেছে স্রোতে। দূরে—আরো দূরে কোথাও বাধা পেলো না, স্রোতের মুখে তরতর ছুটে চলেছে। আমার ভেলাটা কেমন কাত হয়ে পড়লো, পরে জলের ধাক্কায় পাড়ের সিঁড়িতে গতিশূন্য হয়ে রয়ে গেল।

ভাবছি—গতিহীন জড়ত্বই তো মৃত্যু।

হঠাৎ মধুক্ষরা স্বরে ও বলে,—বাবুজী, কোথায় থাকেন?

সন্ধ্যার আবছায়ে জমে ওঠে আলাপন, পরিচয় এবং সর্বশেষ নিমন্ত্রণ!

পরদিন ওর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম ভীমঘাটে।

দেখি, রূপসী সকাল বেলায় তানপুরা হাতে বসে, রেওয়াজ করছেন।

গায়িকা! তবে হয়তো কোন বড়দরের বাঈজী হবেন।

ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খাতিরখাত্‌রাটুকু ইশারায় বন্ধ করেছিলাম। আসন নিয়ে, মন দিয়ে গান শুনতে শুরু করে দিই।

দাসী এসে হাতে চায়ের কাপ ও কিছু খাদ্যাদি ধরে দিয়ে যায়।

বেশ গাইছে। কসরতি না থাকলেও সাদামাটা সুরেলা গলা। ভৈরবীতে গাইছে 'বাজুবন্দ খুলি খুলি যায়'—বহু পুরাতন গীত।

গান শেষ করে আমায় বলেন,—অব্‌ আপ্‌ কুছ পেশ কিজিয়ে।

আমি বলি,—আমি গান জানি কে আপনাকে বলল?

মধুর হেসে রূপসী জবাব দেন,—নেহী তো যাঁহা ম্যায় আচ্ছা গাতি থি আপকা বদন্‌পর মুস্করাট আতি থী, অওর যব ভুল গাতি থী তো আপকো বদনপর্—বলে হেসে ফেললো।

আমি বলি,—তবে দিন তানপুরাটা।

গান ধরেছি,—মালনীয়া! আব্ লাও মালা।

অজান্তে গানের ভেতর দিয়ে হঠাৎ মালা চেয়ে বসেছিলাম।

এই মালাটুকু সে এনে একদিন আপন হাতে আমায় পরিয়ে দিয়েছিল—তখন দুজনেই আমরা মথুরায়।

কৃষ্ণা ছিল পাঞ্জাবী ছত্রী। বালবিধবা। উপরওয়ালা বলতে আপনি আর দাসী। তাই আমাদের মধ্যে একটা কেমন যেন সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। ওর কর্মপদ্ধতিতে কোনোদিন আমি দখল দিইনি, দাবি জানাইনি। যেটুকু প্রাপ্য ও আপনি অর্ঘ সাজিয়ে দিয়েছে। পাষাণ দেবতার মতোই বসে বসে তা গ্রহণ করেছি, তৃপ্তি পেয়েছি। চাহিদা নেই তাই বিক্ষোভও নেই! অথচ—

তার কাছে কিসের প্রয়োজনে জানি না, আসতো কত যে অনুচর! তাদের আসা-যাওয়া চালচলনের পীড়নে কখন কখন মনের একান্তে কোথা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো jealousy. মনে হতো একি জ্বালা, ওকি আমার কেনাকালের? নিজেকে সামলে রাখতাম। স্মরণ করতাম নলিনীর সঙ্গের দিনগুলি। জীবনে আর নতুন করে ঘর বাঁধার নেশা নেই।

কাজ না থাকলে কৃষ্ণাকে গান শোনাতাম। ও গান শিখছে ফিল্মের উপযুক্ত করে নিজেকে তোলার আশায়।

মাথুরায় বিশ্রাম-ঘাটে বসে ও আমার কাছে বাংলা গান শিখেছিল—

আরতি-দীপ কে জ্বালিল, যমুনার তীরে—
সখি, কাজল মাখা নীরে।

সেদিন সকাল থেকে কৃষ্ণা বাড়ি নেই।

সারাটা দিন একলা কেটেছে। বিকাল বেলায় তাই, একাই যমুনার ধারে ধারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি ঠিক যেন গোষ্ঠহারা গরুর মতো। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকলাম। আমার ঘরের পাশের ঘরই কৃষ্ণার থাকার ঘর।

ঘরে ঢুকে একটু অবাক হয়ে গেলাম। আমার বিছানা-পত্তর সব গায়েব। পরিবর্তে তক্তার উপর একটি মসৃণ চাকচিক্যে গড়ে উঠেছে নতুন বিছানা।

হঠাৎ দাসী এসে ঘরে ঢুকে বলে,—বাবুজী, আপনি ওপরে আসুন। ছাতের ঘরে আপনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ব্যাপারটা বুঝবার আগেই দাসীকে অনুসরণ করলাম।

ঘরে ঢুকে দেখি আমার বিছানাটিও বেশ পরিপাটি করে সাজানো। বিছানায় বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম,—হঠাৎ এ ব্যবস্থা কেন?

দাসী উত্তর দিলে,—বোম্বাই থেকে দেশাই শেঠজী এসেছেন তিনি নিচের ঘরেই থাকবেন। কাল দিদিমণিকে নিয়ে বোম্বাই চলে যাবেন।

কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। দাসী হেসে বললে,—বিবিজীই আপনাকে সব বলবেন। দাসী বেরিয়ে যায়।

বুঝলাম কৃষ্ণার ডাক এসেছে বোম্বাই থেকে। বোধ হয় ফিল্ম লাইনে। ওর রূপ আছে, চেহারা আছে, হিরোইন হবার যোগ্যতা আছে। কারো যোগ্যতার পুরস্কার এলে হিংসে করার কিছু নেই। তবু যেন মনটা কেমন হয়ে গেল।

খবরটা রাত্রে ও নিজেই পৌঁছে দিলে। আমায় বললো,—চলো আমার সঙ্গে।

আমি বলি,—যাবো, কোন পোস্ট নিয়ে।

উত্তর দিতে পারে না ও।

বলে,—তবে মত দাও!

আমার মতামতের অপেক্ষায় ওর ভবিষ্যৎ আমার দিকে চেয়ে থাকল এও আমি সহ্য করতে পারিনি। তাই 'হ্যাঁ'ও বলিনি আবার 'না'ও বলিনি।

বলেছিলাম,—তুমি তো স্বাধীনা। জোর করে অধীনা হতে চাচ্ছ কেন? আমার মত একটা থাকলেও বা সেটা গ্রহণ করবে কেন?

ও কেঁদে ফেলেছিল!

কিন্তু কেন? কান্নার কি আছে বুঝি না।

ওর বিদায় ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা থাকলেও, যাবার আগের দিন উঠে গেছি বাবার আমলের পাণ্ডার বাড়িতে। তিনি এক বৃদ্ধা, নাম জমনা বাঈ। পিতৃ পরিচয়ে খাতির দেখালেন। বললাম, —নিঃস্ব আমি কিছু দিতে পারবো না।

কৃষ্ণা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার নতুন বাসার নতুন ঘরে। এক গোছা

নোটের রাশি আমার হাতে দিতে সাহস না পেয়ে দিতে গিয়েছিল জম্‌না বাঈয়ের হাতে। জম্‌না বাঈ তা নেন নি। বরং বলেছিলেন,—উহ্ মেরা বেটা হ্যায়। রহে গিয়া, মথুরানাথ সাম্‌হাল লেঙ্গে।

হয়ত জম্‌না বাঈএর সম্বন্ধটা বুঝে ফেলেছিলেন। হাজার হোক অনেক পোড় খাওয়া বৃদ্ধা তো, লোক চরিয়েছেন অগণিত।

যাবার সময় কৃষ্ণা দু' ফোঁটা চোখের জলও ফেলেছিল, কিন্তু বুকে দাগ কাটেনি। তবে বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করলাম।

এখন একা একাই যমুনার উপকূলে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় প্রদীপের ভেলা ভাসাই। একা একাই গান করি—আরতি দীপ কে জ্বালিল যমুনার তীরে, সখি কাজল মাখা নীরে।

গাইতে গিয়ে যেন কার আগমন পথ অপেক্ষায় ক্ষণ কেটে যায়। কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত পিপাসা নিয়ে বসে থাকি—কার পথ চেয়ে। গানখানির বাকী পদ কটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আপন মনে মনের বিক্ষোভে গেয়ে উঠি—

পসরা বহি শিরে—সখি কি চাইবে ফিরে,
গোপনে নিলাজ আঁখি, চাবে কি ঘোমটা চীরে,
সোহাগের গরব হাসি, পড়বে খসি,
সখি, লুটিয়ে দেবে চরণতলে পূজার ডালি—নয়ন নীরে,
এই—যমুনারই তীরে।

গরবিনী পসরা মাথে বেসাতি করতে চলে গিয়েছে। আজ যমুনার কূলে পড়ে আছে শ্রীমতীর পথ চেয়ে তার বিবাগী শ্রীমান। বাউলমন হয়েছে; প্রেমের দায়ে কিনা জানি না তবে মন আজ সত্যিই বাউলিয়া।

হঠাৎ জম্‌না বাঈ আমায় খুঁজে বার করে বলেন,—বেটা, আজ মথুরানাথকী মন্দিরমে গানা বাজনা হোগা। তুম তো বহুত আচ্ছে গাতে হো। চলো মেরে সাথ, উহাঁ কুছ গানে হী পড়ে গা।

মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। উত্তর দিলাম না। মনে মনে বুঝলাম জম্‌না বাঈ প্রেমের মর্ম বোঝেন তাই আমার বিবাগী মনকে ঠাকুর, মন্দির দিয়ে ভোলাতে চান।

উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম মন্দ কি! মথুরানাথের ডাক এসেছে বুড়ীর মারফত, যেতে হবেই।

দুঃসহ নিঃসঙ্গতার চেয়ে অকারণ ভিড়ও সময় সময় ভালো লাগে। মথুরানাথের মন্দিরে সেই অকারণ ভিড়। পার্বণ নয় কিছু নয়, দৈনন্দিন আরতি। তবু এত ভিড় কেন? ভক্তেরা সব সমস্বরে দোহা আবৃত্তি করছেন। তার সঙ্গে পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর আওয়াজ সারা মন্দির প্রাঙ্গণকে গম্‌গমিয়ে দিচ্ছে। খুব ভাল লাগলো।

আরত্রিক শেষ হলে সকল ভক্তেরা একসাথে মাথা নীচু করে নিজেদের মাটিতে মিশিয়ে দিল। খালি আমি উদ্ধত মস্তকে চেয়ে থাকি ঐ মথুরানাথের দিকে। ভাবি, ইনিই কালীয় দমন করেছিলেন, শতফণা কালিন্দীর মাথায় পা রেখে তাদের বিষাক্ত ঔদ্ধত্যকে নমিত করেছিলেন। আজ তাই সবার অহমিকার ফণা তাঁর পায়ে একসাথে লুটিয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে কবির কথা মনে পড়ে গেল—মনে পড়ে গেল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে মাঘোৎসবে গাওয়া, কবির অমর গীতাঞ্জলির প্রথম স্তবক—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে'।

মাথা নমিত করে প্রণাম জানালাম। বললাম—আমার শত কালিমার শত বিষাক্ত গর্ব-দম্ভ আজ তোমার পদস্পর্শে নত হোক।

শান্তি পেলাম।

যাদের সঙ্গ পেয়ে পান্থশালার বন্ধনস্মৃতি মনের ফাঁকে ফাঁকে জাল পেতে ভবিষ্যতের আশা পথ চেয়ে কাল গুণছিল, তারা যেন আজ প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল। মনে হলো—সত্যই আজ আমি মুক্ত।

গানের সভা বসেছে। পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ গান। অথচ ভক্তিরসের অভাব নেই। ভারী ভাল লাগছিল। হঠাৎ জম্‌না বাঈ আমায় এঁদের সঙ্গে রসভঙ্গ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তানপুরাটা আমার হাতে এগিয়ে এল। সুর ছেড়ে বাংলার বৈরাগীদের মতো গেয়ে উঠলাম—'ইয়া জগ ঝুটা—জানেরি মন'। শঙ্করা-রাগের একটি পূর্ণাঙ্গ চৌতাল। এক গানের পরই বুঝলাম সভা জমে উঠেছে। সবাই তারিফ করছে। কিন্তু যাঁর সামনে গাইছি তাঁর তো কৈ সাড়াশব্দ নেই! মন মজ্‌লো কৈ?

এতো শুধু তরকিফের অহমিকা, বাহবা পাবার পূর্ণ প্রয়াস মাত্র। নিজেরই লজ্জা হলো। সবার দিকে চেয়ে অনুরোধ জানালাম। বললাম—রসাভাস হলেও আমি একটি ভজন গানের অনুমতি চাই, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন।

সবার অনুমতি পেয়েছি, মনও অনুমোদন করেছে, তবে নিশ্চয়ই মথুরানাথ এবার কান পেতে শুনবেন। মীরাবাঈয়ের একটা গান ধরলাম—

'ম্যয় গিরধর আগে নাচুঙ্গী !'

মীরা গেয়েছিলেন এ গান যখন তাঁর গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রথম প্রণয় হয়। তাঁর বাবা রতিয়া রাণা মীরার সাধ মেটাতে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীগিরিধারীলালের সঙ্গে। সেদিন আনন্দে আত্মহারা হয়ে মীরা গেয়েছিলেন এই গান। আজ আমি নবজীবন লাভ করে মথুরানাথের প্রেমের ভিখারী, আনন্দে অধীর হয়ে গেয়ে উঠেছিলাম সেই গান।

মহাজনী সঙ্গীতের মাঝে বোধহয় লুকিয়ে থাকে, এক গোপন অনুপ্রেরণা। সেই প্রেরণাটুকুই ভক্ত গায়ককে ভক্তিমার্গের চরম স্থানে টেনে তোলে। আমি জানি না কতক্ষণ গেয়েছিলাম সে গান। কে কোথায় বাহবা দিচ্ছেন কি না দিচ্ছেন তা খেয়াল ছিল না। এমন কি আমার আশেপাশে যে, কোনো শ্রোতা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাও ভুলেছি। মনে হচ্ছিল যে এ গান আমি গাইছি আর গিরিধারীলাল শুনছেন।

সেদিনের সমাহিত মুহূর্তে সামনে পেয়েছিলাম জাগ্রত মথুরানাথকে। এ যদি সত্যি না হয় ক্ষতি নেই। হোক কল্পনা, হোক অনুভাবনা তবু এ হয়ে থাক আমার জীবনের এক বাস্তব পরমক্ষণ যা হারিয়ে পরক্ষণেই আবার আমি টের পেয়েছিলাম যে সম্পূর্ণ রিক্ত—কি যেন পেয়েও হারালাম।

কিসের আকর্ষণীতে আমি সংবিৎ হারিয়ে ছিলাম জানি না তবে জম্না বাঈ আমার হাত ধরে ঘরে ফিরতে ফিরতে বলেছিলেন,—ছুঁড়ী তুমহারা হৃদয়কো বহুত চোট দিয়া, না বেটা?

সারারাতে চোখের পলক পড়ে নি। তবু যেন মনে হচ্ছে আমি ঘুমে অচেতন। এ ঘুম কি তবে যোগীদের যোগনিদ্রা? চোখের সামনে বার বার মথুরনাথের ছায়ামূর্তি ফুটে উঠছে—ফুটে উঠছে তার কাল কষ্টি পাথরের নিটোল মুখখানি। সে মুখের পটভূমিতে যেন ফুটে উঠছে কত কত অতীতের মুখের প্রতিচ্ছবি। জানি না সে কাদের মুখ! কখন কৃষ্ণার, কখন মিস চাটুয্যের, কখন কণার।

ভোর বেলায় উঠে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গিয়ে হাজির হয়েছিলাম মথুরা স্টেশনে। মনে হলো আর এখানে থাকা হতে পারে না। জম্না বাঈকে কিছু বলা হয় নি তবু যেতে হবে।

কোথায় কে জানে! মনটা কি চাইছিল বুঝতে পারছিলাম তবে একটা প্রকট অস্থিরতায় মন আচ্ছন্ন।

হঠাৎ চোখের সামনে একপাল মেয়েছেলে নিমেষে আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। এঁদের প্রমুখ এক বুড়ী—তাঁর আঁচলের গাটে আর একটি বৃদ্ধা। আঁচলে আঁচলে গাট বেঁধে সারা স্টেশনটাকে যেন টানাজালের মতো ঘিরে ফেলেছেন। গুণতিতে হবেন পাক্কা বাইশ জন। বৃদ্ধা আমায় বললেন,—বৃন্দাবনের গাড়িটা আমাদের দেখিয়ে দাও না বাবা!

বললাম,—চলুন, বসিয়ে দিচ্ছি।

পল্টন নিয়ে বৃন্দাবনের গাড়ির দরজা খুলে এঁদের বসিয়ে দিলাম। বুড়ী আমার দাড়িতে হাত দিয়ে আদর করে বললেন,—এ যেন আমাদের কেষ্ট ঠাকুর। নিজেই পথ দেখিয়ে বৃন্দাবনের পথে নিয়ে চলেছেন। তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো না বাবা। আমরা অবলা, তুমি থাকলে বড় উপকার হয় বাবা।

কি উপকার হবে আমায় নিয়ে তা ওঁরাই জানেন, কিন্তু—

হঠাৎ একটা ড্যাবা ড্যাবা চোখের চাহনিতে আকৃষ্ট হলাম! ও যে চেয়েই আছে। মুখখানি ঢল ঢল যুবতী অথচ সেজেছে প্রৌঢ়ার বেশে। পরনে নরুন পেড়ে শাড়ি। ছিম্‌ছিমে দেহটাকে শাড়িখানা চেপে রাখতে পারছিল না, আমি তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি।

বুড়ী বলে,—কি বাবা, দয়া হবে না, যাবে না আমাদের সঙ্গে।

আমি জবাব না দিয়ে শুধু গাড়িতে উঠে বসি।

বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হলাম। বৃন্দাবনে বাবার জানিত পাণ্ডার আস্তানায় ওঁদের তুলে দিয়ে বলি,—পাণ্ডাঠাকুর, এঁরা সব নতুন যাত্রী, আমার সঙ্গে কারো সম্বন্ধ নেই। আমি শুধু পথ দেখিয়ে তোমার যজমান করে দিতে এঁদের নিয়ে এসেছি। এরা সব অবলা, এদের যেন ঠকাবেন না।

মস্ত বড় জিব কেটে দুকানে ও নাকে হাত দিয়ে 'রাধেশ্যাম' উচ্চারণ করতে করতে পাণ্ডাঠাকুর আরও বিনীত হয়ে পড়লেন।

আমি বলি,—আজকাল দুদিন আমি থাকবো, এর মধ্যে সারা বৃন্দাবন আর গোকুলটাকে ঘুরিয়ে আমায় দেখিয়ে দিতে হবে। এ দুদিন এঁরা জিরোন পরে এঁদের নিয়ে ঘুরবেন।

কথাবার্তা পাকা করে সবাই পাণ্ডাঠাকুরের জিম্মায় পুঁটলী-পোঁটলা রেখে স্নানাদির জন্যে পা বাড়ালেন। আমি পাণ্ডাঠাকুরের প্রত্যাবর্তনের আশায়

একটা ঘরে চেটাই পেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ি। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছি।

ভাগ্যের ঘূর্ণিচক্রের আবর্তনে পড়ে কেমন করে ঘুরে চলেছি সেই কথাটাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম। হঠাৎ দরজায় খুটখুট আওয়াজ হল। আমি চমকে উঠে বলি—কে, ভিতরে আসুন!

দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল তার ভেতর দিয়ে বার হয়ে এলো একজোড়া ড্যাবা ড্যাবা চোখ। আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম। বললাম,—ভেতরে আসুন!

স্ত্রীমূর্তি ভিতরে এসে কবাট ভেজিয়ে দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মুখের থেকে তাঁর আবরণটা একটু সরিয়ে নিয়ে বলেন,—আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছি। কৈ এ কে তো কখন কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

উনি মৃদু হেসে বলেন,—আচ্ছা! আপনাকে কি নলিনীর মায়ের শ্রাদ্ধ বাড়িতে দেখেছিলাম? কিছু মনে করবেন না, আপনিই তো নলিনীর বাবু ছিলেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন, এর জবাব কোথায়?

চুপ করে থেকে ভাল করে বসে নিয়ে বলি,—ধরুন তাই, তাহলে কিছু কি বলবেন!

উনি বলেন,—না, এমনি, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।

আমি বলি,—তা আপনি ওদের সঙ্গে স্নান করতে যান নি?

—না মানে, টাকা কড়ি সব আমার কাছে রেখে গেছেন। একজনকে তো সব সামলাতে হবে তাই, আমায় ওরা রেখে গেছেন।

চুপ করে থাকি। মহিলা গুটি গুটি দরজার পাশটায় বসে পড়লেন।

আমি বলি,—মাটিতে কেন আপনি বরং এইখানেই বসুন, আমি না হয় বাইরে ঘুরে আসি।

উঠে দাঁড়িয়েছি আমি। মহিলা—না-না তা নাকি হয়, বলতে বলতে খপ করে আমার হাতটি ধরে বসিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন,—একটা কথা বলব, বলুন রাখবেন। আমি নলিনীর কাছে শুনেছি আপনি খুব সৎ আপনি খুব উদার।

আমি বলি,—তাই নাকি? তা আপনার কথাটা কি?

উনি বলেন,—আমার নাম শতদল। আমি আর নলিনী এক বয়সী। তবে আমার মা আমার একটা নামকো ওয়াস্তে বিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরও করেছি, তারপর তিনি গত হলে বিধবা সেজেছি।

আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলি,—সেজেছেন কি রকম? হয়েছেন বলুন।

ম্লান হেসে উত্তর দেয় শতদল,—হওয়াই আসল তবে সেজেছি। কারণ তিনি গত মানে এ-জগৎ থেকে গত নন। কি একটা মোকদ্দমায় পড়ে গা ঢেকেছেন। কিন্তু যাবার আগে প্রচুর টাকা তিনি আমার জিম্মায় রেখে যান। তিনি আর ফেরেন নি।

—তাই বলে বিধবা সাজলেন? ফেরেন নি ফিরতে পারেন তো!

—ফিরলেও আর আমায় পাবে না। সে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। যাক, সে অনেক কথা।

আমি বলি,—থাক থাক সে কথা আমারও শুনে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং কি বলতে চাচ্ছিলেন বলুন শুনি।

চারদিক দেখে নিয়ে শতদল বলে,—এরা আমায় ধরে এনেছে, আমার টাকায় এরা তীর্থ সারতে চায়। অথচ আমি নাচার।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে বলেন,—আপনি আমায় বাঁচান, আমায় বাঁচান।

আমি বলি,—আমায় কি করতে বলেন?

আশার আলোক যেন শতদলের সারা চোখে মুখে ফুটে ওঠে। সমস্ত পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে আমায় বললেন,—তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে চলো, আমার অনেক টাকা। তোমার কোনোদিনই কিছুরই অভাব হবে না।

আমি স্থির হয়ে বলি,—তারপর।

ও বলে,—তারপর আর ভাবিনি। শুধু ভেবেছি যদি পায়ে স্থান দাও!

সব গুলিয়ে গেল। এক নিমেষে নাটক-অভিনয়ের চেয়েও চূড়ান্ত অভিনয় কলা দেখে বিস্মিত হয়ে গেছি। জবাব যোগাচ্ছে না, তাই চুপ করে থাকি।

ও বলে,—বল গো, একবার বল তোমার মত আছে।

আমি বলি,—ব্যস্ত কেন, এখানে কদিন আছেন তো।

ওদের আগমনবার্তা পেয়ে শতদল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি জড়পিণ্ডের মতো স্থবির।

পাণ্ডাঠাকুর এসে বলেন,—ওনাদের দেখাশুনার জন্যে লোক দিয়েছি। চলুন, আপনাকে নিয়ে এবার বেরিয়ে পড়ি।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে পড়ি।

প্রথমেই গিয়ে দাঁড়ালাম হরিদাস স্বামীর আশ্রমে। এই সেই আশ্রম যেখানে একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক মিঞা তানসেন প্রথম শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম। কানের মধ্যে কিন্তু বাজতে লাগলো শতদলের অপরিচ্ছন্ন কাকুতিভরা আবেদন।

বহু জায়গায় ঘুরলাম—শেঠেদের মন্দির, নব বৃন্দাবন, এ-ঘাট, ও-ঘাট সব ঘুরলাম কিন্তু মন ভরল কৈ? দু-কানের মাঝে শিসে ঢেলে দিয়েছে শতদল। আমি নলিনীর বাবু, অতএব ওর বাবু হতে গররাজি হবই বা কেন?

বংশীবটের ছায়ায় বসে মনকে প্রবোধ দিতে গেয়েছিলাম—হৃদি বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে বিহর হৃদয় শ্যাম। গেয়েছিলাম—

ব্যথায় বাঁশীতে নয়নের মণি শ্যাম হয়ে থাক বাধা।
কালো তারা ছেয়ে ঝরুক শাওন ধারাময়ী শ্রীরাধা॥

ঘরে ফিরিনি। পাণ্ডাকে বিদায় দিয়েছিলাম—।

সন্ধ্যার অন্ধকারে যমুনার পারে বসেছিলাম। ওপারে গোকুল ওখানে আর যাওয়া হলো না, সময় নেই। ওয়াকত্ হো গয়া!

এ পারের ভাঙা কিনারে বসে একা একা গেয়েছিলাম—

ওপারে মথুরা এপারে গোকুল
মাঝে বহে কাল প্রবাহ,
ওপারেতে রবি এপারে পূরবী—
প্রণয় বিরহে বিবাহ!

প্রণয় আর বিরহ—তাদেরই বিবাহ ঘটাবার প্রস্তাব এনেছে শতদল। বাঃ চমৎকার! সেদিনের মনের অবস্থা এই রকমই ছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না। উঠে পড়লাম। পথ চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়েছি একার আড্ডায়।

কুড়ি

চড়ে বসলাম একখানা এক্কায়। বলি,—মথুরা চলো।

রাত আটটায় মথুরায় পৌছলাম। নামলাম এসে মথুরানাথের মন্দিরে —আরত্রিক শেষ হয়ে তখন বসেছে গানের আসর।

সেই পুরানো সভা। এরা আমার চেনা জানা যেন কত আত্মীয়। ওদের মাঝে বসে পড়লাম। প্রথম গায়কের গান শেষ হলো, সবাই অনুরোধ জানায় আজ আবার মীরার ভজন হোক।

মীরার জীবনের মতো আজ আমার উপলব্ধিটুকু আমায় বিহ্বল করেছে, কিন্তু সে কোন পথে? সেই বৃন্দাবন, সেই গোকুল, সেই মথুরানাথ! আমার সারা পাশে, আমার প্রেমিক মনের মাঝে তার যেন স্পর্শ পাচ্ছি—একি সেই পরমের? না, এ অনন্যাদের স্মৃতি মায়াজাল? তবু যেন চারিদিক ঘিরে শুনতে পাচ্ছি তার আগমনবার্তা। এ বিরহ না মিলন, বোধগম্য হচ্ছে না। তানপুরা হাতে বসে গেলাম। গান ধরলাম—

'নৈন লাল্‌চায়ে জীয়ারা উদাসী।
শুনি সাওর বনমাঝ্‌ সাওরকী বাঁশী॥'
মানে—তৃষিত আঁখি মম জীবন উদাসী,—
শুনি শ্যামল বনমাঝে শ্যামলের বাঁশী।
'সুখ নহি রয়েন্‌—নিদ্‌ নাহি নয়নন।
আবত্‌ পীতম নিশ্বাস কুসুমসুবাসী॥'
মানে—সুখ নাহি শয়নে, নিদ নাহি নয়নে,
ঘেরি আসে প্রীতম নিশ্বাস—কুসুম সুবাসী।

মথুরানাথের নিশ্বাসের স্পর্শটুকু যেন সারা অঙ্গে অনুভব করছি। কিন্তু একথা বলার নয়। বলিই বা কাকে?

সবাই বাহবা দিয়ে আমায় সংবিতে ফিরেয়ে আনলেন। আমি তানপুরা রেখে বললাম,—আজ বহুত থক্‌ গয়া, আজ ব্যস্‌ করুঁ।

জমনা বাঈ পথে বলেন,—হঠাৎ কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে বাবা? তোমার জন্যে সারা মথুরা ঢুঁড়েছি।

হাসতে হাসতে গিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম—

ঢুঁড়ত কাহাঁ জঙ্গল জঙ্গল
মনমে বনোয়ারী।

তারপর বলি,—হঠাৎ বৃন্দাবন দেখার ইচ্ছা হলো, তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

বাড়িতে গিয়েই শুয়ে পড়লাম। জমনা বাঈ খাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন, আমি কিন্তু কিছু খেলাম না।

পরদিন সারাটা দিন ঘর থেকে বেরুই নি, কেন তা জানি না। মনে হচ্ছিলো এই ঘরেই হয়ত দর্শন পাবো।

সন্ধ্যার অবকাশে এসে বসলাম চিরপরিচিত বিশ্রামঘাটে। বসে বসে মনে মনে কবিতা বাঁধছি আর গুণগুণ করে গাইছি—

আবার বাজবে বাঁশরী—মনের আঙ্গিনায়,
উজান লহরী ছুটবে যমুনায়!

মাথুরানাথের মন্দিরে আরত্রিক চলেছে। স্থির হয়ে দাঁড়ালাম দু-হাত জোড় করে। মনে মনে বললাম—

'তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে,
নইলে কি আর পারবো তোমার চরণ ছুঁতে।'

আজ আবার বসেছি মীরার ভজন শোনাতে নয়, গাইতে। অভিমানকণ্ঠে শোনাচ্ছি ওই মথুরানাথকে—তোমার জন্যে সব সুখই ছেড়েছি। এখন আর তোমার আমায় অবজ্ঞা করা শোভা পায় না—

'তুমহ্‌রী কারণ সব সুখ ছোঁড়িয়া,
অব্ মোহে কিঁও তরসাও॥'

সেদিন রাতে গেয়েছিলাম—'শুনি ম্যায় হরি আবনকী আওয়াজ!' শেষ করেই ধরেছিলাম—

'চিত-নন্দন বিলমাঈ।
মেরো-বাদর-আবত্ ঘেরী॥'

মনের জ্বালায় প্রাণ ঢেলে গেয়েছিলাম। সবাই করতালি দিয়েছিল। আমার মনের দুঃখ আমার মনের আলোড়ন কেউ বোঝেনি সেদিন। শুধুই ভাল

লেগেছিল তাদের। আমার প্রাণবন্ত গানটুকু। সেদিন প্রাণের জ্বালাময়ী প্রেরণা। কিন্তু সবাই ভেবেছিলেন, এ বুঝি আমার শুধু এক সঙ্গীতনাটকাভিনয়!

মন্দিরের দাসত্ব ভিক্ষা করে জানিয়েছিলাম—

'ম্যয় চাকর রাখো জি! গিরিধরলাল, চাকর রাখো জি!'

জম্‌না বাঈ বুড়ী। তবু তিনি উঠে এসে, সে স্বরে স্বর মিলিয়েছিলেন—

'বৃন্দাবনকী কুঞ্জগলিন্‌মে তুহারী গুণগান গাঁসূঁ—'

মন্দিরের সবাই সমস্বরে গেয়ে উঠেছিলেন! ফলে হয়েছিলাম উত্তেজিত, বেড়েছিল অহমিকা, চাকর থাকা আর হয়নি।

লজ্জা পেয়ে মাটিতে মিশিয়ে গিয়েছিলাম নিজেই। তাই, আবেগ ভরে শেষ গানে মিনতি জানিয়ে গেয়েছিলাম—

'মেরে—জনম মরণ কি সাথী
তোঁহে ন বিসরুঁ দিনরাতি।'

প্রাণ ঢেলে গাইবার চেষ্টা করলাম। প্রাণপাত হয়েছিল মীরার, এই গানে। তবে আমার কেন হবে না! এ প্রাণের আর মূল্য কি, যাক্ না চলে। প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম সেদিন।

জ্ঞান হয়ে চোখ বুজিয়েই অনুভব করেছিলাম কোমল হাতের স্পর্শ সারা মাথায় চুলের মাঝে। এ কোমলতা, মসৃণতা তো জম্‌না বাঈয়ের করস্পর্শে নেই! ভাবলাম তবে কি কৃষ্ণা বোম্বাই যায় নি? এ সেবা কি তবে তারই!

না এ জম্‌না বাঈয়েরই হাত। কৃষ্ণা থাকলেও এসে এমন করে সেবা করতে বসবে না, তার এত সময় বা কোথায়? হ্যাঁ, এইতো হাতের চামড়াগুলি কুঞ্চিত হয়ে পড়েছে। চোখ খুললাম না, ধীরে ধীরে পাশ ফিরলাম।

হঠাৎ কানে এলো জটিয়া মার প্রথম দিনের কথাগুলি—'ওয়াকত্ হো গয়া'। মনটার মধ্যে কেমন যেন হয়ে উঠলো। মাথুরানাথের জীবন মরণের সাথী হবার তীব্র আবেদনের পর হঠাৎ যেন ফুরিয়ে যাবার ভয় আমায় চেপে ধরলো। ওর নরম হাতখানা নিজের হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরলাম।

আমার জ্ঞানে ফেরার লক্ষণ দেখে ও বললো,—একটু দুধ খাবে?

একি দুঃস্বপ্ন! এ কণ্ঠ কোথা থেকে মথুরার জম্‌না বাঈয়ের ঘরে এসে উপস্থিত হতে পারে? এ যে অসম্ভব!

বড় পরিচিত স্বর। চোখ চাইলাম—হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই!

পাশে বসে আমার কণা। মাথায় টকটকে লাল সিঁদুর, দুহাত ভরতি নবপরিণীতার আভরণ!

হতবাক হয়ে চেয়ে থাকি ওর মুখের দিকে। ভাবি এ আমার স্বপ্ন না জাগরণ! মথুরানাথের দরজায় যেটুকু প্রাণপাত করে আরজি জানিয়েছিলাম গতরাত্রে এ কি তারই মূল্য? কণাই কি তবে আমার জীবন-মরণের সাথী?

কণার ঠোঁটে হাসির রেখা। বলে,—কি কাণ্ড বাধিয়ে বসেছো বল তো? ভাগ্যিস টুরের মাঝখানে ওকে বলেছিলাম যে পথে মথুরা দেখে আমি যাবই যাবো। মথুরা হোটেলে জিনিসপত্তর রেখে সন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম বিশ্রাম-ঘাটে। সেখান থেকে বেরিয়ে শুনতে পেলাম মথুরানাথের মন্দির হতে ভেসে আসা মীরার ভজন। কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে ছুটে গিয়েছিলাম মথুরানাথের মন্দিরে। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম নইলে কী যে হতো!

আমি কথা কইবার চেষ্টা করলাম কিন্তু জিব যেন নড়লো না, শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি ওর প্রদীপ্ত সীমন্তের দিকে।

ও যেন বুঝে ফেলেছে। বলে,—এক পাঞ্জাবীকে বিয়ে করেছি বাবাকে জব্দ করার জন্যে। তাতে কি এসে যায়। আজ চারদিন বসে আছি তোমারই পাশে। হাতরাসে ও পোস্টেড। আমায় ছেড়ে দিয়ে ও অফিস জয়েন করতে গেছে আবার শনিবার এসে আমায় নিয়ে যাবে। ও আমার ব্যথা বুঝেছিল তাই এখানে একা রেখেই চলে গেছে।

ওর কথা কটা শুনতে শুনতে চোখ বুজলাম। তন্ময় হযে গেছি ওর প্রেমে। সারাজীবন প্রেমটা যে কি তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু সদুত্তর পাইনি। আজ যেন কণাকে দেখে সে উত্তর পেয়ে গেলাম। প্রেম মানেই যে ত্যাগ আজ সেটা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করলাম। চোখের কোণ বেয়ে কেন জল গড়িয়ে পড়ছিল জানি না। কণা আঁচলের খুঁট দিয়ে তা মুছিয়ে দিয়ে বলে,—ছিঃ, কেঁদো না! তোমার কান্না দেখলে আমি কেঁদে ফেলবো। আমার বাইরের রূপটা কিছু না জেনো, ভিতরটায় দেবতা এক —সে কেবল তুমি। মথুরানাথের বাইরের রূপ পাথর মাত্র কিন্তু তাঁর অন্তরের প্রেমেই মীরা পাগল হয়েছিলেন জানো তো!

জানি প্রাণাধিকা, জানি।

হঠাৎ বুকের মধ্যে যেন মেঘগর্জ্জন করে উঠলো। তোলপাড় করে তোলে সারা শরীরটা—অশেষ যাতনা। যাতনার বেগ সামলাতে না পেরে কঠিনভাবে

জড়িয়ে ধরি ওকে। আরো জোরে, আরো জোরে। বুকের মাঝে জাপটে ধরে ব্যথার উপশমের ওষুধ খুঁজি। ওরা সারা দেহটার ভারে যেন ধীরে ধীরে ব্যথাটা নিভে আসে, নিভে আসে চোখের জ্যোতি। তারপর যেন অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব যেন এক নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে এক অখণ্ড কালের চিরন্তনী স্রোতে দুলতে থাকি।

চেতনার মাঝে মনে হলো আমার সারা দেহ মন যেন বাতাসের মতো হাল্কা হয়ে গেছে। কানে এলো কণার কান্না-মাখা ডাক,—ওগো শুনছো, শুনছো! কি হলো তোমার, বড্ড কষ্ট হচ্ছে তোমার?

আর কষ্ট নেই।

দেখি হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল কণা, আমার বুকের উপর। তারপর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে গুঙিয়ে গুঙিয়ে উঠতে থাকে।

ঘর-ভর্তি লোকজন। ডাক্তার বন্ধি সবই। জম্না বাঈ চোখে আঁচল রেখে কাঁদছেন। বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন,—বড় পুণ্যাত্মা থা, উনকা আখের আরজু মথুরানাথে মান লি।

দেহটার নাড়বার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। নাড়বার চেষ্টা করে বলতে গেলাম —ভয় কি, আমি মরিনি, তোমরা কি ভাবছো আমি গত?

কিন্তু দেখলাম—আমি যেন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমার পূর্ণ সত্তা যেন এক বিদেহী দেহে পরিবর্তিত হয়েছে। ঐ জড় দেহের পাশের বাস্তব পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে আমি শুধু ওদেরই মতো দর্শক মাত্র।

কণা কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ওকে স্পর্শ করলাম। বললাম,—ছিঃ, কেঁদো না!

কিন্তু, আমার ক্রিয়াকলাপ এখন গিয়ে পৌঁছেছে এক অনাঘাত পর্যায়, এক অশ্রুত অধ্যায়। আমি সঙ্গীতজ্ঞ। বেশ বুঝতে পারছি যে এদেরই মতো আমিও এদের সঙ্গে এক লয়ের ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এরা রয়েছে ঘাত-তালের পর্যায় আর আমি পড়েছি অনাঘাত তালের পর্যায়। এদের কথাবার্তা (audible frequency range) শ্রুত অধ্যায়ে পড়েছে বলে ওরা পরস্পরকে শুনতে পাচ্ছে—কিন্তু আমার কথা, আমার গান, আজ থেকে পড়েছে অশ্রুত পর্যায় অর্থাৎ inaudible vibration range-এ, তাই আমায় শুনতে পাচ্ছে না।

এদের বেদনা, এদের আপসোস এসে আমার কানে পূর্ণভাবে পৌঁছে

আমায় নিপীড়িত করছে অথচ এদেরকে আমার বলার যেটুকু তা পৌছে দিতে পারছি কৈ?

আমার দেহ আঁকড়ে কণা ঠায় বসে। শনিবার, আজ আমার জন্মাবার তারিখটা বোধ করি এক। অমৃত ছিলাম—হলাম মৃত, অথচ আমি আমিই রয়ে গেছি।

প্রায় দুটার সময় কণার স্বামী এসে হাজির হলেন। কণা পাশে দাঁড়িয়ে আমার শিল্পীদেহের পূর্ণ অন্ত্যেষ্টিসাধন করলো যমুনার উপকূলে। ভিড় জমেছে কিছু—মন্দিরের ভক্তেরা এসেছে আমার মহানির্বাণের খবর পেয়ে।

দূরে, চিতার আগুন আর ছাইয়ে, বাস্তবতায় নিঃশেষ দেখতে না পেরে কণা এসে নিরালায় বসেছে যমুনার ভাঙা ঘাটে। আমি ওর পাশ ঘেঁষে বসে পড়লাম। ওর দুচোখের জলের ধারা গিয়ে মিশছে যমুনার কালো জলে —আর তারই সঙ্গে সঙ্গে আমার অতৃপ্ত মনকে তৃপ্তি দিতে বোধ করি গুণগুণ করে গাইছিল—

'মেরে জীবন-মরণকী সাথী,
তোঁহে না বিসরুঁ দিনরাতি।'

জাতিস্মরের পান্থশালা

এক

শিল্পলোকের ছায়ায় ছায়ায় গড়ে উঠেছিল জাতিস্মরের আরও একটি শিল্পীজীবনের পান্থশালা। সে পান্থশালায় দুদিনের জন্য বাসা বেঁধে যাদের নিয়ে তার শিল্পজীবনের এক মধুময় রঙিন স্বপ্ন-বুদ্বুদ্ সৃষ্টি করে বিলীন হয়েছিল তাদের কথা না বললে জাতিস্মরের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ, আমি অনুভব করেছিলাম যে এটুকু না বললে আমার শিল্পজীবনের একাংশ ঢেকে থাকবে এক অজ্ঞাত অন্ধকারের কঠিন যবনিকার অন্তরালে।

আমার এই অকপট সত্য-পূর্ণ জীবন আলেখ্য হয়ত এক নতুন জীবন-নাটকের অভিনয়চাতুর্যে সবাইকে অভিভূত না করলেও করতে পারে…তবু তার সত্যতা সম্বন্ধে অযথা সন্দিহান হয়ে আমায় যেন কষ্ট দেবেন না।

চল্‌তি পথের মাঝখানেতে সরাইখানাটুকু
তারপরেতেই তেপান্তরের মাঠ,
পান্থ যত ভিড় জমিয়ে দুদিন বাঁধে বাসা
সামনে রহে যাত্রা শুরুর বাট।

কবে এসেছিল আবার কবেই বা অজান্তে কোন অজ্ঞাত-ক্ষণে অবসর নিয়ে তারা একে একে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল জানি না। তবে জানি যে—

ঘিরে মোর পান্থ-শালাটিরে
ভিড় করে যে পান্থ কত, ক্লান্তি-হারা নীড়ে।

সবুজ শিল্পীর শ্যামাঙ্গনে যেদিন যোলটা বছর উদ্‌যাপিত হ'লো সেদিন হঠাৎ ওমর খৈয়ামের দর্শন ঘাড়ে চেপে বসেছিল। কল্লোল পত্রিকায় লিখেছিলাম ওমর খৈয়মের দর্শন—সঙ্গীত-নাটিকায়। তখনকার দিনে বেতারের আসরে তা বারবার অভিনীত হয়ে—ওমরের দর্শন আমার নিজের জীবন-দর্শন হয়ে প্রতীয়মান হয়েছিল তখনকার দিনের শ্রোতৃবর্গের মনে; বিশেষ করে নারীশ্রোতৃবর্গ মহলে।

দৃশ্যাবলীর নায়ক-নায়িকা ছিল ওমর খৈয়াম আর তার চিরসাথী সাকী, তাদের দুজনের আকাঙ্ক্ষা মিটাতে রূপকে রূপ নিয়েছিল 'গুল-বাহার', 'দিল-বাহার', 'ছন্দ-পিয়ারি' ইত্যাদি ·

একান্তে ওমরের মুখে জাগানিয়া রুবায়েৎ গড়ে দিয়েছিলাম—সাকীর ঘুম ভাঙাতে—

এখনও কি ঘুম ভাঙেনি ঢুল রয়েছে চোখে
কাজলা আঁখির দৃষ্টিটুকু বিভোল কিসের ঝোঁকে ?
স্বপন-জালে জড়িয়ে আছে বুঝি ব্যথার রেশ,
আঁখির পরে মেলাও আঁখি টুটবে সকল ক্লেশ।
চকিত কেন চাহনি তোমার চপল করে তোলো
ওষ্ঠে তোমার গুল্-ফুটেছে, চুম্ বা দিতে হোলো।

ঘুম ভাঙিয়ে ওমর তার সাকীকে গুল-বাগিচায় নিয়ে গিয়ে বলেছিল—

এক লহমার মাঝখানে প্রাণ-পিয়ালা ভরিয়ে তোল !

নবীনা শ্রোতাদের মন-মঞ্জুষায় হয়তো প্রেম উপজিয়ে খুঁজে ফিরেছিল এই ওমর খৈয়ামের রচয়িতার সন্ধান। তাই তাদের ও আমার মাঝে সেদিন গড়ে উঠেছিল এক নতুন প্রেমের পৃথিবী।

আমার চারিদিকে তখন ফুটে উঠেছিল গোলাপের রাশি। দিকচক্রবালে ধরেছিল এক ইন্দ্রধনু রঙের বর্ণালি আকর্ষণ। পৃথিবী সেদিন আমার চোখে ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। জীবনের বাস্তবতার কথা মনে হলেও সেদিন তাকে আমার অন্তরের এই সপ্তবর্ণী রঙে রাঙিয়ে নিয়ে বান্ধবীদের চিঠির উত্তর দিতাম—

আয় না সখি তর্ক রেখে সর্বলোকের ভালো
ধূপ-দীপালী না জ্বালালে কখন দেছে আলো ?
পুড়িয়ে যদি সংস্কারে করে মোদের লীন,—
ধূপ জ্বালানীর মাঝখানেতে বাজ্‌বে মোদের বীণ—
পুড়ছি তবু হাসছি দোঁহে জড়িয়ে তুমি আমি
সর্বনাশের মাঝখানেতে দোষী অন্তর্যামী।···

যারা আমার শিল্প-পান্থশালায় রাত্রি যাপন করে গিয়েছে···তারা সমাজ বাঁধনের ভয়ে শিউরে উঠ্‌লে আশ্বাস দিয়ে বলেছি—

পূর্ণ যা—তা অপূর্ণতা—মূলের মাথায় এক
গোলাকারের এদিক ওদিক—হয় না কোথাও ব্যাক্—

পাপপুণ্যের অতল প্লাবন ছুটছে রাতিদিন
দেখ্‌ছো যারে, শুনছো যারে, বলছো যারে হীন—
তারেই আবার অন্য জনে দিচ্ছে সাধুবাদ
পাপপুণ্যের বিচার কবে প্রেমের পথে বাঁধ ?

এই আমি······

আমার চির-সবুজ শিল্পী মনের সবুজ পান্থশালাটির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যারা ভিড় জমিয়েছিল তাদেরই ইতিবৃত্তটুকু, হয়ত কমে ইতি হয়ে গেছে—তবু ক্ষণিকের উপলব্ধি বা অনুভূতির সত্যতা চিরদিনই চিরন্তনী শাশ্বত হয়ে বেঁচে আছে বা থাকবে যুগে যুগে—সেখানে ফাঁকিবাজি ছিল না—ছিল না সেদিন সেখানে প্রেম-নিষ্ঠার এতটুকু ধোকাবাজি, তাইতো আজও সে সত্যের ঘরে সযত্নে রক্ষিত।

মাত্র ষোলটি বছর—

খৈয়ামের প্রেমদর্শন পাঠ করে মন জর্জরিত···

তবু ভীরু মন দু-পা এগোয় তো চার পা পেছয়।···অথচ,

পান্থশালায় যাত্রী এসে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে···ঠাঁই দিতেই হয়।

তনুজা—

বার বছরের ছোট মেয়ে···সাঁওতালী ভাষায় ওকে ডাকে 'তন্‌জা' বলে··· আমি তাকে সুললিত করে নাম দিয়েছিলাম তনুজা।···

বয়েসে ছোট হলে কি হবে···সেই কিন্তু এই বয়সেই আসন নিয়েছিলো আমার প্রথম প্রেম-গুরুর··তার কাছেই শিক্ষা পেয়েছিলাম—সামাজিকতা আর অসামাজিকতার প্রথম তত্ত্ব।

* * *

ছোট্ট ঝরণা···

কত কত নবীন-নবীনার গায়ে-হলুদের ছোপ ধরানো ঝরণা···

নাম তাই—হল্‌দি ঝরণা···

পাহাড়ে ঘেরা বনতল—তারই অলিগলি ঘুরে ছুটে চলেছে পাহাড়ি নদীর দল, সবই হলদি ঝরণার শাখাধারা।

সেই গলিপথ ধরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছি, আপন মনে। সঙ্গীরা হলদি-ঝরণা ঘিরে বসিয়েছে পিক্‌নিকের আসর।

সেই আসর থেকে বহুদূরে হারিয়ে গেছি পাহাড়ী নদীগলিপথে। পাশে পাশে ঝরে পড়ছে অজস্র পাহাড়ী শিউলি। মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি নদীর

খরস্রোতে···। সে স্রোতমালা অদূরের পাহাড়ী বাঁকে ভাসতে ভাসতে নিজেকে লুকিয়ে ফেলছে।

পাহাড়ি বাঁকের অন্তরালে সেদিন আমারই ছুঁড়ে ফেলা ফুলের রাশি বুকের আঁচলে ভরে নিয়ে হঠাৎ এগিয়ে এসেছিল তনুজা।

আঁচলভরা ফুলের পুঁটলি চেপে রেখেছে ওর সদ্য অঙ্কুরিত বুকের মাঝখানটিতে। আমার ফেলে দেওয়া—স্রোতে ভাসানো ফুলের ওপর যার এত দরদ—সেই দরদীর পানে না এগিয়ে থাকতে পারিনি।

সামনে গিয়ে বলি—

ফুল নিয়ে তুমি কি করবে?···ঐ ধারে পাহাড় ঘেঁষে এ ফুল অনেক পড়ে আছে—নেবে তুলে?

ও খিল্‌খিল্ করে হাসে। বলে—

সে ফুল লিয়ে কি হবেক? সে ফুলে তো তুহার বাস লেগে নাই···

ভাবি···এ বলে কি? ··অবাক হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে থাকি।

তন্বীর রূপের বালাই বলতে ছিল—পিঠ জোড়া রুক্ষ চুলের বোঝা—চোখে ছিল বন্য মায়া—আর তেমন কিছু নয়। তবে কথা বলার মধ্যে ছিল—কেমন একটা মিষ্টি আমেজ। ওর কথা শুনলে আরও শুন্‌তে ইচ্ছে করে।···বলি,

তোমার নাম কি?

ও বলে—তনুজা—

বলে চলে থামে না—হুই হুথাকে থাকি। যাবি হামার ঘরকে?

অনুসরণ করি—কিন্তু নির্বাক।

ও বলে চলে—

হামার ঘরকে কেউ লাই—কেবল হামি আর হামি। বাপু গেছে বনে কাঠ্ কাঠ্‌তে—সেই কাঠ্ একেঠ্‌ঠা করেক—হাটে লিয়ে বেচ্‌বেক—তবে ঘরকে ফিরবেক।

আমি বলি—সারাদিন তুমি একা একা কি কর?

বলে—করবেক আবার কি? সারা দিন হেথাকে হুথাকে ঘুরে বেড়াই··· জঙ্গলে কুল খাই···আম্‌লা···বৌঁচ।

বলি—তোমার ঘরে আর কে আছে?

কেউটি নাই···খালি হামি আর বাপ্‌পুজি। তুমি রোজ দুপ্পারে আসা করো, হামার সঙ্গে খেলবেক।

দুপুরে কিন্তু কোন দিনই আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

এর কয়েক দিন পরে ওর বাপের সঙ্গে কাঠ বেচতে আমাদের মহল্লায় এসে পড়েছিল। তাই আবার দেখা হলো।

ওর বাবার সঙ্গে চেনাজানা হলো…আমার বাড়ির সঙ্গে। রোজ দিয়ে যায় জ্বালানি কাঠের বোঝা…আর আমাদের বাড়িতেই রেখে যায় তনুজাকে ··

বলে—তনুজা খোঁকাবাবুর লেগে খেলবেক।

কাঠ বেচে ঘরে ফেরার পথে তনুজাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে।

মা ওকে চিড়ে আর গুড় দেয়…।

সারাদিন দুজনে বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াই…কখন বা পেয়ারার ডালে উঠে বসি—উন্মুক্ত আকাশের তলে দুটি কিশোর কিশোরী—মনে প্রেম নেই—আছে দুরন্ত আকর্ষণ। ভদ্র ছোটলোকের দুস্তর পারাবার সেদিন দুজনের মাঝে এসে পথ রোধ করেনি।

এমনি করে তিন তিনটা পূজার ছুটির অবকাশে দুজনের মিলন-বিচ্ছেদ ঘটে গেল। শেষ দেখা হলো…প্রথম দেখার মত আবার সেই হলদি ঝরণার পাশ-গলিপথে।

ওর যৌবনের সেদিন ভরা দুপুর—

ওর মাথায় কাপড়—

আমায় দেখে বুকের আঁচল সামলে নেয়…ছুটে লুকোয় পাহাড়ি গলির অন্তরালে—মনে হলো এ যেন তার হাতছানির ইশারা—

ওর পেছনে ছুটে চললাম।

খরগোসের মত পাহাড়তলী শ্যাম-শিউলির-ঝোপে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে…

পিছু থেকে গিয়ে দুহাত বেড়ে জড়িয়ে ধরেছিলাম…ও লজ্জায় এতটুকু মুখ তোলেনি।

দুষ্ট মন…দুষ্টামির ফন্দি আঁটে—

ও বলে,—ও বাবু—হামার যে বিয়া হয়ে গ্যাছেক।

আমি বলি—ভালই তো।

তনুজা হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে থেকে বলে—তবে আর লিবেক কি?

এতো স্পষ্ট প্রশ্নের উত্তর কোথায়…তবু তাকে কাছে টেনে নি—

ও বলে—তোমারে সবটাই দিতে পারি বাবু কিন্তু হামাদের সমাজ কি বলবেক?

সমাজজ্ঞান জন্মেছে আজ তনুজার।

অসামাজিকতার গণ্ডীর মাপকাঠির খবর পেয়ে গেছে সে। তাকে স্পর্শ ক দাঁড়িয়ে ছিলাম কিন্তু সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম।

সে তার বহু পরিচিতের কুণ্ঠাবোধ দেখে বলে ওঠে—না রে না…অত ভয় করবেক না সব নিয়ে চুপে চুপে ঘরে ফিরে যা—খালি ছেলে হইবেক—মনুয়ার।

চমকে উঠি—

মনুয়ার ছেলে হবে সাঁওতালি ছেলে—ভদ্রঘরের বাপ যে ছেলের তার কি সমাজে স্থান আছে? বড় ভাল লেগেছিল ওর সামান্য ইসাবাটুকু—ওর সমাজের বেড়া ভাঙবার ইচ্ছা নেই, তাই কোন দিনই সে বাঁধ ভাঙবার চেষ্টা করি নি।

তাই বার বার সে এসে দাঁড়াতো আমার সন্নিধানে—মনে হতো আমাকে তার অদেয় কিছু নেই—অথচ—

দেবতার নৈবেদ্যর মতই দৃষ্টি-ভোগ ব্যতিরেকে আর কিছু করবার সে সুযোগ দিল না…

তনুজা আমার ভীরু মনকে সাহসী করে গড়ে তুলেছিল, নারী জীবনের নীরব আহ্বান বোঝবার ইঙ্গিত শিখিয়েছিল। শিখিয়েছিল সামাজিকতা আর আর অসামাজিকতার কোথায় পরিখাদ রচনা করেছে…তাই বলেছি আমার পান্থশালার সে প্রথম গুরু। চৌর্যবৃত্তি থেকে সে আমায় নিবৃত্ত করেছিল অথচ তনুজার সঙ্গে মেশামেশির মাঝে একটা এমন রোমান্টিক পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল যা শিল্পী মন মাত্রেরই সাড়া না দিয়ে পারে না। বুঝেছিলাম তার প্রাণটা যতই সূক্ষ্ম-প্রেমানুভূতির আধার হোক না কেন তার সংস্কারিক দেহমন, পাহাড়তলির শুধু মাত্র বন্য প্রাণী নয়। সে ওদের সমাজের মেয়ে। জন্মের সময় শঙ্খধ্বনি হয়ে সারা বনস্থলীর সমাজকে সাক্ষী রেখেছিল। সাঁওতালি সমস্ত সংস্কারে তার পারিপার্শ্বিক সমাজকে সে অটুট বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল। সামান্য ভাললাগার ভালবাসায় সে তা তলিয়ে দিতে পারে নি বরং তার ভাললাগা ভালবাসাটুকু সংগোপনে রেখে, সংসারের আশীর্বাদ অর্জন করেছিল।

দুই

[ওমর-খৈয়ামের প্রেমদর্শনের নর্ম-প্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় নি তমুজার মাঝে। বুঝেছিলাম জংলী মেয়ের সংস্কারবদ্ধ মনে এই সংস্কারবিহীন হৃদ্যতা স্থান পেতে পারে না।

এরই কয়েক বছর পরে কিছুদিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম চক্রধরপুর অঞ্চলের মনোহরপুরে। সেখানে বসু পরিবার কাঠের কারবার করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। জঙ্গল নিয়ে সারা বছব কারবার করে দুর্গাপূজায় ঘটান আনন্দ উৎসব। কলকাতা থেকে যায় অ্যামেচার থিয়েটার দল—দুদিনের আনন্দ উৎসবে সোরগোল তুলতে ; এঁদেরই মধ্যের একজন হয়ে সেখানে পৌছেছিলাম।

উৎসব কেটে গেলে সবাই চলে এলো···আমি রয়ে গেলাম।

দিনে বনাঞ্চলে ঘুরে বেডাই আর 'বেঙ্গল আয়রন ওর' কোম্পানির জনৈক সাহেবের বাংলোয় রাত্রে আড্ডা জমাই।

মিঃ এটুকিনসন লোক ভাল ·

গেলেই বাগানের বড় বড় শরবতিয়া লেবু নিংড়ে গেলাস গেলাস তাজা রস খাওয়ায়। মোটর ট্রলি করে লোহার খনির খাদের পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সময়টা বেশ কেটে যেতো।

বিকেল বেলায় জমত ব্যাডমিনটনের খেলা। তারপর খানিক দাপাদাপির পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়। চারপাশের ঘন জঙ্গল গভীর অরণ্যে পরিণত হতো। ঝোপে ঝোপে জোনাকীর মালা আর দুরাগত খেঁক-শেয়ালীর ভয় জাগানিয়া ফেউ-এর শব্দ।

বসতো চায়ের আসর আর তার সঙ্গে ব্রীজ খেলা ·

রাত নটা বাজলে আলো নিয়ে এগিয়ে দিতো মিঃ এটকিনসনের আর্দালী। বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়া মিসেস্ এটকিনসন আর মিঃ এটকিনসন সাহেব বলতেন—

টা—টা—সো—লং···

তারপর গুডনাইট বলে বিদায় নিতেন। উত্তর দিতাম চলতে চলতে—গুড-নাইট।

এই ছিল তখন আমার নিত্য দিনের রোজনামচা।

হঠাৎ একদিন দুপুরে সাহেবের বাংলোয় গিয়ে পৌছলাম। সাহেব মেম-সাহেবকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ঝাড়সিগোদা—আর্দালীও সঙ্গ নিয়েছে।

খবরটা আমায় পৌছে দিল এক নবাগতা তন্বী···

ওর মুখের পানে চেয়ে থাকি!

সত্যিই অনিন্দিতা···

কালো মারবেলের এক খোদিত নিখুঁত নারীমূর্তি। যেমন টানাটানা চোখ তেমনি ঠোঁটদুটি পাতলা। দৈর্ঘ ও আয়তনে এমন সামঞ্জস্য যে সচরাচর বড একটা চোখেই পড়ে না। তন্বীর পরনে গাউন·· বুঝলাম নেটিভ খৃস্টান।

বললাম—তোমায় তো কোনোদিন দেখিনি?···তুমি, মানে—তোমার নাম কি?

মৃদু হেসে পরিচয় দিলে।

বললো—আমি মিঃ এটকিনসনের পালিতা মেয়ে। আমার নাম মিস্ এনাক্সি—আমি পাদ্রী স্কুলে পড়ি—বেশির ভাগ সময় সেখানেই থাকি। ওঁরা বাইরে গেলে খালি বাড়ি পাছে পড়ে থাকে—তাই আমি এসে রয়েছি।

কথা শেষ হয়ে গেছে···পরিচয় জানা হয়ে গেছে···আর থাকা চলে না···অথচ, মন চাচ্ছে না তখনি ফিরতে। মনে হচ্ছে আরও দুদণ্ড দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি—ও যেন লিভিং স্ট্যাচু—কালো মারবেলের।

হঠাৎ বলে ফেলি—ওখানে বুঝি স্কুল আছে···কৈ দেখিনি ত—তুমি কি পড়?

এনাক্ষী বলে—বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? মিঃ এটকিনসন বাড়ি নেই তো কি হয়েছে? হ্যাভ ইওর সিট্—আমি চট করে একটু চা করে নিয়ে আসি—

আমি যেন মনে-প্রাণে এই ধরনেরই একটা কিছু চাইছিলাম। দ্বিধা না করে তাই চেয়ারে বসে পড়লাম—এনাক্ষী ভিতরে চা আনতে গেলো।

একা বসা অসম্ভব·· উঠে দাঁড়াই·· তারপর ধীরে ধীরে বাগানে নেমে পড়ি—সামনেই গোলাপ বাগ···তারই মাঝে এসে দাঁড়াই···।

*　　　*　　　*　　　*

বেতের চেয়ারখানা গোলাপ ক্ষেতে পেতে দিয়ে এনাক্ষী বলে—বসুন···আমি এখানেই চা-টা নিয়ে আসি।

আমি জবাব দিলাম না—শুধু ওর মুখের পানে চেয়ে দেখি। আমার চোখের মাদকতায় ও যেন ত্রস্ত হয়ে উঠে হঠাৎ বলে—জাস্ট্ এ মিনিট—এক্সকিউজ মি।

ও চলে যায়···

কি মিষ্টি হাসি—হাসলে ওকে বড় মিষ্টি দেখায়।

পাহাড়ের ছায়াপাণ্ডুর প্রাতঃকালে ঝলসানো আলোতে কষ্টিমর্মর মূর্তির যে এত রূপ হতে পারে তা এই প্রথম চোখে পড়লো।

এলো বেতের টেবিল আরও একটি বসার মোড়া···এক এক করে দুহাতে মাথার ওপর তুলে নিয়ে এসে বাগানে নামিয়ে দিল।

আংরাখার অন্তরালে যে নিটোল অটুট স্বাস্থ্য এনাক্ষীর নড়াচড়ার অবকাশে তরঙ্গিত হচ্ছিল সে তরঙ্গদোলায় হয়ত একদিন পিনাকীও যোগভ্রষ্ট হয়েছিলেন। শিবাগ্নিতে দগ্ধ মদনদেব তাঁর দেহ পুড়িয়ে অতনু হয়েছিলেন, নইলে নিশ্চয়ই আজ তাঁর উপস্থিতি গোলাপ প্রাঙ্গণের লতা প্রাচীরের ছায়াছন্ন অন্তরালে, ফুলশর হাতে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হতেন।

মিস্ এনাক্সি কুমারী।

গোধূলির পূর্ব লগ্নে—আকাশে তখনও রং ধরেনি কিন্তু এই তরুণ দেহকান্তির মসৃণ-চিক্কণ জ্যোতিধারায় আমি চেয়ারে বসে এক স্বপ্নরাজ্যে যেন রঙিন হয়ে উঠ্ছি।

হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গ হলো—

'নিন—চা খান'···

আমি বলি—

'তুমি দাঁড়িয়ে কেন—বসো?'

মোড়াটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে এনাক্ষী বলে ওঠে—

'ততক্ষণ পেস্ট্রীটা খান···আমি চা তৈরী করছি—নইলে জুড়িয়ে যাবে। এসব পেস্ট্রী কিন্তু মাম্মী মানে মিসেস্ এটকিনসন নিজে হাতেই বানিয়েছেন।

ক্যাশিনারার জালিক-ছায়া এসে ওর সারা চোখে পড়েছে···তার মাঝে পড়ন্ত রৌদ্রের তিলক টীকায় যেন ও সারা মুখে কনে চন্দন পরিয়ে দিয়েছে—আমি পেস্ট্রীর কথা ভুলে সেইদিকেই চেয়ে আছি।

এনাক্ষী মৃদু হেসে বলে—কি দেখছেন?

চমকে উঠে আমি বলি—ভাবছি চা-টা-গুলো কি আমি একা একাই গিলবো? তুমি খাবে না?

এনাক্ষী এবার খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—

বেশ মজার লোক—আপনি না খেলে আমি খাই কি করে?

আমি খেতে শুরু করি। বলি—

তোমাদের মিশনারি স্কুলটি কোথায়?

এনাক্ষী পিছু ফিরে দূরের পাহাড়টার দিকে ইশারা করে দেখায়। বলে—

ঐ পাহাড়ের ফুটে···আমাদের ফুট-হিল-মিশনের মাদার হচ্ছেন—মাদার গ্রেহাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি পড়ো?

ও বলে—অত জানি না, তবে মিঃ এটকিনসন যা বলে দিয়েছেন ওঁরা তাই শেখান। মামমী বলেন—তোকে আমি সঙ্গে করে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবো। বলে ফেলে নিজেই সলজ্জ হয়ে যায়।

আমি বলি—ইংলণ্ডে কালো আদমীদের বড ঘৃণা করে—

কথাটা হঠাৎ বলে ফেলে মনে হলো হয়ত ভুল ইঙ্গিতই করলাম, তাই শুধরে নিয়ে বলি—মানে···হয়ত মিসেস্ এ্যাটকিনসন তোমায় ঘৃণা করবেন না—তবে পারিপার্শ্বিকদের কথা বলছি। তুমি ভারতের কালো মেয়ে, তোমার কালো চুল, কালো চোখ, কালো তারা—সে দেশে মানাবেই বা কেন? তোমার পাহাড়ী পাথরের অঙ্গসৌষ্ঠব···সে যে এক পাহাড়ীয়ার স্বপ্ন সৌধ। হোক সে পর্ণকুটীর··· হোক সে বন্য বেতসীর কণ্টকপূর্ণ নিভৃত নিকুঞ্জ।

আমার মুখে তার রূপের ও ভবিষ্যৎ দয়িতের স্বপ্ন বিলাস শুনে ও যেন কেমন হয়ে গেল। অন্যদিকে ফিরে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললাম—

কি জানো এনাক্ষী—আমরা যা, তারই মত স্বপ্ন দেখা আমাদের শোভা পায়। ইংলণ্ডের লণ্ডন বা কোন সুদূর গ্রামের পরিস্থিতি তো আমাদের ভারতবর্ষের মত নয়। তাই বলছিলাম।

ও যেন কি ভাবছিল। হঠাৎ বলে ওঠে—

আমি ইংলণ্ডে যাবো না—আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি জানি যে আমাদের দেশের বাবুমহলও আমাদের ছায়া মাড়ায় না—তাই সাঁওতালী আমরা, আমাদের সাঁওতালী পরিস্থিতিতে গড়া সাঁওতালী আবহাওয়াই ভালো।

আমি মনে মনে অনুভব করলাম যে ইংলণ্ডের ঘৃণার কথাটুকুতে সে মর্মাহত,

তাই আমা হেন বাবুদের ইশারাটুকুও সে অনায়াসে দিতে ভোলেনি। আমি যেন মুষড়ে গেলাম। বললাম—

এখানকার বাবুদের কথা জানি না—তবে বাবুদের মধ্যেও হয়ত মনের মানুষ পাবে কিন্তু শ্বেতদ্বীপে সে ভরসাও নেই।

এনাক্ষী কথা বলে না। খালি আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

উঠে পড়লাম—

কারণ, এনার সঙ্গে এই নিভৃত পরিচয়টুকু আমি প্রকাশ করতে চাই না। দেরি করলে পাছে মিস্টার আর মিসেস্ এটকিনসন এসে পড়েন।

এনা বোধহয় সেটুকু বুঝে ফেলেছিল তাই বলে—

মাম্মীদের ফিরতে রাত আটটার ট্রেন—

কথাটা শুনে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম—মন বললো—এ সুযোগ তোর আবার হঠাৎ জুটবে না···কিন্তু পা বাড়িয়েছি···তোলা যায় না···তাই বলি—

আজ চলি···আবার দেখা হবে।

তিন

রাত্রে বসু পরিবারের সঙ্গে একযোগে সবাই খেতে বসেছি···

বোসজা মশাই তার পুত্রকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে খবর কি পেলি?

বোসজা মশাইয়ের পুত্র বললে—মিঃ এটকিনসন সাহেব—স্টেশনে টেলি করে জানিয়েছেন তার ফিরতে আরও একটা দিন তো বটেই হয়ত দুদিনও লেগে যেতে পারে।

বোসজা মশাই রাগ করে বলেন—তোকে বললুম—ওদের যাবার আগেই বিলটায় একটা সই করিয়ে আন—তা—ইত্যাদি···

কানে কথাই আর আসছে না·· শুধু বাজছে ঐ এক কথা একদিন তো বটেই হয়ত দুদিনও লেগে যেতে পারে।

আজ ফিরে ফিরতি বসে এনার সঙ্গে গল্প করতে লজ্জা বোধ করেই ফিরেছিলাম—ভেবেছিলাম আবার কবে এ সুযোগ সুবিধে ঘটবে—না·· অতনুর শরবিদ্ধ মন টেনেছে—ভগবানও সুযোগ মিলিয়েছেন।

তারপর দিনই সকালে মিঃ এটকিনসনের বাংলোয় উপস্থিত হলাম।···বেল বাজিয়েছি—

খবরাখবর নিতে মিস এনাক্ষী এসে দাঁড়ালো।

আমি বলি—তুমি? মিঃ এটকিনসন ফেরেন নি···ভাবলাম মর্নিং ওয়াক করে বড্ড টাইয়ার্ড হয়ে পড়েছি—মিসেস এটকিনসনের হাতে এক গেলাস শরবতীয়া লেবুর শরবৎ খেয়ে ক্লান্তি দূর করব।

এনা হেসে বলে—বেশ তো না হয় আমার হাতের তৈরি এক গেলাস শরবতীয়ার রস খেয়ে ক্লান্তিটুকু দূর করুন?

কালকের জড়তা আজ এনাক্ষীর কেটেছে·· হয়তো আমারও···

বললাম—বাঃ রে, তুমি ভেতরে বসে শরবতীয়ার রস করবে আর আমি বুঝি একা একা বারাণ্ডায় ভেরাণ্ডা ভাজবো।

এনাক্ষী আমার কথায় খিলখিল করে হেসে উঠে বলে—বেশ তো, এক মিনিট —আমি লেবু নিয়ে এখানে বসেই শরবৎ বানিয়ে দিচ্ছি—আমি গেলাম আর এলাম।

চকিৎ হরিণীর মতই এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্যমনস্ক হয়ে বুক সেলফে নজর দিতে গিয়ে দেখলাম—চেরোর এস্ট্রলজি বইখানা রাখা রয়েছে—আমি সময় কাটাবার জন্যে সেখানা হাতে তুলে নিয়ে বসলাম।

নিমেষে এনা ঘরে ফিরে এলো তার শরবতের সরঞ্জাম নিয়ে · আমি কিন্তু চেরোর বই-এ গভীর মনোনিবেশ করলাম।

ও বললে—বাঃ বেশ তো···আপনি একলা থাকবেন বলে আমি কোথায় ছুটে এলাম আর আপনি···

বললাম—ভেরি ইণ্টারেস্টিং···দেখি হাতখানা।

হাত দেখতে জানেন বুঝি?

না জানি না—শিখবো—তোমার হাত নিয়ে প্রথম লেশন নেবো।

দেখুন না আমার হাতে সমুদ্র ভ্রমণ আছে কিনা?

চট করে গেলাস ভরে শরবতীয়ার রস আমার হাতে তুলে দিয়ে—জাগ থেকে জল নিয়ে নিজের হাতটা ধুয়ে নিয়ে সে আমার কাছটি ঘেঁসে বসলো—

এক চুমুক শরবৎ মুখে টেনে নিয়ে গেলাসটাকে নামিয়ে নিয়ে—দক্ষিণ করে ভরে নি, এনার বামপাণি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি—আঙুলগুলো যেন চম্পক অঙ্গুলি।···

এনা বলে—কি দেখছেন ?

বলি—আঙুলের ডগার চক্রগুলি···

নিজেকে সামলে নি···বলি—

লেন্স আছে।

এনা বলে—একটা আছে—ড্যাডির—আনছি।

উঠে যায়। নিভৃতে এক চুমুকে শরবতটুকু নিঃশেষ করি—তবু যেন তেষ্টা মেটে না।

এনা এনে লেন্সটাকে হাতে দেয়—পাশটিতে বসে—বাড়িয়ে দেয় তার বাম হাত।

এবার তার দুহাত ধরে নাড়াচাড়া করি—

কি গঠন—সত্যই মৃণাল বাহু !

অনেকক্ষণ আত্মতৃপ্তির পর বললাম—এবার বল কি কি শুনতে চাও ?

বলে—সমুদ্রযাত্রা।

বলি—আগে বিয়ে—পরে সমুদ্রযাত্রা।

উত্তরে বলে—বিয়ে আমি করব না।

বলি—সে কি কারো নিজের হাত ?

দুজনে চুপ !

আমি বলি—কার যে কখন ফুল ফুটবে সে কেউ বলতে পারে না।

সে বলে—তবে জ্যোতিষ কেন ?

আমি উত্তর দি—হাতের লেখায় যা পেলাম—তাই তো বললাম—তুমি তো মানতে চাও না···

এনাক্ষী বলে—কি মানবো ? বিয়ে করা—তাছাড়া আমায় বিয়ে করবেই বা কে—যা কালো ?

কৃষ্ণচূড়ার ছায়া এসে পড়েছে বারান্দার মেঝেতে···মেঝের ছায়ায় লালফুলও কালো আলপনা এঁকেছে।

আমি বলি—বিধিমতে বিয়ে না করলেও—তোমার মন দিতে হবে কারুকে।

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে এনা—খালি গেলাসটা তুলে নিয়ে ছুটে ভিতরে চলে যায়।

আমি যেন অপ্রস্তুত হয়ে উঠে পড়ি···সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি বাগানে—দূরের করঞ্জার ধারেই গোলাপ ক্ষেত—রাশি রাশি সাদা গোলাপে ভরে আছে,

তারই মাঝখানে একটা ব্ল্যাকপ্রিন্স ফুটে যেন সারা বাগানটাকে ঝলমলিয়ে তুলেছে ··কী সুন্দর এই কালোরূপ—সাদার মাঝে কালো গোলাপ ··

এনা ফিরে এসেছে···নিজেকে সামলে ফিরে এসে ছাখে ঘর শূন্য ··তাই ছুটে বাগানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের দিকে ছুটেছে·· ফিরে চায় এধার-ওধার, মৃদুস্বরে বলে—কোথায় গেলেন ?

আমার কাপড়ের অংশ হাওয়ায় উড়ে কখন আমায় তার দৃষ্টিতে ধরিয়ে দিয়েছে জানি না···চুপি চুপি এসে আমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে—

আমি বুঝি দেখতে পাই নি ··পালিয়ে এলেন যে ?

আমার হাতটি ধরে টান মেরে বলে—চলুন !

আমি সেই হাতের বন্ধনটুকুর জোরে টেনে নিলাম আমার বুকের কাছে··· আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল এনাক্ষী · যেন এক বিষধর সর্প দেখেছে সে স্বচক্ষে।

দুঃখ পেলাম···নিজেকে অপরাধী বোধ করলাম। চুপ করে থেকে বললাম—

তুমি তো মিশনারী আশ্রমের নান নও এনাক্ষী ?

মাথা অবনত করে সে উত্তর দেয়—না · আমি নান (Nun) নই। আমি সাধারণী—আমি মিঃ এটকিনসনের পালিতা কন্যা ··তবে কুমারী · এই কুণ্ঠাই কি আমার জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ নয় ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি—সত্যিই আমি অপরাধী। কারো আদর্শের ওপর হাত দিতে চাই না···তা ছাড়াও···

এনাক্ষীর চোখ দুটি যেন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। বললুম—বুঝেছি···

ও মৃদুস্বরে উত্তর দেয়—কি বুঝেছেন ?

বললাম—বুঝেছি যে হয়ত তুমি অন্য কারোর প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী।

আরও সজল হয়ে ওঠে ওর চোখ দুটি।

টপ টপ করে দুফোঁটা জল কাঁকর মাটিতে ঝরে পড়ে নিমেষে অবলুপ্ত হলো। ও বলে—অকারণে নিষ্ঠুর হবেন না···আপনাকেই হয়ত ··

—আর বলতে পারে না এনাক্ষী।

তবে ? তবে কেন দূরে সরে গেলে ?

এনাক্ষীর কথার বাঁধ ভাঙে। বলে—বিশ্বাস করুন, আপনাকে দূর হতে দেখেছি, কিন্তু আপনি দেখতে পান নি···প্রতি শনিবার আমি আসি···রবিবার

থেকে সোমবার ফিরে যাই তাই। ওটুকু দেখার জন্য…আমি ইদানীং চার্চে যেতাম না। বাবা-মা কেউই জানেন না আমার এই নিভৃত আত্মদান।

আমি সাদরে তাকে কাছে টেনে নি। বলি—এনাক্ষী—

…এইটুকুই যেন চিরন্তন হয়। সে বলে—চেয়ে থাকে আমার মুখের পানে।

আমি বলি—চিরন্তন! মানে কি বলতে চাও ··বিবাহের বন্ধনে?

এনা ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

আমি বলি—কেন?

এনা চোখ তুলে সাহস ভরে বললো—কারো ক্ষণ-প্রণয়িণী হবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই…তাকে আমি ঘৃণা করি।

আমি বলি—কিন্তু! যদি আমাদের প্রেমটুকু শাশ্বত হয়…মিলনের মাঝে ব্যবধান রচনা করে রাখি…তাতেও কি তোমার আপত্তি?

—জানি!

—কি জানো?

—বাবুরা সাহেবদের মত কালো রং সইতে পারে না।

উত্তর দিলাম না…দেবার ইচ্ছে হলো না।

ও বলে—কি কথাটা ঠিক কিনা?

আমি বলি—বন্ধুত্বের কি কোনই দাম নেই?

এনার চোখের চাহনি কেমন ঘুরে গেছে—ওখানে ফুটে উঠেছে বন্য প্রখরতা, ঘাড় নেড়ে জানালো—না।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলি—ভেবে দেখবো কেমন?

নীরবে কথা না বলে চলে যায় এনা…আমি স্তব্ধ—মনে হয়, আমি কাপুরুষ—আমি ভীরু!

কিন্তু আমার আদর্শ পান্থশালার সেই সাকীকে—বিবাহের গণ্ডীর বহুদূরে যার বাস।

সেকি সম্ভব হবে আমার জীবনে?

চার

ফিরে এসেছেন মিঃ এটকিনসন মিসেসের সঙ্গে···আমার যাতায়াত তেমনি পূর্বের মতই চলেছে। সব কথার মাঝে আমার চোখজোড়া খুঁজে বেড়ায় যাকে অনুক্ষণ সে কিন্তু প্রতিদিনই অনুপস্থিত।

এনাকে না পেয়ে ভেবেছি ছেড়ে দেবো ওদের ওখানে যাওয়া। রাত্রে তাস খেলা কিন্তু···প্রতিদিনই মনে হয়·· আর একটা দিন···আজ যদি আসে হ্যাঁ আজ তো শনিবার···দূর থেকেও ওকে একবার নিশ্চয়ই দেখতে পাবো।

···কিন্তু ওযে আমার চিন্তার পরিশেষ জানতে চেয়েছে···কথা দিয়েছি···ভেবে দেখবো···কি ছাই ভেবেছি!

মিঃ এটকিনসনের কাছে প্রোপোজাল? যদি না বলেন—যদি বলেন ওকে নিয়ে ঘর বাঁধার যোগ্যতা আছে কি না তোমার? অর্থ··তোমার সমাজের অভিমত ··তোমাদের আত্মীয়দের অনুমতি···ক্রীশ্চান হতে পারবে?

—না—! না দেখা হওয়াই মঙ্গল···

* * * *

ব্রিজের আসর নিত্য বসছে···থ্রি হ্যাণ্ড ব্রিজ।

নিত্য ল্যানটার্ণ হাতে পৌঁছে দিয়ে যায় চৌকিদার···আর্দালী ছুটিতে বাড়িতে গেছে···চৌকিদার ঠিক রাত সাড়ে নয়টায় রোঁদে বেরোয়। আমায় পৌঁছে দিয়ে কাজে যায়···।

* * * *

আজ এসেছে এনাক্ষী···

দূর থেকেই আমায় দেখে ভিতরে চলে গেছে···

বাগানে চায়ের আসর বসেছে—চা নিয়ে সবাইকে পরিবেশন করতে এলো এনাক্ষী নিজে। ব্যাপার কী?

চারিচক্ষের মিলনের আশায়···যতবারই ওর দিকে চেয়ে দেখেছি ততবারই দেখছি ও অন্যমনস্ক! সন্ধ্যা হয়ে গেছে···উপরের বারান্দায় জমে উঠলো ব্রিজের আসর। ভেবেছিলাম আজ হয়ত ফোরহ্যাণ্ড হবে···কিন্তু না, সেই থ্রি হ্যাণ্ড।

খেলা জমেছে—অযথা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছি···আনন্দ আর ধরে না···

তাকে দেখেছি···জানছি সে ভেতরে বসে বই নিয়ে পড়ছে—না আমার কথা শুনছে··· ।

সাড়ে নটা বেজে গেল—চৌকিদার এসে তার হাজরে জানিয়ে গেল। বললাম—তুমি চলে যাও, আমার কাছে টর্চ আছে, চলে যাবো···তাছাড়া আজ তো পূর্ণিমার রাত।

খেলা শেষ হতে প্রায় সাড়ে দশটা বাজলো

মিসেস্ এটকিনসন আপ্যায়িত জানিয়ে বলেন—হ্যাড সামথিং উইথ্ আস্···

মন—যা মন দিয়ে চায়—বুঝি পেয়েই যায়···এইটুকুই চেয়েছিলাম।

চারজন এক টেবিলে খেতে বসলাম···গল্প-গুজবে জমে উঠলো—কিন্তু এনা? অসম্ভব চালাক!

কথার পর কথা বলে যাচ্ছে··একটা কথাও আমায় বলছে না···অথচ আমাকে ঘিরেই তার সব কথা।

মিসেস্ এটকিনসন ভালোমন্দ খাবার খাওয়াতে চান—জেনে, এনা কথা না বলেই একটার জায়গায় দুটো দিয়ে দেয় তুলে আমার পাতে···আমি ওর দিকে চাইলে ও অন্যমনস্ক হয়ে অপর পাতে দিতে থাকে।

মিসেস্ বলেন—কি দেখছেন···ও···নো, নো—ইউ মাস্ট্···

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বাংলো থেকে গুডনাইট করে এগিয়ে পড়লাম। গেটের দরজাটা ক্যাঁচ শব্দ করে আমায় মিঃ এটকিনসনের বাউণ্ডারি পার করে·দিল।

মন উৎফুল্ল···অকারণ উৎফুল্ল··শিষ দিতে দিতে চলেছি···

হঠাৎ মোড়টা ঘুরতে যাবো—কি যেন সর সর করে সরে গেল—সঙ্গে সঙ্গেই গা'টা ঝিমঝিম করে উঠলো, তার পরেই···পায়ে একটা দারুণ বেদনা···তার সঙ্গে অসম্ভব জ্বালা···সে জ্বালা মানুষের সহ্যের বাইরে···ঘুরে টলে পড়ে গেলাম···মুখ দিয়ে একটা ক্ষীণ চিৎকার বার হয়েছিল বলে মনে হলো—তারপর জানি না··· ।

* * *

জ্ঞান যখন হলো তখন রাত দুটো···

এটকিনসন সাহেবের বাংলোর বেডরুমে বিছানায় শুয়ে···পাশেই হল ঘর···যেন সরগরম। কাকে যেন স্ট্রেচারে করে·বার করে নিয়ে গেল!

নিশ্চুপ চেয়ে আছি···

একটা জিপ স্টার্ট নিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেলো···তারপর, সব নিস্তব্ধ···

মিসেস এটকিনসন আমার ঘরে এসে ঢুকলেন রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন।

আমি আস্তে আস্তে বলি—কি হলো মিসেস এটকিনসন ?

আপনার জ্ঞান ফিরেছে ? সবিস্ময়ে বলে ওঠেন মিসেস এটকিনসন।

ডাক্তারও তাই বলে গেছেন—এখনি জ্ঞান ফিরবে।...একটু জল খাবেন ?

মিসেস এটকিনসন আমায় জল খাওয়ায়। খুবই তেষ্টা পেয়েছিল—সারা গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। জিভটাও অকারণ ভেতর দিকে যেন টেনে ধরছিল। জল খেয়ে শুধালাম—কাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে গেল...আমারই বা কি হলো ?

মিসেস এটকিনসন বলেন—আপনাকে বোধহয় পাহাড়ী বিচ্ছু-টিচ্ছুতে কেটে-ছিল। আপনার চিৎকার শুনে · সবার আগেই ছুটে গিয়েছিল আমার পালিত কন্যা...এনাক্ষী। পেছু পেছু আমরা গিয়ে পৌঁছাই ! মেয়েটা আমাদের পৌঁছনর অপেক্ষা না করেই, তার সাঁওতালী সংস্কারের বশে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে আমি বলি—কি ?

মিসেস উত্তর দেন—সে সেই মুহূর্তেই আপনার পায়ের ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে সাবা বিষটা সাক্ করে বার করে দেবাব জন্যে চুষে চুষে কালো রক্ত কুলি করে ফ্যালে।...কিন্তু বিষাক্ত বক্ত যতই বাইরে ফেলুক না কেন তার কিছু পেটে চলে যাবেই...একথা কিন্তু তখন কারোও মাথাতেই আসে নি। সবাই আপনাকে নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে আপনাকে উঠিয়ে আনা...স্টেশন থেকে ফাদার গ্রেহামের হাঁসপাতালে ফোন করা ডাক্তার আনা...এই সবের মাঝে ভুলেই গেছি যে এনাক্ষী কী ভয়ানক স্টেকই না তার নিজের জীবনের ওপর নিয়েছে। ওই বিষ মুখ দিয়ে সাক্ করে বের করা কি সহজ কথা ? আমরা সবাই প্রায় দু ঘণ্টা ধরে আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত · ইতিমধ্যেই দি পুওর গাল সাকাম্ড—মুখে জলের ঝাপটার পর ঝাপটা দিতে দিতে তবে যেন একটু নড়ে উঠলো · ভাগ্যিস ডাক্তার বাবু প্রেজেন্ট ছিলেন...তবু তিনি পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছিলেন...ফাদার গ্রেহাম নিজে এসে গিয়েছিলেন তিনি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করে তাকে হাঁসপাতালে রিমুভ করে নিয়ে গেলেন। জানিনা হোয়াট্ উইল বি হার ফেট্...হোয়াট উইলবি মাইন !

মিসেস এটকিনসনের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো ··আমি উত্তেজনায় উঠে বসেছি·· বলতে চাইছিলাম—আমার জীবনের জন্যে ও করল জীবন উৎসর্গ ? কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বার হবার পূর্বেই জ্ঞান হারালাম।

*　　　　*　　　　*

প্রান আমার আবার হলো…কিন্তু না হলেই হয়ত ছিল ভালো…কারণ ম আমার বিষে সে জর্জরিত হয়ে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে তার কে! জানি না ওমর খৈয়ামের সাকী এতবড় স্বার্থত্যাগ করে প্রেমের চ রাখতে পারত কি না…আমার পান্থশালায় উড়ে আসা বনের বিহঙ্গিনী শেষ যাতনার প্রতিচ্ছবি আমি যেন চোখের ওপর দেখতে পেলাম।

পাঁচ

র সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনোহরপুর ত্যাগ করে আমি পালিয়ে বাঁচি। হয়ত এনাক্ষী পাহাড়ী বিচ্ছুর বিষাক্ত হলাহল থেকে সে যাত্রা ডাক্তারদের আযাসেই রক্ষা পাবে, কিন্তু আমি মনে মনে বেশ বুঝেছিলাম তাকে শহুরে র নিঃশব্দ দংশন শেষ করে দিয়েছে! নইলে আমার জীবন-মৃত্যুতে কি যায় আসে? সে কেন প্রাণ উৎসর্গ করে আমায় বাঁচিয়ে তোলবার করবে?

তাই পালালাম। মনুষ্যত্বের কাছে কৈফিয়ত দেবার আমার কিছুই ছিল তবু শান্তি পাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, এই শহুরে বিচ্ছুর অদর্শনে কৃতঘ্নতায় প্রথম প্রথম হয়ত অসহ জ্বালাতেই জ্বলে মরবে কিন্তু তবু একদিন এই জ্বালাই বে তার মনের মাঝে দুরন্ত বিদ্রোহ—পুরুষের বিপক্ষে বিদ্রোহ—শহুরে দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ!…সেই আমার পরম তৃপ্তি।

তাকে নিজের করে পেলেও তাকে যা তিলে তিলে দিতাম তার চেয়েও ক কম আঘাত তাকে দিয়ে সরে পড়েছি বলে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলি।

মন বৈরাগী হয়েছে…প্রেমে না বিরহে, বুঝে উঠতে পারি না! কিন্তু ভাল লাগে না!

পালিয়ে এসে উঠেছি আমারই এক আত্মীয় বন্ধুর আস্তানায়। সে কাজ রাখা মাইন্‌সের 'কেপ-কপার' মাইন্‌সে।

একাই থাকতো অহী, আমায় পেয়ে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে সে যেন হাতে পেলে।

জায়গাটা পাহাড়সঙ্কুল নির্জন কান্তার। শাল-মহুয়ার ঘন জঙ্গল, তারই

মাঝপথ ধরে সুবর্ণরেখা সোনার কুচি গায়ে মেখে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। অহী অফিসে চলে যায় ভোর না হতে, তারই সঙ্গে কিছু চা নাস্তা খেয়ে আমিও বেরিয়ে পড়ি।

ওর অফিস দেখেছি, দেখেছি ওদের খাদের কাজ, কুলিকামিনদের হৈচৈ, বাবুদের ফষ্টিনষ্টি···

দুটো দিন; তারপর আর ভাল লাগে না। তাই শাল-পিয়ালের বনে বনে ঘুরে মরি···শূন্য বাট, শূন্য মাঠ। সবাই ও অঞ্চলে কাজ করে তামার খনিতে। দুপুরে ফিরি বাসায়·· অহী আসে লাঞ্চ করতে।

সাঁওতালী মেয়ে "বিদেশীয়া" রান্না করে রাখে,—রান্না করে ভাত ডাল আর একটা ভাজিয়া।

অমৃতের মত তাই খাই। অহী ফিরে যায় তার ডিউটীতে, আর আমি আবার বার হই শাল মহুয়ার বনের উদ্দেশে···নদীর ধারের ছায়ায় ঘুরে বেড়াই ···ক্লান্ত হলে শুয়ে পড়ি বনস্পতির ছায়াঘেরা শ্যামল আশ্রয়ে। মনের মাঝে বাসা বাঁধে এনাক্ষীর প্রেম। নিঃস্বার্থ ভালবাসা! নিঃস্বার্থ বইকি, কারণ ও বোধ করি আমায় চিনে ফেলেছিল। এমনি কত কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বনাঞ্চলের ছায়াতলে। স্বপ্ন দেখছি এনাক্ষী এসেছে·· বলছে—ওকি তুমি এখানে শুয়ে ঘুমুচ্ছ আর আমি তোমায় সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছি। ওঠ ওঠ!

ধাক্কা দিয়ে তোলে আমায়···

চোখ খুলে দেখি একটি তন্বী ষোড়শী আমায় ঝাঁকি দিয়ে যাচ্ছে—ও বাবুজি, উঠ্ উঠ্, সাঁঝ কেটে গ্যাছেক বটে···ভাগ্যিস আইছিলাম এঠানে তাইত বটেক খুঁজে মিললো···

ভারী মিষ্টি কণ্ঠস্বর! চেয়ে থাকি তার দিকে অবাক হয়ে। কথা বলছে সাঁওতালীর মত অথচ চেহারায় গৌরবর্ণা সুন্দরী!

সে আমার হাতটি ধরে তোলে। বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর বাসার দিকে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম—তুই কে বল দেকিনি?

খিলখিল করে হেসে বলে—মোরে চিনতি নারলেক বটে···মুই তো বিদেশীয়ার মাইয়ে···

বিদেশীয়ার মেয়ে সুন্দর! সাঁওতাল মেয়ের এত রূপ!···গৌরবর্ণা অথচ সাঁওতালনী। কিন্তু ওকে ত কৈ দেখিনি অহীর বাসায়।

" আর কথা কই না—বাসায় ফিরলাম। অহী বলে—বেড়ে ছেলে তো…, আমি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি আর তুই…

খিলখিল করে হেসে বিদেশীয়ার মেয়ে বলে ওঠে—ঘুমাচ্ছিল বটেক হুই লুখাকে · নদীর কিনারে।

অহী বলে—সে কি রে, এই সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারে তুই নদীর ধারে শুয়ে ঘুমচ্ছিলি! সাপেটাপে কামড়ে দেবে। এখানে আবার মাঝে মাঝে নেকড়েটা ভাল্লুকটা বেরোয়…আচ্ছা ছেলে তো!

ঘরে ঢুকে বসেছি। বিদেশীয়া ছুটে এসে বলল—না বাবু কুথাকে মিলল না আর হেইযে বাবু কুথাকে গিছলেক বটে?

বিদেশীয়ার মেয়ে এসে মায়ের হাত ধরে বলে—চল মা ঘরকে যাই, রাত হলোক বটে…

ওরা চলে যায়। জিজ্ঞেস করি অহীকে—বিদেশীয়ার মেয়ের নামটি কি?

অহী বলে—কি জানি, 'তোপসী' না কি…চল খেতে বসি।

খেতে বসি দুজনে। ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করি—তোপসীকে ত কখন এখানে দেখিনি?

মুচকে হাসে অহী—অথচ টুকটুকে রং…আঁটসাঁট গড়ন…বেশ লাগে, না? দরকার হলে ও আসে। আজ এসেছিল বলে রক্ষে নইলে আমি ত তোকে জঙ্গলে খুঁজে বার করতে পারতাম না।

মনের ঔৎসুক্য মনে চাপি…

রাতে বিছানায় শুয়ে কিন্তু অহী তোপসীর জীবনের ইতিহাসটুকু বলেছিল…

"তোপসী ভূরণ সর্দারের মেয়ে ·

বিদেশীয়া আর ভূরণ এসেছিল কপার মাইনে কাজ করতে চক্রধরপুর অঞ্চলের ঘন জঙ্গল থেকে। রিক্রুটিং অফিসার ওদের টাকা দিয়েছিল রাখা মাইন্‌স্‌ এলাকায়, ধাওড়ায় বাসস্থান দিয়েছিল। তারপর থেকেই বিদেশীয়া আর ভূরণ রাখা মাইন্‌স্‌বাসী। রাখা মাইন্‌সের পত্তনীর সময় ভূরণ ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল…বিদেশীয়া গিয়ে কেঁদে পড়েছিল মাইন্‌ ম্যানেজার উইলসনের পায়ে…

উইলসন বিদেশীয়ার কান্নায় দয়াপরবশ হয়ে ওকে ঘর বাঁধবার টাকা দিল, দিল ধেনো জমি ক্ষেতখামার করবার আর দিল ওর পেটে ওই মেয়েটাকে।

মেয়েটা জন্মাবার পরই উইলসন বদলি হয়ে যায়।

বিদেশীয়াকে মাসহারা পাঠাতো—বলতো এ হচ্ছে ভ্রূণের পেনশন। কিন্তু পাঁচ বছর শেষ হতেই সে মাসহারা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বিদেশীয়া চোখে অন্ধকার দেখলো।

ফুটফুটে মেয়ে দেখে ওদের জাতের সবারই জানতে বাকী রইল না তোপসী কার জন্মিত মেয়ে।

বিয়ে দিতে চায় বিদেশীয়া সাত বছরের মেয়ে তোপসীর···কেউ বিয়েতে রাজী নয়।

ক্রমে কিশোরী হলো তোপসী। ঝগুয়া সর্দারের ছেলে ফুলচাঁদ ওকে ভালবাসলো। বলে বিয়ে করবে···

বাপ আপত্তি জানালো। ফুলচাঁদ একরাত্রে তোপসীকে নিয়ে হাঁটাপথে হাজির হলে জামসেদপুরে।

তারপর দুজনেই কাজ পেলো লোহার কারখানায়।

ওরা নাকি ইঞ্জিনের সাহেবের বিয়েতে যে সানাই বেজেছিল সেই সানাইতেই ওদের বিয়ে সাঙ্গ করে!

তোপসীর রূপে সবাই বিমোহিত। ক্রমে বেধে যায় কাড়াকড়ি মারামারি রাহাজানি···ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মদ খাইয়ে ফুলচাঁদ ফেলে দেয় জলন্ত ফারনেসে। ফুলচাঁদের যাবজ্জীবনের মেয়াদ হলো।

ফিরে এলো তোপসী মায়ের ঘরে।

তারপর থেকেই তোপসী রাখা মাইন্সের সব বাবুদের প্রাণেশ্বরী···সবাই পাগল ওর রূপেতে।

ওর মা আমার বাড়িতে কাজকর্ম করে বলে আমার নামেও বদনাম রটিয়েছিল। আজকাল তাই ও আমার এখানে কম আসে।"

আমি বলেছিলাম—ও কি সত্যি ফুলচাঁদকে ভালবেসেছিল?

অহী বলে—তা জানি না তবে

চুপ করে যায় অহী।

কোথায় যেন ইশারা পাই, বলি—তুই কেন ওকে এখানেই রাখিস না···

অহী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—ও মেয়েকে বোঝা ভার—কে বাবা ও ঝঞ্ঝাটে যাবে—শেষে কি চাকরিটা খোয়াব···

তারপর বলে—এখনকার বড়সাহেব হতে শুরু করে ডেস্প্যাচের হুজরীমল পর্যন্ত ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাই ওসবে আর মন দিই না—

বুঝলাম তোপসী প্রেমিকা···তোপসী নর্মপ্রিয়া!

তোপসী এনাক্ষীর জাতের মেয়ে নয়।

ছয়

মনোহরপুরের বসু পরিবারের কাছ থেকে চিঠি এসে পৌঁছেছে···হয়ত এতে খবর আছে এনাক্ষীর!

কেমন আছে এনাক্ষী?

আমার জন্যে জীবনপাত করেনি ত?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি···নদীর ধারে শ্যামকুঞ্জে নিরালায় বসে রুদ্ধনিশ্বাসে খুলে পড়ি চিঠির লাইনগুলি।

—আঃ···তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম।

হ্যাঁ—খবর রয়েছে এনাক্ষীর। কুড়ি দিন বাদে সে সুস্থ হয়ে রেভারেণ্ড গ্রেহামের হাসপাতাল থেকে মিসেস্ এট্‌কিনসনের কাছে ফিরে এসেছে। কেমন যেন এখনও মুহ্যমানা। ডাক্তার বলেছেন—এ শুধু পাহাড়ী বিচ্ছুর বিষের প্রতিক্রিয়া···

আমি মনে মনে বুঝেছি—এ শুধু শহুরে বিষের উগ্রতা।

এনাক্ষী চায় ঘর বাঁধতে।

প্রিয়তমকে স্বামীর আসনে বসিয়ে, চায় পুত্র কন্যাবেষ্টিত গৃহস্থালী। পৃথিবীর মাঝে পৃথিবীর জীব হয়ে ঘরসংসার করতে। প্রেম—সে থাক হয়ে অবিনশ্বর! থাক সে পুত্র-কন্যা জন্মাবার পূর্বাধ্যায়ে অমর হয়ে। তারপর?···

তারপর বাৎসল্যবিহ্বল বুকে সে শুধু আঁকড়ে রাখতে চায় তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের—তার স্বামীকে করতে চায় পুত্রবৎসল কর্তব্যপরায়ণ পিতা। স্বামী তার হোক পিতৃত্ব লাভ করা এক পুরুষ···আর মাতৃত্বমণ্ডিত হোক তার নারীজীবন। দম্পতিপ্রেমের জীবন তার পর্যবসিত হোক এক ফলে ফুলে সুশোভিত রমণীয় উদ্যানে।

আমি চেয়েছি নায়িকা—যে হবে নর্মপ্রিয়া, মর্মসহচরী। রম্ভা, মেনকার

মত পৌরাণিক যুগের সহচরী নয়, তবে ওমরের সাকীর মত অন্ততঃ আমার চারপাশ ঘিরে দিবারাত্র থাক তার ফুটন্ত রূপ-নিকুঞ্জ বিছিয়ে, সেই নিকুঞ্জের শ্যামছায়াতলে নিত্য উঠুক বীণের ঝংকার, পান করাক কণ্ঠভরে বক্ষমদিরা, আর আমি শুধু চোখ বুজিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে বসে থাকি বুঁদ হয়ে।…

এনাক্ষীর স্বপ্নরাজ্যের স্বামী আমি নই, আর আমার স্বপ্ন-নিকুঞ্জের রানী এনাক্ষীও নয়। তবে ?…তবে তাকে ভেবে নিজের জ্বালা বাড়িয়ে লাভ কি ?

চাই জ্বালাহীন আনন্দ…লেনদেনের নিছক আনন্দ…হেসে খেলে কেটে যাক জীবনপ্রবাহ !

হঠাৎ পাহাড়ী বাঁশীর সুরের মত কানে এসে পৌছায়… এই বাবু !

ফিরে চাইলাম। হাসির আবীর ছোঁয়া গালে টোল ধরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোপসী।

আমায় ফিরে চাইতে দেখে ও বলে ওঠে—দিনরাত নিরালে বসে বসে কার কথাটি ভাবছিস্ বটে ?

ওর কথা শুনে আমার মুখেও ফোটে হাসির রেখা…এইটুকু বুঝি হলো তার কাছে যথেষ্ট ইশারা। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে খপ করে আমার হাত ধরে টান মেরে বলে—হামার সাথে আয় না বাবু…

এনাক্ষীকে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, বলি—আমায় নিয়ে কি করবি ? ঘর বসাবি ? নিকে করবি ? ছেলে কোলে নিবি ?…

চমকে ওঠে তোপসী, শিউরে ওঠে সে, চুপটি করে খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে ভুবনভোলান হাসি হেসে উত্তর করে—ক্ষেপে গেছিস বাবু…বেটার বাপ করবার লিয়ে বিয়াইত করলেম বটে কিন্তু দিল কৈ ? আর বেটা কে চায়…বেটা পেলে যে তুই হামাকে ভুলবিক…তখেন হামার উপায়টি কি হবেক বটে ?

বুঝলাম পেয়েছি। যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম দিকে দিকে তার সন্ধান পেয়েছি…কিন্তু, ও কি পারবে ওমর খৈয়ামের দর্শনের মার্জিতা সাকী হতে… আমার শূন্য কলস রূপমদিরায় পরিপূর্ণ করতে পারবে ওর ঐ বন্য উচ্ছৃঙ্খল শতপ্রসারী বাধাহীন রূপ দিয়ে ?…

আমায় ভাবতে দেখে তোপসী বলে—কার লেগে অতেক ভাবনা বাবু… কারু সাথে মন দিয়া লিয়া করেছিস নাকি ?

হাতে টান দিয়ে বলে—চল—হুই হুথাকে বসি…

এগিয়ে চলি।

এনাক্ষী কালো—

কষ্টিপাথরের খোদাইকরা দেবীমূর্তি…মিশন বাড়ির পীঠে রাখা ভার্জিন ম্যাডোনা…

আর,…

তোপসী ?…তোপসী রূপসী, চিরসঙ্গিনী প্রেমিকা, উর্বশীর মত "নহ মাতা নহ কন্যা"।…প্রিয়তমের চির-আলিঙ্গনের প্রেমমূর্তি। এ মূর্তিতে আছে মাদকতা—আছে স্বপ্নবিলাস—আছে চিরনর্মের উদ্দাম বিহ্বলতা।

এ অঞ্চলে অনেক পাহাড়ের নীচেটা ফোঁপরা, তৈরী করা গুহার মত। মাইনিং ইঞ্জিনিয়াররা ছোট ছোট খাদ কেটে তাঁদের লব্ধ বস্তুর অনুসন্ধানে এদের অঙ্গ ফোঁপরা করে দেখে নিয়েছেন। কিছু না পেয়ে পরিত্যাগ করে চলে গেছেন অন্যত্র। পরিত্যক্ত ফোঁপরা পাথরের অন্তরগুলিতে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট গহ্বর। কেউ জঙ্গলাকীর্ণ, কেউ বা বন্যজন্তুর বাসস্থান।

এমনি একটি ছোট গুহার দ্বারে এনে আমায় উপস্থিত করল তোপসী।

গুহার সামনে ঝুলছে আস্তরণের মত লম্বা লম্বা বনলতা। হাত দিয়ে পর্দার মত সরিয়ে দিয়ে বলে—আয় আয় বাবু—ভিতরে আয়…

ভয় পেলাম। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে, হাত পাগুলো থরথর করে কেঁপে ওঠে।

তোপসী বলে—ভয় কেনে…ওর ভিতরে কিচ্ছুটি নাই…আয়—আয়!

ওর ভেতর যদি সত্যি বাঘ ভাল্লুক থাকতো, হয়তো এত কেঁপে উঠতো না আমার হাত পাগুলো, কিন্তু এ যেন অসহনীয় কম্পন! কিছুতেই থামাতে পারছি না। এ যেন অনূঢ়ার প্রথম যৌবনানুভূতি…'কৃষ্ণ দরশনে শ্রীরাধার থরথর থরথর অঙ্গ কাঁপিছে'…নিজেকে সামলাতে পারি না…তবু অনুগমন করি তোপসীকে।

ভেতরে উপরের ফাটলপথ থেকে আলো এসে পড়েছে। ভেতরটা অন্ধকারময় ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম তোপসীর হাত ধরে বুঝি চিরান্ধপুরীতেই পদার্পণ করলাম, কিন্তু তা নয়, এ যেন আলোছায়ার সম্মিলিত আবছায়া।…ভেতরে

পাতার চ্যাটাই পাতা, কলসীভরা জল রাখা ··দুরন্ত-রৌদ্র-তপ্ত পথিকের বিশ্রামের পান্থশালা।

তোপসী আমায় নিয়ে পাতার চ্যাটাইতে বসায়। কলসী থেকে মাটির পাত্রে জল এনে মুখে তুলে ধরে। বলে—পি লে বাবু পি লে, বড্ড থগে গেছিস বটে!

মাটির পাত্র হাতে তোপসীকে অপেক্ষায় দেখে মনে পড়ে যায় ওমর খৈয়ামের সাকীর হাতের মদির পাত্রখানি।

পান করলাম···

আজ বুঝলাম—জলেও নেশা হয়!

চোখের রঙে রামধনুর বর্ণ জ্বলে, লতার ঝরোখার বেড়াজালে প্রেমের ঊর্ণনাভেরা জাল বিস্তার করে।

তোপসীর ছড়ানো বিছানো জালে আজ আমি সম্পূর্ণ বন্দী! তোপসীকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলি—"তাপসী"···

ও তোপসী নয়, ও আমার তাপসী!···

নর্মপ্রিয়ার মর্মভেদী তপস্যায় ও উত্তীর্ণা—তাপসী।

সাত

তারপর থেকে দুপুর, নেশায় ঝিমিয়ে পড়ে ··

সন্ধ্যার আবছায়ের আগেই ঘরে ফেরার তাগিদ আসে···ওঠার আগে মাঝে মাঝে গুঁজে দেই দুটি করে টাকা···তার পরদিন দুপুরে সে তা ফেরত দেয়। বলে, মাকে দিতে হয় রোজ রোজগারির মজুরি। দিনের না-কামানোর পয়সা পুষিয়ে নেয় রাত্রিকালে, তার পরদিন তাই ফেরত পাই আমার দেওয়া টাকা—কখন বা ফিরিয়ে নেওয়ার পরও উদ্বৃত্ত হয় ওর কাছে। তাই দিয়ে নিয়ে আসে বাবুদের ক্যানটিন থেকে চপ কাটলেট কেক। একসঙ্গে বসে খাই···

ও টাকা আনে কোথা থেকে? মনে প্রশ্ন ওঠে···

এ প্রশ্নের মানে হয় না···

যেখান থেকেই পাক না কেন সে খবরে আমার কাজ কি?

ও তো কানাকড়িও নেয় না আমার কাছ থেকে···সমুদ্রের মত যা ছুড়ে দিই

ওর দিকে প্রেমের তরঙ্গাঘাতে তা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। আমার পাত্রটুকু পূর্ণ করে দেয়···ব্যস্।

কালকের কথা কালকের ভবিষ্যে অদৃশ্য হয়ে আছে—সে যখন দৃশ্যমান হবে তখন ভাবা যাবে কেন তাপসী এমন করে!

তাই ভাবি না···

দায়িত্ব আমার,···তাকে আদর করা, প্রীত করা, প্রেম দেওয়া!

কিন্তু?

দেহের ক্ষুধায় মনের পেট বোধ করি ভরে না।

তাই এত পেয়েও মনটা, মনে হয়, থাকে ক্ষুধার্ত।

কেন—?—কিসের ক্ষুধা?

পরিপূর্ণ যৌবনের রুদ্রসুধারসটুকু নিঙড়ে আনারের লাল শরবত করে মুখে তুলে ধরেছে···তবুও কিসের পিপাসা?

মনের পিপাসা—মন নিয়ে? সে মন সে দিয়েছে কি?

ভবিষ্যের সঞ্চয়ের দিকে সে যেন চেয়ে থাকে···দুজনের মাঝে, দুইটি দেহের বিনিময়ে যে সঞ্চয় প্রতি জীবনেই জড়ো হয়ে ওঠে তাকে তো মনেপ্রাণে দুজনেই এড়াতে চেয়েছি।···তবে এ পিপাসা কিসের?

জংলী কপোত দম্পতির মত চাইনি তো নিজেদের নীড়কে শিশুকাকলীর কলরবে ভরিয়ে তুলতে···তবে এ কিসের পিপাসা?

এ পিপাসা আমার। তার তো কৈ দেখি না · সে তৃপ্ত। তৃষিত খালি আমি···আকণ্ঠ পান করিয়েছে সাকী তার মদিরকলস···নেশার আবেগে ঢলে পড়েছি···তবু এ পিপাসার শেষ নেই!

তাপসী বলে—তুই বড় ভাবনা করিস্ বটে বাবু। ভাবনা করবি কেনে? আমি কি তোর বোঝা হইয়েছি বটে?

বোঝা?···চমকে উঠি। বোঝা হলেও ছিল ভাল, মোটের মত ঘাড় থেকে টেনে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতাম, যেমন পালিয়ে এসেছি এনাক্ষীর কাছ থেকে।

এনাক্ষী যা চেয়েছিল তাপসী তো তা চায়নি বরং আমি যা চেয়েছিলাম তাই সে প্রাণপাত করে যুগিয়ে চলেছে।···তবে এত পিপাসা কিসের?

সমাজ সংস্কার সবই যখন নিজের হাতে সরিয়ে দিয়েছি তবে ভাল-মন্দের পথে রোধ করে কে দাঁড়াতে চায়!

উন্মুক্ত প্রান্তর, দিকহারা দুস্তর শ্যাম শোভা—তার সঙ্গে মিশেছে দূরান্তের

ঐ নিঃসীম নীল আকাশ·· তার মাঝে আমরা দুজন মাত্র! আমাদের পাপ পুণ্যের কেউ সাক্ষী নেই···অনুশাসন নেই···নেই প্রতিবন্ধক! তবু, কোথায় যেন কি অদৃশ্য তৃষ্ণা আমায় পীড়ন করতে থাকে দিবারাত্র!···মুক্ত বিহঙ্গের অক্লান্ত আকাশভ্রমণ যেমন শ্রান্ত করে তার পক্ষ দুটিকে এ যেন ঠিক তাই! যতই ভেবেছি ততই দিশেহারা হয়েছি।

তাপসী আজ মহুয়া খেয়েছে···ওর গালের কস বেয়ে মহুয়া গড়িয়ে পড়ছে। কলস থেকে মাটির ভাঁড়ে ঢেলে আমার মুখটির সামনে ধরে দেয়। মুচকে হাসে আমার পানে চেয়ে চেয়ে···তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকি ওর মাতাল চোখের দিকে। তারপর মাটির পাত্রটি হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাসায় ফিরে আসি। অবাক হয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকে গুহার দ্বারে, পেছু নেয় না। বাসায় ফিরে চুপটি করে বসে ভাবি—এ আমি কি করলাম!···ওকে কেন আঘাত দিলাম!···মনে পড়ে যায় ওমর খৈয়ামের দুটি ছত্র "রুম্‌ঝুম্ রুম্‌ঝুম্—সাকী ঢালে লাল সরাব।" এই তো চেয়েছিলাম সারা জীবন ধরে···তবে আজ কেন এ প্রতিবাদ? আজ হঠাৎ মনের মণি-মঞ্জুষার ঢাকনি খুলে গেল···তার ভেতর থেকে শতফণা বিস্তার করে জেগে উঠেছে আমার শিক্ষা—আমার দীক্ষা—আমার কৃষ্টি!

বুঝলাম আমার তৃষ্ণার্ত মনে এরই আকর্ষণে আজ ক'দিন ধরে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল···

আজ তা শতফণায় রুখে দাঁড়িয়েছে।

দু'দিন আসেনি তাপসী···

আমার ত্রিসীমায় ছায়াপাত করেনি।

আজ সকালে হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে—বাবুজী! কাল সোনাগড়ার মেলা দেখতে যাবেক?

তাপসী আজ প্রথম আমায় ডাকলো বাবুজী বলে—

তুই ছেড়ে সে বলেছে—যাবেক।

আমি ওর দিকে চেয়ে সম্মতি জানাই···

ওর মুখে হাসি ফুটে উঠে। বলে,

—ভোরে সঙ্গে লিয়ে যাবো ··তৈয়ারী থাকিস···

আর কথা বলে না, চলে যায়।

এক নিমেষে নেমে যায় ঐ দূরের নদীর ধারের খাদে।

অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকি ওর দিকে।…হঠাৎ কথা আসে,—

'বাবুজী টেলিগ্রাম'—

পিওন সই করিয়ে নিয়ে, টেলিগ্রাম হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়।

আমি টেলিগ্রাম খুলে পড়ি—

টেলিগ্রাম এসেছে মিসেস্ এটকিন্‌সনের কাছ থেকে।

ঠিকানা পেলেন কোথা থেকে ?…

বোধহয়, মনোহরপুরের বোসবাবুদের কাছে।…লিখেছেন,

—মিসেস্ এট্‌কিনসন কলকাতায় যাচ্ছেন। ট্রেন রাখা মাইনসে দাঁড়াবে না বলে, সম্ভব হলে দেখা করতে বলেছেন, দুটো স্টেশন আগে জাম্‌সেদ্‌পুরে।

এ টেলিগ্রাম মিসেস্ এটকিনসনের জবানি না এনাক্ষীর নিজের ?—না, এনাক্ষীর এতদূর সাহস হবে না। মিসেস্ এটকিনসন হয়ত এই টেলিগ্রাম নিজেই দিয়েছেন। এমনি কত কি নিজে নিজে ভাবি।

আজই রাত্রের ট্রেনে ওরা আসছে…

জামসেদপুরের ট্রেন আজ বিকেলে। জামসেদপুরে পৌছুবে সন্ধ্যায়। ডাউন বোম্বাই মেল রাত নটায়। ওদের সঙ্গে দেখা করে সে রাতে আর রাখা মাইনসে ফেরা চলেনা…তাই ভাবছিলাম।

তাপসী সোনাগড়ার মেলায় নেমন্তন্ন করেছে। ওকে কথা দিয়ে দিয়েছি… ও নিশ্চিন্ত হয়ে বনহরিণীর মত লাফাতে লাফাতে এমনি চোখের সামনে দিয়ে নেমে গেল। দুদিনের বিচ্ছেদের পর আমার নর্মপ্রিয়া আজ সন্তর্পনে এসেছিল তার প্রণয়ভিক্ষা জানাতে…সে ভিক্ষা আমি দেবো বলে স্বীকৃতি দিয়েছি…আকাঙ্ক্ষিতা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে কাল এসে আমায় হাত ধরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু…

এনাক্ষী আমার জীবনদাত্রী !

আমার শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টির উজ্জ্বল পথের অতিথি !… তাকেই বা হতাদর দেখাই কি করে ?

টাইমটেবল হাতড়ে দেখলাম ভোররাত্রে একখানা লোকালট্রেন সিনিস্টেশন থেকে রাখা মাইনসে আসছে…নিশ্চিন্ত হলাম।

অহী দুপুরে খেতে এসে আর অফিস গেল না…বললে ওদের দুদিন ছুটি।

সোনাগড়ার মেলায় এ অঞ্চলের সব সাঁওতালরাই যোগ দেয়। প্রায় চার

পাঁচ হাজার সাঁওতালের দল একত্র হয়ে নাচে, গানে, তীরের খেলায় এ মেলায় অনুষ্ঠান জমিয়ে তোলে।

সব ছোটে ওই মেলায়। এমনকি রাখা মাইনসের সাহেবরাও মেমদের নিয়ে জড়ো হয় ঐ মেলায়। কতক কতক বাবুরাও মেলা দেখতে যাবার প্রোগ্রাম করেছেন।

আমি বলি,—আজ বিকেলে আমি জামসেদপুরে যাবো ভাবছি···

অহী বলে—চল না ঘুরে আসি, ছুটিতে বসে বসে কি করব এখানে?···

চা খেতে খেতে অহীকে এনাক্ষীর নিজের জীবন অগ্রাহ্য করে আমার জীবন বাঁচানোর ইতিহাসটুকু শোনাই। মিসেস্ এটকিনসন তাই বোধহয় আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আমার জীবনদাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার।

অহী হাসে—বলে, রোম্যান্টিক!

বিকেলের ট্রেনে জামসেদপুর যাবার জন্য—তৈরী—হচ্ছে অহী। আমি শুধু হাতে পায়েই যেতে চাই। অহী আমার সুটকেশটা গুছিয়ে দিচ্ছে না নিচ্ছে বুঝতে পারলাম না। বললো,

—সঙ্গে থাকা ভালো। যদি দরকার পড়ে যায় কিছু?

আমি আপত্তি করি না।

সন্ধ্যার আগেই দুজনে গিয়ে স্টেশনে পৌছাই। অহীর হাতে আমার সুটকেস। অহীকে টিকিট করতে দিয়ে একটু নিরালায় স্টেশন ইয়ার্ডে পায়চারী করছি আর এনাক্ষীর কথাই মনে মনে তোলাপাড়া করছি।

ট্রেন এসে দাঁড়ালো—গাড়িতে উঠে পড়লাম আমি! অহী সুটকেসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—

'ধর! এইনে টিকিট আর টাকার ব্যালেন্স!···আমি আর যাবনা।'

ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার আগেই ট্রেনটা হুইসিল দিল।

আমি বলি—মানে?

ও বলে—মানে খুবই সোজা·· ট্রেনে বসে ভেবে নিস। পরে আশীর্বাদ করবি।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে···ওকে পিছনে ফেলে আমি তখন এনাক্ষীর দিকে এগিয়ে চলেছি।

কামরার বেঞ্চিতে স্থির হয়ে বসলাম। অহীর শেষ কথাটার মানে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম···।

অহীর হঠাৎ এই মত পরিবর্তনটা কেমন যেন লাগছিল।

অহী কি তবে আমায় ছল করে বিদায় করে দিলে? ও কি ভাবলে তাপসীর সঙ্গে···

না-না · তা কি করে হয়? · তবে?

ট্রেন হুহু করে এগিয়ে চলেছে—

মনটা কেমন উচাটন···কেমন ব্যাথায় টন্‌টন্ করছে···

কার জন্যে ব্যথা?···কিসের ব্যথা···নিজেই বুঝে উঠতে পারিছিলাম না। বাখা মাইনস কি তাহলে আমায় বিদায় দিল?···সেই জন্যেই কি অহী নিজে হাতে আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে দিল?···স্টেশন পর্যন্ত এসে আমার স্যুটকেস আমার হাতে তুলে দিয়ে বিদায় দিল।

না—না—

কাল সকালের লোকালেই আমায ফিরে আসতে হবে···নইলে তাপসী কি বলবে? কি কৈফিয়ৎ দেবো তার কাছে? নইলে সে ভাববে বাবুজী ভয় পেয়ে···পালিয়ে গ্যাছে দেশ ছেড়ে···চুপি চুপি···

যেমন জেনে রেখেছে এনাক্ষী!

আট

জামসেদপুর স্টেশনে নেমে বেশ ভাল করে এক কাপ গরম চা খেলাম। মাথার ঝিমুনীটা যেন কেটে গেল।

স্টেশনে থেকে খবর নিলাম যে রাত দশটার পর ও দিকে ট্রেন ইন্ করবে। অতএব রেলওয়ে ক্যানটিনে খাবার অর্ডার দেওয়া ছাড়া উপায় কি?···

অর্ডার দিলাম—মুর্গী আর রুটি।

একটা অহেতুক ভয়ে বুকটার মধ্যে দুরদুর করছিল···

—কেন তা জানি না।

মিসেস্ এটকিনসন কি এনাক্ষীর আর আমার মধ্যের সম্বন্ধটা জেনে ফেলেছেন? যদি বিয়ের প্রোপোজালটা দিয়ে ফেলেন?···কি উত্তর দেবো?

আমার যাযাবরী মন তো বিয়ের প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হতে পারবে না।

সে মন যে শুধু ঘুরে বেড়াতে চায় দুনিয়ার অপরিচিত সীমানার বন্যমৃগীর উদ্দেশে সে কথা তো তাঁকে বলা হয় নি!

গৃহনীড় যে আমার কাছে দুঃসহ কারাগারের বন্ধন! সেখানে নেই সজল বর্ষণ, নেই উষা প্রদোষের সপ্তরঙের খেলা…নেই গোধূলি, নেই কুহেলিকালিখা ভোরের আবছায়া আলোছায়ার খেলা…নেই জ্যোৎস্নাবিধৌত শুভ্র বনস্পতিদের নীরব আহ্বান—তা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা যে অসম্ভব।

এক বন্ধনহীন উদ্দাম স্বপ্নকে বাস্তবতার রূপে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা যে আমার জীবনকে উল্কার মত দিক হতে দিগন্তরে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতে চায়… তাকে কি সামান্য বিবাহবন্ধনে মন্ত্র পাঠ করে বা রেজিস্টারীর কাগজের কঠিন অনুশাষণে বেধে রাখা সম্ভব?

প্রেমের জীবন,—উৎসারিত উৎসের মত—অবারিত জ্যোৎস্নার মায়াজালে ঘেরা আলোছায়া-মাখানো শীতল এক জনশূন্য বীথিকা। যদি কিছু থাকে সে পথের মায়ায় জড়িয়ে—থাকবে শুধু দুটি হৃদয়ের এক অটুট ভালবাসার রেশমী সূত্রে বাধা। যদি আকাশ থেকে ঝরে পড়ে কিছু দুজনের মাথার ওপর—যে ভগবানের আশীর্বাদ নয়—ঝরে পড়ুক ফুলবীথিকার ছিন্ন ফুলের ঝরাপাঁপড়ীর মৃদু স্পর্শন। এ কাব্য-মনের খোরাক হয়ত জীবনের বাস্তবতার রূপে রূপান্তরিত হবে না—হয়ত থাকবে মনের গহন অভ্যন্তরে এক মায়ামৃগের মত সোনাব অঙ্গ নিয়ে তবু সে সোনার হরিণ সোনাই থেকে যাবে।…তাতে মালিন্যের ছোপ ধরবে না…নিত্য ব্যবহৃত হলেও না। পিতলের পাত্রকে উজ্জ্বল রাখতে গেলে দরকার হয় নিত্য মার্জনা কিন্তু সোনার পাত্র;…সে দোষের ছোঁয়া পায় না—সে সদাই সমুজ্জ্বল।

এ ছাড়া আর আমার গতি নেই। নইলে বাস্তবতার রূপে যে হবে দয়িতা সে কেমন হবে! সে বলবে হয়ত, 'তোমায় আমি জীবনে সর্বক্ষণ পাবো—ঘিরে রাখবো আমার সেবা দিয়ে, সংকল্প দিয়ে, তোমায় শান্তির সান্নিধ্যের সন্ধান দেবো পরম নিষ্ঠার সঙ্গে! কিন্তু কে দেবে?…এক কামনাময়ী নারী?

দিলেও, তার পেছনে থাকবে এক অদৃশ্য দুঃসহ নিষ্ঠুর বন্ধন যা থেকে মুক্তি নেই—ইহজীবনে। প্রস্ফুটিত স্বর্ণচাঁপাকে বইয়ের পাতার চাপে বেঁধে রাখলে যেমন হয়। প্রজাপতিকে ধরে কালো ভেলভেটের ওপর আলপিন বিদ্ধ করে যেমন রাখা হয় ফ্রেমে সাজিয়ে।

এতে জীবনটাকে নিয়ে হয়তো সংগ্রহশালার প্রদর্শনীর বস্তু করে তোলা যায়

কিন্তু তা দিয়ে তো আর সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগান যায় না! সৃষ্টিতত্ত্বের সংগ্রহ-শালাটুকু বন্ধ থাক ওই মেটারনেটি হোমে—আমি শুধু এর অনুপ্রেরণাতেই তুষ্ট…ওর বেশী আমি চাইনা।

মানে, পাওয়া আমি চাই না—চাই পাবার চেষ্টা—পাবার জন্য পাগল করা আকাঙ্ক্ষা—চাই পাবার নেশা—যার দুর্বার স্রোতে সারা বিশ্ব, সৌরজগৎ ছুটে চলেছে যুগযুগান্ত ধরে। এরা যদি আচম্বিতে থেমে যায়—দাঁড়িয়ে যায়?

না—ভাবতে পারা যায় না…।

এনাক্ষী হয়ত বলবে—এতেই আমি ধন্য—এতেই আমি খুশী সুখী—আমি কৃতার্থ…সফল হয়েছে আমার প্রতীক্ষার তপস্যা!

* * *

বাবুজী খানা তৈয়ার।

রেলওয়ে ক্যানটিনের বয় এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। চমকে উঠ্‌লাম, বললাম—কিতনা টাইম হুয়া?

—রাত নটা বেজে গেছে বাবুজি! গরম গরম খেয়ে নিন্।

উঠে চলি ক্যানটিনের টেবিলে।

খেতে বসলাম কিন্তু খাওয়ার রুচি হারিয়েছি।…এক দুরন্ত চিন্তা স্রোতের আবর্তে পড়ে আমার খাওয়ার স্পৃহাকে হরণ করেছে। কেবলই মনে হচ্ছে কি অভিপ্রায়ে মিসেস্ এটকিন্‌সন এই টেলিগ্রাম করেছেন।

ঘড়িতে দশটা বেজে দশ মিনিট।

প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালাম—ইঞ্জিনের একচোখো আলোটা সারা স্টেশনটাকে এক ঝলকে বিশ্লেষণ করে এগিয়ে চলেছে আমায় পাশে ফেলে—আমি অপরাধীর মত চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। পাসিং ট্রেন থেকে আওয়াজ শোনা গেল…মিঃ বোস—!

বুঝলাম মিসেস্ এট্‌কিনসনের গলার আওয়াজ।

ট্রেন দাঁড়াতেই ছুটে গেলাম ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের ধারে। উনিও ততক্ষণ ট্রেনের দরজা খুলে নেমে দাঁড়িয়েছেন। আমায় দেখেই বললেন—

—হাউ-ডু ইউ-ডু? টেলি পেয়েছিলেন তাহলে। আই-নিডেড্ ইউ-ভেরি আরজেন্টলি।

আমায় নিরালায় নিয়ে একটু সরে গিয়ে বিনা আড়ম্বরেই বলে চলেন—

—পারহ্যাপ্‌স আপনি জানেন—পুওর গার্ল লাভ্‌ড ইউ। কিন্তু সে আশা

ওর কাছে নিরাশ হয়ে যাওয়ায়, ও প্রতিজ্ঞা করেছে যে ও ওর স্বজাতিকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। অথচ আমি সেটা মোটেই চাইছি না। ও একটা সাঁওতাল কুলিকে বিয়ে করলে আমার সমস্ত শ্রম, ওর পেছনে পয়সা খরচ, সবই বৃথা হয়ে যাবে। ওকে বারণ করেছিলাম কিন্তু ও বলে—Don't you understand mummy—a raven can't be a peacock with peacock's feathers & tail'। উত্তর দিতে পারি নি অথচ আমি জানি ও যদি সাহেবের ট্রলি-ঠেলা কুলিটাকে বিয়ে করে ঘর বসায় তাহলে আমার আইডিওলজির চূড়ান্ত অপমান।

আমি বলি—কেন? ওকি ট্রলিঠেলা কুলিকে ভাল বেসেছে নাকি? ও তো শিক্ষিতা!

মিসেস এটকিন্‌সন উত্তেজিত স্বরে উত্তর দেন—বটেই তো—এনাফ সি হ্যাজ লারণ্ট্‌। তাছাড়া সুশীলাও আছে। আপনাকে ও ভালবেসেছিল কিন্তু যখন দেখ্‌লো সেটা ওর দুরাশা মাত্র তখন সাফ বুঝেছে যে কোন ভদ্রলোকই কোন দিন ওকে বিয়ে করে ঘর বসাবে না—অথচ মেয়েটার ঘর বাঁধার প্রকট ইচ্ছা। তাই সাহেবের মাইন্‌সের সর্দারের ছেলে বিশুয়াকে বিয়ে করবে বলে মনস্থ করেছে।

আমি জিজ্ঞেস করি—কেন—ওদের মধ্যে কি কোনো ভালবাসা ছিল নাকি?

উনি বলেন—না ও নিজেই প্রোপোজাল দিয়েছে।

চুপ করে থাকি···কি বলবো ভেবে পাই না। আম্‌তা আম্‌তা করে বলি—তা আমাকে টেলিগ্রাম দিয়েছেন কেন?

উনি বলেন—you can solve the problem. ও পাশের গাড়িতেই আছে—interএ আছে। যাচ্ছে ঘাটশিলা—ওখান থেকে যাবে ওদের কি একটা পর্ব আছে সেখানে। সেই পর্ব মেলায় হবে বিশুয়া আর ওর বিয়ের পাকাপাকি লগ্নী। বিশুয়া সিংভূমের লোক—জাতে সাঁওতাল।

আমি বলি—বিশুয়া কি সঙ্গে আছে নাকি?

উনি বলেন—না। আমি চাই, আপনি ওর সঙ্গে দেখা করে ওকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনুন।

আমি বলি—of all persons···আমি? ও শুনবে কেন?

মিসেস্‌ এট্‌কিনসন বলেন—শুনবে—I know it for certain—ও আপনার কথা ফেলতে পারবে না। আপনি এক কাজ করুন—ওকে নাহয় নামিয়ে

নিন…ওকে দুটো দিন আটকে রাখুন—তারপর আমি খড়্গপুর থেকে ওই গার্ডকে পাকড়ে আনছি—ওর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেবো। সে এনাক্ষীকে বিয়ে করবে বলে পাগল।

আমি বলি—কিন্তু এনাক্ষীতো পাগল নয় ?

উনি বলেন—সে একমাত্র পাগল আপনার জন্যে। সে বিশুয়ার জন্যেও পাগল নয় এটা জানবেন—শুধু গোঁয়ারতুমি করে এ কাজ করছে—নিজের ওপর নিজের অভিমান হয়েছে—তাই আমি জানি…ওকে আপনি নিবারণ করলেই থমকে যাবে। ওকে follow করতেই আমি এ ট্রেনেই যাত্রা করেছি…ও জানেনা যে এ ট্রেনে আমিও চলেছি।

ট্রেন হুইসল দিল—

উনি দরজায় হ্যাণ্ডেল ধরে বলেন—উঠে পড়ুন Inter কামরায়…

* * * *

জানলায় মুখ রেখে উদাস হয়ে বসে আছে এনাক্ষী…।

আমি কাছে এগিয়ে গিয়ে বলি—সরো—বস্‌তে জায়গা দাও।

চমকে উঠে চেয়ে থাকে আমার মুখের পানে…বলে,

—আপনি ?…

বলি—সরে বসো। কোথায় চলেছো ? ‥

এনাক্ষী সরে বসে জায়গা করে দেয়…বলে, আপনি…

কথা কেটে আমি বলি—জামসেদপুরে এসেছিলাম। যাবো ঘাটশিলা…তুমি ! তুমি কোথায় চলেছো…একা একা ?

এনাক্ষী একটা ঢোক গিলে বলে—আমিও ঘাটশিলা যাচ্ছি।

আমি বলি—তা একা যে—মিসেস্ এটকিন্‌সন বুঝি first class এ !

এনাক্ষী চুপ করে থাকে।

—কি কথা বলছো না কেন ?

হঠাৎ ওর চোখ দুটো যেন চিক্‌চিক্ করে ওঠে ‥নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে মুখটা জানলার দিকে ঘোরায়।

আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপিচুপি বলি—কি হয়েছে এনাক্ষী ? আমায় বল !

ও বলে—ওঁদের বাঁধন কেটে চলে এসেছি—আর ফিরে যাবো না।

আমি বলি—তা বেশ করেছো। তা এখন কোথায় যাবে…আমার সঙ্গে ?

ও এবার শত দুঃখেও হেসে ফেলে বলে—বললুম তো ঘাটশিলা।

আমিও হেসে উত্তর দি—আমিও যে ঘাটশিলাতেই যাচ্ছি—তাইতো বললাম।

ও বলে—বেশ চলুন!

এরপর কথা থেমে যায়। ট্রেনে কথা ভাল জমে না—পারিপার্শ্বিক আছে তাই চেষ্টাও করিনি। মার্জিত হয়ে ওর পাশটিতে চুপটি করে বসে থাকি—কারণ চেয়ে দেখ্‌লাম···আশেপাশের লোক জিজ্ঞাসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে তাকিয়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ট্রেন এসে পৌছে গেল ঘাটশিলা স্টেশনে। আমিও ওর সুটকেশটা তুলে নিয়ে স্টেশনে নেমে সটান waiting room-এ ঢুকে পড়লাম। ···আর ও আমার ফেলে আসা সুটকেস হাতে নেমে পড়ে আমার পেছু নিয়েছে আড়চোখে দেখলাম।

ফার্স্ট ক্লাস Waiting Room-এ পদার্পণ করে ও বলে—নিন্ আপনার সুটকেশ···ওটা আমার আমায় দিন!

আমি Waiting Room-এ দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলি—ঐখানে শান্ত হয়ে বসো।

ও বলে—ওরা যে আমায় খুঁজে বেড়াবে!

আমি বলি ওরা আবার কে?

ঢোক গিলে ও উত্তর দেয়—মানে বিশুয়ার লোকজন।

বলি—বিশুয়াকেই চিন্‌লাম না—তা আবার তার লোকজন। আমায় একলা ফেলে চলে যেতে চাও যেতে পারো···নইলে ওই ইজিচেয়ারটায় চুপটি করে বসো···

ও কথা বলে না···ওর পা দুটো যেন গেঁথে গ্যাছে···দরজার শার্সি দিয়ে বাইরের পানে নজর!

আমি বলি—ওদের খুঁজে নিয়ে আসবো?

হঠাৎ চমকে উঠে···এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে আমায় শাসিয়ে নিয়ে সে গিয়ে বস্‌লো ইজি চেয়ারটায়।

ইঞ্জিনের আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল···বাইরে কারা যেন খালি স্টেশনে ঘোরাঘুরি করছিল···তার পর সব স্তব্ধ।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে আমি আমার সুটকেসটা খুলে একখানা চাদর বার করে ওর

দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি···নাও লক্ষ্মিটীর মত ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়, আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি।

ও আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে ওঠে,

—জানেন কাল আমার বিয়ে?

আমি বলি—তাই নাকি? ···তাহলে বল তুমি অপরের বাগদত্তা?

ওর চোখ দুটো যেন আগুন বর্ষণ করলো···

খুব নীচু স্বরে আমি বলি—এনাক্ষী!

ও চুপ করে থাকতে পারে না···কেঁদে ফেলে। তারপর ধরা গলায় বলে—

—আমি তো আপনারই জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চেয়েছিলাম মিঃ বোস!

আমি স্মিত হেসে উত্তর দি—জীবনের ভার—গুরুভার। সে ভার নেওয়াও যত দুরূহ—দেওয়াও তত দুরূহ···তার চেয়ে এটুকু কি মন্দ লাগছে?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে এনাক্ষী দাঁড়িয়ে ওঠে···দেখি ঠোঁটদুটো ওর কাঁপছে··· একটা চাপা কান্নায় যেন ওর কণ্ঠ রোধ হয়ে যাচ্ছে···তবু ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে··· উত্তেজিত ভাষায় জানায়,

—নারীর জীবন ক্ষণ-প্রণয়িণীর জীবন নয় মিঃ বোস। সে এক চিরন্তনী প্রেম-স্রোত। সুখে-দুঃখে, সেবায়-যত্নে, সংকল্পে, সাহায্যে তার সান্নিধ্যই পুরুষের একমাত্র কাম্য।

বুঝলাম এনাক্ষী কথা বলতে শিখেছে।

আমার প্রত্যাখ্যানের নিষ্ঠুরতাকে লুকিয়ে রাখতে না পেরে আজ ফুঁসিয়ে উঠেছে। ···কিন্তু যার জীবনের দয়িতা হতে চায় এই নারী তাকে পাশে পেয়েও এই আনন্দ মুহূর্তকে উপেক্ষা করছে একি শুধু সামান্য শিক্ষার সংস্কারে? ···না···

মনে হয় যাক ভেসে যাক আমার জীবন দর্শন—ওমর দর্শন—এনাক্ষীর কথার এরা কি সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবে?

নইলে ভাঙা জীবন নিয়ে ও কি করবে? কোথায় যাবে? দয়িতের প্রণয়ের ফল্গুটুকু বুকে নিয়ে ওকি তবে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে···?

ও বলে—আচ্ছা মিঃ বোস—বিয়ে করতে আপনার এত অমত কেন?··· আপনি কি বিবাহিত।

আমি বলি—বিবাহিত তো নই-ই···বরং বিবাহের কল্পনাই আমার কাছে এক ভয়াবহ রসিকতা।

কেন ?…

…আজ বিয়ে করে তোমার কোলে একটি প্রেমের নিদর্শন গুঁজে দিয়ে যদি ছেড়ে চলে যাই…বা ডাইভোর্স ঘটে তবেই কি তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে তোমার আজীবনের সংস্কারের তপস্যা ?

…আমি যদি তাই ভালবাসি…তাতে আপনার আপত্তি আছে ?…

…আপত্তি আমার যেমন নেই… তেমনি আমাদের দুজনের মাঝে এটাই যে পরম নিষ্পত্তি বলে আমি মানতে পারছি না।

…মানতে পারছেন না ?

বাণবিদ্ধ হরিণীর মত ছটফট করে ওঠে…বাইরের জানলার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। …ভোর হয়ে আসছে… জানলার সার্সি দিয়ে তারই—মৃদু আভাস রুদ্ধ জানলায় আঘাত করছে। ও বলে,

—ভোরের আলো দেখা দিয়েছে…আমায় আপনি ওদের কাছে পৌঁছে দেন তো বড় ভাল হয়…নইলে আমায় নিজেই পথ চিনে যেতে হবে।

—যদি বলি, পৌঁছে দিতে তো পারবই না… তোমায় আমি ছাড়বও না !

ও হঠাৎ দৌড়ে এসে আমার দুটি হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে—কেন আপনি আমায় নিয়ে খেলা করছেন মিঃ বোস…আমি যে আপনার নিতান্তই…

কথা আর বেরুলো না…কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এনাক্ষী।

আমি আমার বাহুবন্ধনে ওকে জড়িয়ে নিয়ে। আমার বুকে মুখ রেখে ও যেন পরম আশ্রয় পেয়েছে বলে মনে করে আমার দেহে ওর দেহখানি সম্পূর্ণ এলিয়ে দেয়। আমি ধীরে ধীরে ডাকি,

—এনাক্ষী।

সারা শরীর ওর কেঁপে ওঠে বার বার… তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে সজল চোখে বলে—আপনি ছাড়া আমার সব শিক্ষা সব তপস্যা বৃথা হয়ে যাবে মিঃ বোস।

আমি বলি—অনন্তকাল আমার জীবনকে তোমারই মন্দির করে রাখতে চাই এনাক্ষী—

তুমি যে আমার প্রাণদাত্রী।

নয়

সকালবেলা এনাক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উঠলাম ডাকবাংলোয়। দুজনেই স্বস্তি পেলাম। বাংলোর বাবুর্চির হাতে টাকা তুলে দিয়ে নাস্তার ব্যবস্থা করতে দিয়ে সকালের প্রাতঃকৃত্যটা সেরে নিলাম।

বাইরের খোলা বারান্দাটায় বাবুর্চি নাস্তা দিয়ে গেল। আমি আগেই এসে বসে অপেক্ষা করছিলাম এনাক্ষীর জন্যে।

বাংলোর বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে অনতিদূরের পাহাড়গুলি। লালমাটির পথ···আজ পথ ধরে যেন পিঁপড়ের সারের মত লোক চলেছে সোনাগড়ার মেলায়।

এ মেলায় আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল তাপসী। ভোররাতে এসে হয়ত দরজায় টোকা দিয়ে ডেকে গ্যাছে···বাবুজি ঘুমিয়ে পড়েছে বলে হয়ত অপেক্ষাও করেছে, তারপর অপেক্ষায় নিরাশ হয়ে হয়ত অহীর কাছে শুনেছে—বাবুজি কালই বিকেলের ট্রেনে রাখামাইনস্ ছেড়ে চলে গেছে।

···চলে গেছে?···বাবুজি···আমায় না বলে? এও কি সম্ভব? ···না না বাবুজি তো কখনও মিথ্যা কথা বলে না! —না···তবে হয়ত রাগ করেই চলে গেছে বাবুজি, আমার ওপর অভিমান করেই···

—কি ভাবছেন বসে বসে? খাবার যে জুড়িয়ে গেল! ···পেছন থেকে বলল এনাক্ষী।

কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ এনাক্ষীকে···স্নান সেরে চুলগুলো পিঠে এলিয়ে দিয়ে একটি শাড়ি ও ব্লাউজে ঢাকা ও একহারা চেহারাখানায় আজ কি জলুস··· হোক কালো·· তবু সে কষ্টিপাথরে তৈরী নিখুঁত মর্মর-প্রতিমা।

আমি স্মিত হেসে বলি—সত্যি এত শীগগির যে সব জুড়িয়ে যাবে ভাবিনি। ভেবেছিলাম যা রাগান রেগেছিলে—এ রাগ জুড়োতে কত যে মুশকিল হবে কে জানে।

মুচকী হেসে এনাক্ষী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো·· বললো—খান!

শুরু করা হলো নাস্তা খাওয়া···খেতে খেতে চেয়ে থাকি পাহাড় পথের দিকে।

সারি সারি লোক চলেছে…অগুণ্তি। এনাক্ষীও বার বার সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। আমি বলি,

—কি এনাক্ষি, মনটায় টান পড়েছে নাকি ?

দুচোখে ও বিদ্যুৎ চমকালো · তারপর হেসে জবাব দিল,

—এদিকের পেছটান যে এগুতে দিচ্ছে না।

বলি, চলোনা আমরাও যাই !

শিউরে ওঠে ও। বলে—অমন কাজও করবেন না। জানেন না তো আজকের মেলার মানে কি ?…এ মেলায় আজ অন্তত দশ পনের হাজার সাঁওতাল এই সোনাগড়ার টিলায় জড় হয়…মহুয়া খেয়ে তারা সবাই চুর্ চুর্ হয়ে আছে। তারা আজ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য…সারা বছরের যার যত কিছু হৃদ্যতা আর শত্রুতা তা নিয়ে হয় অসংকোচ বোঝাপড়া। ওসব জায়গায় নিষ্পত্তি বিপত্তি দুয়েরই ফলাফল ভয়াবহ·· হয় রক্তারক্তি·· নাহয় মহুয়া খেয়ে গলাগলি করে মরে বসে থাকে। তাই ওসব জায়গায় পদার্পণ করাটা এতটুকু নিরাপদ নয়…আপনারও নয় আর এখন আমারও নয়।

এনাক্ষীর·· এখন কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করে বললাম,

—কেন তোমার নয় কেন ··তোমাকেও কি ?

—না যাওয়ার প্রতিশোধ নেই বুঝি ?

—বলবে কাল এসে পৌঁছতে পারি নি, আজ এসে পৌঁছলাম।

—আপনাকে নিয়ে ?…হা হা করে হেসে উঠে এনাক্ষী।

আমি বলি—এতে হাসির কি আছে…বলবে একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—শুধু পৌঁছে দিয়ে—এখানকার মেলা দেখে চলে যাবেন।

এনাক্ষী কেমন বিমনা হয়ে যায়। পরে ধীরে ধীরে বলে,

—আপনারও কি ঐ রকম ইচ্ছা…

আমি—তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে…

—সত্যি ?

কথাটা বেফাঁস মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল…তাই কথা ঘোরাতে বলি,

—আচ্ছা এনাক্ষী, তোমার বাগদত্তা স্বামী, তোমায় এখন পেলে সত্যি কি—

—না, একলা পেলে হয়ত কিছু বলবে না, তবে আপনার সঙ্গে…জানিনা—

বলি—জানি এনাক্ষী, সত্যিই ও জায়গা তোমার আমার কারোরই নিরাপদ নয়। স্টেশনও নিরাপদ ছিল না তাইতো ডাকবাংলোতে সরে এলাম।

আজকের দিনটা কাটিয়ে রাত্রের বোম্বাই মেলে তোমায় নিয়ে মনোহরপুর ফিরে যাবো ভাবছি।

চুপ করে গিয়ে কিছুক্ষণ এনাক্ষী আমার পানে চেয়ে বলে ওঠে—মাম্মীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করবে।

আমি হেসে উত্তর দি—সে লজ্জা নিবারণের লজ্জাহারী তো আমি রইলাম।

এনাক্ষী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,—ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাস্তাটা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকবে···তখন একটু দুজনে মিলে ঘুরে আসবো—কি বলেন?

—বেশ, তাই হবে···

কি একটা কাজে এনাক্ষী অন্দরের দিকে পা বাড়ায়···

আর···আমি ধীরে ধীরে পা বাড়াই গেটের দিকে।

বাংলোর টিলার নীচেই খরস্রোতা স্বর্ণরেখা···সোনার কুচিতে ভরা তার ঝিকিমিকি বালুচর। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওই নদীতটের উচ্চ বন-রেখা। ওরা যেন ঝুঁকে ঝুঁকে পড়েছে নদীর জল স্পর্শ করবে বলে কিন্তু নদী তার নিজের সংযম রেখে ছোঁয়া না দিয়েই তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে।

পাশপথ ধরে উঠে পড়েছি নদীর পাশের উঁচু টিলাটার ওপরে।···একটি রাঙা মাটির সুদীর্ঘ পথ, বনের বুক চিরে ছুটে চলে গেছে···অদূরে শৈলগিরির চূড়া পার হয়ে নেমে গেছে এক অজানা প্রান্তরে। এ পথে ভিড় নেই, নির্জন, শুধু পড়ে আছে পথ—পথিকের পথ চেয়ে। সেই নিরালা-পথের যাত্রী, একা আমি।···পথ চলেছি সীমান্তের দিকে দৃষ্টি রেখে।

এ পথের কি শেষ নেই? সীমাহীন দুরন্ত পথ যেন কিসের আকর্ষণে আমায় আকৃষ্ট করেছে। ওপাশের দূরান্তের প্রান্তরেই কী সোনাগড়ার মেলা···ওখানে কি তাপসী আমার জন্যে হাজার সাঁওতালী পরিবেশের মধ্যে একজন নিছক বাঙালীকে খুঁজে ফিরে বেড়াচ্ছে?

হঠাৎ নিঃসীম আকাশের পটভূমিকায় যেন এক কালো ছায়ামূর্তি দেখ্‌তে পেলাম। পিছনের সূর্য-কিরণে সে মূর্তির রূপ চিত্রপটের এক শিলাওট বলে মনে হচ্ছে তবু বোঝা যাচ্ছে—যে সে মূর্তি কোনো এক নারীর। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে···তার দেহের ভঙ্গীতে আর পাদক্ষেপে দুলছে এক সাঁওতালী ছন্দ। এ ছন্দ আমার বড় চেনা···তবে কি তাপসী এই পথেই আসছে!

উন্মনা দাঁড়িয়ে পড়ি···

ছায়ামূর্তি হঠাৎ তীর বেগে আমারই সন্ধানে এগিয়ে আসতে থাকে—

দূর থেকে নারী কণ্ঠের উৎকণ্ঠ ভরা স্বর কানে এলো—মিঃ বোস !!!

ফিরে দাঁড়ালাম···

আবার ডাক এলো···পাহাড়ে টক্কর খেয়ে সে ডাক প্রতিধ্বনিত হয়ে দূরান্তে মিলিয়ে গেল—বুঝলাম···এ কণ্ঠ তাপসীর নয়···

সামনেই এনাক্ষী !

বলে—একি করেছেন ? একা একা এমনি করে পাহাড়তলির পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! জানেন কি বিপদ হতে পারে ?

বলি—বেড়ানোর বিপদ কী ? পথ হারাবো ?···

এনাক্ষী কানের কাছে তার মুখ নিয়ে এসে নীচু স্বরে বলে—না, তা নয়। আমায় যারা স্টেশনে নিতে এসেছিল তারা আমায় না পেয়ে কি অমনিই ফিরে গেছে ভাবছেন নাকি। তাদের মধ্যে কেউ যদি আমারই সন্ধানে আমাদের অজান্তে পিছু নিয়ে থাকে···আর যদি···

আমি হেসে বলি—আর যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে আমাকে ? এই না ?

···হ্যাঁ·· ভয়বিজড়িত কণ্ঠে এনাক্ষী উত্তর দেয়।

···তা তুমি তো আছ।

···ওরা আমাকেও ছাড়বে না।

এবার আমি মজা করতে বলে উঠি—তবে আমার সঙ্গে এলে কেন ?

চুপ করে থাকে এনাক্ষী। তারপর এক অসম্ভব দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দেয়—থাকবো বলে। তা বলে আপনাকে বিপদে ফেলবো বলে নয়। চলুন বাংলোয় ফিরে চলুন।

চলতে সুরু করে এনাক্ষী···ওকে অনুগমন করি।

সারা পথটার মধ্যে দুজনেই নীরব। বাংলোয় ফিরে প্রথম কথা কইলাম আমি। বললাম—তোমায় ওদের কাছ থেকে কেড়ে রেখে হয়ত ভাল করি নি···

কেন ?

—যাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারব না তাকে তার ঘর বাঁধার সঙ্গীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার অধিকার আমার থাকা উচিত ছিল না···

এনাক্ষী কিন্তু চটলো না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখের সামনে মুখ এনে বললো—তবে এখন উপায় ?

বুঝলাম এনাক্ষীও রঙ্গিলা···

ওর প্রাণেও সুর আছে…শহরের তন্বীর মত সহজজাত রঙ্গভঙ্গ অনঙ্গে সেও সুরেলা—সেও চটুলা।

বেশ লাগছিল ওকে—বললাম, উপায় তুমিই বল!

এনাক্ষী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। চুপ করে থেকে, ধীরে ধীরে বলে—

—যে ঘর বাঁধতে চায় না তাকে জোর করে ধরে রাখবার ক্ষমতা আমার নেই। তাই শুধু এই কথাটাই শেষবারের মত অনুরোধ জানাচ্ছি যে আমার ভবিষ্যৎ দয়িতের সম্বন্ধে আপনি আর বাধা দেবেন না।

—না কক্ষনো বাঁধা দেব না, বরং সাহায্য করবো।

—কি সাহায্য করবেন?

বলি,—যদি বলি, যে তুমি একটি শিক্ষিত আংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করে সুখী হও! ঘর বাঁধো…বছর বছর একটি করে সন্তানের…

হঠাৎ খপ্ করে আমার মুখটা চেপে ধরে এনাক্ষী।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি বলি—সত্যি বলছি, এই আমি চাই…

—এতে তোমার লাভ?

—তোমার শান্তিভরা সংসারে অতিথি হয়ে আসবো কোনোদিন। চাইব তোমার অমলিন প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা। দূর থেকে সে ভালবাসা নীরব চোখের ভাষায় জানিয়ে যাবো দুজনে। আর যাদের নিয়ে তোমার সোনার সংসার গড়ে উঠ্‌বে তারা সবাই হবে আমার নিকট আত্মীয়‥ কি বল?

ও যেন কোথায় গেছে ‥

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলে—

—আচ্ছা আমি যদি ফাদারের কাছে গিয়ে নান্ হই, তোমার আপত্তি আছে?

আমি বলি—কি দুঃখে তুমি নান হতে যাবে? আমার জন্যে ‥? আমি… আমি তো চিরদিনই তোমার।…

হঠাৎ দারুণ আঘাতে মাথাটা যেন ঘুরে গেল। দুহাতে মাথাটাকে চেপে ধরতে গিয়ে দেখি রক্তে রক্ত…একটা স্ত্রীকণ্ঠের আর্তচীৎকার শুন্‌তে শুন্‌তে আমি জ্ঞান হারালাম।

দশ

চোখখুলে চারপাশ দেখতে গিয়ে মনে হলো এক অসহ্য যাতনা সারা শরীরটাতে যেন আঁকড়ে ধরে রয়েছে। স্মৃতিপথে যেন কিছুই আসছে না···

পাশে বসে এনাক্ষী···দৃষ্টি তার আমার মুখের উপর নিবদ্ধ··সে দৃষ্টিতে রয়েছে এক উদ্বেল আশঙ্কা।

আমায় বললো—কেমন বোধ করছো?

আমি স্মিতহেসে বলি—কি হয়েছে আমার?

মাথাটায় হাত দিয়ে দেখি কঠিন বন্ধনে আমার মাথাটাকে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখেছে। মাথা থেকে হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে দিল এনাক্ষী, বলে—ওতে হাত দিও না ব্যথা পাবে—

আমি বলি—কেন—কি হয়েছে আমার বললে না তো?

ও বলে—পরে শুনো, এখন চুপটি করে থাকো, লক্ষ্মীটি।

এনাক্ষীর তুমি সম্বোধন আমার ভারী-মিষ্টি লাগছিল···ওর অনুরোধে তাই চুপটি করে শুয়ে ওরই মুখের পানে তাকিয়ে থাকি।

মিসেস্ এট্‌কিন্‌সন এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন,

—মিঃ বোস হুঁশে এসেছেন?···তাহলে আরদালীকে একবার ডাক্তারবাবুর কাছে খবর দিয়ে পাঠাও এনাক্‌সি। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন হুঁশ ফিরলেই যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

এনাক্ষী আমার পাশ থেকে উঠে ধীরে ধীরে ঘরের বার হয়ে যায়। মিসেস এটকিন্‌সন আমার পাশটিতে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—হাউ-ডু ইউ ফিল মিঃ বোস?

ঘাড় নেড়ে ভাল আছি জানাতে গিয়ে মাথাটার মধ্যে টন্‌টন্ করে ওঠে··· আমি চোখ বুজিয়ে নিজেকে সামলাই।

মিসেস এট্‌কিনসন বলেন—জানেন মিঃ বোস, মেয়েটা সত্যিই বুদ্ধিমতী, নইলে ঘাটশিলা থেকে আপনাকে এমন করে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে পারত না।···

স্মৃতির অবশেষটুকু মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ সেই দারুণ আঘাত··সেই রক্তস্রোত···সেই স্ত্রী কণ্ঠের আর্ত-স্বর!

মিসেস এট্‌কিনসন বলেন,—আপনাকে যখন ওর সেই সাঁওতালি ভাবী খসম বিশুয়ার লোক আক্রমণ করে, তখন এনাক্‌সী নিমেষে চীৎকার করে লোক জড় করে। তারপর ডাক-বাংলোর চৌকিদারকে দিয়ে পুলিসে খবর পাঠায়। আশপাশের লোকজন এক নারীর আর্তকণ্ঠ শুনে পলায়মান মাতাল লোকটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে চ্যাংদোলা করে বাংলোর একটা ঘরে এনে শিকল তুলে দেয়।···পুলিস এলে এনাকৃসি বিনা দ্বিধায় স্টেটমেণ্ট দিল—মিঃ বোস হচ্ছেন আমার স্বামী···আমরা হনিমুন করতে মনোহরপুর থেকে ঘাটশিলায় কাল রাত্রের ট্রেনে পৌছাই···ওই লোকটা রাত থেকেই আমাদের ফলো করছিল···ওদের সর্দার বিশুয়া মনোহরপুরের আয়রণ ওরস মাইনের সর্দারের ছেলে—জাতে সাঁওতাল। সে চেয়েছিল আমায় মিঃ এট্‌কিনসনের বাংলো থেকে তুলে নিয়ে যেতে···আমি মিঃ এট্‌কিনসনের পালিত কন্যা··

পুলিস মনোহরপুর স্টেশনে ফোন করে খবর সঠিক কিনা জানতে চাইলো। ভগবানের কৃপায় আমিও এসে পৌছে গেছি তার আগের দিন রাত্রের গাড়িতে। কাজেই ইমিজিয়াটলি আমি সবটা বুঝে ফেলেছি, এবং পুলিসকে যথাযথ সত্য জানালাম। নেকস্‌ট্ সকালের ট্রেনে এনাকৃসি আপনাকে নিয়ে পুলিস এস্কর্টে এখানে এসে পৌছালো···তারপর আপনাকে নিয়ে ডাক্তার আর ঘর করছে আমি এদিকে সেই গার্ড সাহেবকে এই সপ্তাহের শেষেই আসতে অনুরোধ জানিয়ে এসেছি···মিঃ রিচার্ড গাঙ্গু নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।···অথচ আপনার আর এনাক্‌সীর মধ্যে কতখানি কি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে জানি না।···

সাহেবের কাছে পরামর্শ নিতে গেলাম, উনি বলেন,—আমি পরের ম্যাটারে হস্তক্ষেপ করি না···মাথাও ঘামাই না। আপনার এ অবস্থায় মেয়েটাকেও কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করি নি, কারণ চোখের সামনে দেখছি—সী হাজ্‌ লেফ্‌ট এভ্‌রিথিং—ইভন্ ফুড্।···শুধু দিনরাত আপনার পাশটিতে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকে।

চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিলাম···—

এ কোনো স্বপ্ন না সত্য···উপলব্ধিতে আসছিল না। এনাক্সীর সেবার কথাটুকু মনে প্রাণে অমৃতের আস্বাদ এনে দিয়েছে···কথা কইতে পরলাম না। উত্তর দিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কী নিজেকেই বঞ্চনা করব···

মিসেস এটকিনসন বলেন—গেট ইউর সেল্‌ফ অলরাইট ফার্স্ট…তবে কালকে বা লেটেস্ট পরশুর মধ্যেই তোমাদের মধ্যের ডেভালাপমেণ্টটা প্রকাশ করে বলো। তবে আজই জানতে পারলে আমি মিঃ রিচার্ডকে একটা টেলি করে দিতে পারতাম। তবু হেস্টি অ্যানসর চাই না…না হয় কালই হবে।

ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এনাক্ষী ঘরে এসে ঢুকলো। মিসেস এটকিনসন উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তারবাবু আমায় পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলেন।

পরীক্ষার কাজ শেষ করে ডাক্তারবাবু আমার হাতে একটা ইন্‌জেকশন করে বিদায় নিলেন। বললেন—ভয় নেই—নাও হি ইজ্ আউট্ অফ্ ডেঞ্জার।…

মিসেস এটকিনসন ডাক্তারকে নিয়ে ঘর ত্যাগ করে এনাক্ষী আর আমাকে অবসর দিলেন।

আমি চোখবুজিয়ে এনাক্ষীর সেবাটুকু তৃপ্তমনে উপভোগ করতে লাগলাম… এত সেবা, এত যত্ন…কি জানি জীবনে আর কখন কারো কাছে কি এমন করে পাবো?…যদি বিয়ে করি…ও হবে আমারই সন্তানের জননী…তাহলেও কি এ আসন আমার অটুট থাকবে?…প্রেমিকার স্পর্শ শিহরণ সেদিন কি এমনিই জাগ্রত আগ্রহে স্ফুরিত হবে?…ওর সকল চুম্বন সেদিন লুণ্ঠন করে নেবে হয়ত আমারই সন্তানেরা। আমার আজীবনের অফুরন্ত প্রেম—যে আজ তৃষ্ণায় আর্ত হয়ে ওর কোমল বুকের তপ্ত-স্পর্শের জন্য আকুল—সে হয়ত এমনিই হাহাকারে সেদিন ফিরে আসবে…আমারই সৃষ্ট অতিথিদের ওর বুকের মাঝে দেখে। তবে কি হবে বিয়ে করে?…থাকনা ও দূরে সরে গিয়ে মিঃ রিচার্ডের বক্ষ সংলগ্ন হয়ে…আমার প্রেমকে এ কোনোদিন অবরোধ করতে পারবে বলে মনে করি না। ওদের সাজানো সংসারের এক অতিথি হয়ে দূর থেকে হয়ত, পুরোনো দিনের স্মৃতি মন্থন করে, নিজেকে তৃপ্ত করতে পারব সেদিন…আর—

ঘুমিয়ে পড়লে?…এনাক্ষী কথা বললো।

না।

তবে?

ভাবছিলাম।

কাকে?

তোমাকেই…

আমাকে ?···কেন ? কি বিপদেই না তোমায় ফেলে দিয়েছি···স্থা ?

আমি জবাব দিলাম—বিপদটুকুই তো আজ আমার পরম সম্পদ···বিপদটুকু ঘটেছিল বলেই তো আজকে আমার চারপাশ ঘিরে সম্পদের এত প্রাচুর্য···

ওর হাতটা ধরে নিই নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে···

লজ্জা পেয়ে যায় এনাক্ষী।···

বলে—যাও!

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চায় এনাক্ষী···আমি কিন্তু ওর হাতটাকে বুকের মাঝে নিবিড় করে ধরে নিয়ে বলি—তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে এনাক্ষী!

ও বলে—সে সব তো আগেই করে নিয়েছো···

চুপ করে থাকি। তারপর ধীরে ধীরে বলি—করছিলুম এমন সময় জ্ঞান হারালাম···আজ তার জের টেনে পূর্ণচ্ছেদ ঘটাতে চাই···

হেসে ও উত্তর দেয়—যে ছেদ ঘটাবার আগেই ভগবানের অতবড় নির্দেশ ঘোষণা হয়ে গেলো—নাই ঘটালে তার পূর্ণচ্ছেদ্।

বলি—না পূর্ণচ্ছেদ টানতে চাই না বরং তাকে টানতে চাই চিরন্তনীর পর্যায়···

বলে—বল অবাস্তবের পর্যায়! তাইতো বলেছিলাম···নান্ হয়ে যাই···অমত করো না।

আবার চুপ করে থাকি।

ভাবতে চেষ্টা করি···কিন্তু ভাবতে কষ্ট হয়···বলি,

—ধূধূ মরুভূমির মাঝে শ্যামল মরূদ্যান। হয়ত ক্লান্ত পথিক সেখানে বসে শ্রান্তি দূর করতে পারে—বা করে। ···কিন্তু সেখানে সে কি বসবাস করতে পারে এনাক্ষী? সামনের অবারিত ধূধূ বালুরাশি দেখে আবার তাকে আঁৎকে উঠ্তে হয়···অথচ পথ তাকে চলতেই হবে ঐ তপ্ত বালুর রাশি পায়ে ঠেলে ঠেলে। তাই কোনো উদ্যানপালক মরুভূমিতে উদ্যান রচনা করতে চায় না···পরের বাগান হলেও যদি তা সুসজ্জিত হয়···পথিকের তা দেখেও শান্তি···ক্ষণেকের জন্যে বসেও শান্তি। তাই···নান্ হয়ে মরুভূমিতে মরূদ্যান বসিয়ে লাভ কি?···তার চেয়ে যদি মিঃ রিচার্ডকে নিয়ে সুসজ্জিত বাগান রচনা করো, সে বাগিচায় হয়ত পদক্ষেপের অনুমতি না পেলেও দূর থেকে দেখেও শান্তি পাবো—আর আঘ্রাণে শ্রান্তি দূর করব···তারপর ফিরে যাবো নিজের পথে। ফেরার পথ মরুর দুস্তর বালুরাশির আতঙ্ক নিয়ে আসবে না।

এনাক্ষী কথা বলে না…

টপ্ করে এক ফোঁটা গরম জল হাতের ওপর এসে পড়লো—

আমি লক্ষ্য করলাম…কিন্তু মুছে ফেললাম না।

বললাম—জানো আমাদের জীবনের সংস্কার এত বড যে, সে সংস্কার মানুষ কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না। বাঙালীর ছেলেরা বিলেত গিয়ে ইংরাজী খানা খেতে শেখে—বড ভাল লাগে। তারপর দুমাস যেতে না যেতেই লুকিয়ে মা-বোনেদের চিঠি লেখে—আমাব জন্যে ভাজামুগের ডাল, বড়ি, আমসত্ত্ব পাঠিও, আবার কেউ বলে—দুচারখানা পাঁপর আর তার সঙ্গে তোমার হাতের কাসুন্দি।… এমনিই সংস্কার গ্রস্থ আমরা।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রেম যখন গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে ওঠে তখন যেমন সব সংস্কার কোথায় যেন মিলিয়ে যায়…তারপর প্রেমের আবর্তন কেটে গেলে পরস্পরের নিজের নিজের সংস্কার এমনি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে তাকে আর রোখা যায় না। তখন দুটো সংস্কারের যদি রুচি, মত ভিন্ন হয়, প্রেমের সুকঠিন তুষারও তখন গলে গলে জলে পরিণত হয়ে দুটিকেই ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

ও যেন কী বলতে চাইছিল…আমি অবকাশ না দিয়েই বলে চলি—এ যেন ঠিক পুকুরের পানা। দুহাত দিয়ে সাফ করে ভাবি কালো শীতল জলে অবগাহন করব—কিন্তু ডুব দিয়ে অতলান্তে তলাতে না তলাতে ওপরের পানায় আবার ভরে যায় ওপরের জলস্তর। সেখানে তখন আর জলের অবলেশ পর্যন্ত থাকে না—সে শুধু অপরিষ্কার পানা আর পানা।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এনাক্ষী ব্যোধহয় নিজেকে প্রস্তুত করছিল। এবার সে কথা বলল,

—যাঁকে চিনি না জানিনা তাঁকে স্বামীর আসনে বসিয়ে মিথ্যে খেলায় অপরাধ হবে না?

আমি বলি—ভগবানকেও তো চেননা…জাননা—শুধু রেভারেণ্ড ফাদারদের মুখে এঁর পরিচয় পেয়েছো—তাঁকেও প্রভুর আসনে বসিয়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করতেই তো নান্ হতে চলেছো…এতেও তো অপরাধের বোঝা কমে যাবেনা এনাক্ষী। মিঃ রিচার্ডকে তোমার মাম্মী জানেন…মিঃ এট্‌কিন্‌সন জানেন। তাঁরা যখন বুঝেছেন তিনি তোমার উপযুক্ত, তুমি সেখানে গেলে অর্থে, মানে প্রতিষ্ঠিতা হতে পারবে তখন তোমার নিজের মনোবৃত্তিটুকুকে নানের মতই নিরপেক্ষ রেখে, সেবা-যত্ন-শ্রদ্ধা করতে আপত্তি কোথায়?

চুপ করে থেকে ম্লান হেসে উত্তর দেয়—না, যুক্তিতে তোমার সঙ্গে আমি এঁটে উঠ্‌তে পারবো না—তবে মন যে মানছে না !

আমি বলি,—আজ যাকে মন মানছে, কাল তাকে মন না মানতেও তো পারে ? তেমনি আজ যাকে মন মেনে নিতে চাচ্ছে না—কাল হয়ত মন তার তিলার্ধও অবাধ্য হবে না। এ শুধু অভ্যাস এনাক্ষী এর বেশী কিছু না।

ও রেগে ওঠে ··বলে,—শুধুই অভ্যাস ?

উত্তর দি—হ্যাঁ শুধুই অভ্যাস। আমাকে ভাল লাগাও তোমার অভ্যাস মাত্র। নইলে কোন যুক্তিতে তুমি বিশুয়াকে নিয়ে ঘর বাধবে মনে করে এগিয়েছিলে শুনি !

তর্কের সুরে উত্তর দেয়—সে আমার নিজের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম।

আমি এবার বলি—এ ক্ষেত্রেও যদি তুমি নিজের প্রতি প্রতিশোধ নাও, তাতে আমি কিন্তু তৃপ্ত হবো। আমার তৃপ্তিতে তোমার তৃপ্তি যদি না হয়, বুঝবো আমার সংস্কারের সঙ্গে তোমার সংস্কার তিলার্ধও মিলবে না—দুজনের আজকের অনুরাগ ভবিষ্যৎ বিরাগের পানায় গা ঢাকা দেবে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পড়ে···বলে,—এই যাঃ ভুলে গিয়েছি, তোমায় যে গরম হরলিক্স দিতে ডাক্তারবাবু বলে গেলেন।

ছুটে বেরিয়ে যায় এনাক্ষী···আমারই সেবার উদ্দেশ্যে—

মনের কোথায় যেন ক্ষীণ হাহাকার শোনা যায়।

এগার

কলকাতায় ফিরে এসেছি···

শরীরটা হয়ে গেছে স্থবির···মনটা হয়েছে স্থাণু।

ঠিক যেন শ্মশান বৈরাগ্য···প্রিয়া হারার ব্যথায় সারা মন যেন টন্‌টন্ করছে···

শ্মশান বৈরাগীদের ব্যথা পার্থিব···কাজেই পার্থিব বিচ্ছেদে মনটা টন্‌টন্ করে তবে তার রিপ্লেসমেণ্ট্ হলেই···সে ব্যথার অবসান ঘটে। তাই বিপত্নীকরা স্ত্রীর বিচ্ছেদ বেদনায় আবার একটা বিয়ে করে বসে।

বিকল্প বিরহের ভারী ভালো দাওয়াই।

বোধকরি আমার মনটাও এমনিতর কোনো বিকল্পের অনুসন্ধানেই মুহ্যমান। নইলে এনাক্ষীর বিরহে এমন স্থাণু স্থবিরত্ব পাবো কি কারণে?

নিজে হাতেই তো তুলে দিয়েছি মিঃ রিচার্ডের হাতে। নিজে দাঁড়িয়ে রচনা করে এসেছি তাদের দাম্পত্য জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি।

এতো আনন্দের কথা…তবে? এতে ঔদাসীন্য এলো কোথা থেকে?

মনকে ধিক্কার দেই…শান্ত হতে শেখাই অশান্ত মনকে…কিন্তু অস্থিরতা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। …এমন সময় এক বন্ধু এসে কানে মন্ত্র দিয়ে গেল… চেঞ্জে যা।

কোথায় যাই বলতো?

কেন রাজগীর যা না…ভারী ভালো লাগবে…চারদিকে পাহাড়…তারপর পাহাড়ে পাহাড়ে তপ্তকুণ্ড…কুণ্ডে স্নান করো—খিদে বাড়াও…ব্যস্!

* * * *

শেষ পর্যন্ত রাজগীরেই পাড়ি জমালাম…

সে আজকের রাজগীর নয়, ১৯২৮ সালের রাজগীর। আজকের মজেক বাঁধানো ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানের সপ্তধারা, ব্রহ্মকুণ্ড, বাগিচাসহ কুণ্ডমালার পরিবেশ তখন ছিল না। তখন ছিল প্রকৃতির খোলা বুকে তুলে রাখা অরণ্যের এক আরোগ্য-নিকেতন…বাতে পঙ্গু, নানান চর্ম-রোগাক্রান্ত বা অজীর্ণ রোগগ্রস্থদের নিরাময়-ভবন।

বাসস্থান—ধর্মশালা…তাও তিনটি হাতে গুনে। শ্বেতাম্বরী, দিগম্বরী আর একটি—সেটিও সে সময় নির্মাণাবস্থায় . অনামী। ছিল জৈনদের তীর্থক্ষেত্র বৌদ্ধদের বোধিনির্বাণের সপ্তপর্ণী গুহামন্দির আর শৈবদের বৈভারগিরি চূড়ে শিব-শিলা।

সাকী খোঁজার দুঃসহ পাপের অন্ত ঘটাতে এলাম রাজগীর…পুণ্যক্ষেত্রে। সপ্তধারায় তপ্ত-সলিলে মনের যত কিছু আবিলতা ধুয়ে মুছে যাবো।…তারপর,

নালান্দার পুরাতনী আবেষ্টনীর মাঝে ঘুরে বেড়িয়ে পুরাতন অতীত অধ্যায়ে নিজেকে সমাহিত করব…এই হবে পাপীমনের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত!

উঠেছি নবনির্মীয়মান ধর্মশালায়…ইট বের করা একখানা একতলা ঘর?… কেউ বলবে না সেখানে—সাত দিন হো গিয়া, ব্যস্ নিকাল যাও। তাই নিশ্চিন্তে নির্ঝঞ্ঝাট আবাসেই আস্তানা গেড়েছি।

স্টেশনের প্রায় সংলগ্ন একটি বাংলো···কোন এক ডাক্তারবাবু নাকি এর মালিক। সেই বাংলোতে কারা যেন এসে উঠেছেন···কোথাকার এক জমিদার। খবরটা আমার কানে পৌছে দিলে আমার ধর্মশালার শ্রীদরোয়ান।

দরোয়ানজীই আমার একমাত্র ত্রাণকর্তা—গাইড্—আশ্রয়দাতা এবং দিন-রাতের ভোজন-পিতা।··যাকে বাংলায় বলি বাপের হোটেল—এ হোলো দরোয়ানজীর হোটেল।

দরোয়ানজি আমায় বুঝিয়ে দিল যে, আজকে এ জৈনদের তীর্থস্থান বা বৌদ্ধদের ধর্মস্থান। কিন্তু এর ঢের আগে এই রাজগীর তার মহাভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করেই চিরজাগ্রত!···মহাভারত যুগে এই রাজগীরই ছিল জরাসন্ধের ভিটে। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ও জরাসন্ধের মহারণে জরাসন্ধের রক্তে আজও নাকি এখানকার মাটি লাল টকটকে—তাকে আজও এ দেশীয়রা বলে—"রণভূম্"।

সপ্তপর্ণী গুহাটা ছিল জরাসন্ধের কোষালয়···ওর মধ্যে জরাসন্ধের শত স্ত্রীরা অলঙ্কার রাখতো···বছরে একবার করে উপত্যকার মধ্যবর্তী 'নির্মল কূপে' স্নান করতে গিয়ে রাণীরা তাদের সমস্ত অলঙ্কার সেই কূপে নিক্ষেপ করে এই কোষালয়ে এসে নব আভরণে সজ্জিত হতেন।

লর্ড কার্জন নাকি নির্মলকূপ খনন করে বহু অলঙ্কারাদি পেয়েছিলেন, তাই তার গায়ে তকমা এঁটে নোটিশ লিখে রেখে গেছেন। দরোয়ান বলল—পাণ্ডাদের দেখাতে বললেই তারা আমায় দেখিয়ে দেবেন।

পাঁচটি পাহাড চূড়ায় জৈনদের মন্দির। কিন্তু ওগুলো একদিন হিন্দুদেরই ছিল। সপ্তধারা, ব্রহ্মকুণ্ডাদি জরাসন্ধেরই সিনানাগার ছিল···ইত্যাদি। সব তথ্য সংগ্রহ করলাম দরোয়ানজীর কাছ থেকে। ভাবলাম সব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মাসখানেক কেটে যাবে, ··একটা মাস মনকে অতীত অধ্যায়ের পূর্ণ অনুশীলন পাঠ করিয়ে চাঙ্গা করে সতেজ হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাবে।

আসার পথে সিলাও স্টেশন থেকে বিখ্যাত খাবার খাজা কিনে এনেছিলাম। দরোয়ানজীকে কিছুটা দিয়ে বৈকালীন জলখাবার খেয়ে পথঘাট দেখতে বেরোলাম।

পথ ঘুরে চলে গেছে বৈভার পাহাড়ের পাশ কেটে। ওই পথ ধরে গেলেই নাকি বুদ্ধগয়া পৌছানো যায়···আর অপর দিকের পথটা বাজার হয়ে সোজা নালান্দায় গিয়ে পৌছেছে।

দরোয়ানজীর কাছ থেকে পুরো রাজগীরের একটা গ্র্যাফিকাল প্ল্যান পাওয়া গেল। ভাবলাম কাল সকাল থেকে সার্ভে শুরু করে দেবো।

সন্ধ্যের আগেই খুব খানিকটা অঝোরধারে বৃষ্টি হলো। দৌড়ে এসে ঢুকি নিজেদের আস্তানায়। বৃষ্টির ধারার সাথে প্রখর বজ্রধ্বনি পাঁচ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সারা রাজগীরকে যেন কাঁপিয়ে তুলছিল। মেঘগর্জন এমন দুরান্ত পর্যন্ত এক ঝংকার তুলে স্তম্ভিত হয়ে বার বার পাঁচ পাহাড়ের মাথায় মাথায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে এ আমার কল্পনাতীত। কেমন যেন ভয় করতে থাকে। মনে হলো এমন মেঘনিনাদের গুরুধ্বনি, যেন বুকের মাঝে সত্যিই দুরু দুরু করে উঠছে। পাঁচ পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার স্রোতের মত জলপ্রপাত ঝরছে।

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে পড়লেন এক ভদ্রলোক আমাদের ধর্মশালায়। চমকে দেখি ভদ্রলোক আমাদের দেশীয়। বল্লাম—ওখানে কেন—ঘরে আসুন!

ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

বললুম—বসুন। এঃ—এ যে একেবারে ভিজে গেছেন? জামাটা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিন। হাওয়া আছে শুকিয়ে যাবে।

* * *

দরোয়ানের কল্যাণে চা এসেছে—পরিচয় জমে উঠেছে।

ভদ্রলোকের নাম—মহেন্দ্রনাথ সরকার। মাত্র কাল এসেছেন রাজগীরে··· উঠেছেন ডাক্তারবাবুর বাংলোয়। সঙ্গে এসেছেন অসুস্থা ভাইঝি।

আমি বলি—কি অসুখ?

তিনি আমতা কেটে বলেন—মানে এ একরকম···মানে পায়ের দিকটায় কমজোর, উঠতে পারেন না, তাই ডুলির ব্যবস্থা করতেই বেরিয়েছিলাম।

ওঁর পরিচয়ের মাঝে ভাইঝির সম্মানে "পারেন না" প্রয়োগে একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি—উনি কি বেশ বয়স্থা?

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে জানাল—না ··না, বরং উনি এখনও কিশোরী, মানে আমার নিজের ভাইঝি নন···উনি হচ্ছেন··মানে, বিহারের গিধৌড় স্টেটের সম্পর্কে নাতনী—মানে শিমূলতলার রাণীর একমাত্র দুহিতা শ্রীমতী পুষ্পা দেবী।

চমকে উঠে বলে ফেলি—পুষ্পা?

ভদ্রলোক আমার চমক দেখে বলেন—আপনি ওঁদের চেনেন নাকি?

আমি বলি—বিলক্ষণ। শিমূলতলায় আমাদের বাড়ি আছে। সে বাড়ি আজ সত্তরোর্ধ্ব কাল ধরেই আছে। তিলুয়ার পথে শরৎ বাবুর বাংলোতে পুষ্পারা তখন থাকতেন···সেই সময় আমার সঙ্গে হয় চেনাশোনা। পুষ্পার বয়েস তখন সাত কি আট বছর হবে আর আমার বয়স তখন হবে বার তের বছর। বাবার

সঙ্গে ওঁদের স্টেটের ম্যানেজার সরকার মহাশয়ের আলাপ ছিল।···পুষ্পা হঠাৎ একদিন গাছ থেকে পড়ে গিয়ে আর মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে পারেনি। শিমুলতলার অবিনাশ ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাতে প্রথমটা ছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—নাভিকুণ্ডের নীচেই স্পাইন্যাল কর্ড ফ্রাকচার হ্যে দুভাগ হয়ে গেছে।···ওকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়াই উচিত।

—সরকার মশাই সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন।

—তারপর ?···আমি জিজ্ঞেস করি।

—বৎসরাধিক ওর পিঠটা কাঠ বাঁধা অবস্থায় ছিল ··ভাঙ্গা মেরুদণ্ড জোড়ার জন্যে, ফলে মাঝে মাঝে শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়ে উঠ্‌তো আর অল্পস্বল্প জ্বর হতো। কিন্তু অন্যান্য সমস্তই যথাযথ ঠিক ছিল। প্রাণহানির ভয় ছিল না বলে সরকার মশাই পুষ্পাকে শিমুলতলায় ফিরিয়ে আনলেন। সেই সময় শরৎবাবুর বাংলোতেই রাখা হয়।

আমি বলি—ঠিক বলেছেন···শয্যাগত পুষ্পাকে খেলার সঙ্গী জোটাবার ভার বাবার ওপরই পড়লো—তাই সেখানে আমি গিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছিলাম।

তারপর ?

—প্রায়ই আমি ওঁদের বাসাতেই দিন কাটাতাম। পুষ্পার সঙ্গে গল্প—পুষ্পার সঙ্গে কড়ি খেলা—পুষ্পাকে ছোট ছোট বই পড়ে শোনানো—পুষ্পার সঙ্গে গান গাওয়া—যাত্রাভিনয় শোনা অংশও কখন কখন ওর সঙ্গে অভিনয় করতাম। আর ছিল তখনকার দিনের একটা ফোনোগ্রাফ। এই সব নিয়েই আমাদের দিন বেশ কাট্‌তো।

মহেন্দ্রবাবু বলেন—সরকার মশাই ছিলেন আমার জেঠামশাই। জেঠামশাই-ই আমাকে ওই স্টেটে দাখিল করেন আমি আমলাঘরে কাজ করতাম। জ্যাঠা-মশায়ের মৃত্যুর পর রাণীমা আমাকেই ম্যানেজারের আসন দিলেন। কাজেই পুষ্পার তদারকের ভার আমার উপর ন্যস্ত হলো। রাণীমা পুষ্পার জন্যে শিমুলতলায় একটি বাংলো করে দিয়েছিলেন—সেইখানেই আমার প্রায়শঃ থাকতে হোতো··· আর শনি রবিবার স্টেটের কাজে তিলুয়া যেতে হোতো।

জেঠাবাবুর মৃত্যুর পর দুবছরের মধ্যেই রাণীমা গত হলেন। মৃত্যুর সময় আমায় বললেন—মহেন্দ্র, আমার পুষ্পার ভার তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। তুমি ওর নিজের কাকার মত ওকে দেখো নইলে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারছি না। রাণীমার চোখের জল দেখে থাকতে পারি নি—কথা দিলাম।

মেডিক্যাল কলেজের সাহেব ডাক্তারের কথাই সত্যি হোলো। পুষ্পার দেহের নিম্নাংশের পরিপুষ্টতার অভাব রয়েই গেল।···বলেছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে গেলে ওকে ভাল করতে পারেন···কিন্তু ওঁর সঙ্গে যাবে কে?···আমি তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। তাই সর্বশেষ ডাঃ রায়। রায় দিলেন যে রাজগীরের গরম জলে স্নান করানোর প্রয়োজন রয়েছে।

আজ চার বছর তাই এই সময়টা ওকে নিয়ে আসি আর সারা শীতকালটা এখানেই বাস করে শিমুলতলায় ফিরি।

বলি—জানি না পুষ্পার আমায় মনে আছে কিনা। থাকা অন্ততঃ উচিত—কারণ ও আমার কাছে গান শিখতো।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে—রাতও বাড়ছে। মহেন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন—বললেন,

—চলি, কাল কুণ্ডে দেখা হবে। পুষ্পা মাকে আমি আপনার কথা বলবো'খন।

হ্যাঙ্গার থেকে জামাটা নিয়ে গায় দিতে দিতে বলেন—কিছু মনে করবেন না—আপনার নামটি?

আমি বলি—বলবেন—তোমার ছেলেবেলাকার খেলার সঙ্গী—নারাণ—যার কাছে তোমার গানের হাতেখড়ি হয়।

বারো

রাজগীরের সিনান আগার।··

অফ্-সিজ্‌ন—ভিড় নেই···যা দশ-বিশজন আসছেন, সবাই সপ্তধারার জলে মাথা পেতে দিয়ে স্নান শেষ করছেন। আমিও তার মধ্যে একজন···

স্নানের সময়টা আমার বেড়েই চলেছে। কার জন্য অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। দরোয়ানের সারা রাজগীর জরিপ্ করা তালিকা মাথা থেকে যেন নস্যাৎ হয়ে উবে গেছে। পাল্টে গেছে প্রোগ্রাম। অতীতে ধূলোপড়া পাতার আর পৃষ্ঠা উল্টোতে গা নেই। বর্তমান সামনে মূর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে,···হয়ত এখনি এসে পৌছবে তাই এই তিতিক্ষা।

বেলা প্রায় নটা বেজে গেল অথচ কারো দেখা নেই। না মহেন্দ্রবাবুর আর না পুষ্পার ডুলির। অগত্যা স্নান সমাপন করতেই হলো। মাথা মুছে কুণ্ড

মহলের দ্বারে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড় বেয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে—তারই সঙ্গে পাহাড়ী রাঙাপথটি একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হয়ে রাজগীরের ছোট্ট গ্রামের দিকে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে।

অদূরে নদীর কাছেই দেখতে পেলাম লাল সালুতে ঢাকা একটা ডুলি কুণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। সামনে বরকন্দাজী পোশাকে দুটি দরোয়ান আর তার সামনে মহেন্দ্রবাবু।

পাহাড়তলির সিঁড়িব ওপর আসন নিলাম। তাহলে মহেন্দ্রবাবু শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। একটা অভিবাদন করেই নেমে যাবো। বলে যাবো যে ধর্মশালায় একবার আসবেন।

তিতিক্ষাব ফল ক্রমে পাহাড়ী চড়াইয়ে এগিয়ে আসছে…মনটার মধ্যে কেমন একটা উচাটন।…প্রায় কাছে এসেই পড়েছেন ওঁরা।

মহেন্দ্রবাবু সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে আমার পাশটিতে প্রায় এসে পড়েছেন।
—নমস্কার জানালাম…

ভদ্রলোক ঠিক সেই সময় চট কবে পিছু ফিরে ডুলিবাহকদের হুঁশিয়ারী করে বলেন—খবরদার—ধীরে, ধীরে—আহেস্তণ।

নমস্কাবটা মাঠে মারা গেল…

ডুলি সামনে দিয়ে এগিয়ে উঠে গেল।

আমি পেছু নিলাম।

ওপরে সপ্তধারার মহল্লায় ডুলি ঢুকে বামে ব্রহ্মকুণ্ডের ধাবে দাঁড়ালো। বরকন্দাজী পোশাকপরা দরোয়ান দুটি মস্ত বড একটা কালো পর্দা ব্রহ্মকুণ্ডের প্রবেশ পথের সামনে টেনে ধরলো…তার মধ্যে ডুলি ব্রহ্মকুণ্ডের সিঁড়ি বেয়ে কুণ্ডে অবতরণ শুরু করলো। মহেন্দ্রবাবুকে এবার সামনাসামনিই পেলাম। আবার নমস্কার জানালাম…

উনি একটা শুষ্ক প্রত্যুত্তব দিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে সরে গেলেন।

কেমন যেন গুলিয়ে গেলাম…

হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ রাজকীয় সমাবেশের আডম্বর দেখে নীচের সিঁড়িপথ ধরে ধর্মশালায় প্রত্যাবর্তন করলাম।

মনে বড় ধাক্কা লেগেছে…

ভদ্রলোক চেনা পর্যন্ত দিতে চান না…অথচ সারারাত ছেলেবেলার সঙ্গিনী পুষ্পা সম্বন্ধে কত না স্বপ্ন রচনা করেছিলাম তার ইয়ত্তা নেই।

রাজগীরের দর্শনীয় সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে যার আকাঙ্ক্ষায় সারা সকালটা ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটালাম তার দিক থেকে কোন সাড়াই পেলাম না!

দরোয়ান বললো—বাবুজি। আপ চাউল মাঙ্গাযেঙ্গে ন হামলোগোকা রোটি খায়েঙ্গে।

খাওয়ার কথা মনে ছিল না। বললাম—রোটিই সহি।

দরোয়ান গরম দুধ আর জিলিপি প্রস্তুত রেখেছিল—সকালের জলখাবার হিসাবে। বসে বসে তাই গিল্‌লাম।

সারাটা দিন অস্বস্তিতে কেটেছে···

এই বুঝি মহেন্দ্রবাবু আসেন!···কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা···মহেন্দ্রবাবুর আশাপথ চেয়ে দুপুর গেল—দেখতে দেখতে বিকেলও অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু···

দরোয়ান অভিযোগ করে বলে—আপ ক্যা বাবুজি। সারা সময় ঘরকে বৈঠ রহা—কিতনা দেখনেকো স্থান হায়—যাইয়ে ঘুমকর আইয়ে।

আমি বলি—দরোয়ানজি!···বড থগে গেছি তাই কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি বিশ্রাম নিতে! দুদিন চুপচাপ বিশ্রাম নেবো—তারপর দেখবে কী চরকী ঘোরান ঘুরব। তোমাকেও সাথ দিতে হবে। তখন অস্থান, কুস্থান, দেবস্থান সব একসঙ্গে দেখে শেষ করে দেবো।

দরোযান উত্তর দেয়—হামার সময় কৃথা বাবুজি। তব আপকো আচ্ছাসে আচ্ছা এক গাইড দে দুঙ্গা।

নির্জন রাত্রি··

একা ঘরে শুয়ে—ঘুম আসছে না। খালি মাঝে মাঝে সকালের অপমানটা যেন গুমরে গুমরে উঠছে···

আমার পরিচয়ে···কি, পুষ্পা আমায় চিনতে পারেনি—কিংবা ছেলেবেলার কথা হয়ত ভুলেই গ্যাছে।·· তার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে তার আভিজাত্য তাই আমার মত নগণ্য লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ···না, এ তার এড়িয়ে যাওয়ার ছলনা মাত্র!

কিন্তু, মহেন্দ্রবাবুর কি হলো?

কৈ আমি তো তাকে কিছু অসম্মান করিনি যাতে তিনি আমাকে অমনতর অপমান করতে পারেন?

দূর্ তর্ যাক পুষ্পা—নিপাত যাক মহেন্দ্রবাবু···

কাল সকাল সকাল কুণ্ডস্নান সেরে পাহাড়ে পাড়ি দেবো…দরোয়ানজির কথামত গাইড নিয়ে ক'দিন এক গোড়ে স্থান দেখে প্রস্থানের ব্যবস্থা করবো—যত শীগগির পারি।

বাইরে তখনও দরোয়ানজি তুলসী রামায়ণের সুর ভাঁজছিল। বিছানা থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরোয়ানজি পাঠ থামিয়ে জিজ্ঞেস করল—কিওঁ বাবুজি…আবতক জাগ রহে হো··

আমি বললাম—রামায়ণ পাঠ শুনছিলাম।·· রাবণ গুষ্টির তুষ্টি সাধন করবার মন্ত্র জপছিলাম দরোয়ানজি

দরোয়ানজি মৃদু হেসে…তুলসীকৃত রামায়ণে মনোনিবেশ করলো।

*　　*　　*　　*

উষা লগনেই নিদ্রাভঙ্গ ঘটেছে…কিন্তু,

আড়মোড়া দিতে দিতেই ছ'টা, সাতটা, ক্রমে আটটায় বিছানা ত্যাগ করে তৈরী হয়ে নিয়ে কুণ্ডাভিমুখে গজেন্দ্র গমনে যাত্রা করে যখন পৌছলাম তখন ঠিক ন'টা।

সপ্ত-ধারায় মাথা পেতে তখনও রয়েছি…এমন সময় এলো লালসালু মোড়া রাজকীয় ডুলি।

আমি একবার দৃষ্টিপাত করেই নিজের কাজে মনোনিবেশ করলাম…

অদূরে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রবাবু…চোখে চোখে পড়ে গেলো কিন্তু আজ নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ডুলিওয়ালারা যথাযথ পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল। আজ লক্ষ্যে পড়লো, ডুলির সাথে সাথে একটি দাসীও সঙ্গে আছে।

ইচ্ছে করেই দেরি করে স্নান সমাপন করলাম। স্নানান্তে পোশাক বদল করে বাইরের সিঁড়ির পাশের পাথরের বেদিটায় বসে পড়লাম। বেদির এক পাশেই একটি গণেশমূর্তি। ইনি স্নানার্থীদের নিত্য পূজা পান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লালসালুর ডুলি ফিরতি-পথে নেমে আসছে—এসে দাঁড়ালো আমারই বেদির পাশ বরাবর—আমি চোখ বুজিয়ে সূর্যস্তব পাঠ করতে সুরু করে দিই।

ডুলির ঢাকনি খুলে দেয় দাসী…ডুলির অধিষ্ঠাত্রী দেবী অদূরের গণেশজীর চরণে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছেন। সূর্যপ্রণামের ফাঁকে চোখ তুলে দেখতে গিয়ে দেখি এক

অসামান্যা সুন্দরী জোড়হাতে পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে চোখ দুটি মুদিত করে গণেশজীকে প্রণাম জানাচ্ছেন।

মুদিত চোখ দুটি যেন পদ্ম কোরক। ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে চক্ষু উন্মোচন করলেন ভক্তিপ্লুত চোখে মিনতি জানিয়ে ফুল ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—"নমো গণেশায়"।

এই কি পুষ্পা ?...

এত সুন্দরী !...

আমার স্মৃতিপটে যে পুষ্পা আজও আঁকা রয়েছে সে যে অনেক পেছিয়ে পড়েছে এ রূপের কাছে। কল্পনার যে সুচারু মূর্তিখানি বার বার গড়ে তুলেছি কদিন ধরে, তার চেয়ে এ যে কত সুন্দর তা তো চিন্তা করা যায় না। এ যে এক রূপলাবণ্য-পুঞ্জ—এক অনিন্দ্য বিস্ময়—এক জ্বলন্ত বহ্নি-শিখা !...

নিমেষে যবনিকা পড়ে গেল...

নিমেষে সে লালসালুর আবরণী ঢাকা ডুলি গিরিপথের শেষ ধাপে নেমে গিয়ে দুরান্তে রাঙামাটির আঁকা-বাঁকা পথে হেলতে দুলতে মিলিয়ে গেল। আমি বসে রইলাম সেই প্রস্তর বেদিকায়।

কিন্তু—

ওতো পাথরের খোদাই মূর্তি নয়...ওরও তো প্রাণ আছে—আছে ওর প্রাণে দয়া, মায়া, প্রেম, মমতা, প্রীতি, স্মৃতি সবই...তবে ?

বিস্মৃতির বিস্মরণ অধ্যায়ে যবনিকা টেনে দেবার মত তো আমাদের বন্ধুত্ব হয়নি ? তাহলে আমায় চিন্তে পারলে না কেন ?

ওতে—আমাতে কত খেলেছি—বর-বৌ খেলা। সে বালিকা বয়সেও তন্ময় হয়ে বলতো—ওগো শুনছো ?

আজ উন্মেষিত পদ্মদল...

হয়ত কত ভ্রমরই না ও মধুর মিষ্টি ঘ্রাণে মুগ্ধ মধুকরের মত ওর চারপাশ বেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাজেই বাল্যের পুতুল খেলার খেলনার মতই ছুড়ে টান মেরে ফেলে দিয়েছে আমাকে...বাল্যের ভাঙাচোরা খেলনারই মাঝখানে।

কোথায় যেন বিষাক্ত দংশনের ব্যথা পাচ্ছি।

বাবু—লালসালু মোড়া ডুলি নিয়ে ত্বরিতে

ছিল মশাই ? ওখানে ডোবার মত তো জল

...র গলা পর্যন্ত জল—তবে ভদ্রমহিলা ডুবে

না—এ আমার পরাজয়—নিদারুণ পরাজয় ! ...ত পারলে বাঁচি।

আজ পাঁচ দিন ধর্মশালার বাইরে পা রাখিনি—কুণ্ডে

...এমন কি খাবারের জন্যে বাজারেও পা বাড়াই নি। দরোয়... ...

বেঁচে আছি।

জানিনা·· এ কি আমার অভিমান ?···না···

এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে আমায় যেতেই হবে···

সাতদিনের দিন বিকেলের ট্রেনেই রওনা দেব বলে ঠিক করলাম। আজ শেষ দিনের সকাল। শেষ কুণ্ড স্নানের আশায় ধর্মশালা থেকে পা বাড়ালাম। মনের নিভৃত কোণে শেষ দর্শনের শুভেচ্ছাটুকুকে সঙ্গোপনে পোষণ করে সময় ধরেই কুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমিও কুণ্ডে পদার্পণ করলাম—সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো লাল-সালু-ঘেরা রাজসিক ডুলি।

তাড়াতাড়ি নিজেকে স্নানের উপযোগী করে নিয়ে এগিয়ে চলি সপ্তধারার দিকে ···স্নানান্তে চট করে পথের পাথরের বেদীতে চোখ বুজিয়ে সূর্যধ্যানের অন্তরালে বিকশিত শতদলের আঘ্রাণ নেবার জন্যে।

মাথায় জলধারা ঝরছে···

চোখের সামনেই কালো পর্দার অন্তরালে লালসালু মোড়া ডুলি অন্তর্হিত হলো —আবার পরক্ষণেই ব্রহ্মকুণ্ডে যাত্রী নামিয়ে ডুলিবাহকরা বাইরে এসে দাঁড়ালো।

* * * *

একটা আর্ত চীৎকার··

চমকে উঠি···

স্ত্রীকণ্ঠ বলেই মনে হলো। সবাই ত্রস্ত দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে চায় কালো পর্দার দিকে · ব্রহ্মকুণ্ডের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে বরকন্দাজী পোষাকপরা দরোয়ানদ্বয়···তার আশে পাশে ডুলি বাহকের দল—অদূরে মহেন্দ্রবাবু—সবাই সন্ত্রস্ত ব্যস্ত ত্রস্ত অথচ কারোরই ব্রহ্মকুণ্ডের অন্দরে প্রবেশ অধিকার নেই।

অসামান্যা সুন্দরী জোড়হাতে পুষ্পাঞ্জলি   নি শোনা যাচ্ছে—

প্রণাম জানাচ্ছেন।

মুদিত চোখ দুটি যেন পদ্ম কোরক।   আমি কালো পর্দা টেনে ব্রহ্মকুণ্ডে

করলেন ভক্তিপ্লুত চোখে মিনতি

গণেশায়”।   দাঁড়িয়ে আকুলকণ্ঠে চীৎকার করছে আর

এই কি পুষ্পা?…   জলের তলায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

এত সুন্দরী।   কোমরের নীচের অর্ধাংশটা জলের মধ্যে পড়ে অসম্ভব

হয়ে কেমন ছোট্ট দেখাচ্ছে…

অঙ্গবাস অসংলগ্ন…

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ি ব্রহ্মকুণ্ডের ফুটন্ত জলে। একডুবে তুলে ধরি পুষ্পাকে জলের উপরিভাগে…জলের ওপর সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে দাসী—তখন পুষ্পার দেহটাকে ধরে প্রাণপণ টেনে হিঁচড়ে সিঁড়ির ওপরে তোলবার চেষ্টা করছে…

আমি ততক্ষণ জলের মধ্যের সিঁড়ির ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি…

পুষ্পা অর্ধচেতন অবস্থায়…

আর আমি?…

বিস্ময়ে বিমূঢ়! চেতনা থেকেও হতচেতন! এ দৃশ্য জীবনে কখনোও কল্পনা করা যায় না…ভাবি, এ আবার প্রকৃতির কী অভিনব নিষ্ঠুর খেলা?…

পুষ্পার দেহের নিম্নাংশ আজও শিশু অথচ উপরাংশ পূর্ণযৌবনা। যৌবনের মধু…যৌবনের মলয়ানিল…যৌবনের রঙীন চিন্তা…সবই তার পরিপুষ্টমনে পরিব্যাপ্ত…অথচ, এ যেন এক জীবনভরা ব্যঙ্গ!

রঙ্গিলা অথচ তাতে রঙ্গের অবলেশমাত্র নেই…অঙ্গ আছে অথচ সেখানে অনঙ্গের বালাই নেই…ভাবতেও মনটা যেন শিউরে ওঠে!

তড়িৎগতিতে জল থেকে উঠে বাইরে এসে দাঁড়াই…

ভিতর থেকে কথা আসে—ম্যানেজার মশাই, ভিতরে আসুন।

মহেন্দ্রবাবু হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢোকেন—সঙ্গে ডুলিবাহকগণ…

অর্ধচেতন শরীরটাকে ততক্ষণ দাসী যথাসম্ভব আবরণে সজ্জিত করে ডুলিতে উঠিয়ে তোলে।

আমি বলি—এতটুকু দেরি নয়…বাড়িতে গিয়েই ডাক্তারবাবুর জিম্মায় ফেলে দিন মহেন্দ্রবাবু!

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে—মহেন্দ্রবাবু—লালসালু মোড়া ডুলি নিয়ে ত্বরিতে নেমে যায়।

সবাই জিজ্ঞাসা করেন—কি হয়েছিল মশাই ? ওখানে ডোবার মত তো জল নেই। নীচে পা রেখে দাঁড়ালে বড়জোর গলা পর্যন্ত জল—তবে ভদ্রমহিলা ডুবে গেলেন কি করে ?

শত প্রশ্ন···শত কৌতূহলী বিতর্ক থেকে সরে পড়তে পারলে বাঁচি।

নিরুত্তর···পাহাড়তলির পথে নেমে চলি !

*　　　*　　　*

ধর্মশালার ঘরের মধ্যে দুরন্ত গরম···

দরোয়ান খাটিয়াখানা বাইরের উঠানে বিছিয়ে দেয়···আমি বিশ্রাম নি।

···তাহলে, পুষ্পার পিঠের শিরদাঁড়া আজও অসংলগ্ন ! জগতে কি বিস্ময়ের বস্তু হয়েই ও বেঁচে থাকবে ?···

এইজন্যেই বোধকরি ও আমায় চেনা দিতে চায় নি—ধরা দেয় নি—পরিচয় পর্যন্ত মহেন্দ্রবাবুর কাছে লুকিয়েছে !···এ লজ্জা সত্যি ও কাকে বলবে ?··

ও যে এক সচল রূপ-বিলাস ! অচলের অধ্যায়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখা ছাড়া ওর গত্যন্তর কোথায় ?···ও যেন স্বয়ং অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী ব্যক্ত প্রকৃতি—অন্তহীন অব্যক্ত অধ্যায়ে সমারূঢ়া—এক পরমা বিকৃতি।

রূপ আছে, রূপের অনুভূতি আছে·· প্রেম আছে, প্রেমিকের স্পর্শ এসে প্রাণকে মাতিয়ে তোলে···মস্তিষ্ক আছে···মন আছে···তবু ? ··

ও যেন একই আধারে কুমারীর অপ্রকাশিত অভ্যন্তর আর নারীর অগণিত কামনা-বাসনা মাখা বৈচিত্র্য যৌবনের প্রকাশিত রূপ-সম্ভার।

তন্ময় হয়ে ভেবে চলেছি···

তুলনায়···অতুলনীয়া অথচ অব্যক্তা···এই যোগরূঢ়া সৌন্দর্যময়ীর স্ফুটন্ত যৌবন দেখে মনে আসে এ যেন চিরকুমারী—বালিকা গৌরী···যোগাসনে বসে··· গচ্ছিত করে দিয়ে রেখেছেন নিজের রূপসম্ভার—কোন এক দেবতার উদ্দেশ্যে··· এই বুঝি তার অর্ধনারীশ্বর সাধনা···এ সাধনার বিচ্যুতি ঘটাতে পারে না, ত্রিলোকের কোন অনঙ্গই।

চোদ্দ

গায়ে নাড়া পেয়ে ঘুম ভাঙ্‌লো·· চোখ রগ্‌ড়িয়ে উঠে বসি।

মহেন্দ্রবাবু আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে নিদ্রাভঙ্গ করিয়ে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান।

আমি উঠে বসতেই প্রণাম জানিয়ে বলেন—

—মাপ্‌ করবেন নারায়ণবাবু, আপনাকে বিরক্ত করলাম তাছাড়া তিনটেও বেজে গেছে।

আমি বলি—খবর কি? পুষ্পাদেবী ভাল আছেন তো?

—আজ্ঞে হঁ্যা! আধঘণ্টার মধ্যেই সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু বললেন—যে উনি নাকি এক বিন্দুও জল খান নি, শুধু ভয়ে অজ্ঞানের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকে প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে—সুস্থ হয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে—আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—

—আমায় জল থেকে তুল্‌লেন কে?

কি বিভ্রাট উত্তর কিই বা দিই, তাই চুপ্‌ করে রইলাম।

উনি বলেন—কে দরোয়ান?

উত্তর দেই—দরোয়ানের সাধ্য কি মা যে তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে!

উনি প্রশ্ন করেন—তবে—ডুলির বেহারাদের কেউ?

আমি বলি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ·· তাও কি সম্ভব হয় বেটি!

কিছুটা বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তবে কে? দাসী তো তোলে নি··· আর তার তোলবার শক্তিই বা কোথা! ··তবে কি আপনি নিজে তুললেন?

খানিক চুপ করে থেকে বলি—তা আর পারলাম কৈ মা!

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করেন—তবে এ কাজ কে করলো বলবেন তো?

আমি তো মশাই ভয়ে আড়ষ্ট! ক'দিন আগে আপনার নাম বলতে তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলেছিলেন—আমার প্রসঙ্গ নিয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে আলোচনা করতে আপনার লজ্জা হয় না।

মাথা চুলকিয়ে তাই বলি—জানো মা পুষ্পা, আমাদের কিছু করার আগেই···

হঠাৎ সেই যে যাকে—মানে যার সঙ্গে মেলামেশা করতে তুমি মানা করে দিয়েছিলে—সেই ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে, কারুকে কিছু না বলেই—একেবারে কুণ্ডের ফুটন্ত জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে তুলে ধরলেন দাসীর নিকটে। হয়ত খুবই অন্যায় করেছিলেন উনি—কিন্তু না করলে তো উপায় ছিল না মা।

সব শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

পরক্ষণেই আবার ডাক পড়লো…ভিতরে ঢুকতেই বললেন—

—যিনি এত বড় উপকার করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে আপনার একবার তার কাছে যাওয়া উচিত ছিল।

ওঁর কথার ধরণটাই মশাই বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না—মানে, শ্লেষ না ব্যঙ্গ—না সত্যি সত্যি…ঠিক বুঝতে পারলাম না। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি এতক্ষণে কথা বললাম…বললাম—

—কেন মহেন্দ্রবাবু! রাজপ্রাসাদের কেতা তো আপনার অজানা নেই। ইনাম দিয়ে উপকারের প্রত্যুত্তর দেওয়াই তো রাজারাজড়াদের চিরদিনের রীতি।

মহেন্দ্রবাবু হেসে বলেন—ঠিক তাই হলো মশাই…ঠিক তাই! শেষ পর্যন্ত তাই আজ্ঞা দিলেন। বললেন—কাকাবাবু শীগগির গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে, সঙ্গে করে নিয়ে আসুন…তাঁর এ উপকারের ঋণ সারাজীবনেও পরিশোধ হবে না।…তাই…একবার আজ্ঞা হয়ত…চলুন!

আমি হেসে ফেলি। বলি'—আমি যে আবার কেতাদোরস্ত নই মহেন্দ্রবাবু! আমি তো আর রাজপরিবারভুক্ত মাননীয় ব্যক্তি নই?…আমরা রাস্তার লোক—একবার "তু" বললেই ছুটে যাবো। নিন এখন বসুন…চা সেবন করুন!

মহেন্দ্রবাবু তাগিদ দিয়ে বলেন—থাক মশাই! ওখানে গিয়েই চা সেবা করবেন।

আমি বলি,—সেটা হলেই ভাল হোতো কিন্তু আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রত্যুপকারের আশা নিয়ে আমাদের মত লোক উপকার করতে আগে বাড়ে না। পুষ্পা দেবী না হয়ে,

ও অবস্থায় রাম শ্যাম যদু পড়লেও এইটুকু করাই ছিল প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এর জন্যে দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন কেন?…আপনি বরং পুষ্পা দেবীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বলবেন—ওঁর নিমন্ত্রণই আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেছে—এর বেশী আমার নিষ্প্রয়োজন!

মহেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন—

—নিন্ মশাই চলুন! আপনিও তো মশাই কম জেদী লোক নন…

আমি হেসে বলি—জেদ নয় মহেন্দ্রবাবু· আজই সন্ধ্যার ট্রেনে আমি রওনা হচ্ছি—তাই সময় হয়ে উঠবে না।

মহেন্দ্রবাবু এবার খুশী হয়ে বলেন—বেশ তবে যাই…মাকে সেই কথাই বলিগে।

* * *

সত্যিই রাজগীর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগ্‌লাম। প্রস্তুত আর কি…সর্বদাই তো প্রস্তুত! ··আর জিনিষপত্তর?…সে বালাই কোনদিনই ছিল না· আজও নেই। তবে যাবার আগে দরোয়ানজিকে এবং তার আনুসঙ্গিক সেবাযত্নের একটা দাম তো দিতে হবে তাই ব্যাগটা খুলে টিকিটের টাকা কটা সরিয়ে রেখে হিসেব করতে বসি—কতটা এদের দিয়ে যেতে পারি।

দরোয়ানজি ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বললো—বাহবা—ক্যাবাৎ! রাজগীরকুণ্ড এক ধরমস্থান—কুছু না দেখকর যানে সে মহাপাপ হোগা বাবুজি! ইসি লিয়ে অ্যাইসি চলি যানা গুনা হায়।

আমি বলি—আমার হয়ে আপনিই সে সব পূজা দিয়ে দেবেন—বিকল্পে পূজার রীতি তো আমাদের শাস্ত্রে বিধি আছে।

ট্রেন সন্ধ্যা ছ'টা সাত মিনিটে—এখনও যথেষ্ট দেরী আছে। চা পান করে তাই একটু শ্বেতাম্বরী মন্দিরের পরশনাথকে দেখ্‌তে বার হলাম। ওখান থেকেই স্টেশনে চলে যাবো তাই ব্যাগটা দরোয়ানজীর হাতে জিম্মা করে দিলাম।

শ্বেতাম্বরী ধর্মশালার অভ্যন্তরেই শ্রীপার্শ্বনাথের রাজসিক মূর্তি। অলঙ্কার আভরণে ও রেশমী আবরণে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

সামনের মন্দিরে দিগম্বরী দলের ধর্মশালা…তারই অভ্যন্তরে এই পরশনাথ আবার দিগম্বর।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই তীর্থধর্ম সেরে ফেললাম। এখনও হাতে অনেক সময় তাই ধর্মশালাতে ফিরে এলাম···হাজার হোক এই আস্তানাটুকু একদিন আমায় বুকে করে রেখেছিল···মায়া পড়ে গেছে। তাছাড়া···মনে মনে প্রণাম জানানোও দরকার।

দরজা ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম··

দেখি···লালসালু মোড়া ডুলিখানা ধর্মশালার উঠানে অপেক্ষমান ··পাশেই মহেন্দ্রবাবু দাঁড়িয়ে·· হাতে তার ঝুলছে আমারই সুটকেশটা।

মহেন্দ্রবাবু চোখ টিপে ইসারায় আমায় কাছে ডাকলেন···

দাঁড় করালেন ঠিক ডুলির সামনে ·

ডুলির পর্দাটা সরে গেল নিমেষে ··

ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে আছে পুষ্পা আমার মুখের পানে।

সেই প্রভাতসূর্যভাত প্রস্ফুটিত কমল! উঃ এত রূপ মানবীর হয়! চোখ-মুখের আর দেহের যৌবন গরিমায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের এক নিমেষে লজ্জা পাইয়ে দেয়।

নিম্নাংশ এমনভাবে শাড়িতে ঢাকা যে তার অস্তিত্ব যে নেই বা অমন শিশু-সুলভ তা তিলার্ধও বোঝা যায় না।

আমায় দেখে হাত জোড করে নমস্কার জানালেন। মুখে মৃদু হাসির ক্ষণপ্রভার একটা ঝিলিক খেলে গেল।···

আমি কথা কইলাম—কেমন আছেন? · আপনি কেন কষ্ট করে এলেন। আমি নিশ্চয়ই আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতাম কিন্তু আজই আমায় চলে যেতে হচ্ছে বলে—তাই···

পুষ্পা স্মিত হেসে উত্তর দিল—আমি আবার কবে থেকে আপনির পর্যায়ে পড়লাম—নারাণ?

আমার সারা অঙ্গে যেন বজ্র-বিদ্যুৎ খেলে গেলো··

নিমেষে মন থেকে ভুলের বোঝা নেমে গেলো—আমায় এড়িয়ে চলার কারণ পুষ্পার আভিজাত্য নয়···শুধু দুঃসহ অপারকতা! বিশ্বের বিস্ময় হয়ে সবার সামনে আর নতুন করে সপ্রকাশিত হতে চায় না পুষ্পা···তাই এ লুকোচুরি!

বললে—দাঁড়িয়ে কেন নারাণ···চলো আমাদের বাড়ি।

আম্‌তা কেটে আমি বলি—অথচ,

ও বলে—অথচ তোমার আজ রাত্তের ট্রেনেই যাওয়া ডিউ ছিল···কিন্তু যাওয়া হলো না—কারণ আমি তোমায় যেতে দেবো না।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে, ডুলি-বেহারাদের বলি—এই ডুলি উঠাও!

মহেন্দ্রবাবুর হাত থেকে স্যুটকেসটা কেড়ে নিয়ে এগিয়ে চলি···

পিছু থেকে বরকন্দাজী পোষাক-পরিহিত দরোয়ান এসে আমার হাত থেকে ব্যাগটাকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে সেলাম জানায়।

পনেরো

আজ তিনদিন হয়ে গেল পুষ্পার বাড়িতেই অধিরূঢ় হয়ে বসেছি···

এই তিনটা দিন প্রাণভরে ওর মুখের দিকে চেয়ে মুগ্ধ নেত্রে শুনেছি ওর জীবনব্যাপী রোগপরিচর্যার রাজসিক সমারোহের কথা। কান পেতে শুনেছি ওর ব্যর্থ হৃদয়ের অন্তর-পুকার, ব্যথিত আর্তনাদ, আর প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি ওর পুষ্পিত যৌবনের নববসন্তাগমনের দুরন্ত অনাদর-টুকুকে।

কিন্তু, এর প্রতিকার কৈ?

তাই, জবাব দিইনি একটিও···

আমায় কাছে পেয়ে, ওর সমস্ত জমানো কথা—জমানো ব্যথা যেন নিঃশেষে উজাড় করে দিল। আমার সমবেদনা বা অনুমোদন পর্যন্ত না পেয়ে চতুর্থ দিনে আমারই বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে নিজেকে নিঃশেষিত করে অঝোর ঝরে কেঁদেছিল।

ওর ফুটন্ত ওষ্ঠাধরে এঁকে দিতে পারিনি আমার দুঃসহ অনুভূতি। শুধু ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে একটা কথাই বলেছিলাম—ছিঃ পুষ্পা কেঁদ না। পৃথিবীতে সুস্থ দেহ নিয়ে যাঁরা বেঁচে রয়েছেন তাঁদের তো তোমার মত মন নেই। মানুষ দেহ নিয়ে কতটুকুই বা থাকতে পারে বল? ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতেই তো এ দেহটার দরকার—নইলে সবাই তো মনটুকু নিয়েই বেঁচে থাকেন। সূক্ষ্মদেহে মনের সাতরঙী রামধনু বার বার রঙ ফলিয়ে যায় নানা খেলায়—নানা আবর্তনে—নানা বর্ণালী বৈচিত্র্যে। সেই আবর্তনের চিরন্তনী ছন্দে যারা স্বচ্ছন্দ মিশিয়ে দিতে পারেন তাঁরাই তো পরমপুরুষ বা পরমাপ্রকৃতি!

কথা শেষ হতে পুষ্পা ম্লান হাসি হেসেছিল…

আমি বলি—মনে হচ্ছে একটা ফিলজফির লেক্‌চারবাজি করে গেলাম ন্যা? যা বাস্তবে কখনও কাকেও সুখী করতে পারেনি—তার পুঁথিগত এ একটা বৈয়াকরণী ব্যাখ্যা বুঝিয়ে গেলাম—ন্যা?

কিন্তু, ঠিক তা নয় পুষ্পা? তোমার মনের এই 'নেই-নেই' ভাবটুকু মুছে ফেলে দাও—দেখবে তোমার সব আছে। প্রেম আছে—ভালবাসা আছে, আছে প্রীতি, ভক্তি, মায়া, মমতা সবই…শুধু শক্তি নেই। শক্তি নেই এমনও নয়—শক্তি নেই বলে তোমার একটা ভ্রান্ত ধারণা!

একবার একটি অন্ধ বালক-ছাত্রকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে মুখ দিয়ে একটা ছোট্ট 'আহা' বেরিয়ে গিয়েছিল—সে তখনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল—না, না, নারাণদা আমায় যেন কেউ কোনোদিন করুণা না করেন! কারণ দৃষ্টিমান যাঁরা তাঁদের চেয়ে আমি নিজেকে ছোট ভাবতে পারি না… আর ছোটই বা কিসে?…আমি দেখিয়ে দেবো যে আমি দৃষ্টিহীন হয়েও দৃষ্টিমানদের চেয়ে কম সক্ষম নই! আমি জানি অক্ষমতা শুধু মনের দুর্বলতা। অক্ষম বললেই মানুষ তখনই অক্ষম, আবার সক্ষম বললেই সে তখুনি সক্ষম। আমার চালচলন, লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষা কোনো দৃষ্টিমানের চেয়ে কম হবে না জেনে রাখুন!

সত্যই তাই দেখলাম।…

তাই বলছি পুষ্পা, নিজে অপারক মনে করলেই মন ওমনি অপারক হয়ে যায়। মনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলো না…মনে ভাঙন্ ধরলে সে খান্‌খান্ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে…টুকরো মনকে আর জোড়া দিতে পারবে না। তোমার অস্তিত্ব তোমার মনে—তোমার দেহে নয়! তোমার বিকাশ, তোমার প্রকাশ, তোমার পূর্ণত্ব—সবই ওই মনকে অবলম্বন করে।

ভেবে দেখো—কুমারী অবস্থায় মনই যেমন সব, তেমনি প্রৌঢ়ত্বের পর মনই অবশিষ্ট থেকে যায় আবার। মাঝের ক'বছর দেহের পরিতৃপ্তি…তাই পরিতাপের কিছুই নেই।…মনস্তাপের কিছু নেই…নেই এতটুকু আপসোস্।

বিদেহীর মত এসো শুধু মন নিয়েই খেলা করি। এই খেলাই শাশ্বত… চিরন্তনী। এই হলো রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম। আজ আমার মনে হচ্ছে—ওমর খৈয়ামের সাকীর অস্তিত্ব হচ্ছে তোমার মতই এক বিগত নিম্নাঙ্গীকে আশ্রয় করে। নইলে…

পুষ্পা যেন এক নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো—

'তাই হবে নারাণ, আজ থেকে আমি পূর্ণ অবয়বীর মতই চলবো। আজ থেকে তোমায় সামনে রেখে আমার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিশেষ দেখার নতুন অভিযান শুরু করলাম।'

পরের দিন সকাল থেকেই, রুটিন ধরে, শুরু হয়ে গেল পুষ্পার নতুন অভিযান।

সকালে লালসালুমোড়া ডুলির অভিভাবক হয়ে আমাকেই যাত্রা করতে হয়। মহেন্দ্রবাবু দূরে দূরে থাকেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের মাঝে দাসীর কাজ প্রায় ফুরিয়েছে···

সেখানে তপ্ত সলিলে দুটি উত্তপ্ত হৃদয়ের উদ্বেলিত আনন্দোচ্ছ্বাস সিনানাগারকে মুখরিত করে তোলে।···সবাই বাইরে অপেক্ষায়···স্নানান্তে দাসীর ডাক পড়ে, শুধু পুষ্পার ভিজে দেহবাস বদলের জন্যে।

সবাই জোড়া জোড়া চোখগুলোকে বিস্ফারিত করতে করতে কেমন যেন ট্যারা হয়ে চেয়ে থাকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের ওপর। একবার সুবিধে বা সুযোগ পেলেই সুচিন্তিত ভাগ ও বস্তুবিশেষের নিপাতের নির্ঘাত ব্যবস্থা করবেন। মহেন্দ্র-বাবুর তীক্ষ্ণ কটাক্ষে অগ্নি ঝরে অথচ সেই অব্যক্ত বস্তুটির উপর ব্যর্থ আক্রোশে শুধু চেয়েই থাকেন। চোখাচোখী হলেই একগাল হেসে বলেন—দেখুন পালাচ্ছিলেন তো···এখন কত কাজ। বলে, 'যার কাজ তাকেই সাজে, অন্যলোকে লাঠি বাজে'—।

উত্তর দিই না···

তারপর বাড়ি ফিরে বিশ্রাম। এবং তারই সাথে সাথে ব্রেকফাষ্ট সাঙ্গ করে গানের রেওয়াজে বসা হোতো। কখন খেয়াল, কখন ঠুংরী, আবার কখন অধুনিক, রবীন্দ্র সঙ্গীত। পুষ্পার ভাল লাগতো বৈষ্ণবপদাবলী। তাই প্রায়ই আমায় তা গাইতে হতো।

শুধু গান শুনেই পুষ্পা খুশী হোতো না। প্রতিটি পদাবলীর মানে তাকে সুস্পষ্ট করেই বুঝিয়ে দিতে হতো। জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের মানাধ্যায়ের শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনতে শুনতে তার কোথায় যেন কি হয়ে গেলো একদিন।

আমি গাইছিলাম—মানময়ী রাধার অনিদান মান গেল না—তিনি কথাটি পর্যন্ত কৃষ্ণসকাশে কইবেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী

হরতিদর তিমির মতি ঘোরম ॥"

ও বলে—সত্যি মিথ্যে জানিনা বাবাণ—তবে তুমি যখন কথা কও, হাসো, আমি কিন্তু চেয়ে থাকি তোমার দাঁতের দিকেই। কি সুন্দর তোমার দাঁতের সেটিং।

আমি হাসলাম—

ও বলে—ওই দেখ, তোমার হাসি তো নয় যেন এক ঝলক চাঁদের আলো। যে চাঁদের আলোয় আমাব মনেব সব অন্ধকার সত্যিই মিলিয়ে যায়···জানি না শ্রীকৃষ্ণেব তা হয়েছিল কিনা!

কথা চাপা দিয়ে আমি বলি—শোনো, শুধু দাঁতের শোভা দেখারই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল না···ছিল আরও কিছু—তাই বলছেন,

"সত্যমেবাসি যদি কুপিতময়ী কোপিনী,

দেহি খর নয়নশর ঘাতম ॥"

হঠাৎ ফিবে দেখি পুষ্পার কটাক্ষবাণে আমায় যেন বিদ্ধ করতে চায়। সে কটাক্ষে কেমন যেন এক মাদকতা ছাওয়া···আমি চঞ্চল হয়ে উঠি।

ও বলে—শোনো!

আমি ওর কাছ ঘেঁসে বসি··

ও বলে—আর কি লিখেছে?

আমি বলি, বলেছেন—

"ঘটয় ভূজ বন্ধনং—জনয় রদ খণ্ডনং

যেন বা ভবতি সুখ জাতম।"

একটা কথাও পুষ্পা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না···শুধু দুহাত বেড়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে এক ঝটকায় কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলে—

'ঘটয় ভূজ বন্ধনং'—

কতক্ষণ ছিল এ রকম অবস্থায় জানি না···তবে দু' দাঁতের চাপে একটা অস্ফুট আওয়াজ এসে আমার কানে পৌছচ্ছিল।

একটা অসীম তৃপ্তিতে আমায় ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ে, বলে—

—কেমন দেগে দিয়েছি, এ নিয়ে বাইরে যাবে কি করে?

বুঝলাম সে পরিতৃপ্তা!

কিন্তু, সত্যি মুশকিল হলো আমার বাইরে বেরুনর। ,সবাই আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকেন।

তবুও মনে হোতো যে শত লজ্জার মধ্যেও সার্থক আমার জীবন, কারণ এ জীবনের বিনিময়ে অপর একটি ব্যর্থ জীবন হয়ত কানায় কানায় ভরে উঠেছে।

ওর কাছে বসলে মনে হোতো, ওর যেন সারা অঙ্গ আমায় ইশারা দিয়ে ডেকে বলছে—

—'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ—এসো মোর হৃদয় নীরে।'

বাড়িটার মধ্যে কানাঘুষা চলেছে···

কেন চলেছে···? চিন্তার কারণ দেখিনা···গৃহকর্ত্রীর অনুমোদিত প্রোগ্রামই তো তাঁর আদেশমত অনুষ্ঠিত হচ্ছে!

প্রতি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বসতো বাইরের চত্বরে—ভেলভেটের জাজিমে বসে সঙ্গীত জলসা। ওর হাতে থাকতো সেতার আর আমার হাতে তবলা···

পারিপার্শ্বিকের পাহাড়তলীর সবুজেরা সুরা বণ্টন করতো, হয়তো তাই দেখতে দেখতে দুজনেই মত্ত হয়ে যেতাম ময়ূর-ময়ূরীর মত।

সেতারে ঝালা উঠতো···সারা বনস্থলীর বুক বেয়ে, পাঁচ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসার সুর ঝঙ্কার আমাদেরই রচা আঙিনায় বার বার ফিরে আসতো··· সুরে সুরে সন্ধ্যা ঝিমিয়ে আসতো।

আকাশে শেষ সূর্যের আবীর এসে রাঙিয়ে দিত পুষ্পার সীমন্তটুকুকে—মনে হোতো,

—নীল নীলিমায় নীলাম্বরে গাঁটছড়াতে বাধা—

বিশ্ব যখন কল্পনা কথা, কিসের তবে বাঁধা ?—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ···

অদূরের ঝিল্লী আর দুজনের নিবিড় ঝালার চিকারিতে অন্ধকারের আসর জমে উঠতো।

এরপর খাওয়ার তাগিদা—

আমরা যেন দিগন্তের চখা-চখি···সন্ধিক্ষণেই বিচ্ছেদ। রাত্রের সাথে সাথে যে যার চলে যায় নদীর এপারে আর ওপারে!

*   *   *   *

সেদিন পূর্ণিমা।

রাতে ঘুম আসছে না। পাহাড়তলির শ্যামল বনান্ত ঘিরে চাঁদের জোয়ার নেমেছে। আলোর মায়াজালে ধরা পড়ে গেছে মন…হয়তো পুষ্পারও তাই।

হঠাৎ চমকে উঠি…

কীসের গোঙানী?

না…

দাসী ছুটে এসে বলে—নারাণবাবু, জলদি চলিয়ে—বিবিজি বেহোশ হো গয়ি…

দাসীকে সঙ্গে করে পুষ্পার ঘরে পৌছলাম—।

ঘরে ঢুকে দেখলাম পুষ্পা তার সারা শরীরটাকে বিছানাটায় ঘসড়ানি দিয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে—যেন কিসের জ্বালায়। তার সারা বসন অঙ্গ বিচ্যুত…মুখে অস্ফুট গোঙানী।

পাশটিতে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়ালাম—

ওর যন্ত্রণাকাতর চোখ দুটি—নিমীলিত।

জ্যোৎস্নার আলো এসে ওর সারা মুখে বুকে ঝুঁকে পড়েছে। তারই মধ্যে ওর নিপীড়িত দেহখানি ক্ষণে ক্ষণে যেন মোচড় দিয়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

ওকে ডাকলাম—

এক ডাকেই ও চমকে উঠে সাড়া দিল—চোখ চেয়েও কেমন যেন করছে—বললো,

—ওগো তুমি এসেছো?

—কি হয়েছে তোমার?

—কিছু না—

হাতখানা ধরে নিল। এক দারুণ শক্তিতে সে আমায় কাছে টেনে নিয়ে বলে—কাছে এসে একটু বসো না!

দাসীকে বললাম—তোমায় আর ভাবতে হবে না। মহেন্দ্রবাবুকে খবর দেবার দরকার নেই। তুমি বাইরে অন্য ঘরে শুয়ে পড়ো।

দাসী চলে গেল…

পুষ্পা বলে—এ যে কি নিদারুণ যাতনা তা এক ভগবানই জানেন।

আমি জিজ্ঞাসা করি—কিসের যন্ত্রণা হচ্ছে তোমার?

ও বলে—সারা কোমরটা থেকে নীচে পর্যন্ত খসে পড়ছে। আর সারা ঊর্ধ্বাঙ্গে

যেন হাজার হাজার পিঁপড়ে একসঙ্গে চলে বেড়াচ্ছে! এমন সড়সড় করছে যার অনুভূতি কারো না থাকলে এর তীব্রতা বুঝতে পারবে না।

আমার হাতখানা ক্রমেই কষে ধরছে—

তারপর, আবার সেই হেঁচকা টান…

উঃ কি দারুণ শক্তি পুষ্পার ভগ্ন স্বাস্থ্য-শরীরে! নিজেকে সামলাতে পারলাম না—হঠাৎ হেঁচকা টানে ওরই বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ও আমায় দুহাত জড়িয়ে ধরলো। তারপর তার বাহুর নিষ্পেষণে আমায় পর্যন্ত নিপীড়িত করে তুললো।

ও বলতে থাকে—আ—আঃ!

আমি ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে, বলি—পুষ্পা—এসো তোমায় উঠিয়ে বসিয়ে দিয়ে দুজনে বসে গল্প করি—কি সুন্দর চাঁদের আলো!

আদুরে স্বরে ও উত্তর দেয়—না গল্প নয় নারাণ—শুধু তুমি কাছে থাকো!

আমি বলি—তাহলে তোমার সেতারখানা তোমার হাতে তুলে দি! চাঁদনীর আস্তরণে বিছিয়ে দাও তোমার সুরের মায়াজাল—এই মায়াভরা রাত্রে মস্ত্ হয়ে থাকব শুধু তুমি আর আমি!

…এই তো ছিল ওমরের মনের আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ। আজ এসো তোমার হাতের বীণার ঝংকারে আমার জীবন পেয়ালাটুকু পূর্ণ করে নি। ভরে দাও তোমার সুরের মদিরা…পুষ্পা!

কেমন শান্ত হয়ে যায় পুষ্পা! আমার কথাগুলা কান পেতে শুনতে থাকে—

আমি সেতারখানি এনে ওর হাতে তুলে দি, তবলায় চাঁটি মারি। তারপর অনবদ্য সঙ্গীত ধরায়—ছন্দে ছন্দে মেতে ওঠে চাঁদনীধোয়া কক্ষতল। তারের মিড়ে মিড়ে আর ছন্দের আবর্তনে যেন করে চলেছে দুটি হৃদয়ের নিবিড় মিলন-আক্ষেপ।

সঙ্গীতে একেই বলে 'আস'—মানে 'আক্ষেপ'।

প্রণয়ী-যুগলের এই আস বা আক্ষেপ নিয়েই গড়ে ওঠে প্রেমের শুভ্রসৌধচূড়। এ যেন তাজমহলের চেয়েও সমুজ্জ্বল, শুভ্র…তার চেয়েও আরো-আরো ঊর্ধ্বে মাথা তুলে দিয়ে বলতে থাকে—

ঘুমাও—ঘুমাও—তুমি প্রিয়া—
চেতনায় কী যে ব্যথা অচেতন নিয়া,
বুঝিবে না প্রিয়া!

ঝঙ্কারে ভরে গেছে সারা গৃহ-প্রাঙ্গণ। বাতায়নে জ্যোৎস্না অস্তমিত হয়ে ফুটে উঠছে প্রদোষ উষার পিচ্ছিল আলোক। সে আলোকে আমাদের আক্ষেপ নিয়ে আঘাত করছে শ্যামল উপত্যকায়—ঐ কুণ্ডের তপ্ত প্রস্রবণে—ঐ রাজগিরি শৃঙ্গের শিখরে শিখরে।

চখা ও চখীর ইপ্সিত ভীরু রাত্রির এলো অবসান।

ষোলো

আমার পুষ্পার কাছে মাসখানেক থাকার মধ্যে তিন-তিনবার ঘটে গেল এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

ডাক্তারবাবু ওর গরম জলে স্নান বন্ধ করে দিলেন। কুণ্ড থেকে ঘড়ায় করে ভারী জল এনে দেয়, তাতেই ও স্নান সমাপন করে। ডাক্তারবাবুর অভিমত যে যৌবনসুলভ প্রকৃতির রীতি আজও ওর মধ্যে দেখা দেয়নি শুধু ওর নিম্নাঙ্গের অপাবকতাব জন্যে·· অথচ মনের সংযম বা দেহের সংযম না করলে অষ্টমবর্ষীয়ার অঙ্গ নিয়ে প্রকৃতির এই পরিস্ফুতি শুধু বেদনাদায়কই হবে।···এবং এই কারণেই পুষ্পা বার বার বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে বা এক অহেতুক উত্তেজনায় অধীর হয়ে সংযম হারাচ্ছে।

ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহন স্নান এর কারণ হতে পারে তাই কুণ্ডে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন ঐ ঘটনা ঘটেই চললো তখন শারীরিক উত্তেজনার পথ বন্ধ করার জন্যে ডাক্তার আমায় নিরালায় ডেকে ইশারা দিলেন।

কিন্তু আমার পক্ষে একথা পুষ্পাকে জানানো খুবই কঠিন।

মনে মনে বুঝলাম পুষ্পাকে যতই না করুণা করি বা ভালবাসি এ কষ্টের কারণ আমিই। এবং তা আমার কোনোমতেই হওয়া উচিত নয়!

তাই স্থির করলাম দূরে সরে যাওয়াই দুজনার পক্ষেই মঙ্গল।···হয়ত পুষ্পার রাগ হবে, হয়ত ভুল বুঝবে আমায়, তবু আমার কর্তব্যবোধ আমায় যেন প্রতিমুহূর্তে অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগলো।

দেখতে দেখতে আরো পনের দিন অতিবাহিত হয়ে গেল।···ওকে নিয়ে ভুলিয়ে রাখি শাস্ত্র আলোচনায়, পুরাণের গল্পে, এমনি কত কি।

তবু ওর যেন উদ্দামতার অন্ত নেই···ও যেন এক পাহাড়ী নদী—পাথরের

আগল ঠেলে সরিয়ে, ভেঙেচুরে নিজের গতিপথ আপনিই নির্ণয় করে নিতে লাগলে।···ও স্ত্রী আর আমি ওর স্বামী, এ কথাটি যেন ওর মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছিল। আমিও প্রতিবাদ জানাইনি,···জানাইনি এই জন্যেই যে ওর অপ্রাকৃতিক গঠন ওকে জীবনভর যে পরিহাস করেছে তাকে আর নতুন করে অপমান করতে চাইনি।

সেদিন রাত্রে আবার ও বেহুঁশ হয়ে পড়লো।

আমি উপস্থিত হলাম ওর ঘরে। মহেন্দ্রবাবু সেদিন রুষ্টভাবে কথা কইলেন, যত সব অনাছিষ্টির মূল হচ্ছেন আপনি মশাই! এ কি সব নতুন উপসর্গ শুরু হলো বলুন তো? আপনার নিজেরই কোথায় ওকে ধর্মাচরণে মতি ফেরানো উচিত, তা না, দিনরাত চর্চা হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলীর, নয়তো রামী চণ্ডীদাস, নয় বিদ্যাপতি, নয়তো ছাইভস্ম খৈয়াম না কি। এখন সামলান মশাই! জানেন আজ ডাক্তারবাবু কি বলে গেলেন?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকি।

উনি নিজেই বলেন—হ্যাঁ! যা হবার নয় তাই হয়ে বসেছে।···এ শরীরে যদি অসম্ভব সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে বেদনাদায়ক তো হবেই।

বুঝলাম সব কিন্তু জবাব দিলাম না।

উঠে চলে যান মহেন্দ্রবাবু।···মনে মনে বললুম—ধর্মশাস্ত্রই চর্চা করবো এবার থেকে।

ওর পাশটিতে বসে, ওর গায়ে মৃদু নাড়া দিয়ে ডাকলাম—পুষ্পা!

চোখ মেলে চায়, বলে—তুমি এসেছো।

বলি—গিয়েছিলাম কোথায় যে আসব!

—না, আমার পাশে থাকো। যদি কিছু হয়ে যায় হোক তোমার কোলে শুয়েই···সার্থক হবে আমার অভিশপ্ত জীবন।

বড় কষ্ট হয় ওর কথা শুনলে। ওর হাত দুখানা ধরে নিই···ও ঠিক তেমনি জোরে আমায় বুকে টেনে নেয়। চুপ করে থেকে বলি—আমি চলে যাবো মনে করছি·· কারণ আমার যাওয়া দরকার!

লাফিয়ে উঠে বসে পুষ্পা। বলে—তুমি চলে যাবে—কেন?

তারপর একদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তারপর বলে—আমায় ফেলে চলে যেতে পারবে?

আমি মৃদু হেসে বলি—এই তো আমার কোলে মাথা রেখে তুমিই চলে যেতে চাইছিলে। সবাইকে একদিন-না-একদিন চলে যেতেই হবে একজন আর একজনকে পেছনে ফেলে। তবে? এই বাস্তব যাতায়াতে এত ব্যাকুল হচ্ছো কেন পুষ্পা?

ও আদুরে স্বরে বলে—না তুমি যাবে না, আমি আগে যেতে চাই। বল যাবে না·· কথা দাও!

আমি আবার হাসি। বলি—আমার কথায় কি মহাকাল দয়া করে নড়ে বসবেন!

অভিমান সুরে পুষ্পা বলে—ও, বুঝেছি। আমায় গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নিতে চাও···উঃ কি নিষ্ঠুর তুমি!

আমি বলি—তোমার চলে যাওয়ায় নিষ্ঠুরতা নেই খালি আমার আগে যাওয়ায় নিষ্ঠুরতা হবে! ধর তোমায় আমায় সত্যি বিবাহ হয়েছে। আমরা দুজনে আমাদেরই। কিন্তু হঠাৎ যদি আমাদের কাউকে আগে যেতে হয়? তুমি কি করবে?

ও উত্তর দেয়—বেশ, আগে বল তুমি কি করবে?

আমি বলি—আমি জানি, সাকী কখন মরে যায় না, মাত্র সরে যায় কিন্তু তার শাশ্বত প্রেম জীবনের নিশানা ঠিক করে দিয়ে যাবেই। সেই পথের পথিক হয়ে বাকী জীবনটা সেতারের সুরে সুরে তার রেখে যাওয়া মদিরা পান করে বিভোর হয়ে থাকবো।···অমর হতে না পারলেও 'ওমর' তো হব।

ও চুপ করে শোনে। কথা বলে না।

আমি বলি—তুমি এবার কি করবে বল?

চুপ করে থাকে পুষ্পা। তারপর হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলে ওঠে—আমি?··· আমি তোমার স্মৃতিটুকুকে অন্তরে রূপ দিয়ে পুরাণ ভাগবতের বাসুদেব ভেবে পূজা করব। এ ছাড়া অন্য পূজা আমার কাছে হবে শুধু ভণ্ডামিরই নামান্তর।

বলি—বেশ তো, বাস্তব জগতের কাজেকর্মে দূরে গেলেও, তুমি সেই স্মৃতিছবি নিয়ে পূজায় দিন কাটিয়ো। আমার বেশ দেখতে ইচ্ছে করে সত্যি আমার অবর্তমানে এমন পূজারী আমি পাবো কি না।

কিসের ভাবনায় ও নিশ্চুপ হয়ে থাকে। কথা বলে না···

আমিও বলি না।

গাঢ় অন্ধকার বাইরে···ঘরে···আমাদের চারপাশ ঘিরে···

আমিই নিস্তব্ধতা ভেঙে বলি—কি জানো পুষ্পা, আমি জানি বাস্তব জগতে এমন করে কেউ কারো জন্যে পূজা রচনা করে না…কারণ করবে কেন ?…আমি তো আর দেবতা নই, সামান্য মানুষ। মানুষের প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা সব দু'হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে যদি দয়িতকে আঘাত করে দূরেই চলে যাই তবে সে হঠাৎ তার বিনিময়ে পূজা করতে বসবে আমাকে এ আমি যেন ভাবতেও পারি না।…

হঠাৎ ও জবাব দেয়—আর যদি কেউ করে ?

অবাক হয়ে উত্তর দিই—হয় সে পাগল, নয়ত সে সত্যই প্রেমিকা। প্রেম করার দায় যে অনেক !

ও বলে—তাই নাকি, কি—কি শুনি !

আমি বলি—প্রথমত প্রেম করতে গেলেই প্রথমেই ত্যাগ স্বীকার করতে হয় অর্থাৎ দয়িতকে ত্যাগ না করলে প্রেম জন্মায় না। অর্থাৎ বিরহ-অনলে নিজেকে জ্বালালেই তখন প্রেমের বাতি সত্যিই জ্বলে ওঠে। সেই আলোকে তখন দেখা যায় যে দয়িত আমার যায়নি বরং প্রতি পলে অনুপলে আমায় ঘিরেই আছে। তখন প্রিয়হারা হয় না বরং প্রিয়ময় হয়ে পড়ে।…তার স্মৃতির আবাহনী তখন তার প্রিয়কে ঘিরে রচনা করে শাশ্বত বাসরসজ্জা।…সেই মূর্তি হয়ত আমার মত পাশে বসে বাদপ্রতিবাদ করবে না তবে তুমি যা শুনতে ভালোবাসো, করতে ভালোবাসো তাই করিয়ে নেবে।…তোমার একনিষ্ঠ প্রেমই সে পরছায়ার রূপ দেবে। হয়ত কানে কানে অন্তর থেকে বলবে…

আয় না সখি তর্ক রেখে সর্বলোকের ভালো,
ধূপ দীপালি না জ্বালালে কখন দেছে আলো ?
পুড়িয়ে যদি সংস্কারে করে মোদের লীন
ধূপজ্বালানির মাঝখানেতে বাজবে মোদের বীণ !

আমি থামলেই পুষ্পা বলে ওঠে—ধন্যবাদ কবি !

হঠাৎ ওর ভাবান্তর দেখে কেমন যেন গুলিয়ে যাই।

ও বলে—অর্থাৎ তুমি চলে যাবেই।… বেশ যেও, আজ তো নয়, যখন যাবে তখন ভাবা যাবে। তবে আমি যদি আগে যাই তবে তোমায় এসে তোমারই লেখা কবিতার পাদপূরণ করতে হবে তা বলে রাখছি।…

আমি চুপ করে থাকি।

ও বলে—কি বল দেখি !

জবাবের অপেক্ষায় মুখের পানে তাকিয়ে থাকি। তারপর বলে—পারলে না? ··তবে শোনো—

চিতার পরে তুলবে যখন মনের সুঠাম ঘব,

আঁখির জলে নাইয়ে দিও, ও মোর প্রিয়বর।

গোলাপজলের গন্ধ সাথে চুয়া চন্দন জেলো,

রক্তরঙিন পাতলা ঠোঁটে শেষের চুমা ঢেলো।

একটু খানি শীতল মদির ঢেলো চিতার পাতে।

আমি হেসে বললাম—ধন্যবাদ কবি পূজারিণী।

ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—কেন তুমি চলে যেতে চাও জানতে পারি কি?

আমি বলি—অনায়াসে। যাযাবরী জীবন আমার। কোথাও মুক্তাঙ্গন পেলেই ডেরা বসিয়ে ফেলি।···আবাব কাবো খবরদারির হানা পেলে নিমেষে ডেরা ভেঙে দিয়ে অন্যত্র যাত্রা করি। মাটি বেচারী মায়াব বাঁধনে পড়ে যায়, তাই অনেকদিন পর্যন্ত আমাদেব ভাঙা ডেরার কুটো বুকে নিয়ে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে· তখন বরষার অঝোরধারাব অনুকম্পায় সে কুটো ধুয়ে মুছে তাকে নবীন করে তোলে।

পুষ্পা বলে—কবে যেতে চাও?

বলি—ধর, কাল।

বলে—বলি যদি আরো দু'দিন?

—কেন?

—জয়জয়ন্তীর আলাপটুকু সেতারে তুলে নিতে চাই।

আমি বলি—বেশ, তাই হবে···আজ থেকেই শুরু করা যাক।

সেতার এনে ওর হাতে তুলে দিই। জয়জয়ন্তীর প্রথম মিড়ে টান পড়লো। ওর চোখের কোণে জলের ফোঁটা চিকচিক করে উঠলো।

সেতারখানা ওর হাত থেকে কোলে টেনে নিয়ে কোমল গান্ধারের মিড়ে তার টেনে ধরি।·

জলের ফোঁটায় স্রোত গড়াচ্ছে।

সেতার হাতে নিতে নিতে পুষ্পা বলে—জয়জয়ন্তীর বুকে যে এত কান্না লুকিয়ে থাকতে পারে তা আজ প্রথম বুঝলাম নারায়ণ! তোমায় কাছে পেয়ে যে সুখে প্রতিদিন ভরপুর ছিলাম—তোমায় দূরে ঠেলে দিয়ে হয়ত জয়জয়ন্তীই সে সুখেই

জলের ধারা বয়াবে। কিন্তু একটি কথা দাও যে আমার অখণ্ড সুখের দিন সমুপস্থিত হলে তুমি এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে এই জয়জয়ন্তী রাগই বাজাবে।

আমি বলি—কথা দিলাম।

ও উত্তর দেয়—সাক্ষী রইল ভোরের শুকতারা।

সতেরো

রাজগীরের পাট উঠিয়ে চলে এসেছি···চুকিয়ে এসেছি পুষ্পার মায়া।

বিদায়ক্ষণে ওর করুণ চাহনিটুকু আমায় ক্ষণেবিক্ষণে কেমন যেন উদাস করে তোলে। আমুদে লোকেরা হঠাৎ মনমরা হলে সবাই ভাবে বুঝি মেলানকোলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ভাবি—সত্যি ও আমার কে ?···শুধুমাত্র খেলার সাথী।

তাই বা কৈ !···ও যে নিতান্ত এক দাক্ষিণ্যের ভিখারিণী। দক্ষিণার স্বরূপ কতটুকুই বা দিতে পেরেছি ওকে · আর, কতটুকুই বা নেবার ক্ষমতা রাখে ওর ঐ···

দু'হাত দিয়ে ঠেলে দিতে চাই ভাবনার রাশি।···এ তো ভাবনা নয়, দুর্ভাবনা ···তাও যার প্রতিকার সুদূরপরাহত।

ভাগলপুরে চলে এসেছি···

উঠেছি এক বন্ধুর আশ্রয়ে। এদের বাড়ির জামাই আমার কলকাতার বন্ধু। নাম বিশ্বনাথ ঘোষ।

বিশ্বনাথের দৌলতেই নিমেষেই ওদের স্বগোষ্ঠীজাত হয়ে পড়েছি। ওরা তখন ভাগলপুরের উদিত সঙ্ঘ। খেলাধূলা, খোলা গঙ্গার বুকে সাঁতার বা নৌকায় দাঁড় টেনে, বোটে মেরে চলাফেরা করা, থিয়েটার, জলসা, আমোদ-প্রমোদ ঘিরে বিদেশের ছেলের দল চিরকালই যেমন একগোষ্ঠীভুক্ত হয়—এরাও তেমনি।

দু'দিনেই ভাগলপুরের যুবকমহলে প্রতিষ্ঠা নিতে পেরেছি। নতুন জায়গায় নতুন সংস্পর্শে এসে আর মিশে মন থেকে সমে গেছে পুষ্পার বিচ্ছেদব্যথা। এক পূর্ণ-জোয়ারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলাম। সেই স্রোতের আবর্তে পড়ে পুরাতন আবিলতা যত ধুয়ে মুছে ভেসে গেল।

*   *   *

সবাই মিলে হঠাৎ ঠিক করে ফেলা গেল যে গৈবীনাথ দেখতে যেতে হবে। দেখার চেয়ে পিকনিকের স্পিরিটটাই বেশী।

গঙ্গার বুক ফুঁড়ে উঠেছে গ্র্যানাইটের পাহাড়—ওপরের চূড়ে বসে আছেন গৈবীনাথ মহাদেব। সামনের ছোট পাহাড়টায় তাই তাড়াতাড়ি মুসলমানরা অধিকার করে নিয়ে বসিয়েছে একটি মসজিদ।

ইচ্ছে ছিল নৌকো করে যাবার কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেল। গেলাম ট্রেন ধরে সুলতানগঞ্জে। দশ পনের মিনিটের পথ অতিক্রম করলেই গঙ্গার ধার আর গৈবীনাথ।...

ট্রেনের কামরায় পা দিয়েই অপর যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি নিজেদের সংখ্যায় ও সাংখ্যবাদে। দলে আমরা দশ বার জন।

আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গার্লস স্কুলের ছাত্রীরাও উঠে পড়েছেন সেই কামরায়। ওঁদের সংখ্যাও কম নয়। ন'—দশজন তো বটেই।...

ওঁদের কিন্তু দর্শন আলাদা...ওঁরা সংখ্যবাদী তো নন বরং বলা চলে বেদান্তবাদীর দল, কারণ আমাদের মত যাযাবরী বেদেদের অন্ত ঘটাতে ওঁদের প্রতিটি জোড়া ভ্রূযুগল আর জোড়া চোখে নয়নবাণ সদাই সপ্রস্তুত... চোখ তুলেছো কি মরেছো!

ভয়ে ভয়ে আমার দৃষ্টিটুকু সরিয়ে নিয়েছি কামরার ওই শেষের কোণটায়। ওখানে বসে আছেন একটি অটুট-স্বাস্থ্য প্রৌঢ়া বিধবা আর একটি স্ফুটনোন্মুখ পদ্মজা। বয়েস তার হবে সতেরো কি আঠারো। বিশের ঊর্ধ্বে এখনও পৌঁছয়নি তাই বিষাক্তও বলা যেতে পারে।...সেই বিষেই বার বার জর্জরিত হচ্ছিলাম।

হঠাৎ ধরা পড়ে গেলাম বিষের ওঝা ফণীভূষণ বিশ্বনাথের কাছে। ও কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চুপি-চুপি বলে—ব্যাপার কি! চোখ লড়ে গেছে নাকি?

হিন্দুস্থানী 'লড়্ গয়া' কথাটার বাংলার পরিভাষার অভাবে হিন্দ-বঙ্গ মেশানো অভিব্যক্তি।

আমি কিন্তু অস্বীকার করলাম। বললাম—'কেলা'...।

ও বলে—কলা...?

তারপর মৃদু হেসে মেয়েটির দিকে ইশারা দিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে, বলে—হ্যাঁ, কলাই বটে! কামকলা বলেই তো মনে হচ্ছে...

চাপতে গিয়ে উত্তর দেই—দূর!...এ-কলা বর্তমান।

স্মিত হেসে উত্তর করে বিশু—মর্তমান নয়! তবে তোমায় মারতে মর্ত্যে বর্তমান।

প্রতিবাদ জানাই।···বলি—না গো মশাই,—কাঁদি, দেখতে পাচ্ছিস না।

বিশু চমকে উঠে—কাঁদি?···কাঁদবি কিরে?·· এক অজানা অচেনা মেয়ের জন্যে কেঁদেই বা করবি কি বল?

রেগে উঠেছি।

বলি—আঃ মল! মেয়ে কোথায় পেলি? ঐ যে এক কাঁদি পাকা মর্তমান কলা, শেষের দিকটায় ঠেসান দিয়ে রাখা রয়েছে···দেখতে পাচ্ছিস না?

বিশ্বনাথ শেষের কোণটায় নজর বুলিয়ে একটি নিশ্বাস ফেলে বলে—কলা এবং কামকলা দুটোকেই নজরবন্দী করে রেখেছে মূল কাঁদির সর্তক দৃষ্টির বেড়াজালে।

আমি হেসে ফেলি—তাইতো ভাবছি কি করে "হরণ-পালা" সাঙ্গ করি।

বিশ্বনাথ ফিসফিস করে কানের কাছে বললো—কাম-কলাটিকে চিবুতে তোর বেশীক্ষণ লাগবে না হয়ত, কারণ যা চোখজোড়া করে রেখেছিস কিন্তু কাঁদির কলা আত্মসাৎ করা সহজ হবে বলে বোধ হচ্ছে না।

বলি—দেখা যাক্···

মনে মনে ঠিক করলাম যে কলার অছিলায় কামকলার সঙ্গে আলাপ জমাতেই হবে। এক মিনিট চুপ করে ভেবে নিয়ে চেঁচিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিই—হোয়াট্ ননসেন্স! এ যে সব ঝিমিয়ে যাচ্ছে—বিশু, তোর বাঁশী ধর্!

বিশু বলে—বেশ, ধরছি···কিন্তু তোকেও ভাই "পোঁ" ধরতে হবে—

সবাই একযোগে সায় দিয়ে ওঠে।

বেজে ওঠে বিশুর বাঁশী · সঙ্গে সঙ্গে উদাত্তকণ্ঠে গান বেরোয় আমার কণ্ঠ থেকে—"তখন উর্মি বিলীন স্তব্ধ সিন্ধু, মুক্ত নীল আকাশে"—

সারা কামরাখানা দেখতে দেখতে আকৃষ্ট হয়ে চেয়ে থাকে সংগীত উৎসদ্বয়ের দিকে। সবাই চুপ করে বসে গান শোনে আর নীরব দৃষ্টির বিনিময়ে সামনের বেঞ্চিতে বসা যে যার জুড়ি খুঁজে বেড়ায়।

দেখলাম কোণের কিশোরীকে মনের কিশোরী করবার লোভে নিজের নয়নদ্বয় সেইখানেই ঘুরে ঘুরে মরছে···

বিশু আড়চোখে সেটুকু দেখে নিয়ে একটা ছোট্ট চোখের টিপনি মারলো।

গান সমাপ্তের সঙ্গে বন্ধুদের হাততালির সাথে সাথে সামনের বেঞ্চির তন্বীরাও ঘন ঘন করতালি দিয়ে উঠলো। বন্ধুর দল চীৎকারে বলে—ওয়ান্স্ মোর—

তারি মাঝে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ মিশিয়ে শোনা গেল—আর একটা—আর একটা—

আমি হিরোর মত জেস্‌চার নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বলি—না ভাই, ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গলা কাঠ হয়ে গেছে···এক গেলাস জল যদি যোগাড় করে দিতে পারিস

বলার অপেক্ষা মাত্র !

কোণের প্রৌঢ়া বলে ওঠেন—এই যে আসুন। আমার সুরুইতে জল আছে।

এগিয়ে চলি কোণের দিকে···

ভদ্রমহিলা তাঁর মোরাদাবাদী টিফিন ক্যারিয়ার খুলে, দুটি সন্দেশ তার থেকে বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিযে বলেন—আগে এ দুটো মুখে ফেলে দিয়ে তারপর জল খাবে। শুধু জল খেলে গলা ধরে যাবে।

ভদ্রমহিলার সামনের বেঞ্চির একটি ভদ্রলোক সরে বসে বসার জায়গা করে দিয়ে বলেন—এই যে, এইখানে বসে খেয়ে নিন।

আমার কামকলা দেবীর ঠিক সামনাসামনিই আসন মিললো। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে বলি—জয় মা বাঙ্গা কালা !

অদূরের বন্ধুদের লোলুপ ব্যর্থ দৃষ্টিগুলোকে একবার অনুসরণ করে ফিরে তাকাই বিশ্বনাথের চোখের দিকে। চোখ দিয়ে যেন ওর আগুন ছুটছে।

ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলা তাঁর মোরাদাবাদী গেলাসটি শ্রীমতী কামকলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন—সুরুই থেকে জল গড়িয়ে দে দেখি অঞ্জলি।

অঞ্জলি !

চমকে উঠি। গেলাস ভরে জল হাতে এগিয়ে দেয় অঞ্জলি আমি জলের গেলাসটা ধরতে যাচ্ছি এমন সময় কথা শোনা গেল—যদি কিছু মনে না করেন, আমায় শুধু এক গেলাস জল দিলেই হবে। বাঁশী-বাজিয়ের গলা ধরলেও কিছু আসে যায় না···তাই শুধু এক গেলাস জল !

চেয়ে দেখি বিশ্বনাথ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। জলের গেলাসটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলি—নাও গেলো—উঃ কি জেলাস !

বিশ্বনাথ গেলাসটিকে ধরে নিয়ে হেসে বলে—"উই মেন্‌ দাই নেম্‌স্‌ আর জেলাস"···অর্থাৎ আমরা পুরুষ, আমাদের নামই জেলাস অর্থাৎ পুরুষমাত্রই জেলাস।

চারদিক থেকেই সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন—দাঁড়াও দাঁড়াও বাবা, শুধু জলটা খেয়ো না, দুটো সন্দেশ দি।

বিশু বলে—না না না, থাক থাক! সব কটাই যদি অপোগণ্ডদের খাওয়াবেন, নিজে খাবেন কি?

ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হয়ে বলেন—এ যে আমার ঘরের তৈরী বাবা—ফুরিয়ে গেলে আবার করে নেবো।

আমি বলি—তাইতো বলি—এ দেশে এমন সন্দেশ! ভারী ভালো লেগেছে—

প্রৌঢ়া বলেন—আরো দুটো খাবে বাবা?

আমি বলি—না না। আপনাদের কাছে ভালোকে ভালো বলার জো নেই, অমনি বলবেন আরও নাও।

সন্দেশ ও জল নিঃশেষ করে বিশ্বনাথ খালি গেলাসটি আমার হাতে সমর্পণ করে নিজের সিটে ফিরে চলে। গেলাসটি সন্তর্পণে ফিরিয়ে দিই অঞ্জলির হাতে। হাসি হাসি মুখে গেলাসটিকে ধরে নেয় অঞ্জলি, তারপর আর এক গেলাস জল গড়িয়ে আমার হাতে তুলে দেয়। চারিচক্ষে মিলন হলো·· কোঁৎ কোঁৎ করে এক গেলাস জল নিঃশেষ করলাম। তবু যেন তেষ্টা মেটে না। বলি—আরও এক গেলাস।

ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন—আহা রে থাক থাক, জল আর খেও না বাবা··· বরং তার চেয়ে আমি দুটো কলা দিই খাও। তেষ্টা থেমে যাবে।

আমি বলি—ওগুলো বুঝি আপনার কলা? নিশ্চয়ই কেনা নয়, বাগানের!

উনি স্মিত হেসে উত্তর দেন—কিনলে কেউ কি আর খাবার জন্যে এক কাঁদি কেনে বাবা? কাঁদি কাঁদি কলা কেনে ব্যাপারীরা।

আবার বিশ্বনাথ ছুটে আসে, বলে—না মাসীমা, ওকে দেবেন না, ও যে মর্তমান কলা। খেলেই ওর গলা ধরে যাবে। বরং আমি বাঁশী বাজাই···আমার গলা ধরলেও বাঁশী থামবে না।

আমার চোখদুটোও ওর দিকে কটমট করে চেয়ে আগুন ছোটালো।

খিলখিল করে হেসে ওঠে অঞ্জলি—হাসিতে ফেটে পড়লো।

আমি অপ্রস্তুত···

মাসীমা কিন্তু কলা ছিঁড়ে আমার হাতে দুটো আর ওর হাতে দুটো করে

ন। তারপর একছড়া কলা একটা ছুরি দিয়ে কেটে বিশুর হাতে তুলে দিয়ে ন—দাও না বাবা তোমাদের বন্ধুদের একটা একটা করে। খাওয়াতে আমি ভালবাসি—বিশেষ করে ওমনি করে যদি কেউ চেয়ে খয়ে। লজ্জা করো না। লজ্জার বালাই আমাদের কারো কোনোদিন ছিল বলে জানি না। তবু জ্জ হয়ে বলি—সে কি? আপনার যে সব ফুরিয়ে যাবে!

মাসীমা বলেন—না বাবা, বাগানে কত যে হয়। কে খাবে? পশুতে পিতে খায়, ফ্যালে, ছড়ায়। এ তো তবু…

আমি কথা কেটে বলি—মানুষে খাচ্ছে।

আবার সেই খিলখিল করে হাসি—।

সবাই অমৃতমান খেয়ে অমৃত্তির পাকে পাকে রসাল হয়ে উঠেছে তাই আসর ম উঠেছে। সুযোগ বুঝে আমি বিনা অনুরোধেই গেয়ে উঠি—

আমি অঞ্জলি নিয়ে তব পথ চেয়ে
বসে আছি ওগো প্রিয়,
মম ব্যর্থ ব্যাকুল প্রাতে—
চরণ পরশ দিও!

গানের পর গান চলেছে। প্রতি গানের শেষে করতালি উঠছে ছাত্রার ও তাতে যোগ দিচ্ছেন।

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে এসে গাড়ি থেমে গেল।

দেখলাম যে গাড়ি প্রায় খালি হয়ে গেল। ছাত্রার দল প্রথম নামছে… র পেছনেই আমাদের দল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময় মাসীমা ন—আজ যখন এমন দল পাওয়া গেছে তখন অঞ্জলিকেও একবার গৈবীনাথ ন করিয়ে নিয়ে যাই। অনেকদিন থেকে ওকে কথা দিয়েছি।

আমি বলি—বেশ তো চলুন না—আমরা তো রয়েছি।

উনিও নেমে পড়েন।

গৈবানাথের পথে যেতে যেতে নিজের সম্বন্ধে সব কথাই বলে ফেললেন সীমা।

ওঁরা যাচ্ছিলেন মুঙ্গেরে। ওঁদের বাড়ি মুঙ্গেরের উত্তরে মথুরাপুরে।

মুঙ্গেরের 'কষ্টহারিণীর ঘাট' গঙ্গার উন্মুক্ত বুকে নেমে এসেছে। ঋষি মুদ্গল ানে বসে তপস্যায় নাকি শ্রীবিষ্ণুর আসন টলিয়েছিলেন। তাঁর দর্শন লাভ

করে ইহজীবনের কষ্টের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তাই ওই ঘাটের নাম কষ্টহারিণীর ঘাট। আর মুদ্গল ঋষির স্মরণে জায়গাটির নাম হয়েছে মুঙ্গের।

নৌকো করে গেলে ওঁরা ওই ঘাটেই নেমে থাকেন। কিন্তু এরই উত্তরে বুড়িগণ্ডক আর তিলজুগা নদী গঙ্গায় এসে পড়েছে। প্রতি বর্ষায় এ অঞ্চলের মাইলের পর মাইল জলে ডুবে যায়। নদীর জলের বালির বাশি চড়ায় পরিণত হয়ে ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সেগুলি সব সুজলাং সুফলাং হয়ে ধান আর গমের প্রাচুর্য ঘটায়। এই সমস্ত জায়গায় সব জমিরই মালিকান স্বত্ব হচ্ছে মথুরাপুরের জমিদারদের। মাসীমা নাকি সেই জমিদারির দশ-আনা শরিকান এবং ভবিষ্যতে এর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হচ্ছেন অঞ্জলি।

মাসীমা বলেন—জানো বাবা, এ অঞ্চলে ঘুরলে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না। যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি এসব জায়গায় খাওয়াদাওয়ার সুখ। ছেলেবেলায় তোমার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে অনেক ঘুরেছি কিন্তু এখন লোকাভাবে, আর যাওয়া ঘটে না। এখন তাই মুঙ্গেরের বাড়িতেই থাকি।

ঘাটে এসে দেখলাম নৌকো নিয়ে ছাত্রীরা যাত্রী হয়ে গৈবীনাথ পাহাড়ের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ঘাট শূন্য···অন্য নৌকো নেই। ওটা ফিরে এলে তবেই আমরা যেতে পারব।

ঘাটের ধারে বসে মাসীমা বলেন—এখানে যখনই এসেছি মুঙ্গের থেকে নৌকোয় এসেছি···ট্রেনে চড়ে এই প্রথম এলাম।

আমি বলি এখান থেকে নৌকোয় করে আপনাদের মথুরাপুরে যাওয়া যায় না?

উনি উত্তর করেন—তবে আর বলছি কি· গঙ্গার পথে যেতে পারলে তোমাদের দেখাতাম কি সুন্দর এর দু'পাশের শোভা। এখান থেকে মথুরাপুর পৌঁছতে গেলে প্রথমেই ছোটগণ্ডক, তিলজুগা, কিউল আর মান নদীর সঙ্গম-স্থলগুলো একে একে ফেলে যেতে হয়। এদের ভিতর দিয়ে দু'পাশের সমস্ত জমিই শস্যশ্যামলা। যতদূর চোখ যায় খালি সবুজ আর সবুজ। আবার গঙ্গার অপর দিকে চাও তুমি—দেখবে ছোট ছোট পাহাড়—চলেছে তো চলেইছে। পারতাম যদি তোমাদের নৌকো করে নিয়ে যেতে তো দেখতে বাবা কি সব জায়গা!

বিশু বলে—মাসীমা, ও যাযাবর। ওকে বলছেন ও কথা—কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাচ্ছেন—বলে সেধো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি।

সবাই হেসে ওঠে।···

আঠারো

নৌকো ফিরে এসেছে…

মাঝি মাসীমাকে দেখেই দু'হাত জোড করে এসে দাঁড়ায়। বলে—রানীমা! নমস্তে—

মাসীমা বলেন—রামস্বরূপ, তুমি এখানে? তোমার সে সব বজরা কোথায়?

রামস্বরূপ কাতরস্বরে উত্তর দেয় —আর রানীমা! সে সব গেছে। সোয়ারী মেলে না—তাই এখানে ফেরীর কাজ করে খাই। তবে আজও এক আধটা ছৈ-তোলা গয়নার নৌকো যে রাখি না এমন নয় রানীমা। অবরে-সবরে যাত্রী পেলে নিয়ে যাই।

রামস্বরূপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রানীমা অঞ্জলিকে নিয়ে নৌকোয় পা রাখলেন। আমরা ক'জন রানীমার অতিথি হয়ে উঠে বসলাম।

নৌকো চলেছে। রানীমা যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন…আমরাও চুপচাপ। শুধু দাঁড় বাওয়ার ছপছপ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর গঙ্গার বক্ষ চিরে সামনে উন্নত মস্তকে দাড়িয়ে শৈলরাজ গৈবীনাথ তাঁর নীরব প্রতিরোধ সৃষ্টি করে গঙ্গার খরস্রোতে আবর্ত সঙ্গীত গেয়ে চলেছিলেন।

হঠাৎ রানীমা সম্বিতে ফিরে এসে বলে ওঠেন—একী! সবাই চুপচাপ কেন? গানটান হোক।

গান শুরুর আগেই পথ ফুরোলো।

সবাই উঠে পড়ি গৈবীনাথের পাদদেশে

ওপর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত ভেসে আসছে—

> "ওগো তোরা কে যাবি পারে!
> আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।"

ওদেরই পাশ কাটিয়ে আমরা উঠে চলেছি। ওদের পার হয়েই অঞ্জলি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসির দমক সামলাতে না পেরে আমায় পিছু থেকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল।

আমি বলি—কি হলো কি? এতে হাসির কি আছে?

হাসির দমকে দমকে অঞ্জলি উত্তর দেয়—সুর আর অসুরের লড়াই বেধেছে।

আবার সেই হাসি।

বুঝলাম অঞ্জলির সত্যিই সুরজ্ঞান বলে কিছুটা আছে কারণ ওদের গল সুরগুলো যেন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবু পাহাড় নদী সংযোগস্থলে টক্কর খেয়ে প্রতিধ্বনিমিশ্রিত এ গান সেদিন কানে খারাপ লাগছি না। তাই বললাম—কেন, কি খারাপটা গাইছে?

রানীমা মৃদু ধমক দিয়ে বলেন—কি হচ্ছে অঞ্জলি! বুড়ো হলি ত বেহায়াপনা গেল না।

অঞ্জলি সংযত হবার চেষ্টা করল।

বিশু বলে—আমরাও আসর জমাচ্ছি অঞ্জলি, ভয় নেই। তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি সুর বোঝো কাজেই আমি বাঁশী ধরছি··তুমি তার সঙ্গে গান ধর।

আমার দিকে চেয়ে বলে—আর তুই যদি গানখানা জানিস তো ওর সঙ্গে যোগ দিবি।

রানীমা হেসে বলেন—বিরাট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়ে গেল দেখছি. বেশ—ততক্ষণ তোমরা শুরু কর, আমি গৈবীনাথ দর্শন করে আসি।

রানীমা রামস্বরূপের সঙ্গে আরও এগিয়ে চলেন ওপর দিকে।

বারান্দার মত একখানা পাথর ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে নদীর দিকে চেয়ে নীচে ছিটকে পড়লে একেবারে গঙ্গার শীতল বক্ষে সমাধিস্থ হবার সুযোগ রচনা করেছে।

আমরা সেইখানটাতে বসার ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু সবাইকে খুঁজতে গিয়ে দেখি, মাত্র আমরা তিনটিতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। বাকীগুলি কোথায় পার্টির আশেপাশে বৃন্তচ্যুত হয়ে খসে পড়েছেন। ভাবলাম—নিশ্চয়ই অঞ্জলি এইটুকু লক্ষ্য করেই তখন অত হাসছিল। আমরা বুঝতে পারিনি।

বিশু বাঁশীতে ফুঁ দেয়··বাজাচ্ছে প্রলয় নাচনের সুর।

গুনগুন করে অঞ্জলি এক ফাঁকে গলা মিশিয়েছে··আমিও তাকে অনুগমন করলাম। ত্রয়ীসংযোগে এক অনবদ্য সুরধারা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো জানি না অপর পক্ষের কানে সে সুর পৌঁছালো কি না তবু প্রাণপাত করে চেঁচিয়ে গাইছি। পাশেই গৈবীনাথের শিবলিঙ্গাশ্রিত শৈলশিখর। যদি তাঁর নিজের গুণাগুণ স্বকর্ণে শুনে খুশী হয়ে একটা কিছু অঘটন ঘটান। গান শুনে

তুষ্ট হয়ে যদি অঞ্জলিকে বরদান করে বসেন। …কিন্তু আমায়? শাস্ত্রে বধূদান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে বলে মনে পড়ে না।

নটরাজ বন্দনা শেষ করে কখন আবার অঞ্জলি আর আমি দ্বৈত সঙ্গীত শুরু করেছি নিজেরাই জানি না। গানখানি কবিরই লেখা—

"সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে—
প্রেমডোরে বাঁধা ঝুলনা।"

বাঁশীটা নিজে নিজেই থেমে গেছে…সে হুঁশ আমাদের নেই…গান থামিয়ে হঠাৎ ফিরে দেখি যে বিশু-বংশীওয়ালা আমাদের বাঁধা ঝুলনায় দোল দিয়ে সরে পড়েছেন।

প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। পাশেই অঞ্জলিকে নিতান্ত কাছে পেয়ে বিশ্বনাথকে মনে মনে শতকোটি নিবেদন জানিয়ে ধন্যবাদ দিলাম। দুজনেই থেমে গেছি এক অফুরন্ত নীরবতা। কেমন যেন অস্বস্তি মনে হচ্ছে। এই দুর্নিবার শূন্যতার মাঝেই অতনুর শর এমনি কত যুগলকেই না শরবিদ্ধ করে প্রেমবিরহের সখাদ সলিলে ডুবিয়ে মেরেছেন!

শ্রীমান মদনদেবকে সে অবসর না দিয়ে অঞ্জলিকে প্রশ্ন করি—জানো অঞ্জলি রবীন্দ্রনাথ এ গানখানি কোথায় রচনা করেছিলেন?

ও চোখদুটো বিস্তার করে বলে—না, জানি না তো।

আমি বলি—রাশিয়ায়। একটি ভালো স্প্রিং কাউচের—ভেলভেটে মোড়া গাড়িতে বসিয়ে ষোল ষোলটা ঘোড়ায় টানা সুসজ্জিত রথে চড়িয়ে রুশ অধিবাসীরা কবিকে আতিথ্য দেখিয়ে মস্কো শহরে নিয়ে চলেছিলেন। পথের দোলনে কাউচে দোলা লেগেছিল সেদিন, সঙ্গে সঙ্গে কবির মনেও দোলা লেগেছিল এবং সে দোলানির মর্মগাথাটুকুই হচ্ছে কবির এই কয়েকটি ছত্র। কাউচের দোলাটুকু ছিল যদিও কঠিন বাস্তব কিন্তু কবির লেখনীটুকু কত যে তরুণতন্বীর মনে দোল দিয়ে যায়·

অঞ্জলির চোখদুটো যেন আরো বড় হয়ে উঠেছে। বলে—ও, তাই বুঝি!

তারপর একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে থেকে বলে—আমি তো দেখছি আপনিও কম কবি নন। নইলে এইটুকু এইভাবে এক তন্বীর চোখের সামনে তুলে ধরতে পারতেন?

—ও, তাই নাকি!—মনে মনে রেগে গেছি।

ও খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে—অর্থাৎ প্রেমিক। প্রেমিক না হলে

কেউ কি বলতে পারে? আচ্ছা, বলুন তো, আপনি প্রেমে পড়েছেন? আপনি প্রেম করতে জানেন?

আমি হতবিস্ময়ে ওর মুখের পানে চেয়ে থাকি। ভাবি এ কী নির্লজ্জ প্রশ্ন অঞ্জলি করছে! একটি অনূঢ়া অবলীলাক্রমে জিজ্ঞেস করছে এক নওজোয়ানকে যে সে প্রেমে পড়েছে কি না—সে প্রেম করতে জানে কি না।

ধৃষ্টতা—

নইলে ঠাট্টা করছে?···বা যা জিজ্ঞাসা করছে তা ও অভিধান থেকে সংকলন করেছে, নয়ত কোনো নাটক-নভেলের অভিনয় দেখে মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে ও বলে—কী, চুপ করে রইলেন যে?

আমার দৃষ্টি ওর মুখের পানে নিবদ্ধ···

ও বলে—ও কি, আমার মুখের পানে অমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন? দেখবেন যেন আমার প্রেমেই না পড়ে যান।

আমি হতচকিত।···ভাবতেও পারছি না যে অঞ্জলি এত বাচাল হতে পারে।

মৃদু হেসে উত্তর দিই—অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেলেছো তাই ভাবছিলাম কোন্‌টির উত্তর দিই। যাক—একটা একটা করেই উত্তর দিচ্ছি শোনো। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যদি বলি—হ্যাঁ পড়েছি, পড়ে হাত পা ভেঙে জগন্নাথ হয়ে বসে আছি, তাই অভগ্ন হৃদয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে শুধু জুলজুল করে চেয়ে আছি আর অপর প্রেমিকদের ভাঙা-গড়া ওঠা-নামা লক্ষ্য করে চলেছি···

ও খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়লো। তারপর সামলে নিয়ে বলে—যাক তবু হৃদয়টা ভাঙা পড়েনি। কাজেই এইবার অভগ্ন হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে আমার বাকী প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে ফেলুন।

একটু চুপ করে থেকে বলি—তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে যদি বলি—জানি।

ও ঠোঁট উলটে উত্তর দেয়—কচু জানেন! বলুন দেখি প্রেম করতে গেলে কি কি করতে হয়?

ওর কথা শুনে ভাবি—এ কি ওর ছেলেমানুষি, না পাগলামি···না বাচালের অত্যুক্তি···

বলি—তুমিই বল!

উত্তরে বলে—সে পরে বলবো'খন। তবে বলে বলে প্রেম শেখানো যায় না···

আমি হেসে বলি—যদি হাত পা বুক সব ক'টাকেই গুঁড়ো করে দিই···

অঞ্জলি কেমন একটা করুণার চোখে চেয়ে নিয়ে উত্তর দেয়—তাতে অথর্ব হয়ে নিজেই পড়ে পড়ে কাতরাবেন, অপর পক্ষের মন জয় করা হবে না।

আমি হাসলাম। বললাম—হেরে গেছি। এবার যদি বলি, জানি না···

চট্ করে উত্তর দিল—তবে শিখুন।

বলি—কার কাছে? তোমার···

কথা কেটে জবাব দেয়—আমার সাধ্যি কি যে আপনার মত গুণী মানীকে প্রেম শেখাবো।···তবে পুরুষের প্রেম · এক ভ্রমরের ফুলবিলাস মাত্র!

চমকে উঠি অঞ্জলির কথা শুনে। তবে অঞ্জলি তো পাগল নয়···বাচাল নয়·· ছেলেমানুষ নয়! বুঝলাম অন্তরে অন্তরে যে ও-ও প্রেম বোঝে।

বললাম—আর নারীর?

ও হেসে হেসে বলে—এক হতে অন্য—অন্য হতে নিত্য নতুনের অভিসারে নব নব যাত্রা নারীধর্ম নয়!

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলি—এসব পুরাতনী ধুলোপড়া পাতার আবর্জনার মধ্যে পাওয়া যায় বটে তবে এ নিতান্তই অর্থহীন···

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি। মনে হলো কোথায় যেন ওর পুরাতন সংস্কারে আঘাত করেছি। ও কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়—পুরুষের ধর্মও অর্থহীন···

আমি বলি—কিসে?

উত্তর দেয়—ঐ এক-নারী প্রীতি—

আশ্চর্য হয়ে বলি—সে কি! ফুলবিলাস দোষে এই যে ভ্রমরের দলকে গাল দিচ্ছিলে।

জোর গলায় উত্তর পেলাম—দিচ্ছিলামই তো। তা বলে পুরুষ স্ত্রীর আঁচলের তলায় তার অফুরন্ত প্রেম লুকিয়ে ছুপিয়ে বসে থাকবে এ কথাও তো আমি বলিনি।

অঞ্জলির উল্টোপাল্টা সমস্যা সমাধানের মন্তব্য শুনে মনে হলো ও প্রেমের কিছুই বোঝে না· ·শুধু পুরাতন সংস্কারের চাপে নতুন সংস্কারগুলোকে কাটিয়ে ওঠার এটা একটা প্রয়াস মাত্র। তাই ঊর্ণনাভের মত নিজের জালে নিজেকেই জড়িয়ে ফেলে রুদ্ধ হাহাকার করে মরছে।

চুপ করে থেকে এবার বলি—তুমি ক'টা প্রেমে পড়েছো?

সেই খিলখিল করে হাসি। বলে—এক গণ্ডা…

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করি—গণ্ডার পরিজন ?

হাসতে হাসতে উত্তর দেয়—আমি অর্থাৎ নিজে, মা, বিশুবাবু আর আপনি।

এমন মুক্তকণ্ঠে প্রেম-পরিজনের নাম উচ্চারণ করা কোনো নারীরই রসিকতা ছাড়া যে আর কিছু হতে পারে না সেটা সুনিশ্চিত করে ফেললাম। মনটা কিছুটা দমে গেল। তবু মুখে হাসির রেখা টেনে বললাম—তোমার তো গণ্ডা পুরো। তবে আর ভ্রমরের ফুলবিলাসকে অভিশাপ দিচ্ছিলে কেন ?

অঞ্জলির সেই হাসি…বলে—শুনুন মশাই, মা আর নিজেকে ছাড়া এখনও দু'দুজন বাকী রইলেন…অথচ নারীধর্ম একমুখী।

বললাম—তোমার ধাঁধার উত্তর এবার অত্যন্ত সরল হয়ে এসেছে কারণ বিশুবাবু বিবাহিত··

পাগলের মত আবার সেই হাসি…

ওর হাসি দেখে আমিও হেসে ফেললাম।

ও বললো—ওই তো বলছিলাম—এক-নারী প্রীতিও পুরুষের ধর্ম নয়…

উত্তরে বলি—ও সমস্যার সমাধান তবে বিশু আর আমার হাতেই ছেড়ে দাও।

অঞ্জলি হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উত্তর দিল—সে তো দুজনে দুজনে বোঝাপড়া কিন্তু আমার মনের সমস্যা…?…শ্যাম রাখি না কুল রাখি !

এবার আমি হেসে উঠি। বলি—দেখো অঞ্জলি, তোমায় আমি বোকা ভেবেছিলাম কিন্তু সত্যিই তোমার চেয়ে চালাক মেয়ে আমি জীবনে পাইনি। তাই তোমায় সাহস দিয়ে বলি—তোমার যাকে মনে ধরবে সেই তোমাকে অনুগমন করবে কথা দিলাম…কিন্তু হঠাৎ বংশীওয়ালা আমাদের মধ্যে থেকে উধাও হয়ে সে সমস্যারও সমাধান ঘটিয়ে তার শেষ মতবাদ ব্যক্ত করে গেছে …অতএব,—

এবার অঞ্জলি থতমত খেয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। বলে—যান্—না না… আপনি বড় দুষ্ট…

চলে যায় পাহাড়ের অন্তরালে…

আমি ওকে অনুসরণ না করে, চুপটি করে বসে ওরই কথাগুলোর পুনর্বিশ্লেষণ করছিলাম।

উনিশ

সূর্যাস্ত দেখে আমরা গৈবীনাথ ছাড়লাম।

বিশু সদলে ডাউন ট্রেন ধরে ভাগলপুরেই ফিরে গেল। আমি কিন্তু নিমন্ত্রণ এড়াতে পারলাম না।

*   *   *

ট্রেন এসে কিউলে দাঁড়ালো। আমি নামবার জন্য প্রস্তুত হই। রানীমা হেসে বলেন—এখানে আমরা নামবো না, আমাদের স্টেশন লক্ষ্মীসরাই।

লক্ষ্মীসরাই স্টেশনের দক্ষিণ গা বেয়েই চলেছে কিউল নদী। এর পুরাতনী নাম ছিল 'কেবল নদী'। এরই খরস্রোতের বুকে দেশী বজরায় চড়ে রানীমার গ্রাম ব ভিটেতে পৌঁছতে হয়।

রাত তখন প্রায় সাড়ে সাতটা কি আটটা। স্টেশনে নেমে এমনিতর এক বজরায় আশ্রয় নেওয়া হলো। পারি-পার্শ্বিকের আতিথ্যে বুঝলাম যে রানীমা এ অঞ্চলের বহুপরিজনবেষ্টিতা মাননীয়া শ্রদ্ধার্হা। কাজেই তাঁর সঙ্গের সহযাত্রী হয়ে আমারও খাতিরদাবী কম হলো না। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রানীমা হেসে বলেন—ও আমার পথে-কুড়োনো ধর্মবেটা।

ধীরে ধীরে বজরা কিউল নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে পশ্চিম কিনার ঘেঁষে চলেছে।

চাঁদ উঠেছিল…

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে পারের তটরেখা অস্পষ্ট। পারের ঘুমন্ত গ্রামগুলোর অস্তিত্বটুকু এক গাঢ় স্বপ্নালোকে সমাচ্ছন্ন। তবু ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল এই নতুনের সমাবেশ তাই বাইরের খোলা জায়গাটায় একলাটি চুপ করে বসে ছিলাম।

রানীমা বলেন—বাইরে বসো না বাবা হিম লাগবে।

উঠে এসে বজরার ঘরে প্রবেশ করলাম। ঢুকে দেখলাম একটা কাপড় ভাঁজ করে খাওয়ার আসন পাতা হয়েছে, আর রানীমা টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবার দেবার আয়োজন করছেন। অঞ্জলি আর আমি, দুজনের খাবার গুছিয়ে দিতে দিতে রানীমা বলেন—কিছু খেয়ে নাও, অনেকক্ষণ আগে সেই গৈবীনাথে খেয়েছো—নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে?

আমি কেমন দুজনের মাঝে একলা পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেছি। কোথা থেকে যেন দারুণ 'কিন্তু' এসে নিজেকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। ভাবছি—এ নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করা আমার উচিত হলো কি না।

চুপটি করে মুখ বুজিয়ে খেতে দেখে রানীমা বলেন—কী, এখানে এসে অমন চুপ হয়ে গেলে কেন? বন্ধুদের ছেড়ে বড় একা একা লাগছে?

অঞ্জলির চোখে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে মুচকে হেসে বলে ওঠে—ভয় করছে না তো?

—ভয়?

—হ্যাঁ—তাইতো দেখছি। ভাবছেন মা মেয়েতে মিলে বুঝি কোন্ বনবাসেই না নিয়ে চলেছি।...

কথা শেষ করে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে অঞ্জলি।

রানীমা চোখের ধমক দিয়ে বলে ওঠেন—আঃ কি হচ্ছে অঞ্জলি -ঠিক হয়ে বসো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলেন—দিনের বেলা হলে সব দেখতে পেতে। চাঁদটাও ভাল করে ওঠেনি নইলে তোমায় দেখাতাম আমাদের 'কেবল' গ্রামের অপর পারে অর্থাৎ ওপারে আমাদের পূবপুরুষদের 'পুরানো রাজার গড়'। ওর ভগ্নস্তূপ আজও বর্তমান। সবাই বলে ওটা বৌদ্ধদের 'বিদার্বন স্তূপ'—পাশে তার বৌদ্ধ মঠের ভগ্নাংশ। কিন্তু ওঁর মুখে শুনতাম বুদ্ধযুগের পর আমাদের পূর্বপুরুষরা ঐ প্রাসাদে বাস করতেন তাই আজকালের লোক ওকে বলে 'পুরানো রাজার গড়'। একদিন দিনের বেলায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবো তোমায়।

পুরাতনী গল্প শুনতে বরাবরই ভাল লাগে। বৌদ্ধ মঠের খবর পেয়ে জিজ্ঞাসা করি—এসব অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রসার ছিল নাকি?

উনি উত্তর দেন—এর সব জায়গাটা ঘিরে আজও বৌদ্ধ ভগ্নস্তূপে ভরতি। আমাদের কেবল গ্রামের পশ্চিমাংশে রয়েছে 'সংসারপুখুর দিঘি' আর তার উত্তরে আরও একটা মস্ত দিঘি। সেই দিঘির পাড়ে একটা বৌদ্ধ মন্দিরের ভিত্তি আজও বর্তমান। ওর মধ্যে বৌদ্ধ যুবার প্রতিকৃতি ছিল...শুনেছি তিনিই নাকি ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। তিনিই নাকি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের একটি পাথরের প্রতিমা। আর ওখানকার বাগানবাড়িতে আজও রয়েছে একটা ছোট বৌদ্ধ মন্দির, তার মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি আজও বিরাজ করছেন। এই 'বাগান আজও আমাদের খাসে রয়েছে। উনি জীবনের বেশিরভাগই

ক্ষেতিবাড়িতে কাটাতেন। তার নাম কোবয় গ্রাম। কেবল আর কোবয় দুটি পাশাপাশি গ্রাম। কোবয় গ্রামে বাস করার সময় ওঁর ছেলেপিলে হয়নি বলে, নিজে হাতে সেখানে বসিয়েছিলেন মা-ষষ্ঠীর এক মন্দির। সে মন্দিরের মূর্তি হচ্ছেন গণেশজননী। গণেশকে কোলে করে মা ভবানীদেবী স্বয়ং বিরাজ করছেন। আজ আমাদের সমস্ত উৎসব পার্বণে ওঁর পুজো দিয়ে তবেই কাজ হয়।

রানীমার মুখে পুরাতন ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে নিজেকে হারিয়ে বসেছি।

অঞ্জলি বললো—আমরা ওপার থেকে এপারে কেন চলে এলাম বললে না মা?

রানীমা বলেন—হ্যাঁ—সে এক কাহিনী···। আমাদের পূর্বপুরুষ ওই পুরানো রাজার গড়েই বাস করতেন। ঐ যে বিদার্বন স্তূপ ওর মাথায় একটা মস্তবড় গর্ত খুঁজে বার করলেন এক সাহেব। তখনও ওঁর ঠাকুর্দা বেঁচে···

আমি বলি—সাহেব?···কে বলুন তো···

রানীমা একটু ভেবে বলেন—কি জানি বাবা তাঁর নামটা কেমন স্মরণে আসছে না—তবে কেনিং না কি একটা নাম।

আমি বলি—লর্ড কানিংহাম।

উনি বলেন—তা হবে বা। মানুষ-সমান গর্তের মধ্যে থেকে পাওয়া গেল একটা কাঠের গাছকৌটো আর শ্রীবুদ্ধের প্রতিমূর্তি। সাহেব সেই গাছকৌটো খুলে দেখতে পেলেন তার মধ্যে রাখা রয়েছে একটা সোনার বাক্স। বাক্সের ঢাকনি খুলে পাওয়া গেল একটি রূপার কৌটো—তার মধ্যে রাখা ছিল মানুষের দাঁত, অস্থি আর একটি স্ফটিকের মালা। সেই অবধি ওঁরা গড় ছেড়ে এপারে এসে বসতি বাঁধলেন। এপার ওপার সবই তো ছিল ওঁদের জমিদারি।

আমি জিজ্ঞাসা করি—এ সমস্তই আপনার জমিদারি?

উনি স্মিত হেসে উত্তর দেন—তাইতো জানি বাবা—আজও তো প্রজারা রানীমা বলে খাজনা দিয়ে যাচ্ছে। সবই মা-ভবানীর কৃপা···

নৌকো ঘাটে ভিড়েছে।

আমরা একটি ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে উঠে বসলাম।

রানীমা বলেন—তোমাকে নিয়ে বাবা নিজেদের গাঁয়েই চলেছি। এসব জায়গা দেখবারও বটে আর খাওয়া-দাওয়ার সুখও বটে। নইলে লক্ষ্মীসরাইয়ের বাড়িতে উঠলে খালি নোংরা শহর দেখো আর চালানী শুকনো তরিতরকারি খাও।

হাসতে লাগলেন।

অঞ্জলি যোগ দিয়ে বলে—পায়ে শিকল পরা টিয়াপাখির দাঁড়ে বসে ছোলা খাওয়া···

নিজে বলে নিজেই হেসে কুটিপাটি।

গরুর গাড়ি চলেছে—কাঁকরসঙ্কুল বন্ধুর পথ। চাকাগুলো থেকে একটা একঘেয়ে গোঙানি স্বর বেরুচ্ছে আর তার সঙ্গে অপরিচ্ছন্ন পথের পাথরগুলো মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে শরীরের মাঝে দোলানির আমেজ সৃষ্টি করছে। সেই আমেজের অন্তরালে অঞ্জলির নরম স্পর্শ গায়ে বার বার অনুভব করছি—মনে হচ্ছে এ পথ আমার অনন্ত হোক।···

বাড়ি এসে যখন পৌঁছলাম তখন রাত দশটা বেজে গেছে।

সামনেই রাজবাড়ি। পুরাতন ইট কাঠে খাড়া করা আকাশছোঁয়া বাড়ি। রাতের ক্ষীণ চন্দ্রালোকে যেন এক প্রকাণ্ড ভৌতিক পুরী বলেই মনে হচ্ছিল।

রানীমার কণ্ঠে হঠাৎ টানা স্বরে 'ভৈ—র—ব' ডাকে যেন সারা অঙ্গন চমকে উঠলো। হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে বড় বড় খিলানওয়ালা পঁয়ত্রিশ ফুট মোটা দেওয়ালগুলোয় যেন সাড়া জাগলো···সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল লোকজনের ছুটোপাটি ছুটোছুটি।

রানীমা উইদাউট নোটিশে প্রাসাদে প্রবেশ করেছেন·· সবাই অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুত হতে শশব্যস্ত।

মা আর মেয়ের সামান্য জীবনযাত্রার পেছনে এতগুলো লোক কোন্ নিভৃতের একান্তে অপেক্ষমাণ ছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম। দেখতে দেখতে দু'চারটা ডে-লাইট জ্বলে উঠে অন্ধ-বাড়িটাকে আলোকোজ্জ্বল করে তুললো।

আমায় নিয়ে রানীমা সেকেলে সিঁড়ি বেয়ে উপর-তলায় গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁর আগে পিছে কর্মচারী। রানীমাকে পথ দেখিয়ে আলো ধরে এগিয়ে চলেছে। হয়ত তাদের ধারণা ছিল বাড়ির বৈঠকমহলের কোনো এক ঘরে আমার স্থান হবে। তাই সিঁড়ির মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই তারা থমকে দাঁড়ালো।

সিঁড়িটা মাঝপথ থেকে দু'ভাগ হয়ে এক সার বারমহলের দিকে, অপর ভাগ অন্দরমহলের দিকে উঠে গেছে। এই মহলায় এসে রানীমা কিন্তু আমায় বললেন—এদিকটা দিয়ে এসো বাবা!

সিঁড়ি এনে পৌঁছে দিল বারান্দার উপর। আলো পড়ে দু'চারটা চামচিকের নিদ্রাভঙ্গ হলো তাই তারা আপনমনে অন্ধ চোখে ঘুরপাক খেতে থাকে।

অন্দরের যে ঘরটিতে আমায় নিয়ে পৌঁছলেন সেটি সর্বতোভাবে সুসজ্জিত। কিন্তু পুরানো দিনের আসবাব আর অতীতের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে কেমন যেন আতঙ্কের সমাবেশ গড়ে তুলেছে। রানীমা বললেন—এটা কর্তার খাস কামরা ছিল, এটাতেই তুমি থাকবে। পাশেই আমার আর অঞ্জলির ঘর। রাত্রে দরকার হলে দরজায় ধাক্কা দিলেই সাড়া পাবে।

আমায় পৌঁছে দিয়ে রানীমা দালান বেয়ে পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন। আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে ঘরটিকে পর্যবেক্ষণ করছি এমন সময় ভৈরব এসে তেলের ল্যাণ্টার্নটা খুলে নিয়ে সেখানে একটা পেট্রোম্যাক্স টাঙিয়ে দিয়ে গেল। তমসাচ্ছন্ন আতঙ্কতাড়িত ঘরের যেন শ্রী ফিরলো। উজ্জ্বল আলোতে দেওয়ালের একটি অয়েলপেন্টি-এর উপর নজর পড়লো। এক অশীতি বছরের বৃদ্ধের তৈল-প্রতিকৃতি ·নির্বাক চেয়ে আছেন তাঁর নতুন অতিথির দিকে। বৃদ্ধের চোখের চাহনিতে এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি···দেখলে মনে হয় যে ওই চোখে তিনি প্রজাশাসন করেছিলেন—তা রক্তবর্ণ করে নয় বরং কুটচাহনির ঐ তীক্ষ্ণতার অন্তরালে।

ভৈরব এসে পাশের বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে বললো—বালতিতে গরম জল রাখা আছে, দরকার হয় স্নান করে নিতে পারেন।

মাঝের দরজাটা খুলে রানীমা নিজে হাতে করে একটা পায়জামা আর একটা ড্রেসিং গাউন আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন—কর্তার রাখা ছিল তাই এনে দিলাম। তুমি তো একবস্ত্রে চলে এসেছো···তা অসুবিধা হবে না···সবই আছে।

আমি মৃদু হেসে জিনিসপত্তর নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম।

আধঘণ্টার মধ্যে যা খাবার তৈরী হলো তা হঠাৎ নতুন জায়গায় আমার পক্ষে প্রচুর। রাত্রের আহারাদি সমাপিত হলো রানীমার সামনে বসেই। খাচ্ছিলাম আমি আর অঞ্জলি। অঞ্জলি বেশী কথা বলছিল না। ঘুমে ওর চোখ বুজে আসছিল। আমি বসে বসে লুচি মুখে পুরে রানীমার কাছে সাবেককালের গল্প শুনছিলাম।

একদিন ছিল যখন রানীমা নিজে হাতে ক্ষেতি করা থেকে ধান কাটা ধান ঝাড়া ধান গোলায় তোলা চাল কোটা সবই একহাতে করে গেছেন। কেমন নতুনতর কথা লাগছে। ওঁর কর্তা বলতেন—নিজে হাতে সবটা না করলে লোকজনদের ফাঁকি ধরা যায় না তাই গিন্নীরই এসব করা উচিত। হাসতে হাসতে বলেন—তাইতো কথায় বলে কত ধানে কত চাল জানা থাকা উচিত।

তার খবরটুকু না জানলে আর আজকের বিরাট জমিজায়দাদের হিসেব নিকেশ কিছু পেতাম ?

অবাক হয়ে সমর্থন জানাই—মনে মনে এই কর্মশক্তিসম্পন্না শ্রীশক্তির স্মরণে প্রণাম জানাই—ভাবি সত্যিই এরাই হচ্ছে প্রকৃত রানী হবার যোগ্যা।

আবার বলেন—তাঁর সময় কত সব লোকজনের আসাযাওয়া খাওয়াদাওয়া—সব একহাতেই করতে হতো। তাছাড়া পালাপার্বণের কথা ছেড়ে দাও বাবা—সে সব কি আর কাজ! সে সব এক একটা যজ্ঞি—নিত্য যজ্ঞি যেন লেগেই আছে।

অঞ্জলি চটপট ক'খানা লুচি ঠুকরে উঠে গেল। উনি বলেন—মেয়ে ঘুমুলে আর কুটোটি মুখে তুলবে না।

আমি হাসি। উঠে পড়ি—

ঘরে ঢুকে দেখি যথাযথ বিছানা প্রস্তুত। দেরি না করে লেপের মধ্যে আশ্রয় নিই। ভৈরব এসে আবার পেট্রোম্যাক্সটা বদলি করে দিয়ে একটা হ্যাঙ্গিং জুয়েল ল্যাম্প ঝুলিয়ে রেখে গেল। ঘরটার আলোর আমেজ ছায়াঘন হয়ে উঠলো···কখন অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছি।

*　　*　　*

ভোরের কাকলিতে ঘুম ভেঙেছে।

আকাশে রং ধরেছে···উঠে বসি। আলোটাকে নিভিয়ে দিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি ওই আবীরমাখা আকাশের দিকে। নীচে তার খরস্রোতা কিউল নদী। ইচ্ছে হলো বাইরে নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। বাইরের বারান্দায় পা বাড়ালাম। বারান্দায় দেখি রানীমা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পুবের রক্তিম লালিমাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। আমায় দেখে বলেন—বাইরে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে, না ?

আমি বলি—একটু ঘুরে আসি না—ঐ নদীটার ধারে ধারে।

উনি হাসেন। বলেন—নদীর পথ যে অনেক দূর···দূর থেকে পাশে বলেই বোধ হয়—তার চেয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরে এসো—তবে সুষি্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসো—ততক্ষণ তোমাদের খাবার তৈরী হয়ে যাবে। তারপর দুধ জলখাবার খেয়ে দুজনে বেড়াতে বেরিও।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বারান্দার পথ ধরি—

উনি বলেন—ওদিকে নয়—বাঁ হাতে সিঁড়ি।

বাইরের দেউড়ি দিয়ে ফটক পার হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার রাজবাড়ির দিকে ফিরে দেখি। বিহারী ধাঁচের পুরাতনী ইমারত—তবে সুদূরপ্রসারিত। তার পাশেই খামারবাড়ি। পাঁচিলঘেরা উঠানে সারি সারি গোলাঘর—একদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। রাজা বা রাজবাড়ি কথাটা এদেশের লোকদের আতিশয্য মাত্র।

…সোজা পথটা ধরে, গুনগুন করতে করতে কখন চলে এসেছি একটা নাতিবর্ধন গাঁয়ের মধ্যে। গাঁয়ের লোকদের নিবদ্ধ দৃষ্টির তাড়নে এক মুহূর্ত স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে, আমি যত দ্রুত এসেছিলাম তত দ্রুতই পেছুতে পেছুতে হঠাৎ বাড়ির সামনের গেটের কাছে উপস্থিত হলাম। কেবলি মনে হচ্ছিল—ওঁরা যেন আমাকে 'হংসমধ্যে বক যথা'ই ভেবে বসেছে।

চট্ করে গেট পার হতেই খিলখিল করে হাসি উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে কথা এলো—অমন ঘাবড়ে গিয়ে ঢুকছেন কেন? ভয় পেয়েছেন নাকি?

আমি বলি—ভয়—হ্যাঁ কতকটা তাই বটে! কৈফিয়তের ভয়…

খিলখিল করে হেসে ফেলে অঞ্জলি। বলে—কৈফিয়ত—কিসের কৈফিয়ত?

আমি হেসে উত্তর দিই—এই আমি কেন হঠাৎ এই দেশে এই পথে এই বাড়িতে পদার্পণ করেছি।

অঞ্জলি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে রাগতস্বরে উত্তর দিল—বললেন না কেন তোমাদের দেশের রানীমা আমায় হাঁটু ধরে ডেকে এনেছেন—আমি রাজবাড়ির জামাই হবো!

আমি যেন লজ্জায় মরে গেলাম। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি অঞ্জলির মুখের পানে। ও কিন্তু খিলখিল করে হেসে বলে ওঠে—থাক্ আর রাগ দেখাতে হবে না—চলুন ওপরে চলুন—মা আপনার জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে আছেন।

কুড়ি

অঞ্জলির সব লুকোচুরি জারিজুরি হঠাৎ ধরা পড়ে গেল।

সত্যিই তার আমাকে ভাল লেগেছে—

তার হঠাৎ হঠাৎ অপ্রস্তুতকরা কথাগুলো দিয়ে যতই আমায় বিদ্ধ করে নিজেকে চেপে রাখবার চেষ্টা করুক বা ন্যাকামির চূড়ান্ত করে বোকা বোকা চাহনি আর খিলখিলে হাসির আবরণে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা করুক—শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে গেল।

সকালের খাওয়াদাওয়া সাঙ্গ করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম 'সংসারপুখুর' দিঘি আর ওদের বাগানবাড়ি দেখার আশায়। আমাদের সঙ্গে ছিল ওদের সাবেক কালের ভৃত্য ভৈরব। তাকে তিন কথায় তুড়ি মেরে বিদায় করে দিল অঞ্জলি।

বললো—ভৈরবদার কি ভীমরতি হলো যে আমাদের সঙ্গে এলে?

ভৈরব অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে উত্তর দেয়—মা যে বললেন আসতে—

অঞ্জলি বলে—বেশ! এসেছো তো চুপটি করে বসে থাকো এই সংসার-পুখুরের পাড়ে। আমি ওঁকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসছি নইলে আজই রাত্রে তো তুমি মরবে। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোদে রোদে ঘুরলে কি আর রক্ষে আছে! রাত্রে হাঁপের টানে আর বিছানা ছেড়ে সাত দিন উঠতে পারবে না।

ভৈরবের হাঁপের টান। সে আর আগের মত দৌড়াদৌড়ি রোদে ঘোরাফেরা করতে পারে না। জোর করে করতে গেলেই বিছানা নেয় একথা অঞ্জলি জানে, আর অঞ্জলির মাও জানেন।

তবু ভৈরবকে আমাদের সঙ্গে পাঠানোর হেতু আমি বুঝি।

কিন্তু চালাক মেয়েটি এককথায় ভৈরবকে সংসারপুখুর দিঘির ধারে বসিয়ে দিল। আমায় নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলে—যত সব বুড়োহাবড়ার দল—ঘটে এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। যেন ওঁদের আর ছেলেবয়স ছিল না। কোথায় দুজনে প্রাণখুলে ঘুরে বেড়াব, দুটো মনের কথা কইব—না পেছন পেছন গার্ড!

আমি হেসে ফেলি, বলি—তা বাড়িতে থেকেই ভৈরবকে আসতে মানা করে দিলেই তো হতো—

হতো?···আপনিও তো দেখছি আস্ত···থাক—বলে থেমে যায় অঞ্জলি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—মা কি তাহলে শুনতেন? হয়ত নিজেই ঘটঘট করে আমাদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে দিতেন।···তারপর আবার চুপ করে যায়। আরও একটু দূরে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বলে—আচ্ছা, আপনি অত বোকা কেন?

আমি বোকা?···আমায় পর্যন্ত বোকা বানাতে চায় অঞ্জলি? বলি—কেন?

ও হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে—নয়ত কি? বা হয়ত আসলে আপনি বোকা নন—কিন্তু না জানা না-শোনা এক অপরিচিতের বাড়ি এককথায় নিমন্ত্রণ রাখতে চলে এলেন!

চমকে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি ওর মুখের পানে।

অঞ্জলি বলে কি!

ভেতরটা গুমরে ওঠে। পৌরুষে ঘা দিয়েছে অঞ্জলি। চুপ করে থাকি।

অঞ্জলি যেন আমার নিশ্চুপ অস্বস্তি অনুভব করে, বলে—কি, রাগ হলো তো?

—না ভাবছিলাম একটু। বল ত ফিরেই যাই—আমি বলি।

অপ্রস্তুত হয়েছে অঞ্জলি। ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে—চলে যাবেন কেন? চলে গেলে—

মা রাগ করবেন—কি বল অঞ্জলি?

না না—তা নয়।

তারপর কেমন চিন্তিতমনে কী যেন ভাবে।

হঠাৎ আমার হাতদুটি ধরে অপরাধীর মত বলে ওঠে—না না—আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে পারব না—

ও যেন উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। ওর দুটি হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে বলি—অমন করলে আমিও যাবো না।

ও নিজেকে সামলে নেয়।

মা-ভবানীর মন্দিরচত্বরে এসে পৌঁছে গেছি।

মা-ভবানীর গণেশজননী রূপ দেখাতে দেখাতে অঞ্জলি গল্প করে বলে—মার মুখে শুনেছি যে বাবা, মা'র আসার আগেও আর তিনটি বিবাহ করেছিলেন।

তবে তাঁরা সবাই গত আর কারো কোনো ছেলেপিলেও হয়নি বলে বাবার আক্ষেপের সীমা ছিল না। আমার মা তাঁর চতুর্থপক্ষের স্ত্রী তাই মা'তে আর বাবাতে বয়েসের অনেক তফাত। তবু এই গণেশজননীর কৃপাদৃষ্টিতে আমি জন্মেছিলাম। বাবা মা'র অন্তরের নিষ্ঠাঅর্ঘ্য এনে গণেশজননীর চরণে অঞ্জলি দিয়ে আমার নাম রাখলেন অঞ্জলি। মা বলেন—দেবতার অর্ঘ্যে কারো অধিকার থাকে না—এই দেবীর আদেশ। তাই দেবীর চরণে উৎসর্গিত আমি ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। এতবার এত রকমে একথা শুনেছি যে মনের খতে এ-কথাটুকু যেন স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়ে গেছে। আমি মা-ভবানীর সেবাদাসী এই সংস্কারটুকু মা আমার মনে বাল্যকাল থেকেই গেঁথে দিয়েছেন, যাতে বিবাহে আমার রুচি না আসে।

আর ঐ ভৈরবদা—

ও-ও চায় না আমার কোনোদিন কারো সাথে বিয়ে হোক। কথায় কথায় ও বলে—তুমি দিদিমণি মা-ভবানীর উৎসর্গিতা—তোমার বিবাহে মা-ভবানীর রোষাগ্নি জ্বলে উঠবে। তার চেয়ে মায়ের সেবায়েত হয়ে এখানকার রানী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হও।

অঞ্জলির কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি যেন এক উপন্যাস যুগে চলে গেছি—অবাক হয়ে ভাবছি—এ যুগেও বিশ্বাস করে দেবদাসী দেবোৎসর্গিতা এইসব কথাগুলো?

স্বকর্ণে শুনছি—স্বচক্ষে দেখছি—

তবে? না বোঝবার এতে আছে কি? কিন্তু এতে আমার বিচলিত হবার কিছু নেই কারণ আমিও তো চাই এমনি নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত এক দয়িত! যাকে স্বামীর আসনে অনায়াসে বসানো যায়। তাই অঞ্জলির সম্বন্ধে যা জানলাম তা আমার কাছে সম্পদ হয়ে মনের খাজাঞ্চিখানায় জমা হয়ে রইল।

আমি বলি—বেশ তো দেবতার নৈবেদ্য দেবতারই থাক। অনধিকার দখল আমিও করতে চাই না—আর কারোও করা উচিত নয়।

ও যেন কেমন ফ্যাকাশে মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ওর মুখের হাসি ম্লান হয়ে ওঠে—উদ্দীপনা নিভে যায়।

আমরা মন্দির চত্বরে এসে বসেছি।

এতক্ষণ কেউ আর কথা বলিনি।

ও নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—দেবীর সামনে বসে কি মনে হয় জানেন?

আমি উত্তরের প্রত্যাশায় ওরই মুখের পানে চেয়ে রই।

ও বলে—ওটা পাথরে গড়া একটা কঠিন শিলাপ্রতিমা। রক্তমাংসে গড়া দেহের প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা ও রাখে না, বোঝে না তাই অমনধারা আদেশ নির্বিচারে জাহির করে বসে থাকে।··

আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি—দেবীকে আদেশ জারি করতে স্বকর্ণে কেউ শুনেছিলেন কি?

—মাকে আমিও একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—পাথরে গড়া দেবদেবীদের মানুষের মত অনুভূতি আছে কি না—তাঁদের কি আমাদেরই মত সুখে-দুঃখে কামনা-বাসনাগুলোকে উপলব্ধি করবার মত শক্তি আছে? মা বলেছিলেন—দূর পাগলি! তা কি সম্ভব—ওঁরা ওসবের বাইরে—ওঁরা সুখ-দুঃখ কামনা-বাসনারহিত। উত্তরে আমি আবার প্রশ্ন করেছিলাম—তবে মানুষের সুখ-দুঃখ ভাঙা গড়া ভূত-ভবিষ্যের উপরে হঠাৎ আদেশ জারি করে বসেন কোন অধিকারে?

মা যেন মুষড়ে যান। কথার উত্তর দিতে না পেরে নিশ্চুপ আমার মুখের পানে চেয়ে দেখতেন প্রায় মাসাবধি। তারপর উঠে পড়ে লেগেছেন আমার জন্যে সুপাত্র খুঁজে বার করতে।

অঞ্জলির বুকে কোথায় ব্যথা আমি নিমেষেই বুঝে ফেলি। এ শুধু কুমারী-প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা থেকে নারীত্বের ব্যক্ত অবস্থা পাবার চিরন্তনী আক্ষেপ··· তাই এ আক্ষেপটুকু তার অধিকার। এ অধিকার সময়মত না পেলে হয়ে ওঠে দুর্বার—তখন আর তার গতিরোধ করা যায় না—দেবীর প্রত্যাদেশও তাকে একদিন রুখে দাঁড়াতে পারবে না ভেবেই রানীমা হয়ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

আমি মনে মনে অনেকক্ষণ আলোচনা করে বলে ফেলি—এ বিয়েতে তোমার মতামত কি জানতে পারি অঞ্জলি?

অঞ্জলি আবার খিলখিল করে হেসে নিজেকে মানিয়ে নিতে চায়। বলে—আদেশ-প্রত্যাদেশের আমি কোনো যুক্তিই খুঁজে পাই না, তাকে মেনে চলতে মন আমার চায় না। কিন্তু বিয়ের পর যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় তবে মনে হবে দেবীর প্রত্যাদেশ অমান্য করেই আমার এ দুর্গতি। অথচ, আবার যদি না কিছু ঘটে তাহলেও এক দুঃসহ আতঙ্ক নিয়ে বাঁধা-ঘরে সারাজীবন দেবীর অভিশাপের দিন গুনতে হবে। তাতে আমিও সুখী হতে পারব না,

আবার যাঁকে আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবো তিনিও পারবেন না।
তাই ত সমস্যা—

আমি উত্তর দিতে পারি না—

ভাবি এ সমস্যার সমাধান করা বাইরের লোকের শক্তির বাইরে। এ সমস্যার সমাধান কেবল অঞ্জলির নিজের দৃঢ় মনের সুদৃঢ় সংকল্প!

আমি ধীরে ধীরে বলি—এ সমস্যার সমাধানের সুপরামর্শ দেবার লোক তুমি চট্ করে পাবে না অঞ্জলি! তবে আমার মনে হয় তোমার নিজেরই নির্ভীক নিষ্ঠা তোমার মনের এ দুর্বলতাকে জয় করতে পারে।

ও আমার দিকে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে। মনে হয় সে দৃষ্টি এক অতলান্ত সাগরতলের যেন তল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উঠে পড়া হলো।

সারাটা পথ অঞ্জলি আর একটা কথাও বলেনি।

- খেয়েদেয়ে দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—হঠাৎ,···

দেবীর প্রত্যাদেশ আর প্রকৃতির নির্দেশ—কোন্‌টা কার চেয়ে বড় এই নিয়ে আমার মাথায় এক জটিল সমস্যার জট পাকিয়ে উঠলো। বার বার মনে হতে লাগলো—দেবী বলতে মানুষের কাছে তো প্রকৃতিই পরমা দেবী যাঁকে অনুসরণ করে মানুষ দুঃখ-সুখকে অতিক্রম করে চলে যায়। সেই পরমা প্রকৃতির নির্দেশ তো দেবীর প্রত্যাদেশের চেয়ে কম নয়! কুসংস্কারজড়িত মানুষের দুর্বল মনের ক্ষণিক নির্দেশটুকু দেবীর প্রত্যাদেশের পর্যায় তুলে ধরে মানুষকে শুধু শশকের গর্তে মুখ লুকিয়ে নিজেকে অদৃশ্য ভাবা ছাড়া আর কিছুই নয়। সংসারে কোথায় কে কি মহাপাপ করে লৌহকপাটের অন্তরালে সে পাপ সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখে পুরুষানুক্রমে জারি করেছে দেবীর অনাহূত প্রত্যাদেশ বলে—এ তথ্যও মানুষের ইতিহাসে কম পাওয়া যায় না।

অতএব—?

এক্ষেত্রে তবে তা সুনির্ণয় সাপেক্ষ।

অঞ্জলির জীবনোপাখ্যান আমায় সত্যিই পীড়িত করেছে···অথচ এর সমাধান করতে না পেরে কেমন যেন মনটার মধ্যে খচখচ করতে থাকে। আমার মনে জেগে ওঠে এক ডিটেকটিভি অনুসন্ধিৎসা। মনে হলো এই বিরাট ইট পাথরে গড়া রাজবাড়ির খাঁজে খাঁজে জমে আছে কত না রহস্য—কত না

প্রেমাভিসার—আর তার জন্যে কত না খুনখারাবি। রানীমার মুখে শুনলাম যে ওঁদের পূর্বপুরুষ বৌদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যেরা তো ভিক্ষু, অথচ ভিক্ষু হঠাৎ গৃহী হয়ে জমিদারি গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ভবানী উপাসক হয়ে পড়লেন? এর অন্তরালে কোথায় যেন রহস্য লুকিয়ে আছে!

এ রহস্যের তথ্য সংগ্রহ করতে হলে, এক ওঁদের পুরাতন ভৃত্য ভৈরব আর না হয় স্বয়ং রানীমার কাছ থেকেই সম্ভব। কিন্তু, এদের দুজনের কাছেই আমি নবাগত অতিথি। কাজেই কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে।

উপায় ভেবে চলেছি—

একমাত্র উপায়—এখানে শিকড় গেড়ে বেশ কিছুদিন থাকা এবং সারা গ্রামের প্রবীণদের সঙ্গে ভাব করা। মেলামেশার ফাঁকে ফাঁকে হয়ত বার হয়ে আসতে পারে এর জটিল রহস্যের সূত্র। কাজেই দরকার হলে থাকতেই হবে, তাতে যদি বেচারী অঞ্জলির সমস্যার কিছু সুরাহা হয়।

হঠাৎ রানীমার ডাকে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়।

রানীমা ঘরে ঢুকে এসে বলেন—তিনটা বেজে গেছে—তোমাকে নিয়ে ওপারে বিদাবন স্তূপ দেখিয়ে আনি চলো। চা-টা খেয়ে তৈরী হয়ে নাও—

একুশ

সবে প্রস্তুত হয়েছি এমন সময় জানলা দিয়ে দেখলাম অঞ্জলি কাপড়চোপড় পরে নীচে একটা ডুলিতে চড়ে ভৈরবকে সঙ্গে নিয়ে গেটের বার হয়ে চলে যাচ্ছে।

বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

রানীমা ঘরে ঢুকে আমায় বলেন—কৈ চলো, এরপর আবার বেলা পড়ে আসবে।

আমার মুখের কৌতূহলোদ্দীপ্ত অভিব্যক্তির দিকে চেয়ে রানীমা নিজেই বলেন—অঞ্জলিকে একবার আমার পাশের গাঁয়ের বৃদ্ধ জমিদারের বাড়ি যেতে হলো বিশেষ এক দরকারী কাজে। উনি ছিলেন কর্তার আত্মীয় বন্ধু—আর,—

তাঁর সারা মুখখানা যেন কঠিন হয়ে ওঠে। বলেন—আর আমার পরম শত্রু। সারা জমিদারিটা ওঁর কাছেই টেনে নিতে চান কারণ ওঁর হাতেই রয়েছে

আমাদের মরণকাঠি, আর সে কাঠি কর্তা নিজে হাতে তুলে দিয়ে গেছেন ওই পশুর হাতে।...

এক মিনিট চুপ করে থেকে আবার বলে চলেন—বন্ধুর পরিবারের দুর্গতি দেখতে পারবেন না বলে আমায় আশার বাণী শুনিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন, 'অঞ্জলিকে আমার হাতে সঁপে দিলে তুমি রাজরানীর জায়গায় রাজরানীর মা হয়ে জীবন যাপন করবার সুযোগ পাবে—আর আমিও পুত্রমুখ দেখবো।'

আমি বিস্ময়ে বলে উঠি—বলেন কি! আপনার স্বামীর বন্ধু মানে তো বাহাত্তুরে ঘাটের মড়া। কারণ লোকপরম্পরায় শুনেছি যে আপনাতে আর আপনার স্বামীতে নাকি ত্রিশ বছরের ছোট-বড়।

রানীমা মৃদু হেসে উত্তর দেন—ও, সে খবরও কানে এরই মধ্যে এসে গেছে! এখানে থাকলে বহু খবরই হাওয়ায় উড়তে উড়তে এসে তোমার আশেপাশে ঝরে পড়বে।

আবার দাঁতে দাঁত দিয়ে কেমন কঠিন হয়ে যান। তারপর ধীরে ধীরে বলেন —সবার কাছ থেকে খবর সংগ্রহের চেয়ে আমার কাছ হতে শোনাই তোমার ভাল।·· সংবিতে এসে বলেন—চলো, পথে কথা হবে।

পথে যেতে যেতে হাসতে হাসতে বলেন—অঞ্জলি জোর করে নিজে ওর কাছে ভৈরবকে নিয়ে গেল। বলেছে—আমার সমস্যা আমি নিজেই মেটাবো, তুমি কথা বলো না মা।

আমার মনে হাজার প্রশ্ন জাগে।—কেই বা এই আত্মীয় বন্ধু—তার হাতেই বা কি করে গেল এঁদের মারণাস্ত্র! কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি না। তাই মুখ বুজিয়ে ওঁকে অনুসরণ করি।

নৌকায় যখন উঠলাম তখন সাড়ে চারটা বেজে গেছে। কিউল নদীর পূর্ব তীরে বির্দাবনের বৌদ্ধ স্তূপ—উঁচু ঢিবিটা এপার থেকেই দেখা যাচ্ছে।

রানীমা বললেন—আজকাল কেউ আর বৌদ্ধ যুগের নামে ওই জায়গাটার পরিচিতি দেয় না—এখন ওটা পুরানো রাজার গড়। আমাদের চার পুরুষ আগে যিনি রাজা ছিলেন তাঁর নাম রাজা কন্দর্পনারায়ণ সিংহ। ইনি সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষু থেকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক হয়ে যান। বীরাচারী তান্ত্রিকদের অপভ্রংশটুকুই এঁর জীবনের সম্বল হয়েছিল। জুটেছিল নারী আর কারণ।

বৌদ্ধ স্তূপের বিহার প্রাসাদে বাস করে করে এই সব বৌদ্ধ-বিরুদ্ধাচরণ বৃদ্ধ ভিক্ষু ভাইরা সহ্য করে উঠতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তারপর কন্দর্প সিংহের দুর্ধর্ষ প্রতাপের এলাকা ছেড়ে একে একে চলে যেতে বাধ্য হন।

বীরাচারী ধর্মে তখন নরবলি প্রচলিত। কতক বৌদ্ধ ব্রহ্মচারীকে কন্দর্প সেই যজ্ঞে আহুতি দেন। এর ফলে বা তাঁদের অভিশাপের ফলে কন্দর্প সিংহের বংশ নি'সন্তান হয়ে যায়। অপুত্রক কন্দর্পনারায়ণ তখন ঘোর সংসারী। সুরা আর নারীই তাঁর জীবনেব একমাত্র উপচার। তাঁর বিপুল সম্পত্তির সংরক্ষণে বৃদ্ধবয়সে উৎপাদিত কবলেন এক ক্ষেত্রজ সন্তান। কন্দর্প সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষেত্রজ পুত্র বিজয়নারায়ণই রাজত্বের অধিকারী হয়ে বসেন।...

ইনিও বাপকী বেটা সেপাইকী ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া হয়ে উঠলেন। ফলে এঁকেও ক্ষেত্রজ সন্তান প্রতিষ্ঠিত করে জমিদারি বাঁচাতে হলো।

শ্রীমান সামন্তনারায়ণ সিংহ কিন্তু হলেন এঁদের সম্পূর্ণ উলটো। এঁরই ছেলে হলেন আমার স্বামী, আর—

হঠাৎ চুপ করে যান রানীমা। ওঁর চুপ করাটা এতই অকস্মাৎ যে মানুষকে সন্দিহান করে তোলে।

উনি যেন বিমনা হয়ে যান। · দুজনেই চুপচাপ ·

নৌকা এসে পারে তুলে দিল।

সামনেই বির্দাবনের স্তূপ। ঘাট থেকে লালমাটিব সরু পথ ওই ঢিবিটার বুক চিরে যেন ওপরে উঠে গেছে। এ পথ পাথরসঙ্কুল—বন্ধুর।

রানীমাকে বার বার হোঁচট খাওয়ার দায় থেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি ওঁর হাত ধরে এগিয়ে চলেছি। বাঁ পাশে একটা গুহার মুখ। একটা অপরিষ্কার পথ ঝোপে ঢাকা পড়েছে। উনি বলেন—এটা একটু অপরিষ্কার পথ বটে তবু এটার ভেতর দিয়েই উপরে ওঠা সোজা হবে।

গুহার মুখে বুনো গাছের ভিড। সে ভিড ঠেলে ভিতরের সুড়ঙ্গপথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উপরের পাথর জায়গায় জায়গায় খোলা। তারই রন্ধ্রপথ ধরে আলো এসে পড়েছে।

ছোট ছোট সিঁড়িপথ। তাই ধরে গুহার ওপরতলার চত্বরে উঠলাম। ওপরের চত্বরের শেষাংশে একটা গর্ত। লর্ড কানিংহাম এই গর্তই খোদাই করে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছিলেন একটা আধভাঙা বুদ্ধমূর্তি আর গাছকৌটা।

সামন্ত সিংহের আমলেই এ ঘটনা ঘটেছিল।

রানীমা বলেন—আমার শ্বশুর সামন্তনারায়ণের আমলে যখন গাছকৌটার মধ্যে থেকে সোনার পেটি বেরুলো, এবং তার মধ্যে রূপার কৌটায় রাখা অস্থি, দাঁত ও স্ফটিকের মালা বার হলো তখন তাঁর নিশ্চিত ধারণা হলো যে এই পবিত্র স্থানে বীরাচারী সংস্কারগত তাঁর পূর্বপুরুষ যে অপবিত্র অনাচার চালিয়ে গেছেন তারই কুফলে এ বংশ অভিশপ্ত হয়ে বংশানুক্রমে নিঃসন্তান হয়ে গেছে। কাজেই এ ব্যাপারের পর এতটুকু দেরি না করে তিনি এখানকার পাট উঠিয়ে দিয়ে কেবল গ্রামে গিয়ে প্রাসাদ তৈরি করেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পশ্চিমাংশে সংসারপুখুর দিঘির ধারে গড়ে তোলেন এক বৌদ্ধ মন্দির, আর তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এক পদ্মপাণি বোধিসত্বের মর্মরমূর্তি।

সামন্তনারায়ণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হতে গিয়েছিলেন কিন্তু আমার শাশুড়ী তাঁকে তা হতে দেননি। আমার স্বামী রুদ্রনারায়ণ তাঁর পত্নীর গর্ভজাত সন্তান হয়ে মায়ের মনোবৃত্তি নিয়ে বড় হয়ে উঠলেন। তিনি হলেন আবার বৌদ্ধবিরোধী। ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর চরিত্রে দেখা দিল। এই নিয়ে তাঁর বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে। মায়ের সহানুভূতি আর অর্থসাহায্যে তিনি কেবল গ্রাম ছেড়ে কোবয় গ্রামে গড়ে তুললেন তাঁর বাগান—খামার ক্ষেতী আর বিলাসকুঞ্জ। সারাজীবন সেখানেই স্বেচ্ছাচার করে মৃত্যুর আগে ফিরে আসেন বাপের পরিত্যক্ত প্রাসাদে।

বাপের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি ধর্ম রেষারেষি করে কোবয় বাগানে গড়ে তোলেন একটি ভবানী মন্দির—মূর্তি তার গণেশজননী।

একটি একটি করে তিনটি নারীকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী করেও যখন পুত্র হলো না তখন চতুর্থ···

বলতে বলতে রানীমা অতীত অধ্যায়ে সমাহিত হয়ে যান।

আমি নিশ্চুপ ওঁর মুখের পানে চেয়ে পুরাবৃত্ত শোনার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি।

এই ইতিহাস আমার কাছে উপন্যাসের চেয়ে কম হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হচ্ছিল না। অথচ, বাস্তব পরিস্থিতির মাঝে বসে, কঠিন বাস্তবকে সামনে রেখে তাকে অবিশ্বাসও করতে পারছিলাম না।

আমার পান্থশালায় যে সমস্ত শ্রেয়সী, প্রেয়সী আর সুচতুর পটীয়সীদের দেখা পেয়েছিলাম,—যাঁরা আমার জীবনপ্রবাহে বুদবুদের মত উঠে প্রলয়ংকর আবর্তের সৃষ্টি করে মিলিয়ে গেছেন তারাও যতোধিক সত্য,—এ সত্য তার কাছে আরো

সুকঠিন বাস্তব সে কথা কি করে বোঝাবো! এঁদের কথা হয়ত কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবীর রঙীনকলি অধ্যায়ে যাঁরা বিচরণ করেছেন তাঁরা হয়ত গল্পকথার পর্যায়ে একে ফেলতে পারবেন না।

আকাশে সন্ধ্যার ছায়া নামছে…

দুস্তর প্রান্তরের বুকে বৌদ্ধ যুগের ভগ্ন স্তূপের অন্তরালে বসে আছি আমি আর রানীসাহেবা। কোন্ অতীত যৌবনোজ্জ্বল দিনগুলির স্বপ্নে তিনি হয়েছেন বিহ্বল! তাঁর উদাস নয়ন ক্রমে যেন নিমীলিত হয়ে আসে · তারপর টপটপ করে ঝরে পড়তে থাকে সে নয়নযুগল থেকে অশ্রুবিন্দু।

এ অবস্থায় আমার কি কর্তব্য ভেবে না পেয়ে আমি সন্তর্পণে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিই। ধীরে ধীরে ডাকি—রানীমা…

হঠাৎ সারা শরীরটায় ঝাঁকি দিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন রানীসাহেবা। তারপর কান্নায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে গোঙানি স্বরে বলে ওঠেন—না না—তুমি আমায় মা বলে ডেকো না—সে যোগ্যতা আমার নেই—আমি শুধু রানীসাহেবা—

বলতে বলতে আমারই দেহে তাঁর সারা দেহটা এলিয়ে দেন। তারপর নিতান্ত শিশুর মত আমারই বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে যেন একটু আশ্রয় খুঁজে বেড়ান। এক অতৃপ্ত নিষ্কলঙ্ক অপত্যস্নেহে আমায় জড়িয়ে ধরেন নিমেষের জন্য, তারপর সংবিতে ফিরে এসে উঠে বসেন। বলেন—তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার জীবনের সম্পূর্ণ উপাখ্যান শোনাবার লোক আমি জীবনে খুঁজে পাইনি যিনি সব শুনে আমায় তিলার্ধ সান্ত্বনা দেন। আজ তাই তুমি আমার বড আপনার। তোমার কাছেই নামাতে চেয়েছি জীবনের দুঃসহ বোঝা।

শেষোক্ত কথা ক'টা বলতে বলতে তিনি যেন ঝিমিয়ে পড়েন। পরক্ষণেই প্রায়-স্তিমিত প্রদীপের মত হঠাৎ জ্বলে উঠে বলে চলেন—জানি তুমি হয়ত এর কোন প্রতিকারই করতে পারবে না আজ—হয়ত আজ এর প্রতিকারের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে, কিংবা এ তিক্ত জীবনের ইতিহাস শুনে তোমার নিজের জীবনকে দুঃসহ করতেই বা যাবে কেন, তবু মনে হয় সংসারের প্রতি যুবক—যুবতীদের একথা আমি ডেকে ডেকে শোনাই যাতে তারা তাদের রঙীন জীবনে এ প্রসঙ্গ আর কখন না ঘটতে দেয়। তাই আজ আমি তোমায় শোনাব। সব শুনলে হয় তুমি পালিয়ে যাবে ছিনিয়ে নিয়ে অঞ্জলিকে—তার সহায়তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করব।—তবু মেয়েটা তো বাঁচবে… !

এক দমকা হাওয়ায় যেন উদ্দীপ্ত প্রদীপকে হঠাৎ ফুৎকারে নিবিয়ে দেয়। তিনি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।

পরিস্থিতির এক বিকট সংকট! এক বিরাট বিস্ময়! এই ঔপন্যাসিক সংঘাতে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে বসি। অথচ এই সংজ্ঞাহীনা রানীসাহেবাকে নিয়ে কি করি!

ধীরে ধীরে রানীসাহেবার দেহটি মাটিতে নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে উঠি। সারা শরীরটা যেন বেতসের মত টলছে। গিয়ে দাঁড়াই স্তূপ শিখরে। দেখি নীচে নৌকায় কেরোসিনের আলোটা জ্বেলে দিচ্ছে নৌকার মাঝিটা।

চীৎকার করে তাকে ডাকি। সারা প্রান্তর ঘুরে সে ডাক তার কানে পৌঁছে যায়। সে ওপরের দিকে উঠে আসতে শুরু করে।

আমি রানীসাহেবাকে একটু একটু নাড়া দিয়ে বলি—রানীমা, রানীমা—রানীসাহেবা—

ধড়মড় করে উঠে বসেন রানীসাহেবা।

ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর অতি ধীরে বলে ওঠেন—ও, তুমি! চলো বাড়ি চলো।

আবার চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। অবাক হয়ে নিজে নিজেই বলেন—রাত হয়ে গেছে দেখছি।

ওঁকে তুলে ধরি। তারপর আমার কাঁধেই ভর দিয়ে উনি নামতে শুরু করেন।

নৌকায় উঠিয়ে বলি—আপনি শুয়ে পড়ুন, আপনি ক্লান্ত।

উনি বলেন—নৌকায় শুলে আমার বড় মাথা ঘোরে।

চুপটি করেই বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তিনি শুরু করলেন—হয়ত আমি যা বললুম যা বলতে গিয়ে তোমায় বিপদগ্রস্ত করলাম তা এখনও তোমার কাছে অস্পষ্টই রয়ে গেল, তবু তা তোমার কাছে স্পষ্টভাবেই একদিন তুলে ধরব। আজই ইচ্ছা ছিল সেটুকুর তাইতো তোমায় নিয়ে নিরালায় চলে এসেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে গেল…পুরাতন ইতিবৃত্ত মনে করলে এবং তার কী ভয়ানক বিষময় ফল আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে ভাবতে গেলেই আমি

যেন কেমন হয়ে যাই। ডাক্তারেরা বলে ফিটের ব্যামো কিন্তু আমি জানি এক অসহ যাতনায় আমার ক্রমে ক্রমে দম বন্ধ হয়ে আসে।

চুপ করে থাকি।

উনি বলেন—এ কথা যেন কাক কোকিলেও না জানতে পারে, তাহলে আমার চেয়ে অঞ্জলির ক্ষতি অনেক বেশী।

আমি সুযোগ পেয়ে বলি—অঞ্জলি ত দেবীর নামে উৎসর্গিতা, তবে এ বিয়ের প্রস্তাব ওঠার সুযোগ কোথায় ?

রানীমা বলেন—মদ খেলে আর আমার কর্তার পেটে কথা তলাতো না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনেক দুর্বলতার কথা তাঁর ওই আত্মীয়বন্ধুর কাছে নেশার ঘোরে বলে রেখে গেছেন। যদিও আমি সে সমস্তকে নেশাগ্রস্তের উচ্ছ্বাস বলেই নীচের আদালতে পেশ করেছিলাম, এবং নীচের আদালতে জয়ীও হয়ে আছি, তবু তাঁর ওই আত্মীয়বন্ধুটি তাঁর সেই দুর্বলতাটুকুকে আশ্রয় করেই এযাবৎকাল আমায় চোখ রাঙিয়ে আর ভয় দেখিয়ে আসছেন। স্বামীর মূর্খতার মাশুল তাই আমায় একদিন হয়ত দিতেই হবে।

আবার চুপ করে যান রানীসাহেবা।

আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি তো বলেছিলেন রাজা সামন্তনারায়ণ অর্থাৎ আপনার শ্বশুর ধর্মভীরু ছিলেন এবং রুদ্রনারারণ তাঁর একমাত্র সন্তান। আপনাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন নিঃসন্তান, তবে আত্মীয়বন্ধুটি জন্ম নিলেন কি করে ?

রানীসাহেবা কি যেন ভাবলেন। ম্লান হাসি মুখে টেনে নিয়ে উত্তর করেন—তবে কিছুটা খুলেই বলি। রাজরাজড়াদের রানীদের ক্ষেত্র করে যাঁরা পুত্রদান করে যেতেন তাঁদের সংসারের ভার রাজকোষই বহন করত। তাই তাঁরা আত্মীয়ের মত ব্যবহার পেতেন এবং সাধারণ পরিচয়ের সময় বলা হতো—উনি আমার আত্মীয়। সামন্তনারায়ণকে যিনি ক্ষেত্রজ করেছিলেন তিনি বৃদ্ধবয়সে নিজের কামনাবৃত্তি শান্ত করতে না পেরে তাঁরই এক নর্মপ্রিয়ার গর্ভে জন্ম দেন প্রধান সিংহকে! এই প্রধান সিংহ আর আমার স্বামী প্রায় সমবয়সী ছিলেন। গুণাগুণ বিচার করতে গেলে বলা চলে—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। খুড়ো ভাইপোর অত্যাচারে বহু কুমারীরই কৌমার্য নর্মপ্রিয়ারূপে খণ্ডিত হয়েছে।

আমি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি—তাহলে তিনি একপ্রকার অঞ্জলির ঠাকুর্দাদা হলেন বলুন।

—হ্যাঁ, তবে এঁদের অস্তিত্ব রাজবাড়ি কখন স্বীকার করেনি এবং অংশীদার হিসাবেও এঁদের কোন স্বত্ব আইনতঃ বর্তায় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেন—অঞ্জলি জন্মালে ওর সম্বন্ধে প্রধান সিংহ এই প্রচার করতে চেয়েছিল যে ও-ও আমার স্বামীর ওইরকম এক নর্মপ্রিয়ার সন্তানমাত্র। সেই অখ্যাতি চাপা দিতেই আমার স্বামী দেবীর প্রত্যাদেশের গুরুভার চাপিয়ে দেন অঞ্জলির ঘাড়ে—বলতেন মা-ষষ্ঠীর স্বপ্নদত্ত সন্তান এই অঞ্জলি। কাজেই প্রধান সিংহ সুবিধা করে উঠতে পারল না। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পর ও জনশ্রুতি ফলবতী হচ্ছে না···বিশেষ করে যুগ পরিবর্তনের আজকের হাওয়ায়। তাই আমাকে অন্য পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে নইলে প্রধান সিংহ আমাদের মা মেয়েকে এ জমিদারী থেকে উচ্ছেদ করে ফেলে দেবে।

ভাবি, সামান্য বিষয়ের লোভে মানুষ কতই না হীনবৃত্তি অবলম্বন করে। এইতো সেদিন বাওলা মার্ডার কেস বোম্বাইতে ঘটে গেল—এ রাজত্বেরও নিভৃত অন্তরালে এমন কতই না খুন-খারাপি হয়ে গেছে কে জানে! আজ যুগাবসানেও তার ছায়া যেন ঘিরে রেখেছে রানীসাহেবার ভবিষ্যৎ জীবনকে—দুর্বলা অবলা জেনে।

বলে ফেলি—লোকটা একটা জানোয়ার!

দাঁতে দাঁত চেপে উনি বলেন—শুধু জানোয়ার নয়—হিংস্র জানোয়ার। এদের লোভ দেখিয়ে পিঁজরায় বন্দী করতে পারলেই রক্ষে—নচেৎ নয়।

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন রানীমা—

অজান্তে আমারও চাপা বেদনাক্ত নিশ্বাস নিঃশেষিত হয়ে যায়।

বাইশ

সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। জমিদার-প্রাসাদের আবছায়ে দরজা-জানালাগুলো পর্যন্ত বিরাট ষড়যন্ত্র-চোখে যেন আমার পানে চেয়ে আছে।

রানীসাহেবা আর তাঁর একমাত্র কন্যার এতবড় বিপদ···অথচ ট্রেনের যাত্রী। হিসাবে এ-দুটি প্রাণীকে দেখে একান্ত নিশ্চিন্ত সুখীজন বলেই মনে হয়েছে।

ভাবছি, আমিই বা হঠাৎ এঁদের জালে জড়িয়ে গেলাম কেন? আর রানীসাহেবা তাঁর জমিদারির এহেন পরিস্থিতি জেনেও কেনই বা আমায় নিমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে তাঁদের এই বিরাট জমিদারির রহস্যজালে জড়িয়ে দিলেন? কিছুই যেন বোধগম্য হচ্ছে না।

মাঝে মাঝে অঞ্জলির সুন্দর হাসিমাখা মুখখানা মনে পড়ে কেমন যেন বুকটায় মোচড় দিয়ে উঠছে···।

অথচ এ সমস্যার শেষ না শুনে নিজের সমাধানেরও হেস্তনেস্ত করে উঠতে পারছি না।

মনে জোর এনে ভাববার চেষ্টা করি।

অঞ্জলিকে নিয়ে পালিয়ে যাব ছিনিয়ে নিয়ে ওই বাহাত্তুরে বুড়োর কাছ থেকে? পালিয়ে যাবই বা কোথায়! যদি ধরা পড়ে যাই—যদি পুলিসের কাছে ধরিয়ে দেয় প্রধান সিংহ! তাহলে অপদস্থের আর সীমা থাকবে না।

আবার ভাবি, রানীসাহেবা সাহস দিয়েছেন, সহায়তা করতে তাঁর এতটুকু ত্রুটি হবে না।···

পালিয়ে গিয়ে অঞ্জলিকে নিয়ে রাখবই বা কোথায়—আর অঞ্জলিকে কি সূত্রে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেব?···

দুশ্চিন্তার আর অবধি নেই।

সাধারণ গৃহস্থের সন্তান আমি। হঠাৎ এই রাজকীয় রহস্যজালের কঠিন যবনিকার অন্তঃস্থল ভেদ করাও কি কম কথা—এ কি আমাদ্বারা সম্ভব?···আর যদি বা সম্ভব হয় তো আমি এঁদের কি সাহায্যে আসতে পারি!

রানীসাহেবা যদি অঞ্জলিকে আমার হাতে স্বইচ্ছায় তুলে দেন—কিন্তু তাতে আমিই বা রাজী হব কোন্ ভরসায়! আর এতে তাঁর নিজের জমিদারিই বা বাঁচবে কিসে! আমি বাংলাদেশের ছেলে…এঁরা বিহারী…আবার রাজ-পরিবারভুক্ত। রাজপরিবারের চলিত প্রথার বিপক্ষে আদালতও রায় দেবে না।

চিন্তায় চিন্তায় আমার দুই কর্ণমূল থেকে আগুন ছুটে বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসি—পাশের বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা জলের হাত দু'কানে ছোঁয়ালাম। ঘাড়ে মাথায় ঠাণ্ডা জল থাবড়ে দিলাম। চুপটি করে এসে বসলাম খাটের ওপর।

অঞ্জলির সকালের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন দু'কানে বাজতে থাকে—আপনি এত বোকা কেন?—না-জানা না-শোনা এক অপরিচিতার বাড়ি এককথায় নিমন্ত্রণ রাখতে চলে এলেন!

অঞ্জলি ঠিকই বলেছিল। ওর সত্য উক্তি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ওর দুর্দশা স্মরণ করে মনটা আমার আবার টনটন করে ওঠে। ওর এই দুরন্ত যৌবনের পরিতৃপ্তি কি ঐ বৃদ্ধের দ্বারা সম্ভব! ওর চেয়ে দেবদাসী থাকাই মঙ্গল। তবু ঐ বৃদ্ধের মৃত্যুর পর অঞ্জলি নিষ্কণ্টক; হয়ে হয়ত নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করে সুখী হতে পারবে।

—খট্—

খট্ করে শব্দ হলো—ভয়ে চমকে উঠি!

পাশের ঘরের আর আমার ঘরের মাঝের দরজাটা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে ছায়ামূর্তি। বিস্ময়ে চেয়ে দেখি—অঞ্জলি!

আমার কথা বলার আগেই খিলখিল করে হেসে উঠে এগিয়ে আসে অঞ্জলি। বলে—ভয় পেয়ে গেছেন নিশ্চয়। ভয় নেই—মা বাড়ি নেই, ভৈরবদার সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী কাজে বাড়ির বাইরে গেছেন।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়!

এখন রাত প্রায় একটা বাজে অথচ রানীসাহেবা বাড়ির বাইরে! অঞ্জলি নিশ্চয় জানে যে এরই মধ্যে ফিরে আসার তার কোনই সম্ভাবনা নেই, তাই সাহসে ভর করে আমার ঘরে এত রাত্রে হানা দিয়েছে—অথচ আমি দেখেছিলাম রানীসাহেবা অত্যন্ত অবসন্ন—ক্লান্ত—প্রায় অসুস্থ বললেই চলে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি—তুমি ঘুমোওনি?

ও বলে—একা-ঘরে ভয় করছিল যে—

বলতে বলতে এসে আমার পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে। হেসে বলে—আমি কিন্তু জানতাম যে তুমিও ঘুমোওনি—

তুমি !!!—

হঠাৎ অঞ্জলি আমায় আপনি ছেড়ে তুমি বলে কোন্ অধিকারে? সারা শরীর যেন হঠাৎ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

বলি—কি করে জানলে?

—মন নিজে নিজেই জানিয়ে দেয়।

ওর চোখে মুখে মাদকতা মাখা—দেহে স্পন্দন—সে স্পন্দনের মৃদু স্পর্শ এসে আমার গায়ে লাগছে।

ও বলে—ওকি কাঁপছ কেন?

আমি হেসে বলি—আমি না তুমি?

ও হেসে ফেলে বলে—ধর দুজনেই

আমি বলি—একা-ঘরে দুজনে এভাবে—একলা—এত রাত্রে। মা যদি হঠাৎ ফিরে এসে যান!

ও উদাস স্বরে উত্তর দেয়—এসে পড়েন এসে পড়বেন। তা বলে আমি 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

আমি হেসে ফেলি।

বলি—মথুরা থেকে যে ডাক এসেছিল। মথুরানাথকে কি দিয়ে ঠেকাবে যে বৃন্দাবনের ব্রজবাসী হতে চাও?

ও উত্তর দেয় মথুরানাথ না ছাই! সে তো এক জরদ্গব—বৃদ্ধ গৃধ্র। এক চোখে ওত পেতে বসে আছে ভাগাড়ের দিকে একদৃষ্টে নজর রেখে।

আমি দু'হাত দিয়ে তুলে ধরি ওর মুখখানি। আদর করে বলি—এই ভাগাড়ের আকর্ষণে কিন্তু বহু নওজোয়ানের চোখকেও ধাঁধিয়ে দেয়।

চার চোখের মিলন হলো।

ও বলে—যাও তুমি ভারি ইয়ে—

দুষ্টামি করে জবাব দিই—আমি হলাম ইয়ে আর বুড়ো জগদ্গব গৃধ্রকে করছো বিয়ে।

ও যেন লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

বলে—বিয়ে না ছাই! বুড়োর মুখে নুড়ো জেলে দেবার ত্রিকুলে লোক জুটছে না তাই ঠিক করেছি গিয়ে মুখে নুড়ো জেলে দেব।

তারপর হঠাৎ কেমন উদাস গম্ভীর স্বরে নিজে নিজেই বলতে থাকে—কেন আমি এই খেলাঘরের সাজানো রাজার ঘরে জন্মাতে গেলাম জানি না। সামান্য গৃহস্থের মেয়ে হয়ে জন্মালে তো আর এ জ্বালায় জ্বলতে হতো না।

আমার মুখের ওপর মুখ তুলে বলে—তোমায় বলেছিলাম না আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন পুরো এক গণ্ডা! ভবানীর প্রত্যাদেশ মানতে গেলে সারা জীবন শুকিয়ে মরতে হবে—মা'র সমস্যার সমাধান করতে হলে নিজেকে ঐ বৃদ্ধ জরদ্গবের তীক্ষ্ণ নখে জর্জরিত হতে হবে—গৃধ্রকে এড়িয়ে পালাতে গেলে ওর ফাঁদে জীবনভোর ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে—আবার তোমায় নিয়ে নিরালা ঘর বাঁধলে হয়ত আমাদের পেছনে রাহুর অদৃশ্য ছায়া ধাওয়া করে ঘুরে বেড়াবে কোন অসতর্ক মুহূর্তে চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করার আশায় আশায়। তাইতো বলে-ছিলাম—শ্যাম রাখি না কুল রাখি।

তারপরই ও যেন ভবিষ্যের ভয়াল ছবি চোখের সামনে দেখতে পেয়ে আমারই বুকের মাঝে নিজেকে কুঞ্চিত করে লুকিয়ে নেয়। এ যেন তার পরম শান্তির ভয়হীন আশ্রয়। জানি না, এইটুকু আশ্রয় কি খুঁজেছিলেন ওর মা সেই নিস্তব্ধ বিদাবন স্তূপের শিখরচূড়ায়! মা আর মেয়ে দুজনেই যেন শান্ত আশ্রয়ের অনুসন্ধানে আমারই চারিপাশে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন—অথচ আমি।

নির্বাক আমি—ক্রমেই জড়ত্ব ছেয়ে যাচ্ছে আমার সারা শরীর আর মনে।

হঠাৎ আমার বুক থেকে তীরের মত ছিটকে পড়ে অঞ্জল খাটের নীচেটায় নেমে যায়। তারপর বজ্রবাঁধনে আঁকড়ে ধরে আমার পা দুখানি। দু'হাঁটুর মাঝে মাথাটা গুঁজে দিয়ে গুঙিয়ে উঠে বলে—বল আমায় ফেলে দেবে না—

ওর স্বরে কান্নার ছোঁয়াচ। চমকে উঠে আমি বলি—ওকি, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একি করছো তুমি অঞ্জলি! ছিঃ! ওঠো—

আমি বুকের কাছে ওকে টেনে তুলি। সারা দেহলতা আমার বুকে এলিয়ে দিয়ে ও বলে—জানি তুমি আমায় ফেলতে পারবে না—তবু তুমি নিজে মুখে একবার বল যে তুমি আমার।

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। সারা শরীরটা থরথর করে কেঁপে চলেছে কিসের উত্তেজনায়। ওর শরীরটাও আমার বুকের মধ্যে থেকে থেকে শিউরে উঠছে।

সারা ঘরটায় আলো আর আঁধারের ছায়ায় মায়ায় যেন ঝিমঝিম করছে—এ স্বপ্ন না সত্য!

এই রহস্যময় পুরীর ভাবী উত্তরাধিকারিণী আমার অঙ্কশায়িনী হয়ে নিথর নিশ্চল দেহে থরথর করে কাঁপছে। অনন্ত নির্ভরতায় নিজেকে সমর্পণ করেছে তার চিরদয়িতের শান্তিময় আশ্রয়ে। ভয়, ভাবনা, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব যেন নিমেষে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অপ্রত্যাশিত কাঙ্ক্ষিত বাসনার মূর্ত রূপ খুঁজে পেয়েছে এক প্রাণবন্ত দুটি বলিষ্ঠ বাহুর রচা সুখনীড়।

রাত এগিয়ে চলেছে·

চিরন্তনী কালের নিঃসীম গভীরতা যেন দুটি হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে খাদ কেটে চলেছে। সেই সখাদ সাগরের অতলান্ত তলে যেন নামিয়ে দিচ্ছে দুটি অনভিজ্ঞ ডুবুরীকে। মৃতের ওষ্ঠপুটে ঢেলে দিয়েছে আজ অমৃতের সুধাভাণ্ড। অসীম তৃপ্তিতে ভরে উঠছে আজ দুটি অভিন্ন হৃদয় কানায় কানায়।

অথচ, এই ব্যবধানহীন ঐক্যের ভবিষ্যৎ যে কী তা এক অদৃশ্য দেবতাই জানেন।

তবু, এ রাত্রে অদূর ভবিষ্যের ভ্রূকুটি দেখে আমরা থমকে দাঁড়াইনি—সংশয়ের চিত্ত দোলায় আমরা এতটুকু দুলে উঠিনি—অজানা রহস্য-সূত্রের বেড়াজালে আমরা বাঁধা পড়িনি।

হঠাৎ মৃদু কণ্ঠে শোনা যায়—আমায় ভুল না—

—এ মুহূর্ত যে চির অক্ষয়—এর ক্ষয় মৃত্যু আছে কি? কালের প্রবাহে শাশ্বত ক্ষয়ক্ষতি হয়ত এই ক্ষণিক মুহূর্তকে কোনোদিনই ভুলিয়ে দিতে পারে না অঞ্জলি!

বিচ্ছেদ ক্ষতি শুধু দেহটাকে বহন করে নিঃশেষিত হয়ে যায়—কিন্তু মনের অফুরন্ত সংগ্রহশালায় এ রূপছবি শিল্পী প্রেমিকের কাছে চিরঞ্জীব হয়ে বিরাজ করবে।

পরম পরিতৃপ্তিতে দুটি সুকোমল হাত আমায় আরো নিবিড় করে বেঁধে নিল।

* * *

ভোর চারটের পর বানীসাহেবা পা টিপে টিপে ঘরে ফিরলেন।

দুটি ঘরের মাঝের দরজাটা খোলাই ছিল। আমার মুখ সেই দিকেই রাখা ছিল। চোখদুটোকে সজাগ রেখে ও ঘরের দিকেই সারাক্ষণ চেয়ে ছিলাম। ওখানে ছায়ামূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ছিটকে নিজেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আগাপাস্তলা লেপ দিয়ে মুড়ে নিই।

ব্যাপারটা অঞ্জলির বুঝতে দেরি হয়নি।

তবু সে পালাবার চেষ্টা করেনি।

বরং মন্থর গতিতে পা টিপে টিপে এ ঘর থেকে বেরিয়ে ওর মা'র ঘরে প্রবেশ করে নিম্নস্বরে বলে—সারারাত ঘুমুতে পারেননি। আমাদেরই দুঃসহ সমস্যা নিয়ে ওর রাত কেটেছে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করে কাতরেছেন সারারাত ধরে, তবু আমাদের দরজায় ঘা দেননি।...

ওঁর গোঙানির আওয়াজ পেয়ে আমিই দরজা খুলে এ ঘরে এসে দেখি মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে ওঁর মাথায় দাঁড়িয়ে। চোখদুটো যেন রাঙা জবাফুল। প্রায় বেহুঁশ—ডাকাডাকি করে কোনোরকমে তুলে চোখে জলের ঝাপটা দিতে তবে যেন ধাতস্থ হলেন।

বসে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম—এই সবে একটু তন্দ্রা এসেছে।

রানীসাহেবা সব শুনে বললেন—বেচারী! সারা বিকেলটা পড়ন্ত রোদ লেগে অসুস্থতর হয়েছে নিশ্চয়ই—তার উপর আমাদের সমস্যাটাও কিছু কিছু ওকে স্পর্শ করেছে বইকি! ফেরার পথে তাই ওকে বড় ক্লান্ত দেখছিলাম।

মাঝের দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল অঞ্জলি।

উনি বলেন—থাক থাক ওটা খোলাই থাক। আওয়াজ হলে আবার ঘুমটা ভেঙে যাবে।

তেইশ

সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারছিলাম না...অবসন্নতা নয় লজ্জায়। চুপটি করে চোখ বুজিয়ে লেপখানা সারা অঙ্গে ঢেকে পড়ে আছি।

শীত নেই তবু শীতের ভান!

মাঘের আর কটা দিনই বা বাকী! তারপরই হাওয়া ছাড়তে শুরু করবে। বনাঞ্চলে পলাশের মাথা রাঙা হয়ে উঠ্‌বে। সে রঙে কুমারী বনানীর মাথায় সিঁদুর লেপে যাবে।

চিন্তা করতে গিয়ে কোন ফাঁকে অঞ্জলির সীমন্তে অজান্তে সিঁদুর লেপে দিয়েছি। তারপর এখানকার ঘোর চক্রান্ত থেকে অঞ্জলিকে উদ্ধার করে নিয়ে সরে পড়বার চুপি সুড়ঙ্গ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

এমন সময় একটি কোমল ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ কপালে এসে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই—আর কত ঘুমুবে—ওঠো—মুখটুখ ধুয়ে চা খাও—বেড়াতে যাবে না?

আড়মোড়া খেয়ে উঠে বসি।

চারচোখে দিনের আলোয় মিলন হলো।

পরিতৃপ্তি ছেয়ে গেছে অঞ্জলির মুখে চোখে। মৃদু হেসে বলি—গুড মর্ণিং।

হেসে ফেলি। পরক্ষণেই দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে, ওর সহাস্য মুখে ছোট্ট নীরব সম্ভাষণ এঁকে দিয়ে বিছানা ত্যাগ করি।

বাথরুম থেকে বার হয়ে দেখলাম অঞ্জলিই আজ আমার পরিচর্যা ও পরিবেশনের ভার নিজে হাতেই তুলে নিয়েছে।

ছোট্ট একটি টেবিলে সাজিয়ে ফেলেছে চায়ের সরঞ্জাম ও কিছু খাবার।

আমি জিজ্ঞাসা করি—মা কোথায়?

মুচ্‌কে হেসে উত্তর দেয়—পূজা করছেন।

চোখে চোখে যেন কতদিনের কত কথারই বোঝাপড়া হয়ে গেল।

রাতের ঘন অন্ধকারের সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায় এ বাড়ির ফাটলে ফাটলে সংশয়ের আবছায়ে রহস্যময় এক গতিবিধি আর দুরন্ত দুস্তর চক্রান্ত···অথচ দিনের আলোয় তা দেখায় স্বচ্ছ পরিষ্কার। যেন আশঙ্কার অবলেশ পর্যন্তও খুঁজে পাওয়া যায় না।

চা ঢেলে দিয়ে অঞ্জলি পাশের ঘরে তাড়াতাড়ি তৈরী হতে চলে যায়। যাবার সময় বলে যায়···চটপট তৈরী হয়ে নাও—একজায়গায় বেড়াতে যাবো।

চায়ে চুমুক দিয়ে ভাবি যে, এদের জীবনের চক্রধার ঘূর্ণি আবর্তনে আমিও ওতপ্রোতভাবেই যেন বাঁধা পড়ে গেছি···আজ আর তা থেকে ছাড়া পাবো না।

পথে বেরিয়ে অঞ্জলি বলে—তুমি নৌকা চালাতে জানো?

আমি বলি—জানি, মানে রোইং করা এককালে অভ্যাস ছিল। সেও আবার কলকাতায় ইডেন গার্ডেনের কাটা ঝিলে। কলেজে পড়ার সময় প্রায় বন্ধুদের নিয়ে এই করে দুপুর কাটাতাম।

ও হাসে···।

একটা সরু গলিপথ এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে নেমে গিয়েছে। সে পথে কত কাল রানীসাহেবার সঙ্গে আসিনি। নদীতে অপেক্ষমান একখানি জালি বোট।

মনে হয় এখানি খাস রাজবাড়ির সম্পত্তি। ভৈরব তার উপর বোধহয় আমাদেরই অপেক্ষায় বসে। আমরা বোটে উঠতেই সে নেমে কিনারে এসে দাঁড়ালো।'

অঞ্জলি বলে—তুমি এইখানেই অপেক্ষা কর ভৈরবদা—আমাদের ফিরতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।

নৌকা ছেড়ে দেওয়া হলো। দাঁড় ধরেছি আমি—তুটো হাতে জোড়া দাঁড় আর অঞ্জলি বসেছে হাল ধরে।

মনে মনে ভাবি এ নিমন্ত্রণ বিপত্তির মাঝে একমাত্র অঞ্জলিই হাল ধরে বসে আছে তাই ভয় করি না। ভাবি আমাদের এ অভিযানের ব্যবস্থায় বোধকরি রানীসাহেবারও সম্মতি ও সমর্থন রয়েছে।—সমাবেশ সেই রকমই মনে হয়।

ওপারের বিদাবন স্তূপ বাঁয়ে ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলি নদীর উপরদিকে। পনের মিনিট উজান বেয়ে চলার পর ডান হাতে অর্থাৎ পশ্চিম কূলেই দেখা গেল একটি খাল—গ্রামাঞ্চলে ঢুকে গেছে।

অঞ্জলির হালের চালনায় নৌকা ঘুরে ঢুকে পড়লো সেই খালে। খালের তুপাশে ক্ষেতি আর ক্ষেতি।

মক্কা আর জোয়ার গাছগুলো যেন মানুষ ছাড়িয়ে দু'হাত করে উঁচু মাথা তুলে আকাশ ছুঁতে চাইছে। এবার হাল ছেড়ে দিয়ে অঞ্জলি বলে,—জানো…এই ক্ষেতিতে মা নিজে হাতে কাজ করেছেন একদিন।

আমিও দাঁড় উঠিয়ে নিয়ে নৌকাকে গতিমুক্ত করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করি—সেদিন রাতে গল্প করতে করতে উনিও বলেছিলেন এ কথা কিন্তু কেন? রানীর কাজ তো নিজে হাতে ক্ষেতি করা নয়।

নৌকাখানার পূর্ব গতি মন্থর হতে হতে নিজে এসে লাগলো মক্কাক্ষেতের ধার ঘেঁষে।…তুজনে হেলে-পড়া মক্কার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে নিয়ে গল্প শুরু করি।

অঞ্জলি বলে—আমাদের রহস্যময় রাজপরিবারের কিছু তথ্য বলব বলেই তোমায় আমি এখানে নিয়ে এলাম।

অঞ্জলি কিন্তু আর কথা বললো না। চুপটি করে বসে আকাশ পাতাল ভেবে চলে। ম্লান হাসি হেসে বলে—যে ব্যাপার তাই কোন্ দিক থেকে শুরু করি ভাবছিলাম।

আমি ওর মুখের দিকে তীব্র কুতূহলী চোখে চেয়ে থাকি।

ও বলে—এ রাজ পরিবার বংশের পর বংশ সিঁড়ি নামিয়ে চলেছে ক্ষেত্রজ সন্তানের অনুগ্রহে। অথচ আজ ব্রিটিশ আমলে সে পদ্ধতি হয়েছে অচল।

সরকার আইন জারি করে সে পদ্ধতির অবসান ঘাটয়েছেন। অথচ এ আইন আমার বাবার শেষ বয়সেই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে···তাই এই রাজ পরিবারের হলো ভীষণ মুশকিল।

যে বংশের নিজের পৌরুষ বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, সে বংশের পক্ষে এ আইন সত্যিই তো এক বজ্রাঘাত। সরকার ক্ষেত্রজের বদলে প্রসার করলেন দত্তক পুত্রের। আত্মজ, ক্ষেত্রজের সমান অধিকারই দত্তকপুত্র পাবে বলে আইন-গ্রাহ্য হলো।

কিন্তু এখানকার রাজপরিবারের সংস্কারে তা মনঃপূত হলো না। তাঁদের ধারণা যে রাজরক্ত যার শরীরে প্রবাহিত নয়, সে রাজা হবার অধিকারী বা যোগ্য নয়···তা বাপের তরফ বা মায়ের তরফ হতে সে রক্ত অর্জিত হলে তবেই রাজ-সম্পত্তির মালিকানের আসনের অধিকারী হয়।

অথচ—

ক্ষেত্রজ যখন আইন বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো তখনি কূটবুদ্ধি গৃধ্র-জরদ্গব রুদ্রনারায়ণকে একষষ্ঠী ঠাকরুণের অবতারণা করে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লো ঐ গণেশজননী—মাষষ্ঠীর ভবানী মূর্তিকে। প্রধান সিংহের পরামর্শে একমাসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হলো এই ভবানী মন্দির।

পূর্বোক্ত বা পরোক্ষ গর্ভজাত শিশুকেই এ ভবানী প্রসাদের অন্তরালে আত্মজ বলে পরিচয় দেবার সুযোগ করে ফেললেন।

এ সব সন্তান ক্ষেত্রজ দোষে দোষী হলেও ধর্মের আড়ালে আত্মজ বলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা পেলো। আইনের চোখে নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়ে এই সব শিশু রাজ্যের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হবার ক্ষমতা অর্জন করলো। রুদ্রনারায়ণ যেন স্বর্গ হাতে পেলেন নইলে এতবড় জমিদারী রাজ সমস্তই তো সরকারের খাজাঞ্চিখানায় জমা হয়ে যেতো · অপুত্রক দোষে।

চুপ করে বসে বসে আমি অঞ্জলির কথাগুলো যেন গিলতে থাকি। মনে হয় রাজ-সম্পত্তির অন্তরালে কতই না কূট-অভিসন্ধি নোংরামি জট বেঁধে থাকে। আবার একেই শুদ্ধ ভাষায় নামকরণ করা হয়েছে জমিদারী নীতি আর কেতা।

হঠাৎ ছেলেমানুষি করে আমি এক প্রশ্ন করে ফেললাম—আচ্ছা, এই আত্মজ ক্ষেত্রজ আর দত্তকের প্রভেদটি ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারলাম না তো?

অঞ্জলির সারা মুখটা একটা লাল আস্তরণে ঢেকে গেল।···তারপর খিল্‌খিল্‌

করে হেসে উঠে বলে—যাও! ন্যাকা যেন…কিছু বোঝেন না…অতশত আমি বলতে পারব না।

লজ্জা পেয়ে নিজের অন্তরেই বিশ্লেষণ করে নিয়ে বলি—সামনের পেছনের দুটো বোধগম্য হচ্ছে তবে মাঝেরটা… ?

অঞ্জলির আবার সেই হাসি। আমার গায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে—মহাভারত পড়েছো তো? বলতো ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু সত্যিকার কার ছেলে ছিল? বিচিত্রবীর্যের না ব্যাসের?

হঠাৎ মনে পড়ে যায়। বলি—ও—ও—বুঝেছি বুঝেছি।

স্কুলে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যে সংস্কৃত নাটকে আমি শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করেছিলাম। মনে আছে কৃষ্ণের দৌত্যাংশে যখন দুর্যোধন কৃষ্ণকে বাপ তুলে গাল দিয়েছিলো তখন শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে শ্লেষ দিয়ে বলেছিলেন—

"বিচিত্রবীর্য বিষয়-বিপত্তি—ক্ষয়েন—জাত পুনঃ অম্বিকায়ং।

ব্যাসেন জাত ধৃতরাষ্ট্র এস লভেত রাজ্যং—জনক কথং তে।"

হাততালি দিয়ে অঞ্জলি বলে ওঠে—ব্রেভো!

তারপর আরও কাছে ঘেঁষে কোলের কাছটিতে চুপটি করে বসে।

ওকে জড়িয়ে নিয়ে চিবুকটা তুলে ধরে ওষ্ঠাধরে চিহ্নিত এঁকে দিয়ে বলি—তাহলে আমারই ক্ষেত্রজ সন্তান ভবিষ্যৎ গদিতে নিশ্চয়ই রাজা হয়ে বসবে বল?

আমার হাতের বাঁধন ছিঁড়ে ··ও ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বলে—যাও!

জরদ্গব প্রধান সিংহ এ পরিবারের কোন দুর্বলতাটুকু অবলম্বন করে এঁদের জীবন-মরণকাঠি নিয়ে নাড়াচড়া করতে চান বা এই বৃদ্ধ বয়সে কেনই বা অঞ্জলিকে অঙ্কশায়িনী করার অবাধ ইচ্ছা নির্ভয়ে জ্ঞাপন করেছেন…তা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো—আমার চোখের সামনে।

ভবানী-মন্দিরের নিভৃত অন্তরালে প্রত্যাদেশের রটনাটুকুও সুস্পষ্ট হতে দেরী লাগলো না। কিন্তু কেন যে অঞ্জলিকে ভবানী প্রসাদী করে প্রত্যাদেশের গণ্ডির মাঝে ঠেলে দিয়েছেন তা আমার কাছে এক বিস্ময় হয়ে এখনও থেকে যায়।

অঞ্জলিকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমাকে হঠাৎ প্রত্যাদেশের গণ্ডির মাঝে ওঁরা জড়িয়ে দিলেন কেন?

অঞ্জলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেয়,—এটা আমার কাছেও একটা বিরাট বিস্ময় বলে মনে হয়। এর নিগূঢ় তথ্য জানবার জন্যে আমি ভৈরবদাকে

পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছি ··কিন্তু সঠিক উত্তর পাইনি—যা পেয়েছি তা তো তোমায় বলেছি।

আমি নিশ্চুপ হয়ে ভাবি।···

আমার পূর্ব প্রশ্নটা আবার আমার মনে জাগে—জিজ্ঞাসা করি,—হ্যাঁ—তোমার মা'র নিজে হাতে ক্ষেতি করার ইতিবৃত্তটা আমায় বলতে হবে।

অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে বলে—মা বলেন, বাবার মত নাকি রাণী হতে হলে নিজে হাতে কাজ করে শিখে নিতে হয়, কত ধানে কত চাল। কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করি না। আমার বড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এইটুকু বুঝেছিলাম যে আমাকে আর এই বিরাট রাজ-সম্পত্তিকে নিয়ে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে যা পূর্ণ করতে মারও যেমন আপ্রাণ চেষ্টা · বৃদ্ধ প্রধান সিংহেরও তেমনি প্রাণান্ত অপচেষ্টা চলেছে।

প্রধান সিংহ এখানকার জেলা আদালতে নালিশ জানিয়েছিল যে আমি নাকি রুদ্রনারায়ণের প্রকৃত মেয়ে নই!

কিন্তু মায়ের সাক্ষী-সাবুদে সে নালিশ নাকচ হয়ে যায়—মা মকদ্দমায় জিতে যান।

তারপর থেকেই জরদ্গব চুপচাপ হয়ে যায়। কিন্তু আজ মাসখানেক আগে হঠাৎ মাকে একখানা চিঠি পাঠালো—তাতে স্পষ্ট করে তার শেষ অভিলাষ জানিয়েছে যে আমাকে তার চাই-ই চাই—নইলে হাইকোর্টে দেখা হবে।

কি ভেবে জানি না—পরিস্থিতির পরিশেষ দেখতে—মা আমায় নিয়ে এখানে চলে আসছিলেন। পথে তোমার সঙ্গে দেখা। আমার নিজের জন্মটাই ·· মাঝে মাঝে মনে হয়—এক জটিল রহস্যপূর্ণ।

কি এক ভাবনায় অঞ্জলি যেন নিজেকে খুইয়ে বসে থাকে! তারপর ধীরে ধীরে বলে—মার রাণী হওয়ার ইতিবৃত্তটাও জানবার জন্যে আমার বিশেষ কৌতূহল হয়েছিল···কিন্তু অনুসন্ধানের জড়টুকু পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে।

আমার মা ছিলেন আমার দিদিমার একমাত্র কন্যা—মামা বলতে আমার কখন কেউ ছিল না। কাশীতে থাকতেন আমার দিদিমা—কিন্তু তিনি এই দেশেরই মেয়ে ছিলেন · পরে কাশীবাসিনী হন।

একবার স্কুল থেকে কাশীতে সারনাথ দেখার সুযোগ পাই। এই অবসরে আমি দিদিমার অনুসন্ধান করি···অবশ্য মাকে সে-কথা জানাইনি। অনেক অনুসন্ধান

করে যাঁর দেখা পেলাম তিনি মাকে মেয়ে বলেন বটে কিন্তু তিনি আমার দিদিমার 'গঙ্গাজল' সই।

তিনি বলেছিলেন—তোমার মা'র পেটে যখন তুমি ছিলে—তখনই তোমার দিদিমার মৃত্যু হয়। তোমার জন্মের পর মা তোমাকে আমার কাছে রেখে কেবল-গ্রামে ফিরে যান। ··

মাস তিন চার পরে একদিন বাজনাবাদ্যি করে তোমার বাবা তোমার মা'কে নিয়ে নৌকাযোগে কাশী এসে উপস্থিত হন—বাবা বিশ্বনাথের পায়ে তোমায় ছুঁইয়ে অনেক যাগযজ্ঞি করে দেশে ফিরে যান। এরপর তোমার মা'র আর কোনো খবর পাই নি।

বাড়ি ফিরে এলাম। বার বার মাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে··· জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। বাবা বিশ্বনাথের পায়ে ছুঁইয়ে মা-ষষ্ঠী ভবানীর প্রত্যাদেশ কেন কাঁধে চাপিয়ে দিলেন ঠিক আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

আমি বলি—বাবা বিশ্বনাথ তো মা ভবানীর স্বামী তাই বোধ হয় ওরকমটা করেছিলেন।

অঞ্জলি কিন্তু অন্য উত্তর দিল। বলে,—দেবীর প্রত্যাদেশের ভারী বোঝাটা যদি মা জোর করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে না দিতেন, আমি নিশ্চয়ই আমার জন্ম-বৃত্তান্ত নিয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করতাম।

অঞ্জলির মুখে যা যা শুনছিলাম তা আমার সাধারণ জীবনের কল্পনারও অতীত। এ সব কথা আমার কাছে এক ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত বলে মনে হচ্ছিল। মনে হতে লাগলো যেন কোন এক অতীত তার লৌহ যবনিকার অন্তরালে আজ পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে···তাকে আলোকিত করতে পারে কে?

ঐ বৃদ্ধ জরদগব?···না, রাণী সাহেবা!···আর হয়ত পারে বৃদ্ধ ভৈরব। আমি জিজ্ঞাসা করি—বৃদ্ধ ভৈরব তোমাদের কতদিনের চাকর?

চুপ করে থাকে অঞ্জলি।

অনেকক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে,—জানো···উনি ঠিক আমাদের চাকর নন। ভৈরবদার অবস্থিতিও অত্যন্ত রহস্যজনক। অথচ,···এ রহস্য ভেদ আমিও করতে পারি নি। শুনি নাকি বাবার আমলে উনি ক্ষেতে কৃষকের কাজ করতেন। তারপর প্রায় বিশ বছর উনি নিরুদ্দেশ ছিলেন। হঠাৎ একদিন ফিরে এলেন···তখন বাবা গত হয়েছেন! মা নাকি ওঁকে চিনতেন, তাই তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। মা বলেছিলেন—ওঁর নাম ধরো না অঞ্জলি···

উনি তোমার গুরুজন হন।··· আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে ওঁকে কি বলে ডাকব ?···উনি বললেন—ভৈরব দাদা। সেই অবধি ওঁকে ভৈরবদা বলেই জানি··· এর বেশী জানার দরকার আজ অবধি হয় নি বলেই জানতে চেষ্টা করিনি। ·· শুধু জানি ভৈবরদা তাঁর স্নেহ দিয়ে আমায় ঘিরে রেখেছেন।

কথাকটা বলে অঞ্জলি চুপ হয়ে যায়।

আমি যেন এক ভুলভুলিয়ার সহস্র দরজায় মাথা খুঁড়ে পথ খুঁজে বেড়াই।

ভৈরবদার বিশ বছর নিরুদ্দেশ আর প্রত্যাবর্তনের আড়ালেই কি তবে এই ভুলভুলিয়ার বাইরে যাবার আসল দেউড়ি। মনে হলো ভৈরবদাই হয়ত জানেন এদের সমস্ত সমস্যার নিগূঢ় তত্ত্ব।

বোটের দাঁড় ধরে প্রস্তুত হই···

অঞ্জলি হালের মোড় ঘোরায়।

চব্বিশ

এ হেন অন্ধতমাচ্ছন্ন জমিদারীর আওতায় জন্ম নিয়ে অঞ্জলি শিক্ষিতা হয়েছিল ও গানে পারদর্শিতা লাভ করেছিল খালি তার মায়ের কল্যাণে !

মুঙ্গেরের একটি গার্লস স্কুলের হোস্টেলে অঞ্জলি মানুষ হয়েছিল। কাজেকাজেই তার সঙ্গিনীরা যুগের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে পদক্ষেপে আজকালকার সমাজের যুবকদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশায় অভ্যস্ত করে তোলে, অঞ্জলিও সেইভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছিল।

হঠাৎ এই গৃধ্রের পত্রাঘাতে আর সঙ্গে সঙ্গে তার আবার গাঁয়ে ফেরার ব্যবস্থায় ওর চলার ছন্দ কেমন যেন পথে ব্যাঘাত পেয়ে ছন্দ-হারা হয়ে পড়েছিল··· এমন সময় পথিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা। সঙ্গে সঙ্গেই আলাপন···আমন্ত্রণ···ও আপ্যায়ন এত শীঘ্র ঘটে গেল যে ওকে যেন ভাববার অবসর দিল না, যেমন দেওয়া হলো না আমাকে।·· ভবিষ্যের দুরন্ত নিমন্ত্রণের মরুভূমির মাঝে আমি যেন হয়ে গেলাম এক ওয়েসিস···সেই মরুদ্যানের শীতল ছায়ায় বিশ্রামের সুযোগ সুবিধার ও করেছে পূর্ণ সদ্ব্যবহার।···কিন্তু আমার ?···

—এ যেন এক গন্ধময় ঘট-পুষ্পের চিরান্ধকার গহ্বরে লোভাতুর প্রজাপতির

প্রবেশ।··ঢোকার সময় থাকে ফুলের আমন্ত্রণ-আকর্ষণ···প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটায় তাকে চিররুদ্ধ করে তার জীবন-বিনাশ।

অথচ,·· অঞ্জলির সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলা যায়···যেন সে সংশয় কিসের আলোড়নে দুলে উঠে নিমেষে জলচ্ছায়ার মত মিলিয়ে যায়।

রানীসাহেবার স্বভাবের যেন পরিবর্তন ঘটেছে।···সে স্নেহভরা আপ্যায়ন যদিচ সম্পূর্ণরূপে সমান চলেছে তবু যেন কোথায় রচনা করছে···দুজনের মাঝে গভীর অন্তরায়।

—আর ভৈরবদা—

সে যেন সদাসর্বদা ছায়ার মত আমায় অনুসরণ করে চলেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়···এ কি শুধু অতিথি সৎকার না এক কঠিন পাহারার দুর্বার আবেষ্টনীদুর্গে আমায় অবরোধের চেষ্টা মাত্র।

সমস্যা যতদূর দারুণ·· ভাবনাও ততদূর নিদারুণ।···রানীমার মুখে মথুরাপুরের যে রূপবর্ণনা শুনে মুগ্ধ-মনে আলোড়ন তুলেছিল সে তো মথুরাপুরের 'কেবল আর কোবয়' গ্রামের উর্ণনাভ-জাল!···এ জালের কঠিন তন্ত্রী ভেদ করে বার হয়ে যাওয়া কি সহজ হবে?

সেদিন রানীসাহেবা আমায় হঠাৎ ডেকে বললেন—আজ তুমি আর অঞ্জলি একটু নৌকো করে ঘুরে এসো, নইলে হয়ত আর সময় হবে না! ভৈরব তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। দেখে এসো আমাদের মথুরাপুরের কুঠি বাড়ি। তার গ্রাম্য পরিবেশ দেখে সত্যিই তুমি খুশী না হয়ে পারবে না। সেখানে গেলে মানুষ আর ফিরতে চায় না।

চুপটি করে শুনি—।

ভাবি বিকেল বেলায় যদি রওনা হই ওখানে পৌছতে লাগবে ঘণ্টাদুয়েক··· অর্থাৎ রাত হয়ে যাবে···তাহলে কি বা ছাই দেখবো! যাওয়া আসাই সার হবে। তবু, বলি বলি করে রানীমার সামনে প্রতিবাদ করতে পারলাম না। কারণ, আজ ক'দিন ধরে রানীমার হুকুমদারীর ছোঁয়াছটুকু যেন আমার মনটাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সবাই যেমন ত্রস্ত হয়ে রানীমার কথার বাদ-প্রতিবাদের সাহস পায় না ··আমিও যেন ঠিক সেইরকমই সাহস হারিয়েছি।·· এ যেন এক জংলী অজগরের আকর্ষণী দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তি।

অঞ্জলি সেজেগুজে তৈরী হয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। বললে—চলো দেরী করো না। বিনা বাক্যব্যয়ে ওকে অনুসরণ করি।

নৌকায় পা দিয়ে দেখি নৌকার ভিতরের কামরায় সুন্দর করে বিছানো বাসরশয্যা। ওরই অনতিদূরে রাখা রয়েছে আমার সুটকেস ও যাবতীয় জিনিষ পত্তর।

চমকে উঠি…চেয়ে থাকি হতবাক হয়ে অঞ্জলির মুখের পানে।

সে স্মিত হেসে বলে—আরও অনেক জিনিষ নেওয়া হয়েছে মশাই, ভয় নেই—তোমায় বিদায় করা হচ্ছে না।…তারপর কানের কাছে মুখটা নিয়ে এসে চুপি চুপি বলে,—হানিমুনটা বিয়ের আগেই সেরে ফেলার পূর্ণ আয়োজন আছে।

মুখে উত্তর যোগালো না…শুধু চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।…তারপর ধীরে ধীরে ওর পাশ কাটিয়ে গিয়ে বসলাম নৌকার গুলুই-এর কাছে।

সূর্য তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে…শেষ দিকরেখার উপান্তে। সারা আকাশখানা যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। তার রক্তিম আভাটুকু ভিতরের ঘরের জানলা দিয়ে গিয়ে পড়েছে অঞ্জলির মুখের উপর।‥ হঠাৎ বুকের চিন্তার স্রোতকে স্তব্ধ করে দিল সে দৃশ্য ‥কিউল নদীর রাঙা জলের দোলাটুকু প্রতিভাত হয়ে অঞ্জলির মুখে তখন ধূপছায়ার মায়াজাল রচনা করছিল…আনমনে আমি গুন্‌গুনিয়ে উঠি—

"রাঙা গোধূলির ছিন্ন মেঘের আলো—

মোর প্রেয়সীর মুখে পড়েছিল‥ লেগেছিল বড় ভালো!"

অঞ্জলি এসে তখন পাশটিতে বসে পড়েছে…চুপটি করে বসে শুনছিল আমার আবেগভরা গানখানি। গান শেষ হলে ও বলে ওঠে—প্রেয়সীর মুখের উপর রাঙা আলোটুকু দেখতে হলে—এদিক ফিরে এসো।

চমকে উঠি…হেসে ফেলে বলি,—আমরা মথুরাপুরে যাচ্ছি কেন শুনতে পারি কি?

মুচকে হেসে অঞ্জলি উত্তর দেয়—বাঃ রে, ব্রজপুরে যে আমাদের স্থানাভাব… তাই তো?

ব্রজরসটুকু অভিধান সম্মত হলেও আমার ভালো লাগলো না। বলি,—অর্থাৎ…

—অর্থ বলে, ভেঙে বুঝিয়ে দেবার সময় হলেই বুঝিয়ে দেবো…সে তো

আর নৌকার ওপর বসে বোঝানো যাবে না।—অবশ্য তোমার যদি পরাশর ঋষির মত কুজ্ঝটিকা তৈরী করার ক্ষমতা থাকে—তাহলে পারো যদি আমাদের নৌকাখানিকে কুয়াশায় ঢেকে ফেলো···সঙ্গে সঙ্গে আমি অর্থের মানে বুঝিয়ে দিতে প্রস্তুত।···বলে, ফিক্‌ফিক্ করে হেসে গড়িয়ে যায় অঞ্জলি।··হাসি থামিয়ে বলে,—তাতে আমিও মৎস্যগন্ধার মত কুমারী থেকে যাবো···আর তুমি ঋষির শ্রেষ্ঠ হয়ে জগতে নমস্য থাকবে।··মাঝে পড়ে হয়ত আরও একটা ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহণ করবে ···ক্ষতি কি ?

আবার সেই অফুরন্ত হাসি ··

হাসতে হাসতে অঞ্জলি লুটিয়ে পড়ে আমার কোলের ওপর।

ছইয়ের পাশে বসে-বসে ভৈরবদা তামাক খাচ্ছিলেন। আমি বলি,—এই ভৈরবদা দেখছেন ?

বেহায়ার মত অঞ্জলি বলে ওঠে—নাতনীর প্রেম দেখে দাদু বুড়ো·· ভাসিয়াছেন যৌবন-সায়রে।

আমি চোখের ইসারায় ধমক দিই।

ও কিন্তু থামে না। বলে,—মানুষ সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়েই ওই এক কাজ করে চলেছে—যাকে বলে রস-স্বাদন।

—সে কি রকম ?

—পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাজই হচ্ছে রস-গ্রহণ। কখন চোখ দিয়ে—যেমন,

"আজু মঝু শুভ দিন ভেলা,

কামিনী পেখনু পরভাত বেলা" ··বা,—তোমার গানেই ছিল,

—"নয়নে লেগেছে ভালো"।···এখানে চোখ দিয়ে রসাস্বাদন। আবার যখন "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলগো।"···তখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা রসাস্বাদন ঘটেছে বুঝতে হবে।···বললে কিনা—"লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু হৃদয় না তিরপিত ভেল"—অর্থাৎ মানুষের ত্বকের রসাস্বাদন ঘটেছিল বুঝতে হবে।

বলি,—তুমিও তো কম কবি নও অঞ্জলি !

ও বলে,—কবি না ছাই। আমরা বাস্তব-প্রেমিক। রসাস্বাদন ভাবুকতা দিয়ে ঘটাই না···বাস্তব দিয়েই ঘটাই।

বলি,—ও পেটে পেটে এতো ?

অঞ্জলি বলে—কেউ কেউ আবার ঘৃণা দেখিয়ে নিকটকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলে,—

"কনয়া-কলস বিষে পুরাইয়া—উপরে দুধকো পুর।"

জানি সোনার কলসপ্রেম-বিষে পরিপূর্ণ—তবু সেই বিষ পান করে অর্থাৎ আস্বাদন করে—হয়ে উঠেছি বিষহরি।

—হঠাৎ একথাটা বলার তাৎপর্য?

গম্ভীর হয়ে যায় অঞ্জলি। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—বিষপান করে হজম করতে পেরেছিলেন বিষহরি নীলকণ্ঠ শিব। তাই শিব সকল দেবতার বড় দেবতা। সুন্দর অসুন্দর···নাগনাগিনীকে কণ্ঠে ধরে রসাস্বাদন করছেন···কী বীভৎস রসাস্বাদন ভাবেন?

আমি বলি—এই রসাস্বাদন একমাত্র শিবেই সম্ভব।

ও যেন তদ্গতভাবে বলে চলে—রস রসই। রসিক যে সে সর্ব রসেই মজে যায়। বিরহ মিলন, পাওয়া-না-পাওয়া মূলগত একই রস—তবে রসিক ভেদে সে হয় দুঃখ আর সুখ।

গঙ্গার সঙ্গমস্থলে নৌকা এসে পৌঁছে গ্যাছে। এরই এপাশ ওপাশ থেকে ছোট গণ্টক···আর তিলজুগা ও মান নদী এসে মিশে গঙ্গাকে যেন এক দুস্তর পারাবারে পরিণত করে গড়ে তুলেছে। এই পারাপারেরই যাত্রী আমরা—পাড়ী দিতে হবে। অথচ ছোট বড় ঢেউয়ের সংঘাতে পানসী আমাদের দুলে দুলে উঠছে।

তবু চলেছি—বিরাম নেই এ চলার।

রাত দশটায় মথুরাপুর ঘাটে নৌকা ভিড়লো।

সিতপক্ষের রাত্রি—তখন সবে চাঁদ উঠেছে। আবছায়া চাঁদের আলোয় আলোয়, দুপাশের ধানভাঙা মাঠের মাঝ পথটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই পথ ধরে আমাদের যাত্রা শুরু হলো।·· ভৈরবদা আগে আগে চলেছে···আর আমি ও অঞ্জলি তাকে অনুগমন করেছি।

নিরুদ্বেগ যাত্রা, হয়ত হয়েছিল অঞ্জলি আর ভৈরবদার। কিন্তু আমার?··· উদ্বেগের আর সীমা শেষ নেই। হয়ত অঞ্জলি সেটুকু বুঝেই আমার ডান হাতটি তার বাঁ হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছিল।

আলের ওপর দিয়ে চলেছি দুজনে আগে পিছে।···আবছা আলো আর আঁধারের এ যেন এক গোপন অভিসার।···কোথায় চলেছি···কেন চলেছি··· নিরুদ্দেশের দেশে রাত্রিবাসের কেন এ প্রয়োজন···কেনই বা ক্ষণ-নীড় রচনা,

কিছুই জানিনা।…কেমন যেন দিশাহারা পদক্ষেপের আওয়াজে নিজেই শিউরে উঠ্‌ছি।

খোলা হাওয়ার ঝোঁকা এসে অঞ্জলির এলোচুলের রাশিকে এনে আমার চোখে মুখে যেন মায়া-পালক বুলিয়ে দিচ্ছিল।…সারা শরীরটা তাই বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল।…এক ঝলক চামেলীর গন্ধ এসে নাকে পৌছল…

গুনগুন করে গান গাই‥ "গন্ধ আসে কেন দেখিনা মালা-পায়ের ধ্বনি শুনি পথ নিরালা"…

অঞ্জলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে আমায় বেষ্টন করে গানে যোগ দেয়—

"ও আমার ধ্যানেরই ধন
আমার হৃদয় দোলায় হাসি রোদন।"

ভাবি—এ নিবিড়তার মাঝে আবার রোদন কেন?

নিবিড়তায়‥ জুয়ারের টান ধরেছে। হঠাৎ এক হেঁচকায় ওকে নিবিড়তম করে‥ চুপিচুপি বলি—এই-ই! · চাঁদটাকে নিভিয়ে দিতে পারো?

পঁচিশ

রাতের অন্ধকারে যে বাসাটুকু একটা সামান্য টালির ছাউনি ঘর বলে মনে হয়েছিল দিনের আলোয় তা সুন্দর বাংলোর রূপ পেয়েছে।

ছোট তো নয়ই বরং বড়ই বলা চলে। গোনাগুনতি প্রায় আট-দশখানা ঘর। মাঝে হল, সুন্দর করে সাজানো…এক পাশের দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ড রাখা। দু'পাশে দুখানা করে চারখানা ঘর…একখানি ড্রইং রুম, অপরটি লাইব্রেরী। লাইব্রেরী ঘরের আলমারি হিন্দী বইয়ে ভরতি।

এ ছাড়া আরও দু'খানি শোবার ঘর। খাট পালঙ্ক যথাযথ রাখা। সাজসজ্জার টেবিলও সেখানে সুরক্ষিত।

পিছনের দালানটি জাফরি দিয়ে ঘেরা…সেইটাই ডাইনিং হল বলা চলে।

ডাইনিং হলের অপর দিকে প্রকাণ্ড সিমেন্টবাঁধানো উঠান। যেন বিল্ডিংএর শেষ হতে দু'পাশে দুটি উইংস বেরিয়ে গেছে। একপাশের সারিতে দু'তিনখানি করে ঘর। সেগুলা রান্না, ভাঁড়ার, চাকরদের ও গেস্টদের থাকার ঘর।

কুয়া থেকে হাতে ঘোরানো চাকার চাপে জলকে উপরের ট্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। দেখলে মনে হয় যিনি এসব করে গিয়েছিলেন তিনি ইংরেজী পদ্ধতিতে পুরোমাত্রায় অভ্যস্ত।

উঠানের শেষে পাঁচিল ঘেরা। মাঝে দরজা…

সেই দরজা দিয়ে বার হলেই খামারবাড়ি। তিন পাশ ঘিরে ধান চালের গোলা সংরক্ষিত—এ ছাড়া ঢেঁকি থেকে শুরু করে চাকি পর্যন্ত যাবতীয় খামারের জিনিসপত্তর তাও সুরক্ষিত। মালিকের যত্নে বা তত্ত্বাবধানে আজও সব যে চালু রয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়।

অঞ্জলি বলে—মা এই খামারবাড়িতেই নিজহাতে কাজকর্ম করতেন। আর বাবা থাকতেন এই বাংলোতে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে কেবল গ্রামে ফিরে-ছিলেন। মা এ জায়গাটাকে খুবই যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন কারণ মা'র বাল্য-স্মৃতি এর প্রতিটি জিনিসপত্রে জড়িত। মা'রও আমাদের সঙ্গে আসবার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু ওখানকার বিশেষ পরিস্থিতি তা ঘটতে দিল না।

আমি বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। বলি—এ সবই তোমার মানে তোমাদের?

অঞ্জলি হেসে উত্তর দেয়—হ্যাঁ, আমার মানে আমাদের দু'জনার।

আমিও হেসে ফেলি। বলি—গৌরবে বহুবচন, কেমন? তা বেশ, আমাকে জড়িয়ে নিয়ে যদি আনন্দ পাও তো আপত্তি করব না। তবে এর মালিকান স্বত্বাধিকারিণীকে জড়িয়ে আমায় যদি অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাকে দান করা হয় তাহলেও আমি তোমার মা'র চিরবন্দী হয়ে থাকতে পারবো না তা আগে থাকতেই বলে দিচ্ছি।

অঞ্জলি বলে ওঠে—ওঃ, পৌরুষে বাধবে বুঝি?

আমি বলি—পৌরুষ বলে আমার কিছু অবশিষ্ট থাকলে কি আর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করতাম, না এখানে আসতাম। শুধু ভ্রমরের মত ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে ঘুরেই মরছি মাত্র। অন্তরের মধুভাণ্ডে হয়ত বসে আছে এক অজানিত মৌমাছি। ভ্রমর তার খবরও রাখে না।

অঞ্জলি হোহো করে হেসে ওঠে।

তারপর ধীরে ধীরে বলে—মধুভাণ্ডের মধুর চিটে তাকে এমন করে আঁকড়ে চেপে বসিয়ে রেখেছে যে বাছাধন নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু—ঠকাস-ঠকাস হয়ে আবহমান বসে থাকবে। থাক না কত মধু খাবে!

আমি বলি—এদিকে ভ্রমর বেচারী—

কথা কেটে দেয় অঞ্জলি। বলে—ভ্রমর বেচারী সুজন—সৌন্দর্যজ্ঞান তার যথেষ্টই আছে তাই ফুটন্ত পাপড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে ফুল-ভবনের ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে তুলেছে।

আমি উত্তর করি—বটে! হয়ত একদিন ফুল-ভবনের সারা পাপড়িঘেরা দেয়ালগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে।

এবার ও যেন একটু অন্যমনস্ক হলো। তারপর একটা ছোট্ট নিশ্বাস চেপে নিয়ে বলে ওঠে—ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়া পাপড়িগুলি একদিন সার হয়ে সেই মাটিকেই উর্বরতা এনে দেবে। তাতে ফুলদণ্ডপ্রসারী গাছটিকে হয়ত আরও সজীব আরও বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলবে।

—কিন্তু ফুল-ভবনের মধুপ মধু নিঙড়ে নিঙড়ে নিজেও যেমন মরবে তেমনি মারবে ফুলটিকেও। সবুজ পুষ্পাধার তার ঝরা পাপড়িগুলির স্মৃতি বহন করে তখন হয়ত এই ভ্রমরের দেওয়া পুষ্পাধারকে বীজাধার করে গড়ে তুলে রেখে সরে পড়েছে। তবু ফুলাধার ভ্রমরের এই সৃষ্টির অনুপ্রেরণার অমর কীর্তিকে কোনদিনই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই ভ্রমর জুড়ে বসে ফুলের স্বামীত্বের পূর্ণ আসনে আর গতায়ু ফুলের কাছে মধুলোভী মধুপ হয়ে থাকবে কেবলমাত্র যমালয়ের যমদূত।

ম্লান হাসি হাসে অঞ্জলি। মনে মনে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপটি করে থেকে বলে—চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

দুজনে বেরিয়েছি। আজ আর পেছনে পেয়াদা ভৈরবদার খবরদারি নেই। আমরা বেরিয়ে পড়লাম—তিনি বাসায় বসে বসে রান্নাবান্নার তদারক করতে লাগলেন।

সবুজ গেঁয়ো ক্ষেত। তারই মাঝ দিয়ে পথ। এ পথের যাত্রীদের উপর চক্ষুদান করে এমন ক্ষমতা কোন দর্শকেরই নেই। অথচ এই নিরালায় দুজনেই যেন কথা হারিয়েছি। দুজনার কাছে দুজনের যেন প্রশ্ন প্রতিবাদ জবাব কিছুই নেই।

অদূরে একটা কুয়া। তার পাশে একটা বলদ চোখ বুজিয়ে অনবরত ঘুরে চলেছে। আর তারই বেঘোরে ঘোরার আড়ে আড়ে একটা লোহার চাকায় বাঁধা সারি সারি টিনের বড় বড় কৌটা একটা চেনে বাঁধা, কুয়ার জলে ঘুরে ঘুরে নীচের জল ওপরে তুলে নিচ্ছে এবং আপনা আপনি জল নিষ্কাষণ করে একটা বড় নীচু

চৌবাচ্চায় জড় করে চলেছে। চৌবাচ্চার জল নালা বেয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই এ অঞ্চলে ক্ষেতে জলসেচন করা হয়।

অঞ্জলি গিয়ে এই কুয়ার ধারে বসলো। অগত্যা আমিও বসে পড়লাম।

অঞ্জলি আর নির্বাক মনের সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে বলে ওঠে—আচ্ছা, ধর আমায় ছেড়ে যদি তোমায় চলে যেতে হয় তোমার কষ্ট হবে?

আমি নির্বিবাদে উত্তর দেই—না—

অঞ্জলির মুখটা হঠাৎ ভার হয়ে ওঠে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আমি কথা ঘুরিয়ে প্রশ্ন করি—আর তোমার?

ও বলে—আমার কষ্ট হলেই বা কি আর না হলেই বা কি—এতে কার কি এসে যায়।

অঞ্জলি উঠে জলাধারে হাত পেতে দেয়।

হাতের অবিরল জলধারার বাষ্প উঠে বোধকরি ওর চোখের পাতাগুলো ভিজে ওঠে।

ওর ভাব দেখে আমিও যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠি। বলে ফেলি—আসে যায় হয়ত দুজনারই। তবে তুমি বলতে পারলে, অপরজন হয়ত বলতে পারল না—তফাৎ এই।

কেমন যেন চোখটায় ছোঁয়াচ লাগলো ঐ জলধারার—চোখের কোণটা ভরে গেছে কোন্ অবসরে তা বুঝিনি। গলাটাও কেঁপে উঠেছিল সেদিন। বললাম—যা আমার অকপটে বলা উচিত ছিল তা আমি বলতে পারলাম না—লজ্জা পেলাম, অথচ তুমি তোমার শত লজ্জা দু'হাতে ঠেলে দিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে। তাই তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়—অন্তত স্পষ্টতায়, তাইতো তোমাকে আমার এত ভাল লাগে।

অঞ্জলি ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে আমায় তার নরম বুকের মাঝখানটায় জড়িয়ে লুকিয়ে নিল। আমিও যেন এত বড় শান্তি আশ্রয় পেয়ে নাবালকের মত সেই বুকের মধ্যে চুপটি করে মুখ গুঁজে পরম তৃপ্তিতে সময়ক্ষেপ করতে লাগলাম।

তারপর ওকে ডান হাতে জড়িয়ে নিয়ে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। বললাম—দেখো অঞ্জলি মিলনের চেয়ে বিচ্ছেদই বড় এইটাই জীবনভরে অনুভব করে এসেছি তবু প্রাণ নিজে থেকে চায় না এ বিচ্ছেদ ঘটাতে। ওমর খৈয়ামের বর্ণিত সাকীর অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলাম। সে সাকীর দলকে রাশি রাশি জুটিয়ে গেছেন আমার অদৃশ্য ভগবান, কিন্তু তাদের সঙ্গে বাস করতে গিয়ে এইটুকুই

বুঝেছি যে আমাদের বৈষ্ণবধর্মের কৃষ্ণ-রাধার অতনু সহজিয়া প্রেমই পার্সিয়ান কবি ওমর খৈয়ামের কল্পনাপ্রসূত সাকী। তাকে মানসী করে পাশে ধরে রাখা যায় আজীবন কিন্তু বাস্তব ব্যবহারে সে ফুলের পাপড়িরই মত ম্লান হয়ে মাটিতে ঝরে পড়বেই পডবে। তার চেয়ে স্ফুটনোন্মুখ ফুলের সদ্যোজাত সৌরভে ভ্রমর নিজেকে ধন্য করে উড়ে যাক অপর ফুলে। এইটুকুই মানুষের কাব্য-জগতে অমর হয়ে আছে। তাই আমাদের ক্ষোভ থাকা উচিত নয়।

ইতিমধ্যে ও কখন ওর মুখখানি আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল। অর্ধনিমীলিত চোখে বার বার আমার মুখের পানে চেয়ে ও যেন আমায় পান করছিল।

এক এক করে দুটো দিন কেটে গেল। বাস্তব কথার জালে জালে এগিয়ে যাওয়া যেন পেছিয়ে পড়েছে। দুজনের মাঝে কোথায় যেন কথায় কথায় বোঝাপড়ার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু এসব কথার অন্ত কোথায়? এ যে এক দুর্বার স্রোত, আবহমান ছুটে চলেছে মিলনের আশা-ভরসা নিয়ে। এর গতি-স্রোতের মাঝে গা ভাসিয়ে ছুটে চলা ছাড়া কারোরই গতিরন্যথা। দাঁড়ালেই আবর্ত রচনা করবে। সে আবর্তের ঘূর্ণিচক্রে হয়ত অতলান্তে ডুবিয়ে নিয়ে যাবে—না হয় তার আবর্তের বিক্রম চাপে পিষে মেরে ফেলবে।

তৃতীয় দিনের রাত্রি।

ঘুম আসছিল না বিছানায় শুয়ে। কিসের ভাবনায় জানি না, তবে মনের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় হুহু করে উঠছিল। এ যেন ঠিক পশ্চিমদেশীয় দুপুরের দুরন্ত পশ্চিমী ঝড়। ঝড়ের বেগে যেমন একটা মিষ্টি আমেজ থাকে তেমনি করে থাকে একটা উদাস করা উড়ো উড়ো ভাব। তোলপাড় করে তোলে মনের স্মৃতির ভাণ্ডার। চাইলে যাকে পাওয়া যায় তাকে চাইব না। ভাবলে যাকে ভালো লাগে তাকে ভাবব না—এ এক দুরন্ত পরিস্থিতি। এর সমাধান নেই অথচ আছে প্রলোভন। একবার ভাবতে শুরু করলে ভেবেই চলো।

বাইরের বাগানে বেরিয়ে এসে পায়চারি করতে থাকি। আকাশের গায়ে হাজার হাজার তারা বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছে—আমিও ওদের মত চেয়ে আছি—রাত্রির বাতাসে ঝিলমিল করছি। পাশের পথে শিউলি গাছের পাতায় পাতায় আটকে রয়েছে হাজার হাজার শিউলি ফুল। এদের এ অবস্থায় বড়

একটা দেখা অভ্যেস নেই। এদের সর্বদা দেখেছি গাছ ছেড়ে ঝরে পড়ে রয়েছে নীচের ধূলায়। রাশি রাশি ঝরা ফুলে রচনা করেছে বিরহীর বাসরসজ্জা। আজ দেখলাম এরাও রাতের মত সংলগ্ন হয়ে আছে তাদের প্রিয়তম পত্র-কিশলয়ের সঙ্গে। আর ভোর না হতেই ঝরে পড়বে—নেবে ভূমিশয্যা প্রিয়হারা হয়ে।

আমার দরজাটা যেন খুলে গেল। হলের বাতিদানের একঝলক আলো এসে যেন বাইরের বাগান পর্যন্ত পদার্পণ করলো। দেখলাম অন্ধকারের আবছায়ে এসে কে যেন আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল—

তারপরই দরজাটা ভেজিয়ে গেল—স্বল্প আলোটুকু নিমেষে মিলিয়ে গেল বাগান থেকে।

হঠাৎ মিহি চাপা গলায় ডাক শুনতে পেলাম—

এ—ই! এখনও ঘুমোওনি? আমারও ঘুম আসছে না।

আমি মৃদু হেসে বলি—এত রাত্তিরে তাই বুঝি আমায় জ্বালাতে এলে?

ও এসে আমার কাছে দাঁড়ায়। বলে—হলটা তোমার, তাই বোধকরি জ্বালাটা আমার তোমার নয়!

তারপর হাতটি ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলো। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশটিতে শুয়ে পড়লো। সারা দেহটা পুঁটলির মত কুঁচকে ঢুকিয়ে দিল আমার বুকের মধ্যে।

আমি কথা বলতে পারলাম না। কেবল স্নেহের এক অফুরন্ত ধারায় আমি যেন ওকে স্নান করিয়ে দিতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত আরামের পর ও কথা বললো—এ—ই শুনছো! আজ ভোরেই আমি চলে যাচ্ছি—মা ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি চমকে বলে উঠি—আর আমি?

ও বলে—না তুমি না—কেবল আমি। আমার উপরেই এসেছে চিররুদ্ধ কারাগারের দণ্ডাদেশ। তুমি মুক্ত—

আমি বলি—ঠাট্টা রাখো—তাহলে আমাকে [illegible] ইন্টার্ন করা হয়েছে বল?

নাও গো প্রিয় শেষ করে নাও
শেষ বিদায়ের গান,
সময় আছে নিশেষ করো
মদির পাত্রখান।
আসছে বটে ছিঁড়তে দোঁহে
অকাল মহাজ্ঞানী,
জ্ঞান কোথা তার, মূর্খ মহা—
তুমি আমিই জানি।

ওর স্পর্শ ওর নিশ্বাস আমার বুকে যেন তপ্ত আগুনের হলকা বলে মনে হচ্ছিল। অথচ এ অনলজ্বালা যেন আমার অনন্ত হোক এইটুকুই বার বার মনে হচ্ছিল। ওর কানে কানে চুপি চুপি বলি—

জলার জ্বালা সইবে যখন
মৃত্যু-শিথিল প্রাণে,
আংরা আঁচে ঝলসে যাবে
তপ্ত-পরশদানে—
সেই সে দিনের পূর্ণক্ষণে
সকল গর্ব নুয়ে,
লোবান, ধুনা, গুগগুল, ধূপ
পুড়বে চুঁয়ে চুঁয়ে—
কইবে তারা মুচকে হেসে
অগ্নি-শিখা মিছে,
পুড়ছি তবু ঢালছি সুবাস
দুইটি পরত্ সিঁচে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজলো—

ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। বলে—আমার যাবার সময় হলো।

আমি বলি—আর আমি?

ও সটান উত্তর দেয়—তোমাকেও যেতে হবে, তবে আজ নয় কাল এমনি ভোরে।

ব্যবস্থাই করে ফেলেছেন। কাল সন্ধ্যায় আমার বিয়ে। গৃধ্রের আবেদন মা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না—তার পেছনে বিরাট সমস্যা জড়িয়ে আছে। এ না হলে মা'র জমিদারি থাকতে পারে না। এ ব্যবস্থায় সবটাই বজায় থাকবে—পরোক্ষে সে হবে আমার—মানে তোমাব।

আমি বলি—তোমার দশা ?

ও তার উত্তর দেয় না। বলে—কাল ভোরে ভৈরবদা তোমায় নিয়ে নৌকা করে কাশীর পথে পাড়ি দেবে। মাত্র তিন দিনের পথ, অথচ এই তিন দিন কোবয় আর কেবল গ্রামে উৎসব চলবে। তোমাকে যাঁরা নজরবন্দী করে জীবনান্ত করার চেষ্টা কবেছিলেন মা তাঁদের চোখে ধুলো দিয়েছেন। কাল মা'র চিঠিতে সমস্তই জেনেচি—কিছু ভেবো না, তুমি নিরাপদ।

কি যেন জিজ্ঞেস করতে গেলাম। কথা সরলো না, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একসঙ্গে পূর্বাপর বহু কথাই মনের মধ্যে ঘূর্ণিপাক খেতে লাগলো। শুধু মনে হলো এ এক প্রকাণ্ড ষড়্‌যন্ত্র। এর অতলান্তে ডুব দিতে গেলে আমি নিঃশেষ হয়ে যাবো।

অঞ্জলি আমার ওষ্ঠাধরে একটা তপ্ত অঙ্গার ঠেকিয়ে দিল। সারা অঙ্গটাই যেন জ্বলে উঠলো। গলায় আঁচল দিয়ে পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে, তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি উঠতেও পারলাম না। এমন কি বিদায় সম্ভাষণ উচ্চারণ করতেও পারলাম না। এমন কি বিদ্রোহী ক্ষিপ্ত মন একবারও চীৎকাব করে উঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে পর্যন্ত পারলো না যে এ তোমাদের অন্যায়···তোমার মা'র অন্যায়—তোমার অন্যায়—সবার অন্যায়।

পরমুহূর্তেই মন বললো—অন্যায় তোর নিজের। এ নিমন্ত্রণ তোকে কে গ্রহণ করতে বলেছিল।

অঞ্জলিও একদিন সে কথা বলেছিল। বলেছিল আমি বোকা—মূর্খ। কিন্তু সে আমায় ঠকায়নি। আমার মনটুকুর পরিধি ছাড়িয়েও সে আমায় অফুরন্তভাবে ভরে দিয়ে গেল। হয়ত আমি চিরজীবনই এই স্মৃতিটুকু নিয়ে পূর্ণ হয়ে থাকবো—কিন্তু সে ?

সে তো যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে চলেছে। দেহ বলিদানের পর মনটুকুই তার হয়ত সারাজীবনের জীবনকাঠি হয়ে থাকবে।

ভাবতে গিয়ে নরম হয়ে আসে নিজেরই মন। অবিচার সে করেনি

আমাকে। রাণীমাও করেননি। সে আমার জীবনের পান্থশালায় যাত্রিসংখ্যার একজন মাত্র। থাকাকালীন এই পান্থশালাকে বড় আপন করেছিল।—কিন্তু চলে গেলেও তার স্মৃতিটুকু পান্থশালার এক প্রধান সম্পদ হয়েই থাকবে।

সারা দিনটা বসে বসে ভেবেছি—

কি ভেবেছি—কেন ভেবেছি তা নিজেই বুঝে উঠবার শক্তি হারিয়ে ফেললাম। কখন মনে হয়েছে—এ যে কত বড় নৃশংস খেলা আমার জীবনের উপর দিয়ে এরা খেলে গেল! আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে—প্রকৃতির অনন্তলীলার একাংশ যদি আমারই উপর দিয়ে খেলে যায় তাতে নিজেকে ধন্য মনে করাই উচিত। এই বিচিত্র নিত্যলীলাময়ী পৃথিবীর সব রসই সঞ্চয় করা তো প্রকৃত রসিকের কর্তব্য।

নাওয়া খাওয়া সেদিন করা হলো না। শুধু সিগারেটের পর সিগারেটের ধোঁয়ায় নিজেকে আর নিজের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করে তুললাম।

আবর্তের বিপাকে জীবন দুর্বিষহ হলেও সে জীবন টেনে নিয়ে চলতেই হবে। মনে হতে লাগলো জীবনের এ কালিমা নিয়ে লোকসমাজে দাঁড়াবো কি করে। আর লোকসমাজ থেকে যদি সঙ্গোপনে এ বার্তা লুকিয়ে ছুপিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলি তাহলেও নিজের দেহ-মনের কাছে আমি যে কত ছোট হয়ে গেছি তা ঢাকবার পন্থা কোথায়?

পন্থা—মহাকাল।

কালের চক্রবিবর্তনে কত অন্ধকারই না আলোকিত হয়ে ওঠে, আবার কত আলোকোজ্জ্বল গৌরবময় জীবনছবিই না দেখতে দেখতে কালের গভীরতম তমতে গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে।

দুপুর কেটেছে—

বিকেলে ঘরের মধ্যে আর ভালো লাগলো না। বেরিয়ে পড়লাম সামনের শস্যশ্যামল সবুজের বুক চেরা পথে। এই চিরন্তন হরিয়ালির জীবনান্ত যৌবন উচ্ছ্বাস দেখে মনটা যেন হালকা হয়ে গেল। মনে হতে লাগলো—

আয় না সখি তর্ক রেখে
সর্বলোকের ভালো,
ধূপ দীপালি না জ্বালালে,
কখন দেছে আলো?

ওই যে জোয়ার-গমের শীষে শীষে নতুন ফসলের সম্ভার মাথা নাড়া দিয়ে, পরস্পরের গায়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আর তারই আশেপাশে ছোট ছোট সাদা হলদে, রংবেরঙের চিত্র-বিচিত্রিত প্রজাপতির দল ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তারা কৈ তো আমার মত লজ্জায় ক্ষোভে অনুশোচনায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে না!—

মনে হতে লাগলো—না এ আমার লজ্জা নয়, বরং এ আমার গৌরব।··· পুরুষত্বের পৌরুষ · এ আমার কর্তব্য।

কৃষ্ণকলি ভালবাসে
সাঁঝ রূপসী উমা,
গোলাপবধূর ওষ্ঠাধরে
প্রজাপতির চুমা—
নীল নীলিমায় নীলাম্বরে
গাঁটছড়াতে বাঁধা,
বিশ্ব যখন কয় না কথা
কিসের তবে বাধা!

বিশ্বের সংস্কারে এ মিলন এ বিচ্ছেদ যখন নির্বিকার, যখন এর যশ নিন্দা দুইই একাকার তখন বিশ্বের জাতক হয়ে এ নিয়ে সখেদ তোলাপাড়ার মানে হয় না।

ভাবতে ভাবতে কখন দাঁড়িয়ে পড়েছি সেই জলসেচনের কুয়ার কাছে। জলের কলকলধ্বনিতে হঠাৎ আকৃষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখি অঞ্জলিকে, ওরই করপুটের অবরোধে জলধারার দুর্নিবার আগলকে ভাঙবার আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে।

আগল ভেঙেছি—ও আমি দুজনেই।

ওর আগল ভাঙার বেদনা কিন্তু ওর মুখে চোখে আমি লেশমাত্রও অনুধাবন করতে পারিনি। মুখখানি তার ম্লান হয়েছিল বটে—সে আমারই বিচ্ছেদ-বেদনায়।

আর আমার?

আগলভাঙার অপরাধের দায়ে আমি যেন ফাঁসি যেতে চাই।

ছিঃ, এ শুধু দুর্বলতা—মনের কুসংস্কার। মনটাকে ঝেড়ে ফেলে নিজে নিজেই বলি—মন চাঙ্গা তো সব চাঙ্গা! মনের খতেনের পাতায় পাতায় আঁকা রয়ে গেছে কত কত রূপসীদের ছবি, লেখা রয়েছে তাদের পর্ব পর্ব স্মৃতিকথা—মান, অভিমান, বিরহ-মিলন। এও সেইরকম একখানি পাতামাত্র সংগ্রহলিপির।

কি বুঝলাম জানি না।···মনকেই বা কি বোঝালাম তাও জানিনা—তবে মন মেনে নিয়েছে—সে শান্ত হয়েছে।

আকাশে সন্ধ্যা নামছে। দূরের চক্রবালে সূর্য গা ঢাকা দিচ্ছে। তার রক্তিম ছটায় পশ্চিমাংশের সিঁথিতে সিঁদুর দেখা দিয়েছে। ও যেন অঞ্জলির আজ রাত্রেরই আর এক রূপ।···

এর একটু পরে মুছে যাবে সিঁথি থেকে সিঁদুর। দিকমেখলার আরক্তিম সজ্জা ডুবে যাবে এক অন্ধ তমসায়। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কেমন নিবিড় হয়ে আসছে—তারপর?

তারপর ভোরের আলো প্রদোষের সঙ্গে সঙ্গে ফুটে বেরুবে। এই তো প্রকৃতির নিত্য খেলা। তবে অন্ধকারের ভয় কোথায়! অন্ধের একমাত্র আশাই তো আলোর প্রকাশ!

বাংলোয় ফিরে এলাম।

ভৈরবদা বললেন—সারাদিন তো কিছু খাওনি, তা রাত্তিতে তো কিছু খাবে? শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে?

শরীর খারাপ বলেই দুপুরের আহারটাকে এড়িয়ে চলে গেছিলাম। কিন্তু ভৈরবদার কথা শুনে মনে হলো এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এখন ভৈরবদাই আমার পরম আত্মীয়। বললাম—আমি এখন ঠিক আছি ভৈরবদা। রাত্রে নিশ্চয়ই খাবো—বেশ ভালো করেই খাবো।

আমার কথা শুনে ভৈরবদা কাজের জন্য পা বাড়ালেন। আমি বলি—আসুন ভৈরবদা গল্প করা যাক। একা একা যেন হাঁপিয়ে উঠছি—

ভৈরবদা উত্তর না দিয়েই আমার অনুসরণ করলেন।

বাইরের বারান্দায় একখানি হাফ-ইজি চেয়ারে বসে পড়লাম। ভৈরবদা এসে সামনে থেকে মোড়াখানা টেনে আমার অনতিদূরেই বসলেন।

আমিই কথা শুরু করলাম। বললাম—আচ্ছা ভৈরবদা, আপনি তো এঁদের চাকর নন। অঞ্জলির কাছে শুনেছি বরং আপনি অঞ্জলির গুরুজন। অথচ এইভাবে—

ভৈরবদা মুখে আর জিবে শব্দ তুলে বললেন—রামঃ! আমি এই জমিদারির

একজন সামান্য চাকরই বাবুসাহেব। চাকর বৈ তো আর কি? ক্ষেতে রোজ খেটে দিনকামান করতাম অঞ্জলির বাপের কাছে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করি—খেটে খেতেন, তবে যে অঞ্জলি বললো আপনি তাঁর পরম আত্মীয়।

ভৈরবদা একটু চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ঐ যাঃ ডাল পোড়ার গন্ধ বেরিয়েছে। বলি ও পাঁড়েজ, ডাল চড়িয়ে কোথায় গেলে—

বলতে বলতে ভৈববদা সটকান দিসেন। বুঝলাম কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যে ভৈববদার এটা একটা বাহানা মাত্র।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম।

ঘরেব মধ্যে বাতি জেলে দিয়ে গেল। দেয়ালগিরির আলো—রোশনি নেই। শুধু অন্ধকারকেই যেন বাড়িয়ে তোলে।

ঘরে ঢুকলাম না বরং অন্ধকারে বাগানেই নেমে পায়চারি শুরু কবে দিলাম।

মাথার মধ্যে ভৈরবদার এড়ানো কথাগুলোর একটা খেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভৈরবদা রোজানীর চাকর। খেতি করতেন অঞ্জলির বাবার কাছেই। অথচ বিশ বিশটা বছর এ গাঁও থেকে গা ঢাকা দিয়ে তবে ছিলেন কেন?

খুনখারাপির দায়ে নাকি?

না—তাহলে ফিরে এলে রানীমাই বা অমন যত্ন করে ওঁকে নিজের কাছে রাখলেন কেন?

দুরন্ত ভাবনা আবার মগজে চেপে বসেছে।

এদের ছেড়ে যখন চলেই যেতে হবে তখন অতশত ভেবেই বা লাভ কি? সত্যি তো ওরা আমার কে?

ট্রেনের যাত্রী বন্ধু বৈ তো কেউ নয়। বন্ধু বলেই বোধহয় ভেবে মরছি!··· না—ঐ গৃধ্র···ও তো আমার পরম শত্রু···ওর ভাবনাটাও তো আমার কাছে কম নয়। আজই রাত্তে অঞ্জলিকে ও আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে ছিনিয়ে নেবে।

বাবুসাহেব, খানা তৈরী।

খেতে বসলাম। ভৈরবদা চুপটি করে পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর ছায়া মস্ত বড হয়ে সামনের দেয়ালে গিয়ে পড়েছে। খেতে খেতে হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। ফিরে দেখলাম ভৈরবদা কেমন উদাস দৃষ্টিতে আমার

পানে চেয়ে আছেন। আমি কথা বললাম না। ভৈরবদাও বলেননি। দুজনেই চুপচাপ—কেবল আমারই খাবার শব্দটা নিজের কানে এসে বাজছে। নিশুতি রাত্রি একঘেয়ে চিবোনোর শব্দের সঙ্গে ভৈবরদার ভৌতিক ছায়াটায় যেন কোথায় সম্বন্ধ পাতাতে চাচ্ছে। মনটার মধ্যে কেমন যেন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে থাকে। খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়লাম।

তবু ভৈরবদা কথা বললেন না। ধীরে ধীরে তিনি চোখের সামনে থেকে সরে গেলেন।

আমিও উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকি।

ভুল করেছি। নিজের ঘরের বদলে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ঢুকেছি অঞ্জলির শোবার ঘরটায়। দুটো ঘর দেখতে প্রায় একরকমের। আসবাবপত্রও প্রায় এক। ওর খাটেই বসে পড়লাম। খাটের পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। দেখলাম অঞ্জলির হাতের লেখা একখানা অর্ধসমাপ্ত চিঠি।

বিস্মিত হয়ে দেখতে গেলাম এ চিঠি কার উদ্দেশ্যে লিখছিল সে। হাতে তুলে নিয়ে অবাক হয়ে যাই।

লিখেছে :

প্রিয়তম,

তোমায় নিয়ে আমার জীবনেব খেলাটুকু যখন শুরু হয়ে বহুদূর এগিয়ে গেল তখনই বুঝলাম আমি ভুল করেছি।

ভুল পথে টেনে এনেছি তোমাকেও—তাই আমিই অপরাধী। তোমায় সাবধান করা আমার উচিত ছিল—তোমায় পথ থেকেই ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া—হয়ত তা কষ্ট বলে মনে হতো তবু দুষ্ট হতো না।

কিন্তু, তোমাব উপস্থিতি আমায় পাগল করেছিল, বরং ভেবেছিলাম তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাবো। আমার জন্মরহস্যের জাল, জমিদারির পূর্বপুরুষদের বিছানো জাল আর গৃধ্র প্রধান সিংএর নবরচিত পাশজাল মা'র সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে মায়া হলো, তাই পারলাম না।

কাল নিজেকে যার হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছি তার প্রতিও মায়ের স্বার্থ ব্যতিরেকে কোনো মমতাই আমার নেই।

তুমি জানো আমি সংস্কার মানি না। কাজেই সমস্ত সামাজিক

অনুষ্ঠানই আমার কাছে ছেলেবেলার মাটির খেলাঘরের চেয়ে বড় নয়। বাস্তব জগতের খাওয়া-পরা মান-সম্মান বজায় রাখার উপাদান হিসাবেই একে আমি গ্রহণ করছি, তার বেশী এতটুকু অনুকম্পা আমার মনে স্থান পায়নি।

মনই মানুষের স্বর্গ রচনা করে। সেই মনটুকু তোমাকেই দিয়ে ফেলেছি, তাই সেইটুকুর আশায় সারা জীবনই অপেক্ষায় থাকবো।

জানো ?· মা'রও নাকি এমনি করে জীবন অপেক্ষায় কেটেছিল —ভৈরবদা একদিন সে কথা আমায় বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন। শুধু বুঝলাম যে এ রোগে আমাদের বংশপরম্পরাই আক্রান্ত হয়েছে—যাক সে সমস্ত কথা—

একটা কথা লিখে আমার মনের অনুলিপি আজ শেষ করতে চাই, সেটা হচ্ছে—

তারপর আর লেখা হয়নি।

কাকে লিখছিল জানি না তবু মনে মনে নিজেকেই ওর প্রিয়তমের আসনে বসিয়ে নিয়ে তৃপ্তি পেলাম। চিঠিখানা হাতে করে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। ভৈরবদা সেখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমারই অপেক্ষায়। আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন—রাত সাড়ে তিনটায় উঠতে হবে, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো বাবুসাহেব।

আমি কোনোরকম ভণিতা না করে বলে ফেলি—এক কাজ করা যাক না ভৈরবদা—একেবারে নৌকোয় গিয়ে বিছানা পেতে এখন থেকে শুয়ে পড়লে কি হয় ?

ভৈরবদা ফ্যাসফ্যাস আওয়াজে উত্তর দিলেন—এখনও পানসি এসে পৌছয়নি।

ভৈরবদা যেন একটা নিশ্চল প্রতিমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন।

বললাম—পানসি আসবে কোথা থেকে ?

ভৈরবদা বললেন—তোমার রাণীমার কাছ থেকে।

বললাম—তাহলে তৈরী হয়ে নি।

ভৈরবদা বললেন—তোমার জিনিসপত্তর সবই গুছিয়ে রেখেছি অঞ্জলির কথামত—এখন কেবল পানসির অপেক্ষা।

রাত দুটোয় পানসি এসে পৌছলো।

ভৈরবদা এসে দাঁড়ালেন আমার ঘরে। বললেন—পানসি এসে গেছে—যদি এখনি বেরুতে চাও বেরুতে পারো।

এতক্ষণ বসে বসে স্বপ্ন দেখছিলাম। দেখছিলাম গৃধ্র প্রধান সিংকে প্রদক্ষিণ করে অঞ্জলি যেন সাত পাক ঘুরছে। যেন গৃধ্রের চাদরখানা টেনে নিয়ে কে যেন অঞ্জলির আঁচলের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিয়েছে···কে যেন লকলকে আগুনের সামনে খই ছড়িয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে উঠছে।

ভৈরবদার কথায় চমকে উঠে স্বপ্ন ভেঙে যায়। চমকে উঠে বলি—হ্যাঁ আমি তৈরী—চলুন।

এটা একটা মাছধরা পানসি। মাথায় ছোট্ট একটু হালকা ছই।

উঠে বসলাম নৌকার উপর। মাঝিমাল্লার বালাই নেই···পানসির শেষ প্রান্তে উঠে বসলেন ভৈরবদা—নিজে হাতে উঠিয়ে নেন বোটেখানা।

ছইএর মধ্যে একটা চৌকো অভ্রের চিমনির মাঝে জ্বলছে একটা টেমি। তারই ক্ষীণ আলোয় দেখা যাচ্ছে ভৈরবদার খালি গায়ের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠা-নামা শুরু করেছে।

নিমেষে নৌকা তীরবেগে ছুটে চললো।

আলো-আঁধারের মাঝে ভৈরবদার হাত-পা একসঙ্গে বোটে টেনে চলেছে।

ছাব্বিশ

পলাতক—আমি!

আতঙ্কপীড়িত রাত্রির যাত্রী আমি! আজ···

সবাই যেন ষড়্‌যন্ত্র করে আমায় দূরে সরিয়ে দিতে চায়—নিমন্ত্রণ করে যারা এনেছিলেন তাঁরাও!

হেরে গিয়ে প্রাণ নিয়ে গোপনে পালাচ্ছি···

চাঁদবিহীন আকাশ, তবু তারার ঝিলিমিলি-চোখগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে আমার এই ভীরু, রাত্রের অভিযান।

অন্ধকারের আবছায়ে লোক চেনা জানা যায় না কিন্তু সবই দৃষ্টিগোচর··· ওরা দেখেছে যে আমি প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে চলেছি···

আলো আঁধারের মাঝখানে ভৈরবদার হাত পা দুটো এক বিকট ছায়ালোক সৃষ্টি করে সজোরে বোটে চালিয়ে চলেছে···

দুরন্ত বেগে নৌকাখানা ঠিকরে ঠিকরে দৌড়াচ্ছে···

নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই···তীরগুলো দু'ধারে সরসর করে অদূরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে···

ওগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে না, নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অঞ্জলির ইতিবৃত্ত··· বর্তমানের ঘূর্ণাবর্তে কোথায় যেন তলিয়ে গিয়ে দূরের অন্ধকারে অতীতের প্রেত-মূর্তি হয়ে ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছে।

শুনলে বা পড়লে মনে হবে এ এক গল্প কথা, আজগুবী অবাস্তর রূপকথা···এ অসম্ভব-বানানো-কথা। কেউ বলবেন, বাগবাজারের গাঁজার ইটে বসে দম দিলেও এ তো শোনা যায় না। আধুনিক লিকলিকে ড্রেন পাইপ প্যাণ্ট আর টেরিলিনধারী ছোকরারা হয়তো বলে উঠবেন—গ্যাস দিচ্ছে রে! তাঁদের অনুমোদন করে হয়তো পনিজ টেল বাঁধার দলেরা করুণা করে খুঁক করে মুচকে হেসে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন·· কিন্তু···

কেবল আর কোবয় গ্রামের সেদিনের রুদ্রনারায়ণ, প্রধান সিং, অঞ্জলি আর রাণীমা আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে এক ধুলিসমাচ্ছন্ন বাস্তবই হয়ে থাকবে। এ অভিজ্ঞতার দাম কে দেবে?

নীরব দুটি প্রাণীর মনে কথা যেন ভৈরবদার বোটের ঝটকা টানে টানে ধাক্কা খেয়ে তল পর্যন্ত ঘুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে···ওইটুকুই ছিল সে রাত্রের বাস্তবতা··· আর বাকী যা তা আবছায়ের পথে মিলিয়ে চলেছে।

ছোট গণ্টক, তিলজুলা, মান আর কেবল নদী এসে মিশেছে গঙ্গার গর্ভে···

নৌকা এসে পড়লো সেই মোহনার ধারে···

মথুরাপুরের নেশাটুকু ভোরের বাতাসে যেন হালকা হয়ে আসছে···

ভৈরবদা হঠাৎ বোটে থামিয়ে বলে ওঠেন—বুঝলে বাবাজীবন, রাণীসাহেবা শুধু এইটুকুই চেয়েছিলেন! তোমায় নিরাপদে ঐ ভুলভুলিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া! কারোকে বিশ্বাস হয় না তাই আমায় ডেকে বললেন—এই বুড়োবয়সে পারবে ভৈরব? আমি বলি—পারব না! তোমার মাকে নিয়ে দুই রাত আর এক দিনের উজান বেয়ে কাশী পাড়ি মেরেছিলাম, মনে নেই?

আমি বলি—তাই নাকি ভৈরবদা·· রাণীমার মাকে আমারই মত একদিন পালাতে হয়েছিল কাশীতে?

ভৈরবদা যেন গায়ের জ্বালা ঝেড়ে বলে উঠলেন—না পালিয়ে উপায় ছিল না·· নইলে সে রাতে তার আটবছরের মেয়েকে গুম্ বন্দী অবস্থায় ফেলে সে কি আর যেতে চেয়েছিল—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো! আমিই সেদিন জোর করে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাই···নইলে দেখতাম ওই হতচ্ছাড়া নচ্ছার রুদ্দ্রনারাণকে···যে ও কত বড় আর আমি কত বড়!···কিন্তু ললাটের লিখন কে খণ্ডাবে বাবাজীবন—রুদ্দ্রনারাণকে ভগবান বাঁচাবে তা আমি কি করতে পারি!

আমি নিশ্বাস রুদ্ধ করে শুনে যাই ভৈরবদার কথা। বলি—কি হয়েছিল ভৈরবদা আপনার সঙ্গে?

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ভৈরবদা চীৎকার করে উঠলেন—সে চীৎকার গঙ্গার তীরে তীরে প্রতিধ্বনি হয়ে উঠলো। বললেন—কি হয়নি?···আমার স্ত্রীকে অপহরণ করে তার জাত কুল মান সব লুটে নিল ওই বদমাস লম্পট অথচ আমি মরদ হয়ে তার কিছুই করে উঠতে পারলাম না··

আমি বলি—কেন?

তেমনি উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলেন ভৈরবদা—কোবয় গাঁয়ের এই পুরো-কায়স্থরাও কম যায় না বাবাজীবন···বিশেষ করে বিশু পুরোকায়স্থ—যমকে পর্যন্ত ভয় করতো না···

তারপর হঠাৎ কেমন নিভে গিয়ে স্তিমিত স্বরে ভৈরবদা বলেন—যাক সে কথা—মনে হলে আজও হাত পা সব শিথিল হয়ে আসে—আজ আর সেই বিশু পুরোকায়স্থ নেই বাবাজীবন, সে এখন বিশ্বেশ্বরের দ্বারী কালভৈরবের পাথর-মূর্তি হয়ে কেবল গ্রামের লোকেদের কাছে হয়েছে রাণীসাহেবার খাস চাকর ভৈরব।

তারপর ভৈরবদার হাতের বোটে থেমে যায়। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে·· মাথা থেকে গামছার পাগড়িটা খুলে নিয়ে চোখ মুছে নিতে নিতে বলেন—তবু বাবাজীবন শান্তি পেয়েছি···হাজার হোক মেয়েকে কাছে পেয়েছি · সোনারচাঁদ নাতনী পেয়েছি···সাবেকের দুঃখে জলেপুড়ে তো খাক্ হয়ে গেছিই···আর কেন ওসব ক া!

আমি বলি—তবু ভৈরবদা বলতে হবে আপনাকে সেই পুরাতন কাহিনী··· আপনি অঞ্জলির দাদামশাই—আমারও প্রণম্য।

ভৈরবদা নিশ্বাস ফেলে বলেন—তবে শোনো বাবাজীবন। অঞ্জলির বাপ ঐ

রুদ্দ্রনারান ছিল একটা অকালকুষ্মাণ্ড লম্পট আর পাষণ্ড। পরের কুলনারী অপহরণ করাই ছিল তার নিত্যদিনের ধর্মকর্ম।

আমি ছিলাম কোবর গ্রামের ক্ষেতখামারের নায়েব। আমি আমার স্ত্রী আর একটি মাত্র মেয়ে—বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটছিল দিন। হঠাৎ কোবর গ্রামে রুদ্দ্রনারাণ এসে অবস্থান করতে শুরু করে দিলেন। কি সমাচার? না, এখানে মা-ষষ্ঠীর মন্দির গড়তে হবে। যাতে করে মন্দিরের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় তারি জন্যে নিজে সংসারপুখুরের বাগানবাড়িতে এসে উঠলেন।

সন্ধ্যে হলেই চাই ঢুকুঢুকু · আর রাত্রে আসবে যেখান থেকে হোক একটা রাত-খোরাকী···কি বলব বাবাজীবন, দেশটাকে যেন উস্তন-ফুস্তন করে তুললেন।

আমার জানা ছিল না যে বদমাশটা রাত-খোরাকী খুঁজতে খুঁজতে আমার স্ত্রী রাজলক্ষীর উপরও নজর চালিয়ে বসে আছে।···হঠাৎ আমায় মথুরাপুরে পাঠিয়ে দিয়ে সেই রাতেই তাকে অপহরণ করলো···

আটবছরের মেয়ে বিছানায় অঘোরে ঘুমুতে লাগলো···রাজুকে নিয়ে সংসারপুখুরের বাগানবাড়িতে এনে ফেললো।

মথুরাপুরে পাড়ি দিতে গিয়ে আমি ফিরে এলাম ··এমনি ঝড়বৃষ্টি বাদল নামলো সেদিন।···রাত তখন দশটা বাজেনি···ঘরে ফিরে এসে দেখি···মামলা খতম—সব পাচার কেবল মেয়ে আমার অগাধে পড়ে ঘুমুচ্ছে· ·

আমি খানাতল্লাশি করে যখন লাঠিয়ালের দল নিয়ে ছুটে সংসারপুখুরে পৌছলাম তখন রাত বারটা ·

যা ভেবেছিলাম তাই···ওখানেই রাজুকে আটক করেছে। নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজুকে টেনে বার করে, পাষণ্ডটার মুখে তিন লাথি কষিয়ে উঠে বসলাম এমনি একটা পানসির উপর—তার পর ··

চুপ করে যান ভৈরবদা···

আমিও চুপ করে থাকি।

কেমন ভাঙা ভাঙা স্বরে ভৈরবদা আবার বলতে থাকেন—গ্রামে ফিরে ঘরে গিয়ে দেখি কমলি আমার বিছানায় নেই ···খোঁজ খোঁজ, অথচ রাজুকে ছেড়ে যেতে পারি না। লোকপরম্পরায় শুনলাম কাছারিবাড়ির দরোয়ান এসে কমলিকে তুলে নিয়ে গেছে···থাক নিয়ে···যা হবার তা হবে···আমি সেই রাতেই রাজুকে নিয়ে নৌকায় এসে আবার চাপলাম। তারপর দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঘোটে

ধরে এমনি জোরেই নৌকা ছাড়লাম। তখন আমি জোয়ান পাট্টা…দু'রাত এক দিনে গিয়ে পৌঁছলাম কাশীধামে।

আবার চুপ করে যান ভৈরবদা…

আমি বলি—মেয়ের কি হোলো ?

উত্তেজনায় ফেটে পড়েন ভৈরবদা, উত্তর দেন—ঐ তো কাল হলো, নইলে নালিশ রুজু করেছিলাম—দেখিয়ে দিতাম তুই কত বড় রুদ্দুরনারান…কিন্তু চিঠি দিয়ে ভয় দেখালে হতভাগা—মেয়েকে ধরে রেখেছি এই জন্যে…যদি এতটুকু এদিক ওদিক করিস তবে মেয়েকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

কমলির মা কেঁদে পড়লো। বলে—যা হবার হয়েছে·· মেয়েটার জীবন নষ্ট করো না।

থেমে গেলাম। তারপর থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে এসে দেখে যেতাম আমার কমলিকে।

আমার চোখের সামনে থেকে যেন এক লৌহ-যবনিকা সরে গিয়ে রাণীমার ইতিবৃত্তটুকু জলজল করে উঠলো…

ভোরের হাওয়া ছেড়েছে…

দিগন্তের মেখলায় আলোর রেশটুকু অন্ধ তমসাকে যেন দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিলো।

আমি বলি—ভৈরবদা, রাণীমার ইতিহাসটা আমার জানা নেই…দয়া করে একটু খুলে বলবেন ?

দূরে মোকামা ঘাট দেখা যাচ্ছে…

সেই দিকে চেয়ে ভৈরবদা বললেন—ঐ ঘাটের লাগোয়া-ট্রেন পাবে বাবাজীবন …তুমি দেশে চলে যাও…।

ভৈরবদা আমার কথার জবাব দেবেন না বলেই বোধ হলো·· তাই আর কথা বাড়ালাম না। অঞ্জলির মুখে, রাণীমার নিজের মুখে, আর ভৈরবদার জবানিটুকু নিয়ে সূত্র-ছেঁড়া ঘটনার মালার টুকরোগুলোকে মনে মনে জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সাতাশ

নৌকা এসে ঘাটে ভিড়লো যখন তখন বেশ ফরসা হয়ে গেছে…গঙ্গা-স্নানার্থীরা অদূরে জলে দাঁড়িয়ে অবগাহনের কাজ শুরু করেছেন।

ঘাটে নামিয়ে দিয়ে ভৈরবদা একখানা সীলমোহরকরা খাম বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। বললেন—রাণীমা দিয়েছেন। আরও বলেছেন বাড়ি পৌছে প'ড়ো… পথেতে খুল না এটাকে।

তারপর আমার কাছ ঘেঁষে সরে এসে বলেন—তুমি বাবাজীবন আমাদের বড উপকারই করে গেলে। দশানি ছ'আনির মামলাটা চিরকালের জন্যে নিষ্পত্তি করে রেখে গেলে। তাই যাবার সময় তোমায় আশীর্বাদ করি।

আমি নমস্কার জানিয়ে বলি—বেশ তো! এইবার আপনি ভৈরব নামের অন্ত করে দিয়ে আবার বিশ্বেশ্বর পুরোকায়স্থ হয়ে বসুন।

জিব কেটে ভৈরবদা বলে ওঠেন—না রে ভাই না! তার এখনও দেরি রয়েছে। ঐ ঘাটের মড়া প্রধান সিং যেদিন মরবে, সেই দিনই আমাদের সবার শাপান্ত হবে। তুমিও সেদিন খবর পাবে বাবাজীবন। সেদিন কিন্তু এখানে ফিরে আসতে এতটুকু দ্বিধা করো না!

ফিরে যান ভৈরবদা নৌকোর ওপর।

আমি এসে উঠলাম স্টেশন ইয়াডে। একখানা আপ ট্রেন হুহু করে এসে স্টেশনে ইন্ করলো। আমি বিনা টিকিটেই একখানা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে বসলাম।

ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গালাআঁটা রাণীমার খামখানা ছিঁড়ে ফেললাম।… দেখলাম চিঠি নয়, ছোট একটি হাতে লেখা পুস্তিকা।

পুস্তিকার কভার পেজে লেখা—'কমলমণির রূপকথা'…

পাতা উলটে দেখলাম ছোট্ট একটি উৎসর্গপত্র।

তাতে লেখা—এই রূপকাহিনী তোমাকে দিলাম…যত্ন করে পড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলো ‥আশীর্বাদিকা রাণীমা।

পরপৃষ্ঠায় রূপকাহিনীর গল্পারম্ভ…শুরু হয়েছে এইভাবে—

"বিশ্বেশ্বর আর রাজলক্ষ্মীকে জব্দ করতে রাজাগড়ের জমিদার রাজা রুদ্রনারায়ণ আটক করে রাখলো তাদের আটবছরের কমলমণিকে।

ছ'বছর ঘরে বন্দী রেখে নিষ্কৃতি দিল ক্ষেতখামারের মজুরানী করে…

কমলমণি আবার দেখতে পেলো উন্মুক্ত আকাশ, শ্যামকান্তি ক্ষেতের ধান-বাজরার চাষবাস।…কিন্তু তার আত্মীয় বলতে রইলো না কেউ·· রইলো না স্বজন-পরিজন কেউ কোথাও।

পিছনে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখের চাহনি নিয়তই তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে। কমলমণির দিননামচার কাজ-কর্মের ফর্দ আসে সেইখান থেকে…যে তার সর্বময় কর্তা। তার দয়াতেই কমলমণির বাঁচন-মরণ।

ছেলেবেলার দিনগুলি কমলমণি ভুলে যেতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির জাঁতার পাকে নিজেকে নিষ্পেষিত করতে। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম আর আহারের ফলে কমলমণির দেহের সৌষ্ঠব যেন দিনের দিন ফেটে পড়তে থাকে। সে চেহারা ক্ষেতের যুবা কৃষকদের চোখে বাসা বাঁধার আগেই তাকে সরিয়ে নিয়ে আসা হলো খাস খামারের একচ্ছত্র কর্ত্রী করে।… কে এর কর্তা ?…কার আজ্ঞায় আর তত্ত্বাবধানে কমলমণির এ পদোন্নতি ?

খামারবাড়ির একচ্ছত্র সরকার, রাজাবাবুর পেয়ারের কর্মচারী শ্রীল রতিকান্ত রূপে গুণে নওজোয়ান। ইনিই বুঝে নেন কমলমণির কাছ থেকে দিনের হিসাবনিকাশ। মেয়েমজুরদের নিয়ে কমলমণির উপর খামারের ধান তোলা, ধান ঝাড়া থেকে যাবতীয় কাজের দায়িত্ব·· সে কাজের কৈফিয়ত দিতে হয় রতিকান্তকে।

এই নিয়েই রতিকান্তের সঙ্গে কমলমণির ঘনিষ্ঠতা।

রোজের তর্কবিতর্কের মাঝে রতিকান্ত কিন্তু হাঁ করে চেয়ে থাকে শুধু কমলমণির মুখের পানে।

আর কমলমণি ?

সরকার মশাইএর লোলুপ দৃষ্টির মানে বুঝতে পেরে একদিন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কষিয়ে দিল তার গালের ওপর একটি সজোর চপেটাঘাত।

চড় খেয়ে সামলাতে না পেরে রতিকান্ত ঘুরে পড়লো মরাইএর গায়ে·· বাঁশের চ্যাচরা লেগে রতিকান্তের কপাল চিরে রক্ত ছুটলো।

কমলমণি তার আঁচলের প্রান্ত ছিঁড়ে সেদিন জড়িয়ে দিয়েছিল তার মাথার বন্ধনী। এইটুকুই রতিকান্তকে যেন কমলমণির ওপর নতুন করে অধিকার স্থাপন করবার সুযোগ রচনা করে দিল।

ঘি আর আগুন·· পাশাপাশি কতক্ষণ নিজের সত্তা বজায় রাখতে পারে, তাই কমলমণিকে জয় করলো একদিন রতিকান্ত।

মায়ামমতাবিহীনা, আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্তা কমলমণি জীবনে এই প্রথম দরদি বন্ধু পেলো ··সে বন্ধুকে আত্মসমর্পণ না করে কমলমণির উপায় কি ?

'বিয়ে করবে তো ?' ··কমলমণি রতিকান্তকে তার গা ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিল।

রতিকান্ত বলেছিল—'নিশ্চয়ই !'

এর পর আর বাধা নেই।

বলিষ্ঠ ভ্রমর জড়িয়ে নিল কমলমণিকে · তার পৌরুষ-পরাক্রম দুই বাহুর মাঝে কমলমণি তার পদ্মরাগ ছড়িয়ে দিল। ··মনে হলো এত সুখ বুঝি কমলমণি জীবনে কখন পায়নি।

এর পর ·

শূন্য প্রান্তরের দূর বনান্ত মেখলার অন্তরালে, ঘন কুল বৈঁচির জালিকার আস্তরণে, কেতকী কেউর কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে কত না নিদাঘ দুপুর কেটে গেল ! মাথার উপর শাল-পিয়ালের ডালে বসা ঘুঘুর ডাক দুটো প্রাণকে যেন প্রেম-বিরহের এক নিবিড় দোলনায় দুলিয়ে দিল। মনে হতো জগতের সব কিছুই মিথ্যে···শুধু সত্যি রতিকান্ত আর কমলমণি।

সে ডেকেছে—কমল—কমলমণি !

উত্তর দিতে গা ঘেঁষে বুকে মুখ লুকিয়ে কমল বলছে—বলো আমায় নিয়ে এখান থেকে বহুদূরে গিয়ে ঘর বাঁধবে···

রতিকান্ত উত্তর দিয়েছে—হ্যাঁ তাই ভাবছি—দু'চার দিন ছুটি নিয়ে দেশে যাবো, তারপর সুযোগ বুঝে তোমায় নিয়ে পালিয়ে···

আনন্দে অধীর হয়ে কমলমণি তাকে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরেছে ··কথা তার অর্ধসমাপ্তই রয়ে গিয়েছে।

ভেবেছিল রুদ্রনারায়ণের দুর্বার দৃষ্টি হতে হয়তো এড়িয়ে গিয়েছে দুজনেই··· কিন্তু হঠাৎ খামারকর্ত্রীকে গৃহকর্ত্রী হতে নিমন্ত্রণ এলো···অর্থাৎ আমাদের মেলা-মেশার মাঝে কাঁটাতারের বেড়ার বন্দোবস্ত হলো।

ক'দিন দেখা হয়নি রতিকান্তের সঙ্গে···

দেহটা অসম্ভব ভার ভার লাগছিল কমলমণির ··মনে মনে কেমন ভয় জমে উঠেছে···তবে কি ?

তাহলে তো রতিকান্তকে চাই-ই চাই, নইলে যা সন্দেহ হচ্ছে তার বৈধ বাপ

কে হবে? ···দুর্ভাবনায়, দুশ্চিন্তায় কমলমণি পিঁজরায় আবদ্ধ পাখির মত ছটফট করতে থাকে।

নিঝুম দুপুরের কর্মক্লান্ত অবসরে সবার অলক্ষ্যে কমলমণি খামারের অঙ্গনে গিয়ে দাঁড়ালো। খামারের আমীন বললো—আজ প্রায় এক মাস হয়ে গেল রতিকান্তবাবু দেশে চলে গিয়েছেন।

মনে আশার আলোক উঁকি দিল। তবে তো ঘর বাঁধার আর দেরি নেই।

আরও এক মাস কেটে গেল তবু রতিকান্তের দেখা নেই···তবে কি সে চলে গিয়েছে নিরুদ্দেশের পথে?

তবে এ কথা জানাবে কাকে? উৎকণ্ঠায় রাত্রি দিন যেন পাষাণ বুকে বেঁধে কাটিয়ে চলেছে কমলমণি!

একদিন মা-ষষ্ঠীর মন্দিরে ভবানী দর্শনের জন্য ছুটি পেলো কমলমণি। গণেশ-জননীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে ভাবী সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে ঘরে ফিরলো কমলমণি। যে উদ্দেশ্যে এই দেবীদর্শনের বাহানা তা রয়ে গেল দুরাশার পথে, রতিকান্তকে সে খুঁজে পেলো না। কমলমণির নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করা ছাড়া আর গতি নেই···।

উদ্বেগ বাড়তে বাড়তে আরও একটা মাস প্রায় কাটে কাটে···

হঠাৎ শুনলো গৃহস্বামী দু'দিনের জন্যে পাটনায় যাত্রা করবেন।

মনে ভাবে এই এসেছে তার পরম সুযোগ···

এই সুযোগের মাঝে সে নিশ্চয়ই রতিকান্তকে খবর দিয়ে আনাবে।

সন্ধ্যার অবকাশে গৃহস্বামী আমায় ডেকে পাঠালেন। যুবতী দেহটাকে ভালো করে কাপড়ে ঢেকে নিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর মুখোমুখি। তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন —কমলা, রতিকান্ত দেশে যাবার নাম করে ভেগে পড়েছে···আমার আপনজন বলতে একমাত্র তুমিই পাশে আছো।·· আমার পাটনার হাইকোর্টে একটা মকদ্দমায় যেতেই হচ্ছে তাই তোমার উপর বাড়ির ভার, ক্ষেতীর ভার, খামারবাড়ির দেখাশুনার ভার রেখে নিশ্চিন্তে যাচ্ছি। আমি জানি তুমি একাই সব সামলাতে পারবে। এর জন্যে অবশ্য তোমায় বকশিস করব প্রচুর।

কমলমণি মনে মনে ভাবে—এইটুকু পেলে, গর্ভে যাকে ধরেছে তার জন্যে সে গয়না গড়াবে, পায়ের রুপার মল, গলায় হার···আর,

গৃহস্বামী আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—তবে চল্লুম···এই হচ্ছে তোমার প্রথম পরীক্ষা ·এতে উত্তীর্ণ হলে তোমায় আশাতীত জিনিস এনে দেবো।

কমলমণি খুশীমনে গৃহস্বামীকে বিদায় দিল ··ভবিষ্যের আশায় তার আত্মজের বাড়বাড়ন্তের ফর্দের তালিকা মনে মনে বড় করে চলে।

সাত দিন পরে গৃহস্বামী গৃহে ফিরে এলেন।

কমলমণি ভাবে—এইবার সে ছুটি নিয়ে দিনকতক কাশীতে তার মা'র কাছে পালিয়ে যাবে · নইলে যে বোঝা সে বয়ে বেড়াচ্ছে তার কি কৈফিয়ত সে জনসমাজের কাছে দেবে ?

গৃহস্বামী ডেকে বললেন—কমল, আমি পাটনা যাইনি, গিয়েছিলাম কাশীতে।

চমকে ওঠে কমলমণি··· ।

রুদ্রনারায়ণ স্মিত হেসে কমলের মুখের দিকে চোখ রেখে বলেন—সেখানে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হলো বিশ্বনাথের গলিতে। তাকে আমি ক্ষমা করে এসেছি ···তার শরীরের অবস্থা যা দেখলাম তাতে বাঁচার আশা খুব কম।

—আর বাবা ?···হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কমলমণির।

রুদ্রনারায়ণ বললেন—সে বাজুকে একলা রেখেই আমার সঙ্গে চলে এসেছে তোমাকে তোমার মা'র কাছে নিয়ে যেতে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইলো কমলমণি।

যে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রাজলক্ষ্মীকে ছিনিয়ে নিয়ে বিশু পুরোকায়স্থ নিজে হাতে বোটে টেনে কাশী পৌছেছিল সে আজ ফিরে এসেছে তার পরিত্যক্তা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে !

যদি ফিরেই এলো তবে কেন সে আসেনি সেদিন যেদিন এই শিশু কমল আগুনের ঝলকে ঝলসে গিয়েছিল···কেন তাকে উদ্ধার করে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়নি···তাহলে তো কমলের এতবড় দুর্ভোগের কারণ ঘটতো না···

দুর্জয় অভিমানে ঘাড় নেড়ে কমলমণি উত্তর দেয়—আমি যাব না।

—সেকি ! তোমার মা যে আজ মৃত্যুশয্যায়···

কমলমণি মনে মনে বলে—আমার মৃত্যুর দিনে মা কি আমার পরিচর্যায় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল—তবে ?

কমলকে চুপ করে থাকতে দেখে রুদ্রনারায়ণ বলেন—তৈরী হয়ে থেকো·· সাত দিনের মধ্যেই তোমাকে রওনা হতে হবে।

আবার প্রতিবাদ করতে কমলমণি মুখ তোলে, কিন্তু পরক্ষণেই তার স্মরণ হলো—না না, এ কি বলতে যাচ্ছে সে! ভগবান তার মান বাঁচাবার জন্যে এতবড় সুযোগ অনাহূত হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—সে তা অবজ্ঞা করবে; যে গোপনীয় আত্মা পলে পলে তিলে তিলে সঙ্গোপনে তার মজ্জায় মজ্জায় গড়ে উঠছে তার কি হবে! তাকে বাঁচাতে গেলে মা'র আশ্রয়ই তো কমলের একমাত্র আশ্রয়। …আর মা'র কাছে যদি তা অকপটে প্রকাশ করতে না পারে তবে মা-গঙ্গাই তার একমাত্র ভরসা!

না না কমলমণি যে তাও পারবে না…তার পেটে যে তার নাড়ির বাঁধন… জড়িয়ে জড়িয়ে বড় হচ্ছে!…

কমলমণি উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে ওঠে—না আমি পারব না মা'র কাছে যেতে··

রুদ্রনারায়ণ আস্তে আস্তে উত্তর দেন, মনে হলো কথাগুলো যেন তাঁর হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল।

বলেন—যে কারণে তুমি যাবে না মনস্থ করেছো সেই নিষিদ্ধ কারণ আমি বিধিমত গড়ে তুলবো দৃঢ়তর করে…সে ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি…তোমার ভয় পাবার এতটুকু কিছু নেই জানবে কমল!

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কমলমণি মালিকের মুখের দিকে

কি বলতে চান উনি?

* * *

সাত দিনের মধ্যেই কোবর আর কেবল গ্রামের প্রতিটি প্রজা জেনে ফেলেছে যে রুদ্রনারায়ণ বিধিমত বিবাহ করছেন কমলমণিকে।…অথচ, সে-খবরটুকু কমলমণিকে জানানো হলো না।

বিয়ের দিন সকালে রুদ্রনারায়ণ স্বয়ং কমলমণিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—আজ আমাদের বিবাহ হবে—জানো বোধ হয়।

কমলমণি চীৎকার করে ওঠে—না—না—না, তা হয় না—এ দেহ তোমায় আমি দিতে পারি না—

উনি বলেন—তোমার বাবা আর মা'র এ বিয়েতে মত আছে…

কমলমণি তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেয়—কিন্তু আমার এতে মত নেই…

—কেন নেই কমলমণি ?…এক প্রশান্তিমাখা কাকুতিভরা স্বর বেরিয়ে এলো রুদ্রনারায়ণের কণ্ঠ থেকে।

সে স্বরে কমলমণি চমকে উঠলো।

রুদ্রনারায়ণ কমলমণির পাশটিতে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন—তোমার সকল লজ্জা ঢেকে নেবো বলেই আমার এই আয়োজন!

সারা পৃথিবীর আলো আমার চোখে নিভে গেল…আমি নির্বাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম…উত্তর দেবার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়ে বসেছে।

উত্তর দিলেন উনি।…রাত্রে রাজসমাবেশের মাঝখানে বামপাশে রেখে অগ্নি সাক্ষী করে আমাকে সবার সামনে গ্রহণ করলেন। বাসরঘরে যাত্রাকালে আমার কানে শতকণ্ঠের উচ্চনিনাদ ঘোষিত হতে লাগলো—জয় রাজাগড়কে রাজা রুদ্রনারায়ণ আর রাণী কমলাবাইকী জয়—

আমি রাজাগড়ের রানীসাহেবা হলাম।

কন্যা সমর্পণ করেছিলেন বিশ্বেশ্বর পুরোকায়স্থ নিজ হাতেই।

কাশী এসে খবর পেলাম যে আমার আদ্যোপান্ত ইতিহাস মা জেনে বসে আছেন। বলেছেন স্বয়ং রুদ্রনারায়ণ…

মা বললেন—রতিকান্তকে রুদ্রনারায়ণই কৌশল করে দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল যখন জানতে পেরেছিল যে তুই সন্তানসম্ভবা।

তাইতো ছুটে এসেছিল আমাদের কাছে…তোকে আমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিতে। কারণ রুদ্রনারায়ণ জেনেছে যে তার পরমায়ু আর বেশী দিন নয়।

আমি চুপ করে শুনে যাই। মা বলেন—সব শুনে তোর বাপ জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে ভাবী সন্তানের কি হবে?

রুদ্রনারায়ণ স্মিত হেসে উত্তর দিয়েছিল…সেই জন্যেই তো সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই কমলকে আমি বিয়ে করে নিতে চাই। নইলে আমার আজ আর স্টেটের উত্তরাধিকারী গড়ার ক্ষমতা কোথায়?

তারপর বলেছিল—রাজাগড়ের রাজাবাবুদের বংশানুক্রমে ক্ষেত্রজ সন্তানই গদি পেয়ে আসছে তাই এতে কিছু ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি না। দেরি হলে পাছে কিছু অঘটন ঘটে তাই তোমাদের মত নিয়ে এ বিয়ে যত শীঘ্র পারি সমাধান করতে চাই।

এর পর বাবাকে নিয়ে তিনি মথুরাপুরে ফিরে আসেন।

এরই আট মাস পরে রুদ্রনারায়ণ একদিন অমাত্যবর্গ নিয়ে কাশী এসে হাজির হলেন।

নবজাত সন্তানকে বুকে তুলে নিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণে ঠেকিয়ে স্বদেশে যাত্রা করলেন রাণী কমলমণির সাথে।

শত শত প্রজাদের সমক্ষে সংসারপুখুরের মা-ষষ্ঠী গণেশ-জননীর কোলে শিশুকে তুলে দিয়ে আমায় অঞ্জলি পেতে বসে থাকতে বললেন। আমার করপুটে সে শিশু খেলতে খেলতে নেমে এলো · সবার হর্ষধ্বনিব মাঝে মেয়ের নাম রাখলেন অঞ্জলি!...সমাপ্ত।

রূপকথার এইখানেই শেষ।...এইবার চিঠির মত একটা ছোট্ট পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন—আজ আমার একান্ত অনুরোধ যে অঞ্জলির মাতৃত্বের উদ্বোধন। তুমিই যখন দয়া করে করে গেলে বাবা তখন সময়কালে একবার ফিরে এসো। স্টেটের দায়ে তাকে প্রধান সিংহের পত্নী হতে হয়েছে...কিন্তু সে তো শুধু এক সমাজসমস্যার কাঁচকাঠির পর্দা! যেমন ছেলেবেলায় তুলসীগাছের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মানুষ মেয়েদের বৈধব্যদোষ রোধ করে।...কিন্তু,

যেদিন কাঁচকাঠির পর্দা ভেঙে চুর হয়ে যাবে সেদিন তুমি ফিরে এসো·· রাজাগড়ের সারা সম্পত্তির মালিক হবে তুমিই...এই আমার আকাঙ্ক্ষা।...ইতি হতভাগ্য রাণীমা।

পড়া শেষ হয়ে গেল ··

মনের কোণে ফুটে উঠলো নিদারুণ ঘৃণা।

এই অপত্যস্নেহ? ··এরই নাম সম্পত্তিরক্ষা?

অপত্যস্নেহ আর সম্পত্তিরক্ষার অজুহাতে একটা মূল্যবান জীবনকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে এদের এতটুকু বাধলো না·· আশ্চর্য!

আবার লিখেছেন প্রধান সিংএর মৃত্যুর পর স্টেটের মালিক হবো আমি। বিশ্বেশ্বর বলে গেছে প্রধান সিংহের মৃত্যুতে তাদের সবার শাপান্ত · কিন্তু আজ আমি আমার শাপগ্রস্ত জীবন কিসের বিনিময়ে শাপান্ত করব সে কেবল ভগবানই জানেন।

* * *

আঠাশ

ট্রেন মোগলসরাই পার হয়ে এসেছে⋯ওপারেই কাশী।

আজকের লোক বলে বার্ধক্যের বারাণসী! কিন্তু, সে যুগের বারাণসী ছিল যুবক-যুবতীর মিলনক্ষেত্র, ছিল নটীমঞ্জীরমুখরিত ভারতীয় সংগীতের পীঠস্থান। তাই তার পাদপীঠে ছুটে এসেছি নিজেকে ভুলিয়ে নিতে⋯

গৈরিক মন নিয়ে এসে উঠেছি কবীরচৌরায় এক সংগীতসেবীর আশ্রয়ে। প্রৌঢ় গৌরীশঙ্কর মহারাজ ছিলেন সেকালের প্রখ্যাতা নটী গহরজানের খাস সারেঙ্গীওয়ালা। এঁদের ঘরওয়ানা সঙ্গীত আজও ওস্তাদমহলে বিদ্যমান।

সকাল থেকে বসে তাঁর সারেঙ্গীর ছড়ির টানে শুনি ঠুংরির আরোহণ-অবরোহণের মাধুর্য। নিমেষে ভুলে যাই ফেলে আসা তিক্ত জীবনের স্মৃতির জ্বালা। বুঁদ হয়ে চোখ বুজিয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে সে সুরের মায়াজালের টুকরো-গুলো নিজের গলা দিয়ে গুনগুন স্বরে বেরিয়ে আসে⋯

ওস্তাদজী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিম দিচ্ছেন—"নাহি আওয়ে ঘনশ্যাম।" শ্যাম যে এলো না—না আসায় নায়িকা শ্রীরাধিকার যে কি হয়েছে তার ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হাজার ভঙ্গিমায় সুররসে রসিকজনকে বুঝিয়ে চলেছেন, মনে জাগিয়ে তুলেছেন বিরহের এক অজানিত অনুভাবনাকে।

বিরহিণী রাধার বিরহব্যথার সুরের প্রকাশটুকু বার বার এসে আমার বুকে মোচড় মারছে⋯

আমার পান্থশালার অধিবাসিনীদের কথা একে একে স্মরণে এসে যায়। মনে পড়ে তনুজাকে, প্রাণদাত্রী এণাক্ষীকে, চিরনর্মপ্রিয়া তাপসীর অবারিত প্রেম আহ্বানকে⋯কিন্তু এতে বিরহ কোথায়?

পুষ্পার অক্ষম দেহের আক্ষেপিক প্রেমের অকপট অভিব্যক্তিটুকু এসে তাই বার বার মনে ধাক্কা দিতে লাগলো। একেই তো বসাতে পেরেছিলাম সত্যকার সাকীর আসনে ওমর-দর্শনের প্রতীক করে।

ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার নেশার মত চেপে বসেছিল আমার সাকী খোঁজার নেশা⋯সে সাকী আমি পেয়েছিলাম পুষ্পার মধ্যে, কিন্তু আসল পরশপাথর পেয়েও ক্ষ্যাপা যেমন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেশার ঝোঁকে সারা জীবন ধরে

খুঁজেই ফিরে বেড়িয়েছে পরশ-পাথর, আমারও হয়েছে তাই···নইলে পুষ্পা ছাড়া আর কেউ যে আমার প্রাণের শূন্য পিয়ালাটুকু পূর্ণ করে তুলতে পারবে না কোনো-দিন, তা আমি এই মুহূর্তে অনুভব করলাম।

সারা দিনটাই পুষ্পা যেন মনটাকে টেনে রেখে দিল। হয়ত আমার অন্যায় হয়েছে তাকে ছেড়ে চলে আসা, হয়ত ডাক্তারের নির্দেশ তার দেহের ব্যর্থতাকে উন্নত করতে কোনোদিনই পারবে না বরঞ্চ তার উদ্বেলিত মনে ভাঁটারই সৃষ্টি করেছে···এমনি কত কথাই ভেবে চলেছি।

অশান্ত মন নিয়ে বিকেল হতে না হতেই বেরিয়ে পড়লাম আস্তানা থেকে। গঙ্গার উপকূলে দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসেছি।

মনের চিন্তার লহরের সঙ্গে গঙ্গার লহর মিশে গিয়েছে···তাই সে যেন হয়েছে ঊর্মিবিলীন···

পিছু হতে জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এলো—নারানবাবু না?

চমকে উঠে পেছন ফিরে চেয়ে দেখি—মহেন্দ্র সরকার। আমার উত্তরের আগেই তিনি বলে ওঠেন—বেশ লোক মশাই, ঠিকানাটা অন্ততঃ রেখে আসতে হয়—কি ভোগান না ভুগিয়েছেন আমাকে!

একমুহূর্তে মনে পড়ে যায় পুষ্পার পাশ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য এঁদের কতরকমই না ইঙ্গিত আভাস এসে পৌঁছেছিল আমার কানে···পরিশেষে ডাক্তার-বাবুকে দিয়ে সেটুকু প্রশস্ত পথ তৈরি করেছিলেন এই মহেন্দ্রনাথই। পথিক যখন সে পথ থেকে বিচ্যুত হলো তখন তার জন্য এ আবেগ আক্ষেপ যে কেন তাও যেন নিমেষেই বুঝে নিলাম।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—আক্ষেপের কারণ নেই···চলুন, পুষ্পা কোথায়··· নিশ্চয়ই তার তাড়নাতেই আপনার এই দুর্ভোগ?

হেঁ হেঁ করে মৃদু হেসে করমর্দনের সঙ্গে এগিয়ে চলেন মহেন্দ্রবাবু, যেতে যেতে বলেন—কি জানেন, আপনি থাকাকালীন পুষ্পা মা তবু কিছুটা ভালই ছিলেন, কিন্তু যেদিন থেকে তাঁকে ছেড়ে চলে এলেন সেদিন থেকে যেন প্রতিদিনই দেহটা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে যেতে লাগলো। আজ তো এককথায় বলতে গেলে বিছানায় মিলিয়ে গেছেন! ···কিন্তু, তাঁর আপসোস আপনার জন্যে···বলেন, মহেন্দ্রকাকা, নারানকে যেতে দিয়ে আপনি আমার এ দশা করেছেন। বলুন তো মশাই আমি কি করলুম—আপনি নিজেই জানেন যত নষ্টের মূল ঐ ডাক্তারটা।

বিশ্বনাথের গলির মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে চলি। এসে পড়লাম

চকবাজারের কাছটিতে। ওরই পূর্বগায়ে সরু গলির মধ্যে একটা বাড়ির উপরের তলায় পুষ্পারা থাকে। এটা নাকি তাদের সাবেককালের কাশীবাসের আস্তানা। মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পাথরের সিঁড়ি ভেঙে গিয়ে দাঁড়ালাম পুষ্পার ঘরটিতে। একটি নেয়ারের খাটিয়ার উপরই পুষ্পার শয্যা রচনা করা হয়েছে…

চমকে উঠে দেখলাম সত্যিই পুষ্পা সে বিছানায় যেন লীন হয়ে মিলিয়ে রয়েছে। আমাদের ঢুকতে দেখে আমার মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

মহেন্দ্রবাবু "ভারত জয় করার মত" উৎসাহের দাপটে বললেন—শেষ পর্যন্ত খুঁজে বার করে এনেছি মা পুষ্পা তোমার নারানবাবুকে। ভগবান আছেন তাই তোমার শেষ ইচ্ছা পরিপূর্ণ করতে পারলাম।

আর একটি কথা না বলেই মহেন্দ্রবাবু ঘর ত্যাগ করলেন।

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম পুষ্পার বিছানার পাশটিতে। মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে বললাম—পুষ্পা! কেমন আছো?

পুষ্পার চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। আমার হাতখানা দু'হাতে কপালের উপর চেপে ধরে সে যেন ফুঁপিয়ে উঠলো…তারপর ধীরে ধীরে হাতখানিকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বলে—আগে বল আমায় ছেড়ে আর কখনো যাবে না।

মহেন্দ্রবাবু কোথা থেকে একখানা মোড়া নিয়ে এসে ঘরে ঢুকে বললেন—নিন নারানবাবু এইটাতেই আপাততঃ বসুন। মাত্র পরশু এসে পৌঁছেছি, কিছুই ব্যবস্থা করা হয়নি।

মহেন্দ্রবাবু আবার বেরিয়ে গেলেন।

আমি মোড়া টেনে নিয়ে পুষ্পার পাশটিতে বসে আস্তে আস্তে বলি—পুষ্পা! নিজেকে এমন করে নিঃশেষ করে ফেললে কেন বল তো? মানুষের দেহের পরিতৃপ্তিই কি সব?

পুষ্পা তেমনি একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ কান্নার স্বরে বলে ওঠে—কেন আমায় ফেলে পালিয়ে গেলে তুমি?

—তাই তুমি দেড়মাসের মধ্যে অমন চেহারাখানাকে এমনি করে গড়ে তুলেছো? ছিঃ!

পুষ্পা ম্লান হাসি হেসে জবাব দিলে—তোমায় পেলে আর মরতে ইচ্ছে করে না নারান!

আমি বলি—হঠাৎ মরতেই বা যাবে কেন?

এরপর দুজনেই চুপচাপ।

দীর্ঘ দেড়মাসের বিচ্ছেদের পর এর বেশী কথা যেন আমাদের ছিল না। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থেকে আমিই কথা শুরু করি—এখানে এভাবে পড়ে থাকলে তুমি সুস্থ হতে পারবে না পুষ্পা!

ও বলে—সকালে সরকার মশাই গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি দেখে এসেছেন। তুমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে, ভালো লাগে তো ঠিক করে এসো।

বেদনাভরা দুঃখের এক প্রতীককে বুকে জাপটে ধরে চিরবিরহের আঁধারপথে পথ চলার নামই হচ্ছে শাশ্বত প্রেম। সেই পথের পথিক যারা তারা যদি রক্ত-মাংসের গড়া বাস্তবকে আশ্রয় নেয় তার যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাই ঘটেছে পুষ্পার আর আমার।

বুঝেছি দৈহিক অভিযানের রুদ্ধদুয়ারকে সামনে রেখেই আমাদের এই মেলামেশা। তাই দুটি মনের অবাধ গতির মাঝে যে মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে দেহ-বুদ্ধি তখনই ঘটেছে সর্বনাশের গোড়াপত্তন। তাই পুষ্পার দেহ আজ ভেঙে পড়েছে—তার অটুট মনও আজ ভেঙে পড়েছে তার সঙ্গে। অন্তরের পাওয়াটুকু বাইরের না-পাওয়ার নেশায় আজ নেশারোগগ্রস্ত। এই দৈহিক সম্পাদনা কোনোদিনই যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে যদি মনকে দেহ-বিচ্যুত না করা হয়—তার ভয়াবহ পরিণামটুকুর দিকে লক্ষ্য করে আমি নিশ্চুপ চেয়ে থাকি ওর মুখের পানে।

ওর উপরকার সৌষ্ঠব আজ ভেঙে পড়েছে এক জীর্ণ মলিন চর্ম অবেষ্টনীর মাঝে—সে আবেষ্টনীর জলুস নিঃশেষিত হয়ে আসছে নিকট ভবিষ্যতের কালাভ্যন্তরে।

বেশ বুঝতে পারছি যে পুষ্পার এই বাহ্যিক প্রকাশ শীগ্‌গিরই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তারই করুণ বিদায়টুকু আমায় নিঃশঙ্কচিত্তে সহ্য করতেই ভগবান আজ আবার আমায় এনে পৌঁছে দিয়েছেন পুষ্পারই কাছে।

তৃপ্তি শুধু ওর মুখ চেয়ে ··তৃপ্তি শুধু ওর মনের তৃপ্তিতে। এই ভেবে মন বেঁধে নিলাম যে কোনোদিন কোনো কারণেই পার্থিব সুখের মুখ দেখেনি সে শুধু যদি চোখের দেখার সুখটুকুও জীবনে পেয়ে যেতে পারে তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।···ধন্য হবো আমার সাকীর মনের গহনের স্মৃতি-সৌধ হয়ে··· সেও হয়ত সমুজ্জল হয়ে থাকবে ওর ওই ভাঙা মন্দিরের মর্মরদেবতা হয়ে।

ক্ষীণকণ্ঠে পুষ্পা বলে—জীবনে কিছুই চাইনি নারানদা! কিন্তু হঠাৎ যেদিন

তোমার কথা মহেন্দ্রকাকার মুখে শুনলাম আমার মনের পিয়ালা কানায় কানায় ভরে উঠলো। তবু আমার অতৃপ্ত বাসনা বুকে চেপে ধরে তাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিলাম…জানতাম এ আমার পক্ষে অমৃতের পিয়ালা হয়ে উঠবে না বরং এ হবে এক হলাহলের পূর্ণ কলস। যা পান করে আমি জর্জরিত হবো— আর যে কলসে মুখ রেখে তা পান করব তারও অস্তিত্ব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে!

কিন্তু তবু পারলাম কই?

তোমার অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ পোড়া দেহটুকুকে তুমিই সে পেয়ালা পান করালে। আমি আজ জর্জরিত তাতে ক্ষতি নেই নারান…শুধু দুঃখ আজ যে তোমা হেন কলসটিকে হয়ত ভেঙে খানখান করে রেখে যাবো।

আমি উত্তর করি—ছিঃ পুষ্পা, ওসব কথা মনেও এনো না। ধর তুমি যদি পূর্ণাবয়ব হয়েই আমার গৃহিণী হতে আর ভগবানের অকরুণায় এমনি করেই বিচ্ছেদের পথে ধীরে ধীরে পা বাড়াতে তাহলেও এ পরিস্থিতির পরিবর্তন এতটুকু কি ঘটতো? তাই মনের সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্ন রেখে দেহবিচ্ছেদে অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে কষ্ট পেয়ো না। তোমার আমার দেহবিচ্ছেদ চিরন্তন কিন্তু মনের মিলন হয়ে থাকবে শাশ্বত।

ওমরের সাকীও হয়ত এই…এইটুকুই আজ উপলব্ধি করছি··রাধার কৃষ্ণ পাওয়া-হারানো আর সাকীর ওমরকে সুরার পাত্র মুখে তুলে দেওয়া তাই আজ আমার কাছে একই রূপে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে…

কথা আর বাড়ালাম না, উঠে দাঁড়ালাম।

বললাম—চলি, বাড়িখানা দেখে আসি। ভালো লাগলে কালই তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবো। এ বাড়ির চারপাশের দেয়ালের বদ্ধ-কারাগারে তুমি যেন হাঁপিয়ে উঠছো…

উনত্রিশ

গলিসংকুল বারাণসীর পথঘাট অতিক্রম করে একটু নিরালায় একটা বাগান-বাড়ির খোঁজ আমায় দিয়েছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু চিত্ত অধিকারী। চিত্তবাবু 'নিষাদ' সিনেমার ম্যানেজার ও স্বত্বাধিকারী।

জায়গাটা রমাপুরা ছাড়িয়ে—

কিন্তু গঙ্গা বহুদূরে বলে মহেন্দ্রবাবুর আপত্তি হলো। অথচ মহেন্দ্রবাবুর পছন্দকরা বাড়িখানা গঙ্গার উপর হলেও, বড় সেকেলে বলে আমিও সেটা পছন্দ করতে পারিনি।

অবশেষে কাশী স্টেশনের অপর দিকে গঙ্গার ধারে বহু সাবেককালের একটি বাগানবাড়িতে পুষ্পাকে নিয়ে তুললাম। বাড়ির অধিকাংশ ঘরই পড়ে রইলো অব্যবহারে, খালি দোতলার হলঘর আর তার সামনের বারান্দাটাই ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া হলো।

বাড়িতে উঠে মহেন্দ্রবাবু চোখ বড় করে বললেন—এ যে একেবারে বনবাস মশাই! একে আর কাশীবাস বলা চলে না। কোথায় দু'বেলা বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করতে যাবো, না এখান থেকে চার মাইল পথ অতিক্রম করে তবে…। পুষ্পা মাকে একা ফেলে যাবই বা কেমন করে?

মহেন্দ্রবাবু বললেন—বেশ! আগে থেকেই বলে দিচ্ছি মশাই যে এ বাসায় পুষ্পা মাকে তুলে দিয়ে গা ঢাকা দিলে চলবে না। তাহলে আমি একা একা পাগল হয়ে যাবো। তাছাড়া বাজার হাট রোজের দরকার…

আমি হেসে উত্তর দিই—আপনি রোজ ভোরে বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করে আসবার সময় বাজার হাট করে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। আমি এদিকের সব বন্দোবস্ত করে নেবো'খন। এমনিতর ফাঁকা জায়গায় না থাকলে পুষ্পার স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

—আরে মশাই এতটুকু কিছু ঘটলে ডাক্তারকে খবর দিতেই তো রাত কাবার হবে—বললেন মহেন্দ্রবাবু।

আমি বলি—পুষ্পার আর ডাক্তারের দরকার হবে না সরকার মশাই।

কথাটা বলে ফেলে নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়ি।

দূরান্তে পুষ্পার থাকার ব্যবস্থা করার দুটো কারণ ছিল। এক—কাশীর পথঘাটে চলাফেরার সময় পরিচিতদের কাছে অকারণ কৈফিয়ত দেবার দায়িত্ব এড়ানো, অপরটি হচ্ছে—নিরালায় দুজনের মাঝে যে ফাঁকটুকু দেড়মাস অনুপস্থিতে রচিত হয়েছে তাকে পূরণ করা।

পুষ্পার কিন্তু এ বাড়ি ভালই লেগেছে।

হলের সামনের দালানে বসলেই খরস্রোতা গঙ্গার দর্শন মেলে। সেইখানে বসে সকাল-সন্ধ্যায় গল্পগুজব করা—তারপর এই অল্পপরিমাণ ঘর আর বার।

গাড়ি চালানোর ক্ষমতা পুষ্পার লোপ পেয়েছে তাই আমিই পুষ্পাকে কোলে করে এনে দালানের ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিই। সেইখানে বসে বসে ও কাটিয়ে দেয় সারা সকাল দুপুর আর সন্ধ্যা।

মহেন্দ্রবাবু ভোরে বিশ্বনাথ দর্শন করে বাজার নিয়েই ঘরে ফেরেন!

গৌরীশঙ্করজীর আস্তানা ছেড়ে কাশীর পথে গা ঢাকা দিয়ে আমি এখন ব্যস্ত পুষ্পার পরিচর্যায়, কিন্তু যে সদা হাস্যময়ী রঙ্গিলা যৌবনোজ্জ্বল পুষ্পাকে রাজগীরে দেখেছিলাম সে যেন তেমন নেই। জীবনের দুঃখময় রোগময় যুদ্ধে সে ক্লান্ত শ্রান্ত। কেবল মাঝে মাঝে বলে, যদি আমি চিরদিনের জন্য চলে যাই নারাণ আমার দেহটাকে আর সবার সামনে চিতায় তুলে ধরো না, সকলের বিস্ময় ডেকে এনো না, বরঞ্চ সন্ধ্যার অন্ধকারে এক ফাঁকে এই দেহটাকে ভাসিয়ে দিও গঙ্গার জলে। তাতেও যদি কারো নজরে পড়ি ভাববে এর অর্ধাঙ্গ নিঃশেষ করে গেছে কুমির হাঙরে!

আমি গম্ভীর হয়ে যাই।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে স্মিত হেসে বলে—রাগ করোনা নারাণ! সত্যি তুমিই বলো—আমার এভাবে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয়? এ যে তোমার আমার দুজনারই এক জীবনভোর দুর্ভোগ।

ওকে ভুলিয়ে দিই ওমর খৈয়ামের কবিতা আওড়ে। মনে মনে বলি—হে ভগবান্, পুষ্পাকে এই কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দাও!

ও আস্তে আস্তে বলে—আমাকে দেখলে সবার মত তোমারও করুণা হয়, না?

অদ্ভুত প্রশ্ন!

আমি বলি—না করুণা আসে না, রাগ হয়—ভগবানের উপর রাগ হয়।

ভাগ্যের এ কী বিড়ম্বনা! যদি এমনি করেই অর্ধমৃত করে সারা জীবন রেখে দিলে তবে তার মনের প্রকাশ কেন দিলে?…কেন দিলে এই মনে এক পরিপূর্ণ মনের জোয়ার-ভাঁটার স্রোত?… কেন দিলে রাগ অনুরাগ মান-অভিমানপূর্ণ এক অফুরন্ত বিশ্বের অনুভূতি? এর চেয়ে বিকৃতমস্তিষ্ক স্থবির করে মাংসপিণ্ডের মত ফেলে রাখলে পারতে! তবু মানুষ তাকে করুণাদৃষ্টিতে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে যেতে পারতো!

চুপ করে থাকে পুষ্পা।

তারপর হঠাৎ বলে—তুমি জন্মবাদ মানো নারাণ? মানো মানুষের প্রাক্তন বা ভবিষ্যের পুনর্জন্ম?

আমি জবাব দিই না—কি জবাবই বা দেবো!

ও বলে চলে—হয়ত পূর্বজন্মে কারোকে অতৃপ্ত রেখেছিলাম তার যৌন ইচ্ছায়—তারই অভিশাপে হয়ত—

কথা কেটে প্রতিবাদ জানিয়ে আমি উত্তর দিই—সে তাহলে একটা জন্তু… পশুর অভিশাপ আমি মানি না। এ জন্মে সে সংযোগের অবকাশ তো আমিও পাইনি তাই বলে তোমায় আমি অভিশাপ দিতে পারি? ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না পুষ্পা। মানুষের জন্মের আগে ও পরে কি হয়, কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। তবে পড়েশুনে যা উপলব্ধি করেছি তাতে বুঝি মানুষ প্রকৃতির এক অভিনব স্পন্দনস্রোতমাত্র। সে স্রোতের কোথাও কোনখানে বাধা এসে ছন্দহারা করলে হয় এরকম দুর্দশাগ্রস্ত। জীব হয়ত বার বার জন্মও নিতে পারে, তা বলে সে বার বার এই মানুষ রূপই পরিগ্রহ করবে তা আমি মানি না। অন্ততঃ এই রকম লেখাই পড়েছি…দেহের রূপান্তর ঘটে তবে আত্মার নয়। তোমার আত্মার পরিতৃপ্তি যদি আমাকে ঘিরে হয়েই থাকে এবং আমার আত্মারও সে পরিতৃপ্তিতে তৃপ্তি পেয়ে থাকো তাহলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বাকী রইলো সৃষ্টি। অনুপ্রেরণা রয়েছে অথচ সৃষ্টির ক্ষমতা নেই, সেইটাই হয়ত তোমার জীবনে প্রকৃতির পরিহাস বলতে পারো! কিন্তু এ পরিহাস প্রকৃতি তার অন্য সৃষ্টিতেও তো প্রকট করে রেখেছে। যেমন বীজহীন গাছ…অপরের সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়ে প্রকৃতি তার কাজ করে না—সে স্বয়ংসিদ্ধা। কাজেই এই বীজহীন গাছেরও জীবনে উদ্দেশ্য রয়েছে যার তথ্য হয়ত আমি জানি না, তুমি জানো না কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা জেনে ফেলেছেন। যে পদ্ধতিতে এই সৃষ্টিকে বর্তমান রাখা হয় সেই পদ্ধতিতে যদি তোমাকে রাখা হয় তবে তুমিও হয়ত উদ্দেশ্যহীনা হবে না।

আমার কথা শুনতে শুনতে উদ্দীপনায় মন ওর ভরে ওঠে, চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়, কিন্তু পরক্ষণেই সে চাহনি স্তিমিত হয়ে আসে।

আজ সাত দিন নতুন বাংলোয় এসেছি।

এই সাত দিন একমুহূর্তও ওর কাছ থেকে আমায় সরে যেতে দেয়নি, অথচ তাকে গান বাজনা সেতার ধরাতে কিছুতে পারিনি। ও বলে—বীণার তার ছিঁড়ে গেছে আমার—ও তার বাঁধা যাবে না নারাণ! বরং তুমি কাছে থাকো—তোমার সান্নিধ্যই আমার রোগের ওষুধ।

সাত দিনের নিরবধি সঙ্গ পেয়েছে তবু ও পরিতৃপ্ত নয়। ও বলে—নারাণ, তোমায় যে আমি আরো নিবিড় করে পেতে চাই…সে পাওয়া কি আমার জীবনে হবে না?

আমি বলি—তোমার কাছে তো আমি সারা দিনরাত রয়েছি…এ নিবিড়তাটুকু কি দেহের সংযোগেই হয় পুষ্প? এই যে তোমার আমার মনের অনুক্ষণ সংযোগ এর কি কোন মূল্য নেই?

ও কেঁদে ফেলে…ভোলাতে গেলে ডুকরে ওঠে…

বলে—যে দেহটুকু নিয়ে তোমায় ধরে বসে আছি সেটুকুও যে ক্রমে নিভে আসছে নারাণ। এরপর মনটুকু নিয়ে নিঃস্ব আমি কোন্ মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াবো তার সন্ধান কে দেবে? তাই বলি এ দেহটার একটা প্রায়শ্চিত্ত করে দাও যাতে পরজন্মে অন্ততঃ সুস্থ দেহে তোমায় পাই!

চুপ করে বসে থাকি উন্মুক্ত গঙ্গার জলের দিকে চেয়ে।

অনেকক্ষণ পরে ও বলে—নারাণ, মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার কি গতি হয় জানো?

আমি বলি—জানি।

ও আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আমি বলি—জানো পুষ্পা, আমি তুমি থেকে শুরু করে বিশ্বের সমস্ত জিনিসই মহাকালের এক আবর্তনে ঘুরে চলেছে। সে ঘোরার সীমাশেষ নেই—এমনি অফুরন্ত! দুস্তর পথচক্র চক্রাকারে বার বার একই পথে ঘুরে যাচ্ছে অথচ তার রূপ প্রতিনিয়তই ছন্দে ছন্দে বদলে যাচ্ছে। তাই আপাতবিচ্ছেদ বিদগ্ধ মন সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মুহূর্তের জন্যে হাহুতাশ করে আবার নতুন রূপে, নতুন ছন্দে, নতুন

আলোড়নে মেতে উঠছে। পারিপার্শ্বিকের তারতম্যে সে কখন ম্লান, কখন উজ্জ্বল—তাই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ।

আজ তাই যে ব্যথা তোমায় পীড়ন করছে তাই হয়ত দেখা দেবে সুখের পরিসীমা ঘিরে। আবার আজকের সুখটুকু ভবিষ্যের দুঃখে মাথা খুঁড়ে মরছে। এই চিরন্তনী দর্শনটুকু যাঁরা চোখের সামনে দেখতে পান তাঁরাই আমাদের পূর্ব-পুরুষ মুনি-ঋষিরা। এই দর্শনকেই এঁরা সনাতনী হিন্দুধর্ম বলে প্রচার করে গেছেন। তাই সব ধর্মকে অবলম্বন করে ধর্মান্তর ঘটাতে হয়, কেবল হিন্দুধর্মে সে বিধি নেই কারণ সে নিজেই স্বাবলম্বী। এই ধর্মের ধার্মিক যাঁরা তাঁরা তাই প্রায়শ্চিত্ত মানেন না পুষ্প। এঁরা জানেন যে এই সমস্ত কুসংস্কারের মূল্য কোনো-দিনই কোনো কারণে মহাকাল্ প্রকৃতিকে দেবেন না।

কোনো প্রতিবাদ করলো না পুষ্প, শুধু কান পেতে শুনলো।

লক্ষ্য করলাম ওর মনটা যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমার গলাটা আঁকড়ে ধরে বললো—জানো নারাণ, তুমি এতো জানো তাইতো তোমাকে আমার ছাড়তে ইচ্ছে করে না। মনে হয় মৃত্যুর সময় তুমি কাছে থাকলে যমরাজকেও আমি ভয় করি না।

আমি উত্তর দিই—এই অকারণ কুসংস্কারে পীড়িত আজ আমাদের আবাল-বৃদ্ধবনিতা। সবারই এমনি অকারণ মৃত্যুভয়। কিন্তু মৃত্যুই তো চিরন্তন পুষ্পা। কারণ মৃত্যুর মৃত্যু হয় না—মৃত্যুর ঘটে জীবনের।

বিশ্বের রূপই হচ্ছে মৃত্যু' আর বাস্তব পৃথিবীর রূপ হচ্ছে জীবনটা। জীবন সূর্যের আলোয় বিশ্বটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দিনেরবেলায় সূর্যালোকে যেমন তুমি পৃথিবীর মানুষ বলেই নিজেকে জানো, ভাবতেও পারো না যে বিশ্বের সৃষ্টির মাঝে তুমি একটি কণিকামাত্র, কিন্তু সূর্যবিহীন রাত্রে তুমি আকাশের লক্ষ লক্ষ গ্রহ-উপগ্রহ-তারার মাঝে দাঁড়িয়ে রোজই উপলব্ধি করো যে তুমি বিশ্বেরই সম্পদ; তেমনি জীবনের জ্যোতিতে আমরা নিজেকে ভাবি যে আমরা বুঝি এই জীবনেরই সম্পদ—কিন্তু মৃত্যুই তো রাত্রের মতো বুঝিয়ে দেয় যে আমরা অমর মৃত্যুহীন। তাই মরণের ভয় কোথায় পুষ্পা? তুমি আমি মরণদেশেরই লোক—মরণদেশেরই যাত্রী। মাঝের এই জীবনের আলোকমোহে নিজের দেশকে ভুলে গেলে চলবে কেন? এর জন্যে ভয়ই বা কেন?

ও আমার মুখে মুখ ঘষে তৃপ্তির আনন্দে বললো—তাই যেন হয়, তোমাকে যেন ওখানে গিয়েও এমনি করেই পাই।

আমি বলি—তোমার জীবনে আমি এক অপরিচিত অনাত্মীয়, কিন্তু সেখানে যে তোমার পরমাত্মীয়েরা তোমার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে আছেন।

অভিমান করে বলে ওঠে—যাও! তুমিও আমার সেখানকার আত্মীয়, তাই না নারাণ—

আমি চুপ করে বসে থাকি।

ত্রিশ

আজ ক'দিন ধরে সেতার বাজাচ্ছে পুষ্পা।

সেই মিড়, সেই আলাপ আজ যেন আরো মিষ্টি হয়ে উঠেছে। তারের টানে টানে প্রাণের মধ্যে ও যেন মোচড় দিয়ে চলেছে। গঙ্গার খোলা বুকে ওর হাতের চিকারীর ঝংকারগুলো যেন স্রোতের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রাত দুটো পর্যন্ত বাজিয়ে চলে একনাগাড়ে, থামতে চায় না। বলি—ঘুমুতে হবে না?

ও বলে—আর ক'দিনই বা আছি। এরপর তো চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ব নারান, তাই যে ক'টা দিন আছি জেগেই থাকতে চাই। চাই সুরে সুরে নিজেকে আর তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে।

আমি আপত্তি জানাই। জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই। আড়াল থেকে লক্ষ্য করি যে বিছানায় শুয়ে ও একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে না। কিসের যাতনায় ও যেন সারারাত ছটপট করে।

পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করি—কিসের কষ্ট হচ্ছে পুষ্পা?

ও বলে—চোখ বুজলে পাছে ঘুমিয়ে পড়ি তাই ভয় হয়।

আমি বলি—ঘুমুতে ভয়?

ও উত্তর দেয়—ঘুমিয়ে পড়লে সে ঘুম যদি আর না ভাঙে নারাণ!

চুপটি করে ওর কাছ ঘেঁসে বসে বসে রাত কাটাই।

আজ তিন দিন তাই প্রোগ্রাম বদলে দিয়েছি। বলেছি—সারা দুপুরটা

লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপটি করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। রাত্তিরে বাজিও সেতার, সারা-রাত ধরে।

কিন্তু ও দুপুরে শুয়েও কথা বলে চলে। আমারই কবিতা আমায় শুনিয়ে বলে—তুমিই তো লিখেছো নারাণ—

চাঁদনী রাতে রূপার স্রোতে ভাসিয়ে দিও প্রিয় !
তপ্ত চোখের দু'ফোঁটা জল সেই সাথে মিশিয়ো।
আমার তনুর শেষ সমাধি হোক না জলধিতে,
জানবো তবু রয়েছি তোমার স্মরণ সমাধিতে ;
সেই সেখানে নিত্য রব তোমার সাক্ষী হয়ে—
চিত্ত-ওমর সাথী যে মোর বেহেস্ত আলয়ে।
নাও গো প্রিয় শেষ করে নাও শেষ বিদায়ের গান,
সময় আছে নিশেষ করো মদির পাত্রখান।
আসছে বটে ছিঁড়তে দোঁহে অকাল মহাজ্ঞানী,
জ্ঞান কোথা তার মূর্খ মহা তুমি আমিই জানি।

তারপর ম্লান হেসে বলে—আমার সময় বড্ড অল্প নারাণ। অফুরন্ত কালের স্রোতে বুদবুদের মত ফেটে পড়ার আগে পৃথিবীটাকে ভোগ করে নিতে চাই। তাই যেটুকু সময় হাতে আছে শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই ··

চুপ হয়ে যায়।

আবার বলে—আমার অনেক কথা অনেক ভাবনা তোমায় বলে যাবার জন্যে মনের মধ্যে হাঁকুপাকু করছে কিন্তু ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না নারাণ।

আমি বলি—তোমার মনের সব কথাই তো আমি জানি পুষ্পা।

আরও পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে···

আজ শনিবার পূর্ণিমা।

গঙ্গায় চাঁদের জোয়ার।

ওর হাতের সেতারের ঝংকারগুলো হাওয়ায় দোল খেতে খেতে গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিস্তারিত হয়ে চলেছে।

ওর মুখের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো পড়েছে···ও যেন মোমের পুতুল··· কোন্ স্বপ্নলোকে নিজেকে খুইয়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেছে—

হঠাৎ হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল সেতারখানা ··

তারপর—

ওর দেহটা ··

দৌড়ে উঠে ওর দেহটাকে বুকে তুলে নিলাম।

মুখ দিয়ে চীৎকার বার হয়ে গিয়েছিল—মহেন্দ্রবাবু!—

ওর নিষ্কম্প দেহটা তখনও আমার কোলে। মহেন্দ্রবাবু দৌড়ে এসে ওর হাতের নাড়িটা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। কাপড়ের খুঁটটা নাকের কাছে আলতো করে ধরলেন। তারপর বললেন—ডাক্তারের কোন দরকার হবে না নারাণবাবু—

ভোররাতে ওর দেহটাকে যখন মণিকর্ণিকার ঘাটের সামনের স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম তখন পুবের আকাশে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

এর পর আর একটি দিনও ও বাড়িতে থাকতে পারিনি।

গোধূলিয়ার 'নিষাদ' সিনেমার নীচের বাঙালী হোটেলে ভাত খেতাম আর দিবারাত্র দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে বসে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকতাম।

ঐ গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেছে আমার জীবনের সাকী···

মৃত্যুর পর ভৌতিক জগতের তথ্য আমি বিশ্বাস করি না। দশাশ্বমেধ ঘাটে সেদিন সারা রাতটা কেটেছিল অপলক চোখে। ভোররাতে শুকতারা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট দেখলাম পুষ্পা যেন এসে আমার পাশটিতে বসলো। ওর পরনে লাল বেনারসী চেলি। সাধারণ অবয়ব নিয়ে ষোড়শীর বেশে ও এসেছে···আমার পাশে এসে গা ঘেঁসে বসে পড়ে বললো—নারাণ, আমি আবার এলাম · দেখো চেয়ে আমি নীরোগ হয়ে গেছি···আজ আমি তোমার যোগ্যা নয় কি?

গায়ে ঠেলা খেয়ে চমকে উঠি।

ভোরের আলোয় চারদিক ছেয়ে গেছে। ঘাটের স্নানার্থীরা তাদের নিত্য কাজে ব্যস্ত···

আমার পাশে দাঁড়িয়ে অজিত।

অজিত বোস হচ্ছে কাশীর চৌখাম্বার মিত্তির বাড়ির দৌহিত্র—আমার পুরানো বন্ধু। বললো—কদ্দিন কাশী এসেছিস রে?

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি নিশ্চুপ হয়ে।

ও বলে—এতো ভোরে ঘাটে বসে বসে ঢুলছিস। চল ওঠ—আমার বাড়ি চল…

আমি একটা কথারও জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াই। দুজনে চলতে আরম্ভ করি।

গোধূলিয়ার মোড়ে এসে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বলি—চলি।

ও বলে—সে কী রে, আমার বাড়ি যাবি না?

আমি বলি—আজ বিকেলে যাবো'খন, এখন একটু কাজ আছে।

ও বলে—বেশ। কথা দে বিকেলে নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে আমার ওখানেই চলে আসবি?

আমি রাজী হয়ে ঘাড় নাড়ি…

এরপর জাতিস্মরের শিল্পলোকেই বলা হয়েছে।

জাতিস্মরের চিত্রলোক

আত্মকেন্দ্রিক জীবনের ইতিহাসটুকু শোনাতে চাইলেও শোনাব মত অবকাশ কাব আছে বলুন। তাই যখন আমাব জীবনেব শিল্প আলেখ্য ও জীবনপানশালেব অতিথিদেব সমাবেশেব কথা পাঠকদেব কাছে তুলে ধবেছিলাম তখন সে লেখনীব নামকবণ কবেছিলাম 'জাতিস্মবেব শিল্পলোক ও জাতিস্মরেব পান্থশালা' লেখক ছিল পঞ্চবর্ষী। আজ সেই পঞ্চবর্ষী পাঠক সমাজেব কাছে পাব নিজেব ছদ্মনাম গোপনেব ব্যর্থতা জেনে, আসল নামেই লিখতে বসেছে।

১৯২৩ সালেব ৪ঠা জানুযাবী পযন্ত আমাব পিতা বর্তমান ছিলেন। তখন আমি কলেজে পড়ুযা ছেলে—বযস ১৯ বছব ৩ মাস। বাবাব মৃত্যুব পরই বলা চলে, হযে গেলাম একটি পুবো বাউণ্ডুলে। আমি ছিলাম বাবাব সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তান। ওপবে তিন দাদা বর্তমান· তাব মধ্যে দুই দাদা আমাব মতই পড়ুযা আব সবাব বড যিনি তিনি হঠাৎ ব্যবসাযে বিপযস্ত হযে সংসাব তবীটিকে তখন কর্ণধাববিহীন কবে তুলেছেন। এই ডামাডোলেব মাঝে পডে আমি লেখাপড়া ছেড়ে ঢুকে পড়লাম এক সবকাবী অফিসে (এ জি সি আর) মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। মাসকাবাবে টাকা হাতে পেযে কান্না পেলো ন'মাস কাজ কবে চাকবিতে ইস্তফা দিযে ভাগ্য অন্বেষণে বাব হযে পড়লাম। কি যে কবি—কোন্ লাইন ধবি এইসব ভাবনাব মাঝে পডে দিশে হাবালাম। মূলধন বলতে আমার ছিল উদাত্ত গানেব গলা। কিন্তু তখন আবাব এখনকাব মত গান বেচাকেনা হোতো না।

স্কুল কলেজ জীবনে গানেব সমাদব বহুতব পেযেছিলাম—যাব সবিস্তারে বলা আমাব জাতিস্মবের শিল্পলোকে দিযে গেছি। শুধু এইটুকু বলে বাখি ভাগ্যান্বেষণে বিধ্বস্ত হয়ে নিজেকে ভুলিয়ে বাখতাম সঙ্গীতেব জলসায়। মুরাবী সম্মিলন, কানা শরৎ সম্মিলন, লালচাঁদ সম্মিলন সবই ছিল আমাব পবম প্রিয়… এবং তাবই পবিপেক্ষিতে বন্ধুদেব নিয়ে বাড়ি বাড়ি মজলিস বচনা কবে গান গেযে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতাম।

এ ছাডাও আমার ছিল সাহিত্য প্রীতি ··কারণ নিজেও দু'এক কলম লিখতে পারতাম, তার সমাদরও কিছু কিছু প্রবাসী, অর্চনা, মানসী ও মর্মবাণী বিচিত্রা থেকে পেয়ে নতুন আস্বাদে পুলকিত হয়েছিলাম। মেসার্স এ টি

দেবের বাড়ির মেজছেলে শ্রীসুবোধ মজুমদার আমার সহপাঠী ছিল। তার বাড়িতে প্রতি সকালেই, তৎকালীন বড বড় সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত—সে আসরেও নাক গলিয়ে বসে থাকতাম।

বন্ধু ডাঃ আদিত্য গুপ্ত তখনকার কালে 'মুকুল' পত্রিকার ব্যবস্থাপক ছিল—সে আড্ডাতেও আমার যাতায়াত ছিল—ফলে সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য, অচিন্ত সেনগুপ্ত প্রভৃতিবাও আমার বন্ধু হয়ে পডেছিলেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক জলধর সেন মশাই-এর ছেলে শ্রীঅজিত আমার বন্ধু ছিলেন বলে কল্লোল গোষ্ঠিতেও আমাব সমাদর ছিল। শনিবারের চিঠির সজনীদারও আমি স্নেহেব পাত্র ছিলাম।

এ ছাডাও আমাদের এক স্পেশ্যাল গোষ্ঠীর অধিবেশন হোতো ৭নং রামমোহন রায় বোডের ত্রিতলে। (৭নং রামমোহন রায় রোডের বাডিটি বাণী দাস ও দীনেশ মজুমদারের জন্যে পরে বিখ্যাত হয়েছিল)। 'ইউ'—অর্থাৎ ডাঃ অমিয় বসু ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—ওর ওখানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য সুধীর ধরচৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে আড্ডা বসতো। ইউ-সায়েন্স কলেজে এম-এস-সির ছাত্র ছিল—সেই সুবাদে এ আড্ডা সায়েন্স কলেজেব ছাতে পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছিল। সেই সুবাদে ডাঃ প্রফুল্লবাবু যিনি আচায পি. সি রায়ের স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন তাঁর সঙ্গেও অত্যন্ত হৃদ্যতা ঘটে···যাঁর কল্যাণে আমি আচার্য পি. সি. রায়কে আমার গানে বিমুগ্ধ করে প্রায়ই ওঁব ঘবে বসে থাকতাম।

এইভাবে ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সালের শেষাবধি আমি বিভিন্ন সংস্থা বা আড্ডায় নিজেকে ঘুবিয়ে নিয়ে বেডাতাম যাতে করে ভাগ্যক্রমে কোনো লাইনেব হদিস পাই।···হঠাৎ যেন হদিস পেলাম ··১৯২৫ সালেই এক চমকপ্রদ ঘটনায় আমার গতানুগতিক জীবনকে মোড ঘুরিয়ে এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করতে শুরু করল। বসেছিলাম আচার্য রায়ের ঘরে, খাচ্ছিলাম মুড়ি নারকেল হঠাৎ ঝড়ের মত একদল ছেলে ঘরে ঢুকে বললে—এখানে কে গাইতে জানেন—শীগগীর আসুন—ডাঃ মিত্র ডাকছেন। সবাই মিলে—এমন কি আচার্য রায পর্যন্ত আমায় বলেন—যা যা বেতারে গান গেয়ে আয়—খুব ভাল কবে গাইবি।

১৯২৫ সালে কলকাতা সায়েন্স কলেজের ফিজিকস ডিপার্টমেণ্ট থেকে এক প্রগতি সন্ধ্যায় বেতারযোগে গান আবৃত্তি প্রচারের আয়োজন ঘটালেন ডাঃ

শিশির মিত্র মহাশয়। সারা কলকাতায় শ্রোতারা অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হয়ে পড়েন।

সেদিনের প্রথম আসরে প্রথম গান গেয়েছিলাম 'ঐ মহাসিন্ধু ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে'...মনে হয়েছিল আজকের প্রথম আসরে এই গানখানিই একমাত্র উপযোগী গান।

ডাঃ পি. কে. বোস ডি. এস. সি. এফ. এন. এ যিনি বোস ইনস্টিটিউট-এর একজন প্রাক্তন ডিরেকটর...তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এক টেলিফোনিক আলোচনায় তার এক বিশিষ্ট বন্ধুকে বেতার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন ১৯৭০ সালের ১৯শে এপ্রিল...চিঠিখানি নীচে তুলে ধরলাম।

—"ডাঃ শিশিবকুমার মিত্র ১৯২৩ সালে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই সময় আমি রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা করি ঐ বিজ্ঞান কলেজের অন্যদিকে—আচায প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের গবেবণাগারে।

ডাঃ মিত্র ঐ সময় থেকে বেতার সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করেন (বোধহয় ১৯২৫ সালে)। পদার্থ বিজ্ঞানের একটি ছোট ঘরে তিনি বেতার প্রেরণ যন্ত্র স্থাপন করেন। তাঁর একজন সহযোগীর সাহায্যে মাঝে মাঝে বেতারে কথোপকথন, গান, আবৃত্তি পাঠাতেন। যারা এইসব গ্রহণ করতেন তাঁরা রিপোর্ট দিতেন।

আমি সন্ধ্যাব সময় মাঝে মাঝে ঐ বেতাব প্রচার ঘরে কাটাতাম। কোন কোনদিন পরিচিত ২।১ জন সঙ্গে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহীরেন বসুর নাম বিশেষ করে মনে পড়ে, কেননা যেদিন ডাঃ মিত্র প্রথম বেতার প্রেরণ করেন সেদিন সেই আসরের প্রথম গাইয়ে ছিলেন শ্রীহীরেন বসু। তারপরও তিনি মাঝে মাঝে নিজের গাওয়া গান অনুষ্ঠানসূচীব মাধ্যমে প্রচার কবতেন।

তখন বেতার শ্রোতাদের কানে হেডফোন লাগিয়ে বেতারের বার্তা বা গান বা সঙ্গীত শুনতে হোতো...সেটগুলির নাম ছিল ক্রিস্টাল সেট। যে কজন চেনা পরিচয়ের মাঝে এই সেট ছিল তাদের কাছে আমার গানের ভূয়সী প্রশংসাভিনন্দন পেলাম—বিশেষ করে এইচ বোস (যাঁর দিলখোস বা কুন্তলীন ছিল) তাঁর বড় ছেলে হিতেন বসু ও তাঁর বন্ধু স্বর্গত সুকুমার রায় আমায় ডেকে উৎসাহিত করেন। এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ফুটবল খেলার মাঠে, ডেক অ্যাণ্ড ডাম স্কুলে আমাদের সিক্স-এ-সাইড ম্যাচে।

এঁরা দুজনই আমাদের রেফারি হতেন। কিছুটা আশার আলোর আভাস পেলাম।

১৯২৬ সালের প্রথমেই আমার লেখা 'ধূপ-ধূনা' (পদ্যের বই) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত করলেন। ধূপ-ধূনা লেখা ৭০টি বিচ্ছিন্ন কবিতা হলেও তার প্রত্যেকটির সঙ্গে এমনি এক যোগসূত্র ছিল যা ওমার খৈয়াম দর্শনকে হিন্দুদর্শনে রূপান্তরিত করা মনে হয়। ধূপধূনা প্রকাশের পূর্বে আমি আমার ম্যানস্ক্রিপ্ট কপিটা আমার শ্রদ্ধেয় কবি নরেন দেব—এককথায় নরেনদার হাতে তুলে দিয়েছিলাম কিছুটা দেখে দেবার জন্যে। তিনি কবিতাগুলির প্রভূত প্রশংসা করে দুই একটি ছন্দের কিছুটা রূপান্তর করে আমায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। রেডিওর গান ও পদ্যের বই-এর সমাদরটুকুই আমায় পথ দেখিয়ে আমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দীক্ষা দেয়। এই সময় আমার ভাগ্যদেবতা দুহাত বিস্তার করে আমায় যেন দুদিকে ডাক দিলেন। একদিকে হিজ মাস্টার ভয়েস কোম্পানীর অধিকর্তারা অপরদিকে শুনলাম ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানী, ভারতে ব্রডকাস্টিং-এর ব্যবসায়িক সুযোগ নির্ধারণে টেম্পল চেম্বার (হাইকোর্টের সামনের বাড়ি) বাড়ির ত্রিতলে একটি বেতার প্রেরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে গুণী শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর প্রতিভূ ছিলেন মিঃ সি. সি. ওয়ালিক; এখান থেকে তিনি প্রখ্যাত মঞ্চশিল্পীদের আবৃত্তি, নাটকীয় দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন যন্ত্রীদের বাজনা বেতারে প্রেরণ করছেন এবং পাথেয়স্বরূপ শিল্পীদের হাতে কিছু কিছু দক্ষিণাও দিচ্ছেন। তৎকালীন প্রখ্যাত প্রচার সচিব সুধীরেন্দ্রনাথ সান্যাল মশাইও এ-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছেন—তাঁর হাস্যরসাত্মক নাটিকা 'দেবতাদের মর্তে আগমন' বইখানিকে অভিনয়ে প্রয়োগ করতে। সুধীরদার বই-এর সুরকার হয়ে আমি রিহার্সালে গিয়ে মিঃ ওয়ালিকের সম্মুখীন হই—ফলে আমার কাজ দেখে তিনিও আমাকে ওখানে গাইবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আমি প্রায় ৩।৪ দিন গান করার সুযোগ পাই। এইচ. এম. ভিতে যোগদানের ইতিহাস আমি জাতিস্মরের শিল্পলোকে প্রকাশ করেছি।

এইখানে এইচ. এম. ভি রেকর্ডিং এর পূর্বতন আয়োজন সম্বন্ধে কিছুটা বলি। তখনকার দিনে শিল্পীকে একটি টিনের চোঙার সামনে বসে উচ্চস্বরে গান গাইতে হোতো। তখন মাইকটাইক থাকতো না—চোঙার মধ্য দিয়ে গান গিয়ে একটি ঘূর্ণায়মান মোমের চাকতির ওপর পিনের সাহায্যে স্ক্র্যাপ করে দিত—সেই

ক্রেপিং ভাইব্রেশনেই গান বাধা থাকতো। মোমের চাকতির থেকে সেগুলিকে তামার চাকতিতে ছাপ তোলা হোতো এগুলিকে ম্যাট্রিক্স বলতো এবং এই তামার চাকতি থেকে আবার গালা, ইবোনাইট মিশ্রিত নরম চাকতিতে সেই-গুলিকে ছেপে তুলতে হোতো। চাকতি শক্ত হবার সময় লেবেল লাগিয়ে রেকর্ড করে ছাড়া হোতো। তখন এইচ-এম-ভি রেকর্ডিং স্টুডিও ফ্যাক্টরী দমদমে ছিল না—ছিল বেলেঘাটায়। রেকর্ডিং-এর জন্যে গানের রিহার্সাল হোতো চিৎপুর গরাণহাটার মোড়ের বাড়ি 'বিষ্ণু ভবনে'। ··এখনকার মত সব সময় রেকর্ডিং সুযোগ সুবিধে তখন ছিল না। বিলাত থেকে রেকর্ডিস্ট আসতো বছরে দুবার—অর্থাৎ বছরে দুবার সেশন হোতো। সমস্ত শিল্পীবৃন্দকে গান শিখিয়ে রিহার্সাল দিয়ে তৈরি হয়ে সেশনের জন্য অপেক্ষা করতে হোতো। কাজেই যদিও আমি ১৯২৭ সালেই এইচ. এম. ভির শিল্পী হয়েছিলাম, রেকর্ডিং সেশন হোতে প্রায় ডিসেম্বর হয়ে গেছিল।

২৬ সালের ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল দেখে আমি একটি প্রেস শুরু করেছিলাম জুন মাসে। মুকুল পত্রিকার সারা দলটিকে নিয়ে আমি একটি ছেলেদের মাসিক পত্রিকাও শুরু করি। 'আলপনা' পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেন, সম্পাদকের আসন নিলেন ৺সুনির্মল বসু, প্রচ্ছদপট এঁকে দিলেন প্রখ্যাত যতীন সেন, ভিতরের ছবি অলঙ্কৃত করলেন শ্রীচারু রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। লেখক হিসাবে সবাই যোগ দিলেন—অবনীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সব্বাই। কেবল লেখা পাইনি গুরুদেবের কারণ তিনি তখন ভারতের বাইরে। এই সূত্রে বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, কথাশিল্পী, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুলেখিকা সুখলতা রাও সবারই সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠলো।

এদিকে আবার ২৬শে অগাস্ট ১৯২৭ সালে ১নং গারস্টিন প্লেসে মিঃ ওয়ালিক নতুন করে গড়ে তুললেন ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী। ইংরাজী প্রোগ্রাম ডাইরেকটর ও স্টেশন ডিরেকটর ছিলেন ওয়ালিক সাহেব—তাঁর সহকারী ছিলেন মিঃ চ্যাপম্যান। মিঃ ওয়ালিক এইচ-এম-ভি-র অধিকর্তা মিঃ কুপার সাহেবের পরামর্শে ভারতীয় প্রোগ্রাম ডাইরেকটর হিসাবে ও তাঁর সহকারী হিসাবে নিয়োগ করলেন যথাক্রমে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীরাইচাঁদ বড়ালকে। মিঃ কোয়েস সাহেব হলেন সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার।

১৯২৭ থেকে ১৯২৮ সালের গোড়া পর্যন্ত ব্রডকাস্টিং স্টেশনে বিভিন্ন বিভাগের পত্তনী করে মিঃ ওয়ালিক বি. বি. সি-তে ফিরে গেলেন এবং তাঁরই স্থানে বসিয়ে

গেলেন মিঃ স্টেপল্‌টন সাহেবকে এবং স্টেশন ইঞ্জিনিয়ারের আসনে বসালেন শ্রীসুধীন রায়কে। সুধীন রায় মশাই ছিলেন ডাঃ শিশির মিত্রেরই কৃতী ছাত্র।

নৃপেনবাবু একজন গুণী শিল্পী—অদ্ভুত সুরেলা ক্লেরিওনেট বাজাতে পারতেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের থিয়েটারে 'সীতা' বইতে তিনি কিছু গানে সুরসংযোজনা করেছিলেন আর করেছিলেন আবহসঙ্গীত রচনা। সীতা নাটকের প্রস্তাবনার 'কথা কও' ও 'ধরিত্রীর গান'—'ধরাব মেয়ে' এই দুইখানি গানে তিনিই সুরসংযোজনা করেন। শিশিরবাবুর নিজস্ব পরিষদের যে গুণী সমন্বয়, তাঁদের সাহচর্যও নৃপেনবাবু বেতারে পেয়ে গেলেন। যেমন সু-সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সম্পাদনায় বেতার জগত পত্রিকা শুরু করলেন—৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কথিকার আসর বসালেন। হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট যোগেশ বসুকে এনে বসালেন 'গল্পদাদুর' আসরে—বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার রাজেন সেনকে (মোহনবাগানের শিল্ড খেলার হাফব্যাক) বসালেন বেতার বার্তা প্রচারের আসনে—এমনিতর।

তাঁর সুদক্ষ সহকারী রাইচাঁদ বড়ালও সে সময়ে কম নাম করেননি গুণী সমাজে। ১৯২৬ সালেই তিনি অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে তবলায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তাছাড়া ওঁর পিতা লালচাঁদ বড়ালের স্মৃতি সম্মিলনে ভারতের কোন্ বড় গুণী না আসতেন? কাজেই শিল্পী সমন্বয়ে রাইবাবু ছিলেন অদ্বিতীয়। সেই জন্যে রেডিও তার শৈশব যাত্রাতেই জমিয়ে তুলেছিলেন। ঠিক এই সময় আমি ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীতে পাকা-পাকিভাবে যোগদান করি। ....সুপারিশ বলতে আমার ছিল—আমি এইচ. এম. ভি-র গায়ক···আমার পূর্বতন ব্রডকাস্টিং অভিজ্ঞতা আছে···তাছাড়া রাইচাঁদ আমার বাল্যবন্ধু···স্কুল ফাংশনে আমার গান সর্বসমাদৃত ছিল তিনি তা জানতেন তাই গায়ক পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েও আমি অচিরেই গীতিকার সুরকার এবং নৃপেনবাবুর নতুনত্ব চিন্তাধারার রূপকার হয়ে উঠলাম। নিজের গান গাওয়া ব্যতিরেকে কি কি তখন করতে হোতো, আমি তারই লেখা সার্টিফিকেট থেকে কতকাংশে তুলে ধরছি:

"I have much pleasure to certify, Mr. Hiren Bose whom I know since 1927. His merit in music, composition of Musical Verses and Dramatic talents charmed me during his

service in All India Radio. In Radio he was the incharge of Drama Section and from his own conception he established acoustic Effect Dept. He was a songstar. Music composer, Playwriter, composer of verses Dramatist and Actor. His talents in so many subjects at the sametime was really a singular instance in my office.—Apart from these qualification his original and creative. Genius always helped me in the construction of variety Musical Blocks, Features, Music training class, Morning Programme in Radio for which the listener of India are indebted to him etc. etc'

১৯২৭ সালের শেষাংশের এইচ-এম-ভির গানগুলি রিহার্সাল শেষ হয়েও স্থগিত হয়ে রইল ১৯২৮-এর আশাপথ চেয়ে; কারণ এইচ-এম-ভির পুরাতন পদ্ধতির রেকর্ডিং বর্জন করে বসাচ্ছেন ইলেকট্রিকাল রেকর্ডিং মেশিন; অর্থাৎ এর সব কাজই ইলেকট্রিক ড্রাইভে ঘটবে। এর জন্যে বিলাত থেকে এক্সপার্ট রেকর্ডিস্টকে আনিয়েছেন মিঃ কুপার···মিঃ কোরান সাহেব গত কয়েক মাস ধরে মেশিন ইনস্টলেশনে ব্যস্ত ছিলেন, এবার তৈরী হয়ে আমাদের আহ্বান জানালেন।

ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডের উদ্বোধনী হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। সেই আয়োজনে বেলেঘাটায় আমাদের রিহার্সালঘর থেকে ডাক পড়েছে ধীরেন দাসকে এবং গায়ক-গায়িকা হিসাবে আমাকে আর মিস্ হরিমতীকে। এবারের দ্বৈত ভজন 'সংসার মায়া' ও 'মন আসল ফাঁকিরে' গান দুটি টেস্ট রেকর্ডিং হবে এই নতুন ধারায়, কৃতী হলে উদ্বোধনী উৎসব শুরু হবে।

বেলা সাড়ে দশটায় কবিগুরু এসে গেছেন, সঙ্গে আছেন শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ। এদের নিয়ে মিঃ কুপার ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে ওদের সব দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই ফাঁকে মিঃ কোরান আমাদের দ্বৈত ভজন নিয়ে রেকর্ডিং টেস্ট শুরু করে দিয়েছেন। গান দুখানি রি-প্লে করে সন্তুষ্ট হয়ে কবির অপেক্ষায় আমরা বসে থাকি।

উদ্বোধনীতে কবিগুরু আবৃত্তি করবেন। যতদূর মনে আছে, উনি বোধকরি সেদিন 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' কবিতা দিয়েই উদ্বোধনী শুরু করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সেদিনের রেডকর্ং আসরে যেটুকু রসাল ঘটনাটুকু ঘটেছিল সেটুকু না বললে উদ্বোধনী উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

মাটির উপর পুরু গালিচার ওপর কার্পেটের আসন বিছানো ছিল। ঘরের একপাশের দেয়ালের দিকে খান চারেক চেয়ার রক্ষিত ছিল। মিঃ কুপার কবিগুরু ও প্রশান্তবাবুকে বেকর্ডিং রুমে পৌঁছে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। ভগবতী ভট্টাচার্য মশাই কবিকে কার্পেটের আসনে সমাদরে বসালেন। প্রশান্তবাবু বসলেন পাশের একটি চেয়ারে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে।

ভগবতীবাবু কবিগুরুকে অল্প কথায় রেকর্ডিং নিয়মাবলী জানালেন অর্থাৎ লাল আলো জ্বললেই আর কথা নয়, একেবারে আবৃত্তি শুরু হয়ে যাওয়া চাই। তথাস্তু। যথাসময় লালবাতি জ্বলে উঠলো। ভট্টাচার্যি মশাই ইশারায় কবিগুরুকে শুরু করতে বললেন। কবিগুরু বললেন—'প্রশান্ত তুমি অমন দূরে বসে রইলে কেন; আমার পাশে এসে বসো'...

প্রথম প্লেট ব্যর্থ হলো। প্রশান্তবাবু এসে কবির পাশে বসলেন। আবাব লালবাতি জ্বলে উঠলো। কবি আবৃত্তি শুরু না করে বলে উঠেন—শুরু করার আগে এক গেলাস জল খেলে হোত না প্রশান্ত!

বলে ফেলেই নিজেই হেসে উঠে বলেন, এই যা এবারও নষ্ট হলো তো... সবাই হেসে ফেলি।

কিছুটা সময়ক্ষেপ করে আবার জ্বলে ওঠে লাল আলো...এবার কবি কিন্তু ভুল করলেন না। অনবদ্যভাবেই আবৃত্তি করে চলেন।

মাঝে বোধহয় একটু গলা ঝেড়ে নিয়েছিলেন অতি সাবধানে মিঃ কোরান বলেন, দ্যাটস্ ন্যাচারাল!

এরপর মিষ্টান্ন বিতরণের পালা। ইতরজনেরাও ভাগবাটরায় বঞ্চিত হলেন না।

এইচ-এম-ভি ১৯২৭ সালের রেকর্ডিংএর ফলাফল ১৯২৮ সালের প্রথমেই পাওয়া গেল। আমার গাওয়া সোলো গান 'বেলাবেলি চল পথিক ঘরে' ও 'মোর গানের সকল ব্যথা' শ্রোতৃসমাজে সমাদৃত হয়েছে আর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করলো আমার ও হরিমতীর গাওয়া ডুয়েট ভজন 'সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম জপ মন' আর 'মন আসল ফাঁকিরে'। গান দুখানি যা ছিল ইলেকট্রিক রেকর্ডের প্রথম নিদর্শন। ফলে এইচ-এম-ভির কর্ণধার মিঃ কুপার-এর আমি সুনজরে পড়ে গেলাম। তিনি আমায় তাঁর অফিসে ডেকে বললেন—মিঃ বোস

তুমি প্রোটোটাইপ রেকর্ড সঙ্গীত ছেড়ে ভজন ডুয়েটে যেমন নতুনত্ব দেখিয়েছো, তেমনি নতুন নতুন পরিকল্পনায় ১৯২৮ সালে আমায় কিছু রেকর্ড করে দাও। ওর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি তাঁকে কথা দিয়ে এলাম। ঐ সিজন-এ আমারই প্রচেষ্টায়, ভারতে সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রা সম্বলিত গান বাহির হয়। বাংলা সঙ্গীতে শ্রদ্ধেয় কাজীদা উর্দু গজলের রূপ প্রকাশিত করেন—শিল্পী কে. মল্লিককে দিয়ে। গাওয়ালেন 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' ও 'কে বিদেশী মন উদাসী' গান দুখানি। হঠাৎ গ্রামোফোন কোম্পানীর জয়-জয়কার ছড়িয়ে পড়লো। তখনকার দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন হরেন দত্ত মহাশয়। তাঁর কণ্ঠ অত্যন্ত সুললিত ছিল…দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি অকালে মারা গেলেন। ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ চায়না থেকে কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর সব গানের সত্ত্ব শান্তি-নিকেতনকে দিয়ে দিলেন। ফলে শান্তিনিকেতনের হটকারীতায় হরেনবাবুর গাওয়া রেকর্ডগুলি ভাঙা পড়লো। কারণ দর্শালেন সুর ঠিক হয়নি। এখানে বলে রাখি রেডিওতে তখন আমি আমার নিজের লেখা গান গাইতাম না। গাইতাম রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ. ডি. এল. রায়, রজনীকান্তের গানগুলি। কিন্তু হরেনবাবুর বিধবা পত্নীর শত অনুরোধেও যখন শান্তিনিকেতন হরেনবাবুর গাওয়া একখানি রেকর্ডও রাখতে দিলেন না—সেই দিন থেকে ক্ষোভে দুঃখে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম সবার লেখা গান গাওয়া। সেই দিন থেকেই শুরু করেছিলাম আমার নিজের লেখা ও সুরে গান গাইতে।

রেডিওর কর্মতৎপরতা ও এইচ-এম-ভির রেকর্ডিং-এর চাপে পড়ে. আমার শিশুদের পত্রিকা 'আলপনা' ও 'প্রেস' বন্ধ হয়ে গেল। এর পেছনে অর্থ সমস্যাটাও প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ শিশু কবিতার প্রতি আমার নিজের এক নিবিড় প্রেম ছিল।

তাই ভাবলাম শিশুদের উপযোগী হালকা সুরে গান রেকর্ড করে বাজারে ছাড়লে কেমন হয়। মিঃ কুপারের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি ২৯ সালেই সর্ব-প্রথম নার্সারী রেকর্ড (আট ইঞ্চি) বার করলাম। বিমল দাসগুপ্ত ও কমল দাসগুপ্তর ছোটবোন সুধীরা দাসগুপ্তাকে দিয়ে গান গাওয়ালাম—'ওলো বকুল ফুল (আমার) ও শেফালি ও শেফালি' (পরিতোষবাবু)। রেকর্ডটি শিশুদের মনে তুফান তুলেছিল। ১৯২৯-এর শেষে নিজের সোলো গান (আমার বুকে আগুন জ্বালো) ছাড়াও নতুনত্বের প্রোগ্রাম ছিল—বাদলের গান ও কালবৈশাখীর গান (ঢাকা ইউনিট) 'মন্দির আরতী সঙ্গীত' ও প্রভাতে আশ্রয় দৃশ্য (কলকাতা

ইউনিট) 'ভজন ডুয়েট' বাংলা ভজন···গানগুলির প্রতিটিতে ছিল একাউস্টিক এফেকট যার ফলে অভিনবত্বের চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। যেমন বাদলের গানে (অম্বর মাঝে ডম্বরু বাজে) ছিল সেতারের ঝালার সঙ্গে বৃষ্টির আওয়াজ ও মেঘ গর্জন। কালবৈশাখীর গানে ছিল -ঝড়ো সাইরেন—প্রতিধ্বনিযুক্ত দূরাগত গান ('ঐ আসে ধেয়ে কালবোশেখি মেয়ে')···মন্দিরারতীর গেয়েছিলেন মিস্ ইন্দুবালা ('জ্বালো আজি আরতী দীপ ও বন্দনা করো')। এর সঙ্গে ছিল মন্দিরের ঘণ্টা ঝাঁঝর কাড়ানাকাড়া শিঙা ইত্যাদি···প্রভাতে আশ্রমদৃশ্যে ছিল ভোরের কাকলীর সঙ্গে নহবৎ এবং তার সঙ্গে আশ্রমবাসীদের স্তোত্রমালা। রেকর্ডগুলি যখন বাজারে বার হলো তখন সত্যিই নতুনত্বের এক নতুন যুগ সৃষ্টি করলো এইচ-এম-ভি।

এই প্রসঙ্গে বলতে ভুলেছি যে কলকাতার শিল্পীগোষ্ঠি ব্যতীত ঢাকার শিল্পী-গোষ্ঠীর রেকর্ডিং একসঙ্গেই হোতো। কলকাতার ইউনিটের বড়বাবু ছিলেন ভগবতী ভট্টাচার্য এবং ঢাকা ইউনিটের কর্তা ছিলেন হেমচন্দ্র গুহ। এই দুই ইউনিটেই আমার ছিল অবারিত দ্বার। কারণ হরিমতী ঢাকা ইউনিটের শিল্পী, তার সঙ্গে ডুয়েট হিট করায় আমি হেমবাবুরও প্রিয়পাত্র হয়েছিলাম।

ভাবছেন এত যার রেকর্ড রয়েলটি, রেডিওর বাঁধা মাহিনা, তার আবার আর্থিক সংকট কি ? সত্যি বলছি তখন যা আমাদের দক্ষিণা ছিল তা বলতেও লজ্জা আসে। রয়েলটি তো ছিলই না, উপরন্তু গান লেখা সুর করা শেখানো রেকর্ডিং করিয়ে দিয়ে আমাদের হাতে গান পিছু পাঁচটি করে রৌপ্যমুদ্রা মূল্যস্বরূপ আসতো। ভাবুন কি পেতাম। তবু সৃষ্টিমূলক কাজে প্রকৃত শিল্পীরা চিরদিনই পাগল। তাই এটা পেশার চেয়ে নেশা হয়ে পড়েছিল বেশী। যার ফলে বাড়ি ভাবতেন সরকারি চাকরী ছেড়ে ছেলে আমার কী টাকাটাই না রোজগার করছে, অর্থাৎ এসব কাজ মানে বকামীর নামান্তর মাত্র—তাই এই বাউণ্ডুলেদের না দিত বাড়িরা উৎসাহ, না দিত তখনকার সমাজ এদের ইজ্জত।

১৯২৮ সালের শেষ কি ২৯ সালের প্রথম, ঠিক মনে নেই, বেতারে কীর্তন, কালীকীর্তন, ভগবৎ পাঠ প্রভৃতির বাইরের দলকে নিমন্ত্রণ করে নৃপেন্দ্রবাবু তাঁদের গাইবার সুযোগ করে দেন। এমনি সময় চিত্রসংসদ নামে একটি সংস্থা পরশুরাম রচিত 'চিকিৎসা সংকট' নাটিকা নিয়ে রেডিওতে এসে উপস্থিত হন। এদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিশেষ করে বাণীকুমার (বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য), বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, সত্য দত্ত (পরে যিনি বেতার নাটুকে দলে

অভিনয় করতেন) বিজন বসু, অবনী মুখার্জী (বেহালা) প্রভৃতি মহোদয়গণ। এঁদের অভিনয় কুশলতায় প্রীত হয়ে নৃপেনবাবু এই সংসদের কয়েকজন কৃতী সভ্যকে বেতারভুক্ত করে নেন।

তখন মহিলা মজলিস চালানো হোতো বাইরের বিশিষ্ট খ্যাতনামাদের আনিয়ে। তাঁদের অনুপস্থিতে সময় সময় আমাকেও এর পরিচালনা করতে হোতো। বীরেন ভদ্র মহাশয়কে পেয়ে নৃপেনবাবু মহিলা মজলিসের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করলেন। বীরেনবাবু তখন ই আই আর রেলের কর্মী,....অসুবিধা হলেও তিনি সাগ্রহে এ ভার নিয়েছিলেন 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে। পঙ্কজবাবুকে গাইয়ে হিসাবে নেওয়া হোলো কারণ পঙ্কজবাবুর গলা খুবই মধুর ছিল। বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। গীতিকাব ও ফিচাব, ব্লক প্রোগ্রামের লেখক হিসাবে বাণীকুমার নিয়োজিত হন। বিজন বসু শ্রীযুক্ত রাজেন সেনকে সাহায্যার্থে সংবাদ সরবরাহে নিযুক্ত হন। কিছুটা অবকাশ পেয়ে আমার ওপর ভার পড়লো বেতারের নিয়মিত স্ত্রীশিল্পীদের গান শেখানোর। তাছাড়া শ্রীরাইচাঁদ প্রতিষ্ঠিত ঘরের মেয়েদের দিয়ে রবিবার সকালের মেয়েদেব গানের আসরের পরিচালনার ভাব।

১৯২৮.সালের শেষে আমার নিজের বাড়িতে এক বিপর্যয় ঘটলো। আমার মেজদা হেমেন্দ্রকুমার হঠাৎ মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর ইনিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হন। মেজদা ছিলেন স্যার বি. এন. মিত্রের ভাই তৎকালীন পোস্টমাস্টার জেনারেল ফণী মিত্র মশাই-এর জামাই। এম-এ, ল পাশ করে তিনি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অফ পোস্টঅফিসের পোস্টে সবে ঢুকেছিলেন। হঠাৎ তাঁর বিয়োগে বাড়ির ভারসাম্য হারিয়ে গেল। বড়দা নৃপেন্দ্রকুমারের ব্যবসা আগেই বন্ধ হয়েছিল, ছোড়দা ডাঃ নীরেন্দ্রকুমার তখনও মেডিক্যাল ছাত্র, কাজেই সাংসারিক ভারসাম্য সামলাতে আমাকেই অগ্রণী হতে হোলো। ১৯২৮ সালের গ্রামোফোন সেসনের ফলাফল ২৯শের গোড়াতেই বার হলো যার সাফল্য আমাকে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করে দিল এবং ২৯ সালেই কতগুলি নতুন যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা অঘটন পটীয়সী ভগবান জুটিয়ে দিলেন।

২৯ সালের প্রথমেই বার হলো আমার 'মধুসূদন দাদা' পালা—যা একমাত্র পালা সে-যুগে বাংলার ঘরে ঘরে শিশুদের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল। কারণ সর্বস্তরের শিশুর মুখে তখন উচ্চারিত হোতো 'এসো এসো মধুদাদা'। আমার সোলো গান 'আরতিদীপ কে জ্বালিল—যমুনার তীরে সখি কাজল মাখা নীরে'ও

যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করল। তাছাড়া সেবাবের ভজন ডুয়েট ছিল 'শ্রীগোবিন্দ মুখ চন্দ' ও 'মায়ায় মদির মোহে ডুবিয়ে'—যা তার পূর্বের আসনকে দৃঢ়ভাবেই ধরে রাখতে পেরেছিল।

মিঃ কুপারের কাছে আবার আমার ডাক পড়লো। তিনি বললেন—মিঃ বোস, তোমাদের ভারতীয় গানে অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করো না কেন? ইংরেজী 'পেগন মিউজিক'-এর একখানি রেকর্ড হাতে তুলে দিয়ে বলেন—ত্যাখ দেখি এটার কিছু রূপান্তর করতে পার কিনা?

চেষ্টা করব বলে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাড়িতে এসে রেকর্ডটি শুনে ইংরেজী প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রেরই বিশ্লেষণ করতে পারলাম কেবল পারলাম না একটি যন্ত্রের। পরের দিন কুপার সাহেবের কাছে গিয়ে আবেদন জানালাম। তিনি হেসে বললেন—ওই যন্ত্রটির নাম 'হাউইন গীটার'—জানি না, ইণ্ডিয়াতে এ যন্ত্র পাবেন কিনা?

বহু চেষ্টায় সন্ধান পেলাম মেসার্স বিভান কোম্পানীতে। তাঁরা বলেন—এ যন্ত্রের চাহিদা ইণ্ডিয়াতে নেই বলে রাখি না—তবে এর একটি লেশন বই তোমায় দিতে পারি···চেষ্টা করে দেখো যদি চোরাবাজারে কেউ বেচে দিয়ে থাকে। বহুবাজারের চোরবাজারে সত্যিই এ যন্ত্রটিকে পেলাম। আমার সঙ্গে আছেন শ্রীযুক্ত তারক দে (আজকে বংশীবাদক শ্রীঅলোক দের পিতা)। তারক বেহালাবাদক কিন্তু নতুন যন্ত্রের রূপায়ণে খুবই উদ্যোগী। তারক বললে—কিনে তো নি—তোর কাছে লেশন-এর বইও আছে যা হোক করা যাবে।

বলতে ভুলেছি শিয়ালদহের কাছে অরফিক ক্লাব নামে একটি ক্লাব ছিল যারা রেডিওতে এসে মাঝে মাঝে বাজাতো। আমার সঙ্গে তাদের সম্প্রীতি ছিল খুব। এদের সবার নাম আজ আর আমার স্মরণে নেই···তবে 'তারক দে' তারক দের ভাই জগন্নাথ 'সুরেন পাল' (পটল) শান্তি বোসের নাম আজও ভুলিনি।···তারক দে চোরাবাজারের গীটার কিনে আমার দেওয়া লেসন বুক নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে গীটার বাজানোর চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি অর্কেস্ট্রা সম্বলিত—মায় সিমফনীসমেত দুখানি গান তৈরী করে রিহার্সালে ফেলে দিলাম·· তবে তাতে গীটারের পরিপূরক ম্যাণ্ডলিন ছিল। এইচ-এম-ভির ১৯২৯ সালের শ্রেষ্ঠ অবদান হলো ভারতের সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রাসম্বলিত গান 'শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদ প্রাতে' ও 'চৈতী হওয়ায় কে দিলরে দোল'। গান দুখানি মিস লাইট (তারকবালা গেয়েছিলেন)···'মধুসূদনদাদা'

পালায় ইনি মধুদাদার পার্ট করেছিলেন। এ ছাড়া ম্যাণ্ডলিনযোগে মিস্ বীণা-পাণির গাওয়া 'ফাল্গুন নিশি জাগে' ও 'বাঁশরী বেজে যায় বনে বনে'···বাজার জয় করেছিল। গ্রামোফোন সেলস্ ডিপার্টমেণ্ট থেকে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিল 'শেফালি তোমার' গানখানি এতদিনের রেকর্ড-সেল ভঙ্গ করে তিন মাসে পঁচাত্তর হাজার কপি বিকিয়ে গেল।

সাত নম্বর রামমোহন রায় রোডের ত্রিতল অধিবাসী ডাঃ অমিয় বসু ওরফে ইউ-র আড্ডায় আমার আলাপ হয়েছিল একটি গুণী চিত্র-শিল্পীর সঙ্গে যিনি অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র। তাঁর আঁকা ছবি যেমন আমাকে মুগ্ধ করেছিল তেমনি করেছিল তাঁর বাচনভঙ্গী। নাম তাঁর সুধীর ধরচৌধুরী। ১৯২৮ এর শেষে তিনি এক নির্বাক চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। যতদূর স্মরণ হয় তাঁদের কোম্পানীর নামকরণ হয়েছিল এসিয়াটিক ফিল্মস এমনিতর। অফিস ছিল ইণ্ডিয়ান মিরার স্ট্রীটে। সুধীর ধর তাঁর অফিসে একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ জানান। প্রতি সন্ধ্যায় আমার রেডিও আছে কাজেই বেলা ৩টা নাগাদ তাঁর আস্তানায় গিয়ে পৌছলাম। তার অফিসে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—উপস্থিত ছিলেন তার শ্যালক শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত। আমার নাম পরিচয় পেয়ে তিনি নিমেষেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেললেন। বললেন, সুধীরবাবু তাঁর কোম্পানীর ডিরেকটরদের নিয়ে এখনি এসে পড়বেন কারণ আজ তাঁদের বোর্ডের মিটিং।

সত্যিই পাঁচ সাত মিনিট বসার পর সুধীর ধর এসে উপস্থিত হলেন—সঙ্গে তার চার পাঁচজন ভদ্রলোক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—সবাই ধনী বা ধনীর পুত্র। তাঁরা আমার সঙ্গীত পরিচয়ে পরিচিত হয়ে খুবই খুশী হলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে আকৃষ্ট হলেন শ্রীসুধীরচন্দ্র নান্। বৌবাজারে বি. সি নান কোম্পানীর মালিক। শুনলাম তিনি ও তাঁর পত্নী আমার গানের ভক্ত··· রেডিও ছাড়াও আমার গাওয়া ও প্রযোজনার সব রেকর্ডই তাঁর বাড়িতে আছে।

কথায় কথায় বেলা পড়ে গেল—আমি রেডিও স্টেশনে চলে গেলাম।

এই সময় রেডিও স্টেশনে নিজেদের একটি নাটক বিভাগ খোলার কথা চলছিল এবং এর একটি লিখিত এস্টিমেটও মিঃ স্টেপলটন সাহেবের কাছে পেশ করা হয়েছিল। আজ রেডিও স্টেশনে পৌছেই নৃপেনদার কাছে খবর পেলাম যে মিঃ স্টেপলটন সাহেব আমাদের স্কিম অনুমোদন করেছেন এবং ইতিমধ্যে নৃপেনবাবু আমাকেই ওই বিভাগ চালাবার ভার অর্পণ করা ধার্য করেছেন।

কাজেই ১৯২৯ সালেই বেতার নাটুকে দলের প্রথম পত্তনী ঘটে। বেতার নাটুকে দলের প্রথম নাটকের উদ্বোধন হলো আমারই লেখা গীতি-নাট্য 'মানভঞ্জন' দিয়ে। প্রথম প্রয়াসের প্রায় অংশের বোঝা আমাকেই বইতে হয়েছিল, এমন কি নায়কের ভূমিকায় আমাকেই অবতরণ করতে হয়। অবশ্য সঙ্গে ছিলেন ধীরেন দাশ—মিস বীণাপাণি বেতারের অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৭ সালের শেষ পযন্ত আমিই ছিলাম বেতার নাটকে দলের অধিনায়ক। ব্যবস্থাপনা ও সঙ্গীতাংশের দেখাশুনা করতে সময়াভাবে আমি বীরেনবাবুকে এনে নাটকের আংশিক শিক্ষার ভার অর্পণ করি—বীরেন-বাবুর এই গুণটি বরাবরই প্রকট ছিল ও শিক্ষাও দিতেন সুন্দর করে। এই সালেই শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী বেতারগোষ্ঠী ছেড়ে ফিল্ম লাইনে যোগদান করেন এবং বেতার জগতের সম্পাদকের আসনে এলেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

১৯২৯ সালে রেডিও গতানুগতিক কাজ ব্যতিরেকে নতুন বিভাগেব ভার নিয়ে আমার কর্ম-গণ্ডী এতদূর বেড়ে গেলো যে এইচ-এম-ভির ৩০ সালের ইস্যুতে নতুনত্বে কিছুটা ভাঁটা পড়ে। তবুও সে সিজ্‌নে কমলা ঝরিয়ার গাওয়া মীরার ভজন, মানিকমালা গীত 'মন ওঠে না দ্বারকাতে' ধীরেন দাস গীত আগমনীব দুখানি গান 'শংখে শংখে মঙ্গল গাও' আর 'আজ আগমনীর আবাহনে' মিস বীণাপাণির বাংলা ভজন 'শ্রীরাধা নামের বাঁশরী' ও 'যদি বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে' গানগুলি সঙ্গীত জগতে ল্যাণ্ডমার্ক স্বষ্টি করলো। ৩০ সালে এইচ-এম-ভি শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তরে এক বিরোধ মনোভাব স্বষ্টি হয়—রয়েলটির প্রশ্ন নিয়ে। আমাদের এই মুভমেণ্টের লিডার ছিলেন স্বয়ং কাজীদা। এ সম্বন্ধে পরে বলছি···

১৯২৯ এর শেষ বরাবর একদিন সকালে সুধীর ধরের শ্যালক প্রমোদ দাসগুপ্ত আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। ভাবলাম বুঝি সুধীর ধর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু কথায় কথায় প্রকাশ পেলো যে সুধীরের প্রতিষ্ঠানটি কাযকরী হবে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। আমার সাহচর্যের জন্য তাই তাঁর আমার বাড়িতে আগমন। ভদ্রলোক প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে আমার সঙ্গে গল্প করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল ফিল্ম জগতে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান পর্যালোচক। তৎকালে হলিউড আর্টিস্টরা বা ডিরেকটররা কি দিয়ে খান—কি পরেন—কি কি করে বেড়ান—কার অঙ্গাংশ কত টাকায় ইন্সিওর করা আছে—তাঁর যেন কণ্ঠস্থ। তার চমকপ্রদ বক্তৃতায় আমার মনে হয়েছিল সুধীর

তার এতবড় ফিল্ম একসপার্ট শ্যালক নিয়ে কেন আজ পর্যন্ত কাজে লাগায় নি।

ওঠার সময় প্রমোদবাবু বললেন—সকালের দিকে তো আপনার বিশেষ কাজ কর্ম থাকে না—চলুন না খাওয়া দাওয়া সেরে আপনাকে কিছু ফিল্মী ব্যবসায়ীদের অফিসে ঘুরিয়ে আনি—তাহলেই বুঝতে পারবেন আজকের ফিল্মজগতের চেহারা কি!

সে সময় ফিল্ম স্টুডিও বলতে কিছু ছিল না। ছবি তোলা হোতো বড়লোকদের বাগান বাড়িতে বা কারো ছাদের ওপর খোলা রোদ্দুরে—ছোটখাট ২।৩ ফ্ল্যাটের সেট তৈরী করে। বাড়ির মধ্যে স্যুটিং হলে সূর্যালোককে আয়নায় প্রতিফলিত করে—জগজগা লাগানো কাঠের তক্তাব উপর ফেলা হতো—আবার সেই আলোকিত তক্তার আলো শিল্পীদেব মুখে বা ঘরের আসবাবপত্রে ফেলে আলোকিত করা হতো। ক্যামেরা ঘুরতো হাত দিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে। কাজেই ফিল্মী জগত আবদ্ধ ছিল তৎকালীন ফিল্ম ব্যবসায়ীদের অফিসে।

প্রমোদবাবু আমাকে নিয়ে প্রথমদিন গেলেন দমদমে শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অফিস ও স্টুডিওতে। যেখানে ছবি হয়েছিল ফ্লেমস অফ দি ফ্লেমস (পদ্মিনী)। পদ্মিনীর পার্টে অভিনয় করছিলেন মিস্ গ্যাসপার। ধীরেনবাবু তাঁর ফিল্মী নাম করেছিলেন সবিতা দেবী। আর একজন সুন্দরী দূরে বসেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে প্রমোদবাবু আমার কানে কানে বলেন—উনি হচ্ছেন মিসেস্ গাঙ্গুলী। উনিই হচ্ছেন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে উনিও এই ফিল্মে সেকেণ্ড হিরোইন হয়েছেন। প্রথমটা কিছুতেই রাজী হন নি—শেষে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধীরেনবাবু বলেন—আমি নিজে দৃষ্টান্ত না দেখালে কোন ভদ্রঘরের মেয়ে ফিল্মে আসতে চায় না···স্বামীর কথায় অবশেষে রাজী হয়েছেন। প্রথমে বলেছিলেন—নামতে পারি যদি তুমি আমার হিরোর রোল করো। ধীরেনবাবু বলেন—সে কি করে হয়—আমি যে কমেডিয়ান বরং তোমার পছন্দ মত অন্য কারোর নাম করো। মিসেস গাঙ্গুলী অনেক ভেবে বলেন—তাহলে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে পারি। মাস্টারমশাইমিসেস গাঙ্গুলীকে ইংরেজী পডাতেন। ধীরেনবাবু তাই মেনে নিয়ে মাস্টারমশাইকে শ্রীমতীর হিরোর রোলে নামাতে রাজী করলে। এই মাস্টারমশাই হচ্ছেন পরবর্তী দিনের প্রখ্যাত ডিরেকটর প্রোডিউসার শ্রীদেবকীকুমার বসু। ধীরেনবাবুকে সবাই ডি. জি. বলেই ডাকতেন—ওর কোম্পানীতেই হাতেখড়ি দিয়েছেন মিঃ পি.

সি. বড়ুয়া, কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক শ্রীদীনেশ দাস আরও অনেক বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ ও ডাইরেকটরস্।

তারপরের দিনও প্রমোদবাবু বেলা ১২টা নাগাদ এসে উপস্থিত হলেন। আমায় সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন এক নতুন চিত্রোদ্যোগীর আস্তানায়—নাম জয়গোপাল পিকচার্স। এরা তুলছিলেন 'ইনকারনেশন'। সারা রাজপুতানা ঘুরে এদের ছবির স্যুটিং হচ্ছিল। এ ছবির নায়ক ছিলেন শ্রীকেদার চট্টোপাধ্যায় —প্রবাসী সম্পাদক ও সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র। হিরোইন ছিলেন একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। শুনে প্রমোদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম···কোন বাঙালী ভদ্র পরিবারের মেয়ে কি ফিল্মে নামতে চান না। প্রমোদবাবু বললেন···সবে শুরু করেছে···যেমন কাল ডি. জি-র স্ত্রীকে দেখলেন। ইয়োরোপীয় শিক্ষায় অগ্রণীর দল থেকে কেউ কেউ এগিয়ে আসছেন···নইলে থিয়েটারের অভিনেত্রীরাই হিরোইন হন।

অফিস ঘরের দরজা পার হয়ে হল-এ পদার্পণ করে দেখলাম . চারুদা ও বুড়োদাকে। দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠেন—আরে হীরেন যে, এখানে কি খবর। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দি···এই দেখতে এলাম। বুড়োদা মানে প্রেমাংকুর আতর্থী মশাই আর চারুদা হচ্ছেন চিত্রশিল্পী শ্রীচারু রায়। ওরা দুজনেই আমার চেনা···খুব যত্ন করে বসালেন, চা খাওয়ালেন ··পরে শ্রী নীতেন বসু ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বুড়োদা বলেন—দেখ তো নীতিন···এর চেহারাটা ফোটোজেনিক কিনা? নীতিনবাবু হেসে বলেন··· নেমে পড়ুন না ভালই তো। আমি কেমন থ' মেরে চুপ করে থাকি···প্রমোদ-বাবুকে এদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম—বললাম, এঁর ক্যারেকটার অ্যাকটার হবার খুব সখ। সবাই চুপ করে রইল—বুঝলাম হয়ত মনে ধরল না এঁকে।

এরই দু দিন পরে প্রমোদবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ওঁর বড় ইচ্ছা একবার বাগমারীতে পাড়ি জমান। ওখানে ঘনশ্যামদাস চৌখানী স্টুডিও খুলেছেন। ডিরেকটর হচ্ছেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ।

আমি বলি কালীবাবু আমার আলাপী লোক। উনি কে জানো? উনি হচ্ছেন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রোপাইটর উপেন মিত্র মহাশয়ের আপন ভাগ্নে। মিনার্ভা থিয়েটারে 'আত্মদর্শন' বইখানা মঞ্চস্থ করার সময় উনি পড়াশুনা ছেড়ে মামার থিয়েটারে যোগদান করেন। উনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের থার্ড

ইয়ার স্টুডেন্ট। থিয়েটারের নেশায় ওঁর পড়াশুনা সব ইতি হয়ে গেছে। ওঁদের থিয়েটারের প্রোগ্রাম তো আমারই প্রেসে ছাপা হত।

প্রমোদবাবু বলেন···রেণুবালাকে উনিই তো সুখের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন···তাকে নিয়েই চৌখানী সাহেবকে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। ওদের ছবি হচ্ছে—শঙ্করাচার্য। শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী শঙ্করাচার্যের ভূমিকা অভিনয় করছেন। শুনেছি ওখানে এখনও দু-চারটা ক্যারেকটার-রোল করবার লোকের দরকার, তাই ভেবেছিলাম একবার ঘুরে আসব।

আমি বলি—বেশ আমি কালীপ্রসাদবাবুকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, আপনি নিজেই একবার চলে যান। এছাড়া নির্বাক শ্রীকান্ত হচ্ছে শুনছি··আমার এক বন্ধু চিত্রশিল্পী শ্রীকান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকান্তের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। আমাদেব বড়দা অর্থাৎ শিশির ভাদুড়ীর ভাই তারাদা করছেন ইন্দ্রনাথের রোল—ওখানেও একটু চেষ্টা করতে পারেন।

দু জায়গাতেই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম প্রমোদবাবুকে কিন্তু কার্যকরী কিছুই হয় নি। শেষে আমার বাদুড়বাগানের বাড়ির পিছনে লক্ষ্মীবিলাস হাউসে মিঃ মিত্রের কাছে প্রমোদবাবুকে পাঠালাম। আমাদের চিরদিনের নগেনদার তত্ত্বাবধানে ওবা তুলছিলেন দেবদাস। পার্বতীর ভূমিকায় আমাদের রেকর্ডের গায়িকা মিস লাইট নেমেছিলেন। প্রমোদবাবু ওখানেও ঘুরে এসে বললেন—ওঁদের বই শেষ।

১৯২৯-৩০ সালের প্রথমেই নৃপেনবাবু বললেন—তোমার রেকর্ডে প্রভাতে আশ্রম দৃশ্য আমার খুবই ভাল লেগেছে—অমনিতর একটি প্রোগ্রাম এখানে রচনা করো।···আমি বললাম প্রভাতীদৃশ্য করতে গেলে প্রভাতী প্রোগ্রাম করতে হবে অর্থাৎ ভোর চারটের সময় থেকে প্রোগ্রাম শুরু হওয়া চাই। তখনকার দিনে টেপ রেকর্ডিংএর আবিষ্কার হয় নি···রাত ৪টার প্রোগ্রাম করতে হলে শিল্পীদের রাত তিনটের সময় তুলে রেডিও স্টেশনে উপস্থিত করতে হবে। সব শোনার পরও নৃপেনবাবু আমায় এ প্রোগ্রামের জন্যে তৈরী হতে বললেন। কাজেই 'প্রভাতী' নাম দিয়েই প্রভাতী প্রোগ্রাম শুরু হলো ১৯৩০-এর প্রথমাংশেই।

ভোরের কলকাকলীর জন্য সাউণ্ড-রুমে লাগানো মাইকটা জানালা দিয়ে বার করে পাশের চার্চের বড় বটগাছের দিকে এগিয়ে দেওয়া হলো। একাউস্টিক শব্দে ঝর্ণার বার বার কল কল শব্দের সৃষ্টি করা হলো—সঙ্গে উঠলো এক নতুন যন্ত্রের সুর। পেছনে উচ্চ টোনে বেহালা।

নতুন যন্ত্র বলতে কি ব্যবহৃত হয়েছিল তা একটু বুঝিয়ে বলি। আপনারা নিশ্চয়ই বাচ্চাদের মিউজিক্যাল বক্স দেখেছেন যা থেকে টুং টাং ডিং ডাং করে সুললিত সুর বাজে। আমাদের যন্ত্রটি ছিল এর বড সংস্করণ। টালার জমিদার বাড়িতে এই যন্ত্রটাকে ফ্রান্স থেকে আমদানী করেন এবং স্টিল প্লেটে ভারতীয় রাগ বর্ণালী সংযোজিত প্লেট করিয়ে আনিয়েছিলেন। রাগের স্বরলিপি অনুযায়ী তাঁরা প্লেট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ভোরের সুরের মধ্যে রামকেলি-গুর্জরী টৌডীর প্লেট ছিল। এই যন্ত্রটি আমি আবিষ্কৃত করে ওঁদের বাড়ি থেকে চেয়ে এনে ভোরের প্রোগ্রামে গুর্জরী টৌডীর রেকর্ড চালিয়েছিলাম। ঝর্ণাধ্বনিকাকলী ও সুর সংযোগে এক অনবদ্য সঙ্গীত লহরী ঘরে ঘরে প্রচারিত হতে থাকে। পাখির ডাক, স্বরলহরী ভায়োলিনে তার প্রতিধ্বনিত সঙ্গীত মিলে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মাঝে উঠতে থাকে সংস্কৃত স্তোত্রমালা:। উদাত্ত সুরে বীরেনবাবুর পাঠ ও তার সঙ্গে সুললিত কণ্ঠে স্ত্রী কণ্ঠে গান। মিস আভাবতীর কণ্ঠমাধুরী সবাইকে ছাড়িয়ে শ্রোতাদের কানে এক পারলৌকিক অনুভূতি ঢালছিল। এই মনোরম অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের বহু অনুরোধপত্রে ১৯৩১ সালে বাণীকুমারকে দিয়ে অনুরূপ রচনা করান হয়—যার নাম ছিল 'বসন্তেশ্বরী'। যার ছখানি রাগে সুর সংযোগ করেন শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র বালি এবং বাকী গানের সুর করেন শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিক। এই অনুষ্ঠানটিই 'মহিষাসুর মর্দিনী' পরিকল্পনার উৎস বলা চলে। মহিষাসুরমর্দিনীর প্রভাতী প্রোগ্রাম শুরু হয় ১৯৩২ সালে।

এর আগেই ১৯২৯ সালের শেষাংশেই আমার কর্মসূচীর পরিবর্তন বিচিত্র-ভাবে ঘটতে থাকে। এ. টি. দেবের পুত্র শ্রীসুবোধ মজুমদার আমাকে অনুরোধ জানান যে, তাঁর ভাইপো মধুসূদনকে গান শেখাতে। মধুসূদন দৃষ্টিহীন ছিলেন, তার আবেদন তাই অগ্রাহ্য করতে পারি নি। তাকে গান শেখানো শুরু করতেই আমার মাথায় খেলে গেল যদি দৃষ্টিহীন শুধু শ্রবণগ্রাহ্য সঙ্গীত দিয়ে নিজেকে সঙ্গীতজ্ঞ করতে পারে, তবে অন্ধ মাইকের মাধ্যমে গান শেখান কেন সম্ভব হবে না? আমি এই কথাটি রেডিওতে এসে নৃপেনদাকে বলি। তিনি বলেন —শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা কিভাবে পূরণ করা হবে? আমি বলি—কেন চিঠির মাধ্যমে। নৃপেনবাবুর কথাটা তখনই মনোনীত হয়ে গেল—ফলে মিউজিক ট্রেনিং ক্লাস খোলার জন্যে আমাকে আয়োজন করতে বলেন। ১৯৩০ সালেই আমি সঙ্গীত শিক্ষা আসরের উদ্বোধন করি। উদ্বোধন করা হল এ আসরের অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে-কে দিয়ে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর শিক্ষার আসরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

দিতে শুরু করেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের এ সঙ্গীত মনোমত হচ্ছিল না। তাই দেখে আমি নৃপেনবাবুকে অনুরোধ করি—মিউজিক ট্রেনিং ক্লাশটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষার আসরেই পরিণত করতে—কারণ রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রসার তখন খুবই বেড়ে উঠছিল। তাই শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিককে ওই আসনে বসাতে আমি নৃপেনবাবুকে অনুরোধ জানাই···সেই অবধিই পঙ্কজবাবু সঙ্গীত শিক্ষার আসর পরিচালনা করে আসছিলেন।

১৯২৯ সালে রেডিওর যেমন বিভাগ রচনার কাজ বেড়ে গেছিল তেমনি আমার সঙ্গীত ও একাউস্টিক মুখর নাটিকার লেখা ও সংযোজনা বেড়ে চলেছিল —এ আসরে প্রথমে শব্দবিন্যাসযোগে নাটিকা অভিনীত হল "আশ্‌মানী"— প্রধান ভূমিকায় বীরেন ভদ্র। 'ফাগুয়া' মিস বীণাপাণি, আভাবতী, প্রফুল্লবালা —ধীরেন দাস, আমি ও নায়কের ভূমিকায় বীরেনবাবু। এর পর হল 'ওমর খৈয়ামের নাট্যরূপ'। ওমর-খৈয়াম সর্বজন আদৃত হয়ে রেডিওতে ৬ই নভেম্বর ১৯২৯ সালে অভিনীত হয়। রচনা-গীতিকার ও সুরকার ছিলাম আমি—প্রযোজক ছিলেন নৃপেনবাবু ও রাইবাবু। ওমরের ভূমিকায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সাকী মিস প্রফুল্লবালা, ছন্দ মিস আভাবতী, গুলপিয়ার মিস বীণাপাণি। অর্কেস্ট্রা অরফিক ক্লাব এবং বিশিষ্ট বেহালা বাদক শ্রীঅবনী মুখোপাধ্যায়। অবনীবাবু চিত্রা-সংসদের আরও একজন গুণী যিনি অপূর্ব বেহালা বাজাতেন। পরে সাহিত্য-পত্রিকা কল্লোলের সপ্তম সংখ্যায় কার্তিক ১৩৩৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ আগত প্রায়। ইতিমধ্যে বেতার নাটুকে দলের নাম শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে আরও বলিষ্ঠ করার জন্য ঠিক হয়েছে যে সামনের বছর থেকে মঞ্চ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আহ্বান জানান হবে। এই সূত্রে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে (হাবুলদা···যিনি পাবলিক থিয়েটারের প্রমটার ছিলেন) আমার সহকারীর পদে নেওয়া হল। হাবুলদাকে নিয়ে আমি মঞ্চে মঞ্চে ঘুরে অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছি যাতে করে বছরে আমরা ৭২ খানি করে বই অভিনয় করতে পারি···তার মধ্যে মাসের দুটি মঙ্গলবার গীতিবহুল নাট্য এবং চারটি শুক্রবার ৩ ঘণ্টাব্যাপী পূর্ণ নাটক করা সম্ভব হয়।

সেদিন শুক্রবার, ব্যস্ততার মাঝে সাইকেলযোগে রেডিও স্টেশনে চলেছি, পিছু হতে হঠাৎ ডাক এলো—হীরেনবাবু, ও হীরেনবাবু।

ফিরে দেখলাম শ্রীযুক্ত সুধীরনান্ মহাশয়—তাঁর বহুবাজার স্ট্রিটের দোকানের

সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছেন। নমস্কার! বলে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলেন—ফিল্মের কতদূর কি হল ?

আমি তো অবাক। বললাম—সে কি মশাই—কোম্পানী করছেন আপনারা আর আমি জানব ফিল্মের কতদূর ?

উনি হেসে বলেন—'আমাদের ও কোম্পানী হবে না—নানা মুনির নানা মত, তাছাডা যাক সে কথা, কত টাকা হলে একটা ফিল্ম তোলা যায় বলুন দেখি ?'

কিছুই না জেনে উত্তর দিলাম—'আট দশ হাজার হলেই হয় বোধহয় সেই রকমই তো সব শুনি।'

অবশ্য এ অঙ্কটা প্রায়ই প্রমোদ আমার কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে বলত।

নানমশাই বলেন—'কাল সকালে বাড়ি থাকবেন ?'

বলি—'হ্যাঁ।'

নানমশাই বলেন—'কাল সকালে আমি আসছি···ধরুন সাড়ে সাতটা-আটটার মধ্যে···দশটায় আবার অফিস আছে তো!'

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সাইকেলে পা রাখি, উনি বলেন, নতুন ফিল্ম কোম্পানীর একটা নাম ঠিক করে রাখবেন।

আমি হেসে এগিয়ে চলি—

সাইকেলে যেতে যেতে সুধীর নানমশাইয়ের কথাগুলো ধীরে ধীরে আবার স্মরণ করি···ভদ্রলোক কাল সকালে বাড়িতে দেখা করবেন কথাটা সহজবোধ্য কিন্তু চলার পথে ওঁর শেষোক্তিটা যেন আমার সব গুলিয়ে দিল। ভদ্রলোক কি সত্যিই নিজে একটা কোম্পানী গড়ে তুলে তবে ছাড়বেন···কথাগুলো যেন সুধীর ধরের কোম্পানীকে একটা চ্যালেঞ্জ। এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, কি বা করণীয় ? আমি তো ফিল্মের ফ-ও বুঝি না···দ্যাখা যাক সকালে এসে কি বলেন।

রেডিও পৌছে দেখি বুড়োদা এসেছেন। বুড়োদা তাঁর ফিল্ম কাজের অবকাশে রেডিওতে মাঝে মাঝে আড্ডা বসাতে আসতেন। বুড়োদাকে দেখে বললাম—কাল সকালে বুড়োদা কি বাড়ি থাকছেন।

বুড়োদা হেসে বলেন—কেন, ফের কি কোন নতুন পত্রিকা বার করছ নাকি ? খবরদার, খবরদার অমন কাজও.কর না। যা ঘটেছে তার থেকে মানে মানে যে বেরুতে পেরেছ, সেইটাই বড় কথা। নইলে দেউলে করে ছেড়ে দিত।

আমি যখন 'আলপনা' চালাতাম তখন বুড়োদা ও গিরিজা বসু (কবি) চালাতেন 'যাদুঘর'—আমার পত্রিকা যেমন গয়াপ্রাপ্ত হয়েছে ওঁদেরটাও তাই বটেছিল। বুড়োদা সেই উপলক্ষেই কথাগুলো বললেন।

আমি বলি—না ওসব নয়, অন্য একটা পরামর্শ আছে।

বেতার নাটুকে দলের নাটক এখনি শুরু হবে। নাটকখানি 'অলীকবাবু', প্রধান ভূমিকায় নৃপেনদা নিজেই নামবেন, 'গা ঢালোরে নিশি আগুয়ান' ও 'গা তোলরে নিশি অবসান' গান দুখানি গাইবেন বকুবাবু। আমার আর বীরেনের আজ কিছুটা অবকাশ আছে। তাই রেডিওর দ্বিতলে দক্ষিণের খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে বীরেনকে বললাম—বীরেন! ধর যদি কোন একটা চিত্রঅনুষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি—তোর মত কি?

ও বলে, টাকা?

আমি বলি—ধর সে ব্যবস্থা যদি সম্ভব হয়।

ও বলে—খুব ভাল হয়, দেখ না চেষ্টা করে, আমরা সবাই সহযোগিতা করব। দৃশ্যান্তরের অবকাশে হাবুলদাকে কথাটা বলতে সে উৎসাহিত হয়ে বলে, তোমার যা যা আর্টিস্ট লাগবে আমায় বল, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিছু অভিমত জেনে নিয়ে নিজের মানস চোখে স্বপ্ন রচনায় রাত কাটাই। শুয়ে শুয়ে নতুন কোম্পানীর একটা নামকরণও করে ফেললাম, 'ইউনিক পিকচার্স কর্পোরেশন'—বেশ গালভরা নাম।

ভোর আটটার মধ্যেই নানমশাই এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর যথাযথ আতিথ্য প্রকাশের শেষে তিনিই কথা শুরু করলেন—'দেখুন আমি ব্যবসা করে খাই তাই—ব্যবসাটা যে আপনি বোঝেন না জেনেই আপনাকে নিয়েই আমি ফিল্ম ব্যবসা শুরু করব। আপনি শিল্পী, শিল্প সৃষ্টির মর্যাদা বোঝেন, আপনার লেখা ও সুরের বহু নাটিকাই আমি রেডিও মাধ্যমে শুনেছি, বিশেষ করে কদিন আগের 'ওমর খৈয়াম' নাটিকাটি, তাই আমি বিশ্বাস রাখি এ ব্যবসায় আমরা গড়ে তুলতে পারব, যদি আপনি নিজে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং আপনার সঙ্গে থাকে কিছু নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী। যেমন মিস নিভাননী, মিস রেণুবালা (সুখ), মিস লাইট আর কিছু রেডিওর নামকরা শিল্পী।

আমি চুপ করে থেকে বলি—তা হয়ত পারব।

উনি উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন ব্যাস, ছবির জন্যে আট হাজার টাকার

চেক—আজই ব্যাংকে জমা করে দিচ্ছি—সই হবে দুজনার। খালি বলুন—কিছু নামটাম ভেবেছেন কি ?

আমি বলি—ইউনিক পিকচার্স কর্পোরেশন নামটা আপনার কেমন লাগে ?

উনি বলেন—মন্দ কি, তাই হবে। তারপর বলেন—তাহলে আপনি দশটার আগেই স্নান খাওয়া সেরে তৈরী থাকুন, আমি এসে তুলে নিয়ে যাব।

সময়ক্ষেপ না করে উনি উঠে বসেন ওঁর মোটরে…

ঘটনাটা এতই তড়িৎ-ঘড়িৎ ঘটে গেল যে চিন্তার অবকাশ পর্যন্ত আমায় দিলেন না সুধীরবাবু। আমি স্নান খাওয়া সারতে সারতে ভাবি—ভাগ্যচক্রেব গতি এখন কোনদিকে ? এ যেন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের ভেল্কিবাজি !

প্রায় পৌনে দশটার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন…তৈরী ছিলাম, গাড়িতে উঠে বসলাম। পথে একটা কথাও হল না। দশটার মধ্যেই বহুবাজারের একটি রবার স্ট্যাম্প কোম্পানীর সামনে গাড়ি দাঁড়াল ··সুধীরবাবু দোকানের মালিককে ডেকে বললেন—এই লেখাটি অনুযায়ী একটি রবার স্ট্যাম্প করে বেলা এগারটার মধ্যেই দোকানে পৌছে দেবেন যেন দেবি না হয়…আজ আবার শনিবার—১২টায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যায়। লোকটির জবাবের অপেক্ষা না করেই গাড়ি স্টার্ট নিল এবং ১০-১৫র মধ্যেই তাঁর অফিসে এসে উপস্থিত হলাম। ঠিক এগারটার মধ্যেই রবার স্ট্যাম্প তৈরী হয়ে ওঁর টেবিলে পৌছল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমায় নিয়ে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হলেন।

ব্যাঙ্কে আট হাজার টাকার একাউণ্ট খোলা হল ইউনিক পিকচার্স কর্পোরেশনের নামে এবং চেকে রবার স্ট্যাম্পের ওপর সই করে (পাঁচ সাত খানিতে অবশ্য) আমার হাতে দিয়ে বললেন—যখন ইস্যু করবেন আমার সই-এর পাশে আপনিও সই করবেন।

বেলা ১টার মধ্যেই আমার ছুটি হয়ে গেল। সুধীরবাবু বললেন—আপনি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিন…সামনের রবিবার সকালে আমি আসব আপনার বাড়িতে।

চেক বই পকেটে পুরে রাস্তা চলতে শুরু করি…এক নেশাগ্রস্ত লোকের মত। এ আমার আনন্দ না, মাথায় বজ্রাঘাত। ওঁর অটল বিশ্বাসের প্রতিদান আমি যে কিভাবে দেব সেই দুর্ভাবনায় জড়ভরত অবস্থায় ফিরে এলাম।

এক গেলাস জল খেয়ে ভাবতে বসি, কিভাবে কি করলে কার কার সাহায্য নিলে কাজ এগুনো যাবে। এই বিষয়ে আমি এতই অজ্ঞ যে, গঠন পদ্ধতির ধারাবাহিক প্রশস্তিই জানি না। কদিন প্রমোদের সঙ্গে ফিল্ম প্রতিষ্ঠান দেখতে গিয়ে যা ধারণা হয়েছিল তা মোটেই গঠনমূলক নয় বরং কি করে আর্টিস্ট হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ জোগাড় করা যায় তারই করেছি অপচেষ্টা।

অপচেষ্টা বলছি এই জন্যে—বৃহস্পতিবার অর্থাৎ গত পরশু দিন প্রমোদ আমায় নিয়ে ডালহাউসিতে এক প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিল। কোম্পানীর নাম 'সায়দা ফিল্মস'। পথে প্রমোদ জানিয়েছিল ওরা নাকি একশ টাকার শেয়ার কিনলে অভিনয়ের সুযোগ দেবে। প্রমোদ বললো—ওদের একজন হিরোও দরকার যদি তুমি একশ টাকা খরচ কর তাহলে তুমি হিরোর আসন অনায়াসে কেড়ে নিতে পারবে—কারণ তোমার ফটোজেনিক ফেস আছে আর আমার জন্যে যদি একশ টাকা দিতে পারো আমিও পেয়ে যাবো একটি ক্যারেকটার রোল। একবার সুযোগ পেলে দেখিয়ে দি লন্‌চ্যানীর মত মেকআপ করে…অভিনয় কাকে বলে।

ওদের অফিসের রিহার্সাল হলে দেখলাম বেশ ভিড়…তারই মাঝে অদূরে এক আপটুডেট ছুকরী খুব স্টাইল করে হাত মুখ চোখ নেড়ে কথা বলছেন… ভদ্রমহিলা রূপসী ও সুন্দরী এবং দেখে মনে হয় ইনি কোন এরিস্ট্রকেট ফ্যামিলিরই মেয়ে। প্রমোদকে জিজ্ঞেস করায় বললো—কেন? কাগজে পড়ো নি বাংলাদেশের রয়েল ফ্যামিলির একজন শিক্ষিতা মেয়ে ফিল্মে শীঘ্রই যোগদান করবে? ইনিই সেই মহিলা…এঁদের ভাবী হিরোইন।

একজন পার্শি ভদ্রলোক স্বগোষ্ঠী সহ সভায় এসে ঢুকলেন…হলের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে তাকে সম্মান জানান—এমনকি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পর্যন্ত। প্রমোদ কানে কানে বললো—ইনিই মিঃ সায়দা…এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেকটর। ভদ্রলোকের ডান পাশে একটি কোটপ্যান্ট পরিহিত ফুটফুটে তরুণ দাঁড়িয়েছিলেন—মিঃ সায়দা তাঁকে দেখিয়ে সবাইকে…বিশেষ করে হিরোইনের দিকে চেয়ে বলেন…এঁকেই হিরো ঠিক করলাম—শ্রীকানাই ঘোষাল। আজ সানন্দে এনাউন্স করছি আমাদের শিল্পী চয়ন শেষ হয়েছে—এইবার শীঘ্রই সুটিং শুরু করা হবে।

শোনা মাত্রই প্রমোদের মুখে কে যেন কালি লেপে দিল…আমার মুখও হয়ত তাই…কারণ মনের অবচেতন অধ্যায়ে নিজেকে কখন হিরোর আসনে

বসিয়েছিলাম তা নিজেই জানি না···তাই প্রমোদের মতন আমার মনও হতাশায় ভরে গেল। নিমেষেই প্রমোদকে নিয়ে ওদের অফিস ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। প্রমোদ কথা বলেনি আমি শুধু বললাম—রেডিও চলি···তুমি পার তো শনিবার একবার এসো, শুক্রবার আমাদের নাটক ডে, ব্যস্ত থাকবো।

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় যে অবহেলা আমাদের কপালে লেখা ছিল সেই লেখা শুক্রবারের বিকেলেই কি করে সাদর আমন্ত্রণে উল্টে গেলো সেই কথাটাই ভাবছিলাম এমন সময় চাকর চা দিয়ে গেল অর্থাৎ তিনটে বেজে গ্যাছে··· চা মুখে দিতে যাব এমন সময় প্রমোদ এসে উপস্থিত হলো। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম—দুদিন ডুব মেরেছিলে কেন?

প্রমোদ বললো—দুদিন? তুমি তো কাল তোমার থিয়েটার ডে বলে আসতে মানা করেছিলে···আজকেই তো সময় দিয়েছিলে?

আমি বলি—এদিকে কালই ঘটে গেল চিচিং ফাঁক।

প্রমোদ বলে, চিচিং ফাঁক—সে আবার কি?

উত্তর দি হেসে হেসে—হ্যাঁ চিচিং ফাঁক—হীরে জহরৎ-এর দরজা খুলে গেছে, যত ইচ্ছে তত নাও···কেবল কাসিম মিঞার মত বেরোবার মন্ত্রটা ভুল না।

হতচকিত হয়ে প্রমোদ আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি বলি ফিল্ম কোম্পানী খুলে দিয়েছি কালই···ইউনিক পিকচার কর্পোরেশন··ব্যাঙ্কে টাকা ডিপোজিট হয়ে গেছে এখন চাই গল্প-আর্টিস্ট-ক্যামেরাম্যান-ফিল্ম।

প্রমোদকে ধীরে ধীরে কালকের ও আজকের সকালের ব্যাপার বললাম। সব শুনে প্রমোদ বললো—অঙ্কটা কিছু বাড়িয়ে বললে না কেন? থাক—তা কম পড়লে পরে ম্যানেজ করা যাবে।

আমি বললাম—যা বলেছি তার মধ্যেই করতে হবে—তবু কথার খেলাপ করব না। তারপর গল্প কি হবে বল? মাথায় কিছু আসছে?

সাবলীলভাবে প্রমোদ বলে—গল্প রেডি এখন তোমাদের পছন্দ হলেই হয়।

চা-পানের সাথে সাথেই প্রমোদ গল্প বলতে শুরু করলো। আমার বেশ পছন্দ হোলো। গল্পের হিরোকে হিরোইন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে গভীর রাত্রে চোর বলে সাব্যস্ত করে 'চোর-চোর' চীৎকার করে ওঠে··লজ্জার হাত হতে বাঁচবার জন্যে হিরো হিরোইনের মুখে হাত চেপে দিয়ে বলে উঠেছিল—

এই 'হাস্—চুপ !' আবার গল্পের পরিসমাপ্তিতে—এই হাস্! চুপ !-এর চাপা আওয়াজের প্রয়োজন হয়...তাই বই-এর নামকরণ করলাম হাস্! চুপ !!

বললাম, গল্প আমার পছন্দ হয়েছে...এখন সুধীরবাবুকে শোনাতে হবে—তুমি আজই রাত থেকে লিখতে বসে যাও।...কাল সকালে আমার কাজ আছে...তুমি ৩।৪টার সময় এসো...আশা করি এ সময়ের মধ্যেই গল্প লেখা শেষ করতে পারবে ?

প্রমোদ বললো—হয়ে যাবে।

আমি বলি—তাহলে ৪টার পরে আমি সুধীরবাবুকে গল্প শোনার নিমন্ত্রণ করি কাল—কি বল ?

প্রমোদ বলে—তা পারবো।

আমি উঠে পড়ি—বলি, আজ আবার শনিবার—থিয়েটারে যাবার আছে—হাবুলদা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

প্রমোদ বলে—দুচারটে টাকা হবে ?

আমি বলি—কেন ?

প্রমোদ উত্তর দেয—ভাবছি ফেরবার মুখে একবার থ্যাকার্স বা স্মিথে দেখবো ফিল্ম টেকনিক সম্বন্ধে কি কি বই সংগ্রহ করতে পারি।

কথাটা তাৎপর্যপূর্ণ তাই...পকেট থেকে বার করে প্রমোদের হাতে দশটা টাকা দিলাম।

৫

রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ বুড়োদার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী থাকেন কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সঙ্গীত সমাজের উপর তলায়—আমার বাডির খুব কাছে। ঘরে ঢুকতেই বুড়োদা বলেন—হ্যাঁহে—তুমি নাকি ফিল্ম করছো?

বলি—কার কাছে শুনলেন।

বললেন—সেদিন রেডিওতে—কে যেন বলছিল। কিন্তু সাবধান ভারী পাজী লাইন। কোনো লোককে বিশ্বাস করোনা—কারণ—কেউ কিছু জানে না—স্রেফ ব্লাফে চালাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা বুড়োদা—নীতিন বসুকে ক্যামেরায় পাওয়া যায় না?

বুড়োদা ভুরু কুঁচকে বলেন—নীতিন? তবেই হয়েছে···ওর সময় কখন। মনে করো 'ইনকারনেশন' এখনও বাকী···দেবদাসের টাইটেল তুলতে বাকী। তাছাড়া হরেন ঘোষের 'বুকের বোঝা'···আমাদের ইণ্টারন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌টের 'চাষার মেয়ে'।···ওর সময় কখন—ওসব বড বড কথা ছাড। অন্য ক্যামেরা-ম্যানের কথা ভাবো।

প্রসঙ্গে বলে রাখি বিখ্যাত ইম্‌প্রসারিও হরেন ঘোষ মশাই-এর তত্ত্বধানে তখন 'বুকের বোঝা' ছবি উঠছিল। এঁদেরই সাহায্য করতে গিয়ে মিঃ বি. এন সরকার মশাই ফিল্ম লাইনে ইণ্টারেস্টেড হয়ে—ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফিল্ম ক্র্যাফ্‌ট কোম্পানী খুলেছেন—তাঁদের শ্রীচারু রায় মহাশয়ের 'চোরকাটা' ও শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর—'চাষার মেয়ে' ছবি তুলেছিলেন। নীতিন বসু এই কোম্পানীতে পাকাপাকিভাবে যোগ দেওয়া মনস্থ করেছিলেন।

বুড়োদার কথা শুনে খুব দমে গিয়ে—ধীরে ধীরে বলি,—অন্য কে কে আছেন—এক আধটা নাম তো বলে দিন?

উনি মাথা চুলকে বলেন—কাজের লোক বলতে আছে কৈ?···হ্যাঁ-হ্যাঁ ভালকথা তুমি সুবোধের কাছে যাও না—ও লোকটি ভাল।

বলি—কে সুবোধবাবু?

উনি বলেন—'ঐ যে হে ঝামাপুকুরে—এ. টি. দেবেদের বাড়িতে ভাড়া থাকে। রোগা মত বেঁটে মত মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল।

বলি—ওঁর পুরো নামটি কি—

বলেন—সেটা ঠিক মনে নেই—গাঙ্গুলী না বাঁড়ুজ্যে···ওই লোকটার এলেম আছে···হাতে নাতে কিছু কাজ সত্যিই জানে। তাছাড়া ওঁর বাবা ছিলেন বায়স্কোপের একজন পাওনিয়ার। তোমার ঐ ধরনের একজন লোকেরই দরকার কারণ তুমি নিজে তো কিছুই জান না। সুবোধ থাকলে তোমাকে সে সবদিক থেকেই সাহায্য করতে পারবে।

চায়ের কাপটা শেষ করেই উঠে পড়ি—বলি, দেখি একবার না হয় ওখানেই চলে যাই···

বুড়োদা বলেন—টাকা কড়ির ব্যবস্থা হয়েছে তো।

আমি বলি—হ্যাঁ—নানেরা আমার পেছুনে আছেন।

বুড়োদা উৎসাহ দিয়ে বলেন—তবে এগিয়ে পড়ো—যাও—যাও—সুবোধের কাছে এখনি চলে যাও···বেলা ১টা দেড়টা পর্যন্ত ও বাড়িতেই থাকে।

সুবোধ মজুমদারের বাড়ির ভাড়াটে বলে আমার সুবোধবাবুর পদবি সংগ্রহ করতে দেরি হলো না। সুবোধ মজুমদার বললেন—ওই যা না আমাদের বাড়ির দরজার ডান পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে উঠান পার হয়ে ভেতর বাড়িতে চলে যাবি ওখানেই থাকেন উনি।

বাইরের উঠান পার হয়ে ভিতর বাড়ির ফালি উঠানের সামনেই একটি দালান তার সংলগ্ন ২।৩ খানি ঘর পর পর। ডাকলাম—সুবোধবাবু—সুবোধবাবু সুবোধবাবু বাড়ি আছেন?

সাড়া শব্দ নেই···দালানে উঠে দাঁড়ালাম···রাশি রাশি আবর্জনা অর্থাৎ বইপত্র ছড়ানো। আবার ডাকলাম—সুবোধবাবু আছেন?

—হঠাৎ উত্তর এলো—কে? ···ওইখানে তক্তাপোশে বসুন ঘরে ঢুকবেন না। অদৃশ্য কথার ধরন দেখে বুকটার মধ্যে কেঁপে উঠলো।······

তক্তাপোশে একরাশ কালো সুতোর বিড়ি ছড়ানো···মাদুরখানাতে ধূলো ভর্তি—তারই এক কোণে স্থির হয়ে বসে···অদৃশ্য বক্তার আগমনের পথ গুনতে থাকি। এমন সময় খালি গায়ে একটি ধপ্ ধপে্ ফরসা বেঁটে ভদ্রলোক দালানের শেষ বরাবর ঘরটি থেকে বার হয়ে এলেন—হাতে তাঁর একটি মেথিলেটেড স্পিরিটের বোতল। কানে পৈতে গোঁজা ও কাপড় পড়ার ধরণে বুঝলাম বেলা

১০টার সময় প্রাতঃকৃত্য সারছেন। আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে একবার চাইলেন বলেন, ঘরের মধ্যে যাননি তো?

আমি বলি—না।

উনি অন্তত বার পাঁচেক তার বার হওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং বেরুলেন—প্রতিবারেই হাতে একটি করে ঐ রকম বোতল। তারপর হাত ধোয়ার পালা—১বার-২বার-৩বার-৪বার—করে হাত ধোয়া শেষ করে—গলার কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলেন—ওইখানেই বসুন—আমি ঘর থেকে আসছি।

আমি ভদ্রলোকের ভাবগতিক দেখে নির্ণয় করলাম ভদ্রলোক খুবই পিটপিটে এবং সাবধানী।

একটা বেনিয়ান গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে—তক্তাপোশের পাশের একটি ডেক চেয়ারে বসে বললেন—কি চাই?—

বলি—বুড়োদা—মানে প্রেমাঙ্কুরদা আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন—আমি একটা ছবি তুলতে চাই।

শুনে উনি বলেন—ফটো? তা আমার তো স্টুডিও নেই যে আপনার ছবি তুলে দেবো—আপনি বরং ডি-রতন কোম্পানীতে চলে যান। ওঁদের স্টুডিও বেশ ইকুইপড।

আমি বাধা দিয়ে বলি—না—আমি একটা ফিল্ম তুলতে চাই—তাই আপনার কাছে এসেছি।

আমার আপাদমস্তক বেশ খানিক দেখে নিয়ে বলেন—আপনার মত অনেক জ্যাঠা ছোকরারা আমার কাছে রোজ রোজ ফিল্ম তুলতে আসে—তারপর এটা ওটা সেটা জিজ্ঞেস করে সেই যে ভেগে পড়ে আর চুলের টিকি দেখি না। আপনি বুড়োদার কাছ থেকে আসছেন—আপনাকে আর কি বলবো—মিথ্যে মিথ্যে আমায় বকাবেন না। আমার অনেক কাজ।

প্রতিবাদ জানিয়ে আমি বলি—না-না—আমি সত্যিই একটা ফিল্ম তুলতে চাই তাই একজন ক্যামেরাম্যানের আশায় বুড়োদা আপনার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া আমি ফিল্ম বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ, বুড়োদা বললেন, সুবোধের কাছে যাও—সে সব বিষয়েই তোমায় পথ দেখাতে পারবে।

সুবোধদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা দেখলাম নমিত হয়ে এলো···মৃদু হেসে বললেন—

এই প্রথম দেখলাম যে আপনার বয়সী নবীন যুবক এমনতর সত্য করে তাব অজ্ঞতাটুকু স্বীকার করে!

আমি বলি—আপনাকে আমি সুবোধদা বলবো—আপনিই হোন আমার ফিল্ম শিক্ষার গুরু।

এরপর সুবোধদা বললেন—তবে বসো। এই বলে কাগজপত্র ফাইল খুলে লেখাপডা কবতে থাকেন—হিসেবের অঙ্ক কষেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বলেন—মোট চার হাজার টাকা লাগবে তোমাব—তাতে ফিল্ম, ক্যামেরা, ল্যাবরেটারী—পজেটিভ হয়ে যাবে। তবে আজকালের মধ্যে কন্‌ট্রাক্ট হলে এই বেট, নইলে দেবিতে বদলে যেতে পারে।

আমি বললাম—আমি আজকালের মধ্যেই কন্‌ট্রাক্ট করবো—তবে আমার এক পার্টনার আছেন…তার নাম শ্রীসুধীবচন্দ্র নান—বি. সি. নান ব্রাদার্সের প্রোপাইটর। বলেন তো তাব সঙ্গে আপনাব আজই সাক্ষাত করিয়ে দি… তাহলে কালই কন্‌ট্রাক্ট হয়ে যাওয়া সহজসাধ্য হবে।

তিনি বলেন—কোথায় তাঁর বাড়ি?

আমি বলি—তাঁব বাড়ি বেথুন বোতে। তবে আজ বেলা ৪টা নাগাদ উনি আসবেন আমার বাড়িতে—অর্থাৎ বাদুড়বাগানেই কথাবার্তা পাকা হতে পারবে।

উনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি কথা না বাড়িয়ে ওখান থেকে সটান বেথুন রোতে চলে গিযে—যখন বাড়ি ফিরলাম তখন দেডটা বেজে গেছে।

ঠিক চারটের সময় সুধীববাবু এসে হাজিব হলেন এবং এব পাঁচ-সাত মিনিটেব মধ্যেই সুবোধদা এলেন। সুবোধদা সুধীরবাবুকে তাঁর সমস্ত এস্টিমেটটা বুঝিয়ে দিলেন। সুধীরবাবু এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। তাব পরদিন মিঃ ও. সি গাঙ্গুলি এটর্ণী মশাই-এর অফিসে কন্‌ট্রাক্ট ডিড্ আমাদের সম্পন্ন হোলো।

ইতিমধ্যে প্রমোদ এসে গেছে। সুবোধবাবু চলে যাবার পরই সে ছবির গল্পাংশ পড়ে শোনাতে শুরু করলেন। সুধীরবাবু বললেন—পড়াশুনার দরকার নেই ও আপনি হীরেন বন্ধুকে শোনাবেন—শুধু মুখে মুখে গল্পটা বলুন।

গল্প শুনে সুধীরবাবু রাজী হয়ে গেলেন। ছবির নামকরণও তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। সুধীরবাবু ৫টার মধ্যেই বাড়ি চলে গেলেন। রইলাম আমি আর প্রমোদ।

প্রমোদ বললে—কি ক্যামারাম্যান ঠিক হয়ে গেল ? আমি বলি হ্যাঁ প্রায়। কালই কনট্রাক্ট হবে। এখন গল্পের সিনারিও সম্বন্ধে কি হবে ?

প্রমোদ পকেট থেকে একখানা চটি বই বার করে বললে—থ্যাকার্স বা স্মিথ কোথাও পেলাম না একখানা সিনেমা টেকনিক বই। থ্যাকার্স থেকে এই বইটা দু টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছি—ছ্যাখো।

বইখানার ওপর লেখা—হাউ টু রাইট সিনেরিও।

আনন্দে ডগমগ হয়ে বই খুলে পড়তে শুরু করি। সারা বইয়েতে ডি-এস-এল-এস, এস-এস-সি-ইউ লেখা যার এক বর্ণও আমার বোধগম্য হলো না। বললাম—এসব কি কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ?

প্রমোদ বললে—ওগুলোর কথা প্রিফেসে দেওয়া আছে—ওগুলো মানে ডিস্ট্যাণ্ট সট, লং সট, মিড সট, ক্লোজ-আপ—কিন্তু আইরিশ ইন—আইরিশ আউট এগুলো বুঝছি না।

আমি বলি—কালই কাগজে একটা অ্যাড্‌ভারটাইজমেণ্ট দিয়ে দাও কে সিনারিও লিখতে জানো দেখা করো। দেখা যাক কি ফল পাওয়া যায়—নইলে সুবোধদার কাছেই বুঝে নিতে হবে।

প্রায় সপ্তাহের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কাজে লেগে গেল। হঠাৎ একটি নাবালক—নাবালকই বলবো—দেখতে পাত্‌লা-ফরসা-বেঁটে একটি ১৬।১৭ কি ১৮ বছরেব ছোকরা এসে অফিসে পদার্পণ করলেন। বললেন তিনি সায়াম, ব্যাংকক, বার্মা মুলুকে বহুদিন কাজ করে এ বিষয় একসপার্ট হয়ে কলকাতায় সবে এসেছেন। এছাড়া ৫।৬ খানা বই-এ তিনি ডাইরেকশনও দিয়েছেন। ওঁর দাদা একজন ওয়েল নোন ডিরেকটর অফ হংকং।

বুড়োদার কথাটা স্মরণে এলো। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলাম—বেশ তো আপনাকে আমাদের গল্পের একটা পরিচ্ছেদ দিচ্ছি সিনারিও করে কাল আসবেন।

উনি বললেন—কাল কেন এখনি এখানে বসে করে দিচ্ছি।

প্রমোদকে ইশারা করে আমি সুবোধদার বাড়ির দিকে রওনা হই। আজ ৫ দিন হলো—সুবোধদার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে—প্রায় রোজই সকালে ওর কাছে যাই—আমার জিজ্ঞাস্যের সঠিক নির্দেশ নিতে। আজ লোকেশন সম্বন্ধে কথা হবে।

গত শনি ও রবিবার হাবুলদার সঙ্গে আর্টিস্টদের দেখা করার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল—আজ থেকে সুধীরবাবু একখানি গাড়ি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত আমার কাজেই আমাকে নিয়ে ঘুরবে। এবং সপ্তাহখানেক ঘুরে ছবির প্রায় সমস্ত আর্টিস্টই ঠিক করে ফেলেছি। তার মধ্যে মিস লাইট, নিভাননী—রেণুবালা (সুখ) ছাড়াও আছেন রেডিওর নৃপেন মজুমদার। দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত নেতুদা, বীরেন ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক, সত্য দত্ত··· গ্রামোফোনের বিমল দাশগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী—এবং রেডিওর প্রায় সমস্ত মহিলা শিল্পীরা এছাড়া মায়ের রোল করেন মিস ব্ল্যাকি, অধুনা আশালতার মা, দিদিমা চুনীবালা এবং বালক অভিনেতা জয়ন্তকুমার (আমার ভ্রাতুষ্পুত্র)। (প্রসঙ্গত বলে রাখি শ্রীমতী চুনীবালার এই প্রথম ছবি এবং শেষ ছবি ছিল তার সত্যজিৎ বাবুর পথের পাঁচালী)।

সুবোধদা ও সুধীরবাবু দুজনেই কাস্টিং দেখে খুশী। সুবোধদা বললেন—যতগুলো পারো বাগানবাড়ি জোগাড় করে ফেলো···আর বড়লোকের বৈঠকখানা। রাই বড়াল বন্ধু, কাজেই মল্লিকদের দুখানা বাগানবাড়ি—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানবাড়ি, বটকৃষ্ণ পালের বাগান—ইলাহি বকসের দেওয়ানী বৈঠক—রাইচাঁদ বড়ালের বড় বৈঠক সবই যোগাড় হয়ে গেল।

নীহারবাবুর সঙ্গে সামনের রবিবারই বসা হলো। উনি কতকগুলি কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাদের বইখানার সিনেমা ডিউরেশন হবে ২ ঘণ্টা ১৫ মিঃ ৫ সেকেণ্ড। কাগজগুলি নেড়েচেড়ে দেখলাম—আমাদের ছোট সিনারিও বইখানার মত গল্প লেখার পাশে পাশে ডি. এস এম. এস সব লিখে রেখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নোট করেছেন মিনিট সেকেণ্ড এই সব। আমি জিজ্ঞেস করলাম—এগুলো কি নীহারবাবু। উনি বললেন টাইমিং মানে ডিউরেশন অফ সট···নিজে কিছুই বুঝি না তবে এসব শুনে মনে ভদ্রলোকের তারিফ করে বলি—আপনাকে ডিরেকশন দিলে আপনি পারবেন।

ইনি এক নস্যাৎ হাসি হেসে বলেন—পারব না বলেন কি—বর্মা সায়গন ব্যাঙ্কক সব জায়গাতেই ডাইরেকশন দিয়ে দিয়ে ওসব আমার কাছে জলভাত। প্রমোদ তখন উপস্থিত :ছিল না। নীহারবাবু বললেন—তবে কি জানেন আপনাদের ও প্রমোদবাবু গল্প লিখেছেন বটে তবে সিনারিও উনি কিছু বোঝেন না—অথচ আমার সঙ্গে খালি তর্ক করে আমার সময় নষ্ট করেন। শেষ পর্যন্ত

ভদ্রলোকের সঙ্গে ১০০ টাকায় রফা করে—মাসে ২৫ টাকা করে প্রাপ্তি হবে বলে বিদায় করলাম।

যাবার সময় কতগুলো কাগজ দিয়ে বলে গেলেন—বই-এর হাফ সিনারিও আপনার হাতে তুলে দিলাম—বাকী হাফ ৫।৭ দিনেই পেয়ে যাবেন তখন কিন্তু আমার কিছু অ্যাডভান্স চাই।

ওর যাবার পর এলেন সুধীরবাবু তাকে সিনারিও সম্বন্ধে কথা বললাম, তিনি বললেন—ছেলেটি কথায় যখন এত বকে ওর প্রতি বিশ্বাস বাখবেন না। বরং প্রমোদবাবুকেই কিছুটা তৈরী রাখুন। হাজার হোক নিজেব গল্প, মাথার মধ্যে একটা রূপ নিশ্চয়ই গড়ে তুলেছেন।

ইতিমধ্যে সুবোধদা ক্যামেরা নিয়ে রেডি হয়ে বললেন—এইসব ল্যাবরেটরীব জন্য আরও কটা দিন নেবো তারপরে সুটিং শুরু করে দেবো। চীনে ছুতোরের ব্যবস্থা করেছি বাথটব কববে—বলাইবাবুকে দেখা শুনার জন্যে লাগিয়ে দিয়েছি—তুমি কেবল ছজন আমায় ভাল ওয়ার্কার দাও, যারা আমার ল্যাবরেটরীতেও কাজ করবে আব সুটিং-এর সময় মুখে রিফ্লেকটর ফেলবে। আমি আমার চেনা জানার মধ্যে শ্রীমিণ্টু মিত্র (এখনও মিঃ মেটার ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবে প্রিন্টিং করে) —শ্রীকালী রাহা (আজকেব বড় এডিটার) সূর্যকান্ত (একটি মাদ্রাজী ছেলে) প্রমুখ ৬ জনকে সুবোধদার কাজে বহাল করলাম।

প্রোডাকশনে নিলাম আমার বড়দাকে এবং সঙ্গে ডঃ পি. কে. বোসের-এব ভাই শ্রীমান ললিত বসুকে। স্টিল ক্যামেরার ভার নিলেন শ্রীবিষ্ণু ঘোষ (ব্যায়ামাচার্য)।

প্রোডাকশন বয়—মঙ্গল সিং।

বি. কে পালের বাগানের দোলনায় আমাদের প্রথম সুটিং হবে। বালক জয়ন্তকে দোলনায় দোল দিচ্ছে মিস লাইট—হিরো সেই সুযোগে দোলনার দোল দেওয়ার পদ্ধতি দেখতে এসে হিরোইনের সঙ্গে কেমন করে ধীরে ধীরে ভাব জমিয়ে তুলছেন—এই সিন।

প্রোডাকশন থেকে মেয়েদের এনে মেক-আপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সকাল ৮ টার মধ্যে। মেকআপম্যান হচ্ছে বিখ্যাত সাম (সামসুদ্দিন)। লোকেশন স্পটে সুবোধদা ক্যামেরা নিয়ে তোড়জোড় চালিয়েছেন। ওঁর জন্যে দু-একটা টুল কিনে দেওয়া হয়েছে···বেঁটে মানুষ ক্যামেরার নাগাল পান না। তাছাড়া যথাযথ উচ্চতা না রাখতে পারলে চোখ আর হাত একসঙ্গে চলে না। তখনকার

দিনে ক্যামেরা মোটরে চলতো না—গ্রামোফোনের হ্যাণ্ডেলের মত হ্যাণ্ডেল ধরে হাতে ঘোরাতে হোতো।

প্রমোদ, হিরো-হিরোইন ও জয়ন্তের মেক-আপ সাঙ্গ করিয়ে—ড্রেস পরিয়ে লোকেশনে নিয়ে এলো। আজ আমি হিরো তাই সব কাজেই নিশ্চুপ।

সামনে নীহারবাবু স্ক্রিপ্ট নিয়ে অদ্ভুত পসচাবে দাঁড়িয়ে। এমন সময় সুবোধদা বললেন—অল বেডি—আমি রেডি আছি।

আমাদের অ্যাকশন শুরু করতে বলে নীহারবাবু বলে ওঠেন—রেডি অ্যাকশান— ক্যামেরা গো। সবে আমাদেব কাজ শুরু হয়েছে, মিস লাইট দোলনায় দোল দিতে যাচ্ছে এমন সময় নীহারবাবু বললেন কাট।

সুবোধদা টুল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠেন—হোয়াট ইজ দিস? কাট? কাট মানে? অ্যাকশন সবে শুরু করেছে ওদের করণীয় যা করবার তা কববে তবে তো কাট!

নীহারবাবু হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে বলেন—এ দিকে যে থার্টি সেকেণ্ড পার হয়ে গেল—সেটা হুস রাখেন। এ সটটা আমার থারটি সেকেণ্ডের।

সুবোধদা রাগী লোক—একদম সপ্তমে চড়ে উঠে বলেন—ইউ ইডিয়েট-ফুল থার্টি সেকেণ্ড কলার পাতায় লিখে রাখলেই অ্যাকশন শেষ হয়ে যাবে? ওদের সময় নেবে না, এক্সপ্রেশন দেবে না।

ব্যাপার গডবড় হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী নিভাননী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, মিস লাইটও সদ্য সদ্য দেবদাস পার্বতীর রোল করে এসেছে। দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠেন—সত্যি তো নীহারদি ওদের অ্যাকশন পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

নীহারদি ডাকটা শুনে সবাই হেসে ফেলি—

আমি বলি নীহারদি কি?

নিভা-মা বলেন সে আমরা আপোষে ঠিক করে নিয়েছি....কারণ থিয়েটারের নীহারদিকে নীহারদি বলে বলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি নীহারবাবু মুখ দিয়ে বেরোয় না।

নীহারবাবু অপমানিত হয়ে বলে ওঠেন—জানেন সুবোধবাবু আমি সায়গন ব্যাঙ্কক...

কথা থামিয়ে সুবোধদা ধমক দিয়ে ওঠেন—থামো থামো জ্যাঠা ছোকরা—আমায় আর তোমার সায়গন-ব্যাংকক দেখিও না।

নীহারবাবু এবার—স্ক্রিপ্টের ফাইলটা ধপ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে কেঁদে ফেলে রুমাল চোখে দূরে চলে গেল।

আমি প্রমোদকে বলি—ওহে গল্প লেখক এগিয়ে এসো—স্ক্রিপ্টটা তোলো—এবার তোমার পালা—স্যুটিং করো।

প্রমোদ চালাক ছেলে। বলে সুবোধদা আপনি রেডি হলে আমি স্টার্ট বলে দেবো—তারপর অ্যাকশন শেষ হলে আপনিই কেটে নেবেন।

যা হোক করে—প্রথম দৃশ্যের প্রথম সট হয়ে গেল। কালো পর্দা থেকে মাথা বার করে সুবোধদা বললেন—ও কে, এখন তবে ব্রেক ফর লাঞ্চ হোক।

বাগান বাড়ির দালানে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা—ললিত করে রেখেছিল। মাংস ভাত ডাল তরকারী ভাজা। সবাই তৃপ্তি সহকারে তার সদ্গতি করে চলেছি···শুনলাম নীহারদি খাবে না।

মিস লাইট তার মান ভঞ্জন করতে বললে—নীহারদি না খেলে আমিও খাবো না।....প্রথম দিনের পালা এখানেই শেষ হলো—তিনটে বেজে গেছে· সূর্য ঢলে পড়েছে সুবোধদা বললেন—প্যাক আপ্।

গাড়ি সবাইকে শ্যামবাজারের মোড়ে ছাড়তে চলে যায়, তার ফেরার অপেক্ষায় আমি, সুবোধদা, নিভা-মা ও মিসলাইট এক জায়গায় বসে আলোচনা করি।

নিভামা বলেন—না বাবা, এ রকম করে পয়সা নষ্ট করলে অগাধ জলে পড়ে যাবেন। তার চেয়ে একজন ভাল ডিরেক্টর ঠিক করে ফেলুন। লাইটেরও সেই অভিমত। সুবোধদা বলেন, আজকের পর আর স্যুটিং হবে না। একেবারে ভাল ডিরেকটর এনে তবে কাজ শুরু হবে।

শেষ ট্রিপে গাড়ি সবাইকে পৌঁছে দিল ··এখন গাড়িতে আমি একা। ভাবলাম একবার চারুদার বাড়িটা ঘুরেই যাই না—কি বলেন দেখি। চারুদা তখন থাকতেন মেছুয়াবাজার স্ট্রিটের (এখন কেশব সেন স্ট্রিট) একখানি বাড়ির দোতলায়। ভাগ্যক্রমে চারুদাকে বাড়িতেই পেলাম। চারুদা বলেন—কিহে হীরেন খবর কি ? বুড়ো বলছিল তুমি নাকি ফিল্ম করছো ?

আমি বলি—হ্যাঁ তাইতো এলাম আপনার কাছে। আমাদের বইটা একটু ডাইরেকট করে দিন না। চারুদা বলেন- আমার সময় কোথায়···তা ছাড়া আমার চার্জ দিতে তোমরা কি পারবে। আমি বললাম—আপনাকে কত দিতে

হবে জানতে পারলে…আমার পার্টনার মিঃ নানকে জিজ্ঞেস করে কথা দিতে পারি।

উনি বলেন—বিডন স্ট্রীটের নানেরা…ওরাতো বড়লোক, বোলো ৬ হাজারের নীচে আমি কাজ করি না।

আমি নিরুত্তর থাকি, উনি বলেন ওদের বলে দেখ না—ওরা পারবে দিতে ‥ এতো আর তোমার নিজের কোম্পানী নয়?

কথা না বাড়িয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

৭ নং রামমোহন রায় রোডের বাড়ির ঠিক সামনেই থাকতেন শ্রীদুর্গাদাস বাড়ুজ্যে ·ওর সঙ্গে হাবুলদা থিয়েটারে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। ভাবলাম, একবার ওখানে গেলে কেমন হয়। গাড়ি নিয়ে ওর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম, দেখাও হয়ে গেল।

দুর্গাবাবু বললেন—রেডিওর প্লে কবে থেকে শুরু হচ্ছে—কি বই হচ্ছে?

আমি বলি—রেডিওর প্লের দু সপ্তাহ দেরী আছে, আমি এসেছি অন্য কাজে—মানে আমি একটা ফিল্ম তুলছি, তার ডাইরেকশনের জন্য আপনার শরণাপন্ন হলাম।

দুর্গাবাবু বলেন, ভালই করেছেন, তবে হিরোর রোল হলে অনায়াসে আপনাকে কথা দিতে পারতাম—কিন্তু ডিরেকশন ফিরেকশন আমার দ্বারা হবে না। এ সব ক্যামেরার প্যাঁচ পয়জার ভাববার আমার সময় কোথায়? তার চেয়ে আপনি সটান চলে যান দাদার কাছে, উনি এ-সব বিষয়ে খুবই উৎসাহী। দাদা হচ্ছেন তিনকড়ি অর্থাৎ তিনকড়ি চক্রবর্তী। চুপ করে থেকে দাদার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে উঠে পড়ি। উনি বলেন, বকুলবাগানে ঢুকে যাকে জিজ্ঞেস করবেন—তিনিই বাড়ি দেখিয়ে দেবেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—আজ থিয়েটারের দিন নয়, তাই মোটর ঘুড়িয়ে সটান রওনা হই ভবানীপুরের দিকে। দাদার বাড়ি খুঁজে পেতে দেরী হোলো না—তাঁকে বাড়িতেও পেয়ে গেলাম। গাড়িতে বসে ভাবলাম দাদা মানে আমার জেঠতুত ভাই শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুর (বসুমতীর এডিটার) কাছে শুনেছিলাম, উনি নাকি দাদার বুজম ফ্রেণ্ড।

ওর বাড়িতে নেমে দাদার পরিচয় দিয়ে সব কথাই অকপটে খুলে বললাম। উনি সব শুনে ভেবেচিন্তে বললেন,—কি বা বলি। তুমি হলে সত্যেনের আপন খুড়তুত ভাই, বেশী চাইলেও অপরাধ হবে। এ কাজ বুঝলে খুবই সময়সাপেক্ষ

কাজ, তাছাড়া আমার থিয়েটার বজায় রেখে করতে বেশ দেরীও হবে···অথচ ছবি যত দেরী হবে ততই কষ্ট বেড়ে যাবে···তাই, তোমায় পরামর্শ দি, তুমি অন্য কারোকে ডিরেকটর নাও। আমায় রেহাই দাও—আমায় নিলে আমার বদনাম হবে, তোমারও বদনাম 'হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি নাতিদীর্ঘ লেকচার দিয়ে আমায় বিদায় দিলেন। আমি অকুল সাগরে ভাসতে ভাসতে রাত দশটায় বাড়ি এসে পেঁছিলাম। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু রাতে এক পলক চোখের পাতা বুজতে পারলাম না।

সকালে উঠে চা খেয়ে নীচের বৈঠকখানায় এসে দেখলাম প্রমোদ খুব মনোযোগ দিয়ে সিনারিও নিয়ে পড়ছে আর চা খাচ্ছে। (সুবিধার জন্য প্রমোদকে আমার বাড়িতেই থাকতে বলেছিলাম) আমি বলি, তুমি খুব ভাল করে স্টাডি করো—আমি একবার সুবোধদার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

সুবোধদার বাড়ি গিয়ে দেখলাম দরজার তালা বন্ধ। ভাবলাম, যিনি এত লেট্-রাইজার, আজ ভোরেই বেরিয়ে গেছেন—ব্যাপারটা কি? কিছুক্ষণ বাদেই সুবোধদা ফিরে এসে বাড়িতে ঢুকলেন।

প্রায় ওঁর পেছু পেছুই গিয়ে ঢুকলাম। উনি বললেন, 'এসে গিয়েছো—এখন কোন কথা নয়, একটু চা খাওয়া যাক আগে। স্টোভে জল চড়িয়ে দিয়ে তক্তপোষের ওপর মাদুরে বসে বলেন—বল কি ব্যাপার?

কালকের অভিযানের আদ্যোপান্ত ইতি-বৃত্তটুকু ধীরে ধীরে শোনালাম—উনি কিছু শুনছেন কি, না শুনছেন বুঝলাম না—চা তৈরীতে ব্যস্ত। দু-কাপ চা তৈরী করে আমার হাতে এক কাপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন—যাঁদের কাছে গিয়েছিলে, ওঁরাও এক-একজন তোমার নীহারদির অন্য সংস্করণ—শুধু নামে কাটছেন।···এর পর নিশ্চুপ চা খেয়ে চলেন। আমি বলি কি চুপ করে আছেন কেন—কি করবো বলুন?

সুবোধদা বিড়ি ধরিয়ে বললেন—থাক ও-সব কথা। তোমাকে কতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি আগে তার উত্তর দাও দিকিনি!

—বলুন!

—বেতার নাটুকে দলের ইন্‌চার্জ তুমি? নাটক শেখায় কে?

—আমিও শেখাই, বীরেন বাবুও শেখান।

—অভিনয়টা হয় কি রকম করে?

—কেন বই দেখে শিল্পীরা অভিনয় করে যান।

—বই পড়ে অভিনয় করবে, আর শেখাশেখির কি আছে?

আমি বলি—সেকি, কণ্ঠস্বরের তারতম্য তো ভাবের অভিব্যক্তির ওপর নির্ভর করে···হৃদয়ের অনুভূতিটাকে কি করলে ভাবপ্রকাশ হয় তাই শেখানো হয়।

—উনি বলেন—ভাব প্রকাশ করতে গেলে আবার এসে যাচ্ছে মুখ-চোখের অভিব্যক্তি নয় কি?

আমি বলি—বটেই তো!

উনি হেসে বলেন—রেডিওর অভিনয় মানে চোখ-মুখের অভিব্যক্তির সঙ্গে কণ্ঠের উঠানামা আর বায়স্কোপের অভিনয় মানে কণ্ঠ বন্ধ রেখে শুধু চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে অন্তরের ভাবধারাকে প্রকাশ করা, কথা না বলে হৃদয়ের অনুভূতিগুলো চোখ-মুখ দিয়ে ব্যক্ত করতে যে যত সঠিক পারবে—সেই হল নির্বাক চিত্রের ততই ভাল অভিনেতা। তুমিতো হিরো করছো—নিশ্চয়ই তুমি এটা অনায়াসে বুঝবে এবং করবে।

আমি বলি—নিশ্চয়ই ··অবাক হওয়া দেখতে গেলে সত্যিই অবাক হতে হবে···বিস্ময়, রাগ, অভিমান, প্রেমপ্রীতি ভালবাসা সবই হৃদয়ে অনুভব না করলে চোখমুখ দিয়ে সে কি করে প্রকাশ পাবে বলুন? কেন—সেদিন দোলনার সিনে আমার প্রকাশভঙ্গীতে কি গলদ ছিল?

উনি হেসে উত্তর দিলেন গলদ থাকলে কাট্ করে দিতাম। এখন যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তুমি যেমন তোমার অভিনয় চাতুর্য দেখাবার জন্যে আগে থাকতে গল্পের দৃশ্য অনুযায়ী নিজেকে রিহার্স করে নাও তেমনি অপর শিল্পীকেও তুমি রিহার্স করে তৈরী করে দিতে অনায়াসে পারো। বাকী রইল শট্ টেকিং—সে তো আমার কাজ। আমি পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্যামেরা প্রেস করবো তুমি এসে ক্যামেরার ভেতর দিয়ে দেখে নেবে যে তোমার গল্প এই অ্যাংগেলে প্রকাশিত হচ্ছে কিনা···তারপর আমি ক্যামেরা চালিয়ে ছবি তুলে নেবো। আমার ক্যামেরার বাইরে গেলে আমি যেমন কাট কাট বলে ক্যামেরা বন্ধ করে দি তুমিও তোমার গল্প অনুযায়ী শিল্পীরা না করতে পারলে কাট্ বলবে। অভিব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে তুমি সন্তুষ্ট হলে বলবে ও কে, আমিও ক্যামেরার পূর্ণ প্রকাশ হলে বলবো ও কে, এই তো হলো ডিরেকশন—তবে এর জন্যে এত দৌড়াদৌড়ি কিসের।

আমি চুপ করে থেকে বলি—বড় ভয় করে সুবোধদা, কখনো করিনি তো।

তাছাড়া প্রোডাকশন—দেখাশুনা—হিরোর কাজ—তার সঙ্গে এতবড় দায়িত্ব আমার দ্বারা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

উনি বললেন—ওসব যা বললে তা ডিভিশন্ অফ্ লেবার। প্রমোদ দেখুক আর্টিস্ট আনা—মেক আপ করানো—তাদের পেঁছিনো, এসবের ভার···তুমি শুধু নিজের পার্ট করো আর অন্যান্য অ্যাকটরদের শেখাও—রিহার্স্যল দেওয়াও···তার-পর স্যুট করে নেবো আমি।

···আমি ভাবছি—মিঃ নানের এতগুলো টাকা—যদি নয়-ছয় হয়ে যায় ?

উনি এবার বলেন—বেশ তাহলে ডিরেক্টর খোঁজো···সে এসে মিঃ নানের টাকাটা গুছিয়ে মিঃ নানের পকেটে ভরে দেবে···শোনো আজ সকালে উঠে··· আমি ওখানেই দৌড়েছিলাম। উনি বললেন, সামনের রবিবার সকালে বসে তিনজনে এ-বিষয়ের ফয়সলা করা হবে। আজ উঠে পড়ো···আমার আবার মিস্ত্রীরা এসে পড়বে, ওদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো।

বাড়ি ফেরার পথে সুবোধদার কথাগুলো মাথায় ঘুরতে থাকে।

বাড়িতে ফিরে দেখি তখনও প্রমোদ নীহারদির লেখা সিনারিওর পাতা উল্টাচ্ছে। সামনের বেঞ্চে বসে একটি পুরুষ ও একটি যুবতী। পুরুষটি প্রৌঢ়ত্ব শেষ করে বার্ধক্যের দিকেই এগিয়েছেন-বলে মনে হলো—মেয়েটি যুবতী—দেখতে শুনতে মোটামুটি মন্দ নয়।

ঢুকতেই প্রমোদ চেয়ার ছেড়ে উঠে বসতে দিয়ে বলে—নীহারদির সিনারিওটা বেশ ভাল করে স্টাডি করলাম—দেখলাম ভদ্রলোক যে টাইমিং লিখেছেন তা হয়তো ফিনিসড ছবির শটের টাইমিং—তোলার টাইমিং হিসাবে ওর ব্যবহার করা যায় না।

আমি বলি—এককথায় সবটাই ব্লাফ্···আমরা কিছু জানি না বলে আমাদের নিয়ে আজ একমাস ধরে ফুল বানিয়েছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রমোদকে কি ইশারা করলেন। প্রমোদ বলল—এই যে ইনি সব। এঁকে বলুন আপনাদের কথা—

সেদিনের দিনে বাড়ি বয়ে যে মেয়ে আর্টিস্ট এসে হাজির হতে পারেন—তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

ভদ্রলোক আমায় নমস্কার জানিয়ে বললেন—আমি হচ্ছি সামান্য একজন পল্লীগ্রামের অভিনেতা—আপনার ছবিতে চাকর-বাকরের একটু সুযোগ যদি পাই।

আমি বলি—প্রোডাকশনের জন্যে চাকর তো আমরা রেখে দিয়েছি মঙ্গল সিংকে।

প্রমোদ বলে—না, চাকর-বাকরের পার্টের কথা উনি বলছেন।

আমি বলি—আর ইনি ?

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন—উনি আমার সঙ্গে আসেননি—উনি নিজে নিজেই এসে গেছেন।

ভদ্রলোককে বললাম—বেশ প্রমোদবাবুর কাছে নাম ঠিকানা রেখে যান। উনি খবর পাঠাবেন।

ভদ্রলোক প্রমোদকে ইশারায় বাইরে ডেকে ঘরের বার হয়ে গেলেন।

এবার যুবতী আমাকে ঘরে একলা পেয়ে বললে—আমায় কিন্তু আপনার পায়ে একটু ঠাঁই দিতে হবে···

আমার পায়ে ঠাঁই মানে কি··আপনিও ফিলিমে নামতে চান নাকি? বলেন—

—তা জানি না, তবে যা করলে ভাল হয় আপনাকে করতেই হবে—নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব !

চমকে উঠি···ভাবি সকাল বেলায় একি ক্যাসাদ ! বলি—আপনার ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন—আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

যুবতী বাইরের দিকে ঝুঁকে একটু চেয়ে নিয়ে স্বর নামিয়ে বলেন—উঁনিই আমায় ফুসলে ঘর থেকে বার করে এনে কলকাতায় এক জঘন্য পল্লীতে তুলেছেন। সারা গায়ের গয়নাগাটি সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেচে খেয়ে এখন বলছেন—চল ফিল্মে কাজ করে দুজনে খাসা দিন কাটিয়ে দেবো। আসবার সময় শাসিয়েছেন—খবরদার ওখানে গিয়ে জানাবি না যে আমি তোর পরিচিত। ···আমার কি হবে ? কি করে যে কি হবে একটা উপায় আপনাকে করে দিতেই হবে।

মেয়েটা ঝর্ ঝর্ করে কাঁদতে লাগলো—

আমি রাগে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হাঁক দি—প্রমোদ। মেয়েটি আমার পায়ে হাত ঠেকিয়ে বলে—আপনার দুটি পায়ে পড়ি—ওকে ডাকবেন না, তাহলে বাড়ি ফিরে আর আমার হাড় চামড়া এক রাখবেন না—

আমি ক্ষান্ত হই ··বলি,—কি করতে পারি আমি আপনার বলুন ?

—যা হোক কিছু···

আমি বলি—আমাদের ছবির প্রস্তুতি চলেছে—আরম্ভ হতে অনেক দেরী—কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে প্রমোদবাবুর কাছে এসে খবর নেবেন—যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করব—তবে তা দিয়ে তো জীবন কেটে যাবে না?

মেয়েটি চুপ করে থাকে—

আমি বলি—আজ আসুন—আমাকে এখনি বেরোতে হবে। আমি উঠে দাঁড়াই। মহিলা বাইরের দিকে দু'পা বাড়িয়ে ফিরে এসে বলেন—পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারেন? আজ দুদিন ধরে ঘরে একটি পয়সাও নেই। ও বলে ব্যবসা ফাঁদ—আমার আপত্তি নেই।

আমি এই ঘৃণ্য আবহাওয়া থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে ওর হাতে দিয়ে দি।··· ও গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ এসে ঘরে ঢুকলো। আমি বলি—এতো কি কথা হচ্ছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে?

প্রমোদ বললো—বলছিলেন একস্ট্রা মেয়ে দরকার হলে ওকে জানাতে—উনি এক টাকা রোজে মেয়ে এনে দেবেন। আমি বললাম দরকার হলে জানাবো।···তাছাড়া উনি মেয়েটির জন্যেও বোধকরি অপেক্ষা করছিলেন তাই আবোল তাবোল বকে যাচ্ছিলেন।

—ও তো বললে মেয়েটির সঙ্গে উনি আসেন নি....

প্রমোদ হেসে বললে—আমায় এসে বলেছিলেন—মেয়েটি ওঁর বোন হয়···

ধমক দিয়ে উঠি আমি—কি হয়?

—বোনই তো বললে।

—তবে আমায় বললে না কেন—চেপে গেল কেন?

প্রমোদ বলে—বোধহয় লজ্জায়।··

আমি দাঁত চেপে উত্তর দি—লজ্জায় না পেশায়। খবরদার এ ধরনের লোকেদের তুমি এণ্টারটেন করবে না।

হঠাৎ ··'হীরেনবাবু', বলে ঘরে এসে ঢুকলো 'দশরথ'। দশরথ গ্রামোফোন কোম্পানীর পুরোনো চাকর—রিহার্সল রুমের অধিকর্তা বলা চলে।

আমি বলি—কি খবর গো দশরথ?

—ভট্টচার্জি মশাই বলে পাঠিয়েছেন···দু একদিনের মধ্যেই আপনি আসি যাবেন—শেসন শুরু হয়ি গ্যাছে।

৭

...ভাগ্যদেবতা আমাকে ত্রিশূলারূঢ় করে ছেড়েছেন।

একদিকে বেতার নাটকে দলকে বলিষ্ঠ কবার জন্য মঞ্চ অভিনেতাদের সমাবেশ কবানো· ·অপর দিকে এইচ. এম. ভিব আগামী ১৯৩০-এর রিহার্স´ল শুরু...তারই মাঝখান থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উদয় হয়েছে চিত্র জগত।

এই ত্রিশূলারূঢ় অবস্থানকে সামাল দিতে আমার কি অবস্থা হয়েছে ভাবুন।

দশরথের আজ্ঞাকে অবজ্ঞা না করে পরের দিনই গরাণহাটায় 'বিষ্ণু ভবনে' হাজির হলাম। আগেই বলেছি বিষ্ণুভবন গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্স´ল বাড়ি। ত্রিতল বাড়ি...নীচের তলার খবর রাখতাম না...তবে পাকা বাঁধানো গলিপথ ধরে এগিয়ে গিযে সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতলে ও ত্রিতলে। সিঁড়ির বাঁদিকে—একটি প্রশস্ত হল (হলঘর)—তাব পাশে ছোট ছোট দুখানি সংলগ্ন ঘব...আর ডান দিকে একখানি করে ঘব...এই হচ্ছে দোতলা ও তেতলার প্ল্যান।

দোতলার ডান দিকেব ঘর—অফিসঘর। বাঁদিকের হলে আজ দেখি বিরাট শিল্পী সমারোহ। .যাগেশ চৌধুরী লিখিত 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা রেকর্ড করা হবে তারই মহলা বসেছে। পরিচালনা করছেন—যোগেশবাবু নিজে, সুরকার হচ্ছেন—তখনকার আত্মদর্শন—জয়দেব—ব্যাপিকাবিদায়ের সুরশিল্পী ভূতনাথ দাস। দুজনেই উপস্থিত। নিমাই-এর ও নিতাই-এর গানের রিহার্স´ল হচ্ছে। যথাক্রমে নিমাই-এর ভূমিকায়—কৃষ্ণভামিনী এবং নিতাই-এর ভূমিকায় আশ্চর্যময়ী। শচীমাতাব ভূমিকায়—নগেন্দ্রবালাও উপস্থিত...তাছাড়া তুলসী চক্রবর্তী, শীতল পাল, বঙ্কিম, জহর গাঙ্গুলী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু শিল্পীরই সমাগম। টাইম রাখছে ধীরেন দাস—সিন পাণ্টানব হুইসিল মারছেন—হাবুলদা। হাবুলদা আমার সঙ্গে সবার পবিচয় করিয়ে দিলেন—সবাই ছিলেন আমার পরিচিত কেবল মহিলা শিল্পী নগেন্দ্রবালা, আশ্চর্যময়ী ও কৃষ্ণভামিনী বাদে। সরস্বতী আমার মধুসূদন দাদা শিশু নাটিকার জটিলের ভূমিকা অভিনয় করেছিলো। ধীরেন দাস বললো, ওপরে কাজীদা তুলসীদা (তুলসী লাহিড়ী) বিমলদা (বিমল দাশগুপ্ত, কমল দাশগুপ্তের দাদা) সবাই আছেন—ভট্টাচার্জি মশাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন...যাও। দেরি করো না।

উপরের ডানদিকের ঘরে কাজীদা ইন্দুবালাকে গান তোলাচ্ছেন আর বাঁদিকের ঘরে ভট্টাচার্জি মশাই বিমলদা ও তুলসীদার সঙ্গে বসে কথা বলছেন।

ঢুকতেই ভট্টাচার্জি মশাই বলেন—এবার ঢাকা ইউনিট আসতে পারছে না। কাজেই ভজন ডুয়েট আপনি কার সঙ্গে করতে চান বলুন। মাণিকমালার সঙ্গে করবেন? কারণ বীণাপাণি ডুয়েট গাইতে চাইছেন না।

আমি একটু ভেবে বলি—আমাদের জুড়ীর একটা সুনাম হয়েছে—হঠাৎ ভেঙ্গে দিয়ে অন্যের সঙ্গে গাইলে যদি শ্রোতারা না নেন। তার চেয়ে এবার আমি ডুয়েট গাইব না বরং মাণিকমালাকে নিয়ে বিমলদা গান। বিমলবাবু বলেন—না, আমি এবার শ্যামা সঙ্গীত গাইব ঠিক করেছি—সে গান দুখানি তুমি লিখে সুর করে দেবে।

আমি বলি—তা দেবো। তুমি বরং অন্য নামে মাণিকমালার সঙ্গে ভজন ডুয়েট গাও। আমাদের স্টাইলেই আমি গান বেঁধে সুর করে দেবো।

ঠিক হলো শ্রীদাম বাবাজীর নামে ওই রেকর্ড বেরুবে।

ভট্টাচার্জি মশায় বলেন—তাই ভালো আপনারা বসে আজই একটা লিস্ট তৈরী করে ধীরেনবাবুর কাছে রেখে যাবেন—আমি এখন অফিস চলি। ধীরেন দাস তখন ভগবতীবাবুর সহকারী হিসাবে গ্রামোফোন কোম্পানীতে চাকরি করে।

ভট্টাচার্জি মশাই উঠে গেলে আমরা একটা লিস্ট শেষ করে ফেললাম। শিশু রেকর্ডের সুধীরা দাসগুপ্তা এবার বড়দের রেকর্ডে অর্কেস্ট্রা সম্বলিত গান করবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরিশেষে আমি বিমলদা ও তুলসীদাকে আমার চিত্রজগতের অনুপ্রবেশের খবর দিলাম। দুজনেই সাগ্রহে ছবিতে নামতে রাজী হলেন। সবারই হবে ছবির জগতে হাতেখড়ি, কাজেই উৎসাহ কারো কম নয়।

পাশের ঘরে কাজীদা গান শেখাচ্ছেন—আমি গিয়ে পৌছলাম। ইন্দুর গান তোলা শেষ—আমায় নমস্কার করে কুশল খবরাদি জিজ্ঞাসা করে নীচে নেমে গেলেন। সাথে সাথে ধীরেন দাস এসে হাজির হলো। ঘরে ঢুকেই নীচু গলায় বললো—কাজীদার জিত হয়েছে শুনেছো?

কিসের জিত···মুখের পানে চেয়ে থাকি। ধীরেন বলে—রয়েলটি কেসের।

কাজীদা মুচকে মুচকে হাসেন। ধীরেন বলে চলে—গ্রামোফোন কোম্পানী রেগে লাল....হয়ত কাজীদার গান বন্ধ করে দেবে।

কাজী হা-হা-করে হেসে বলেন—ধীরেন তোকেও রয়েলটি না দিলে কাজ করিস না। এ সেসনটা আমি যেমন করছি করে নে—তবে সামনের সেসনে আর নয়। রেকর্ড লেবেলে সুরকার গীতকারদের নাম দেবে না—পয়সার বেলা ৫।১০ টাকা—আমাদের কি ভিখিরি পেয়েছে? এই সিজনেই চলে যেতাম তবে দেখি মেগা ঘোষ কি করে। যদি রেকর্ডিং পারমিশনটা পেয়ে যায়।

ধীরেন বলে—উনি ঠিক রেকর্ডিং লেবেল্ বার করে নেবেন—অতবড় ডিলার কে আছে বলুন? এ বছর উনি টুইন্ কিং হয়ে গেছেন—তা জানেন?

আমরা দুজনেই বিস্ময়ে বলে উঠি—তাই নাকি?

গ্রামোফোন কোম্পানী ইতিমধ্যে 'টুইন' মার্কা রেকর্ড বার করেছে—যার দাম মাত্র পাঁচসিকা—তখন কুকুর মার্কা রেকর্ডের দাম ছিল আড়াই টাকা। মেগা ঘোষ নাকি একাই দুলক্ষ রেকর্ড কাটিয়ে দিয়েছেন। মেগা ঘোষের পরিচয়টা তাহলে শুনুন। মেগাফোন কোম্পানীর—শ্রীজিতেন ঘোষ দস্তিদার মশায়—ওঁর ডাকনাম ছিল মেগা ঘোষ।

সারাদিন আলাপ-আলোচনায় দিন কাটিয়ে বিকালে রেডিওর পথে পা বাড়ালাম। যাবার আগে তুলসীদা ও বিমলদাকে আমার বাড়িতে আসার কথা বলে গেলাম।

রবিবার সকালে সুধীর নান মশায়ের বাড়িতে যথাসময় উপস্থিত হয়ে দেখলাম আমার আগেই সুবোধদা এসে হাজির হয়েছেন।

আমায় দেখে সুধীরবাবু বললেন—কি, ডিরেকটার বিভ্রাট ঘটেছে তো?

আমি হাসলাম।

গত বিকেল ও রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা ধীরে ধীরে শোনালাম। কথা শেষ হলে সুবোধদা মৃদু হেসে বললেন, আমি কিন্তু অলরেডি ডিরেকটার ঠিক করে ফেলেছি। তবে মিঃ নান, আপনাকে এর জন্যে পঁচিশটি টাকা ব্যয় করতে হবে।

সুধীরবাবু অবাক হয়ে বলেন—সে কি রকম? ব্যাপারটা কি?

সুবোধদা খুব গম্ভীরভাবে জোর গলায় বলেন—ইওর ডিরেকটর ইজ সিটিং বিফোর ইউ···ওকে শুধু এক সপ্তাহ ধরে তিনটে করে শো···নতুন নতুন ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাই কোন্ শট্‌টার কি নাম—এবং সেটি গল্পাংশের কোন্

প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর জন্যেই তো পঁচিশটা টাকার প্রয়োজন এবং আশাকরি—আমাদের কোম্পানী এটুকু ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আমি প্রতিবাদ জানাই…ঘোরতর ভাবে· ····

কিন্তু আমার সমস্ত প্রতিবাদ নস্যাৎ করে দিয়ে দুজনে একসঙ্গেই রায় দিলেন, আমাকে ডিরেকশন শিখতেই হবে।

সত্যই সুবোধদা শেষ পর্যন্ত অসাধ্য সাধন করে আমায় ফিল্ম ডিরেকটরের পদে অভিষিক্ত করলেন…তাই আমার ভাগ্যে চিত্রলোক শুরু হয়—হিরো পরিচালক ও প্রযোজকের আসন নিয়ে।

সুধীরবাবুর বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে সুবোধদা বললেন—মাত্র এক ইক সময়, কাজেই রেডিও গ্রামোফোন ছেড়ে ছবি দেখায় মেতে যাও—অবশ্য আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

সুবোধদা বাড়ির দিকে এগিয়ে যান, আমি পথে রেণুবালা (সুখ)-র সঙ্গে কনট্রাক্ট ফাইনাল করতে রেণুর বাড়িতে নেমে পড়ি। সুবোধদাকে পৌঁছে গাড়ি আমার কাছে ফিরে আসবে।

রেণুর সঙ্গে পূর্বেই কথা কওয়া ছিল তাই দক্ষিণার কথাটা ও চুক্তিপত্রের সইটা করিয়ে নেওয়া দরকার। কথাবার্তা সই সাবুদ খুবই আনন্দের মধ্যে দিয়ে দুইপক্ষই শেষ করলাম। খবর এলো আমার গাড়ি ফিরে এসেছে। নীচে যেতে রেণু আমায় হঠাৎ ডেকে বলে—দাদা একটা মেয়ের কথা আপনাকে একটু জানিয়ে রাখছি যদি পারেন—ওকে একটু সাহায্য করবেন, বড় গরীব। বলেই রেণু চেঁচিয়ে ডাকে—কৈ রে বিজুলি?

নীচের ঘরের মধ্যে থেকে বিজলি হঠাৎ বেরিয়ে আমার সামনে এসে থতমত খেয়ে যায়।

আরে এই তো কাল সকালে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে ওর দুঃখের কথা জানিয়ে আমার পকেট থেকে পাঁচ টাকা ছিনিয়ে এনেছিল।

রেণুকে জিজ্ঞাসা করি—'এ কতদিন তোমাদের বাড়িতে আছে?'

রেণু বলে—ওর মা এ-বাড়ির পুরনো বাসিন্দা, অনেক দিন আছে—আগে অবস্থাপন্নই ছিল, এখন বুড়ী হয়ে গেছে, পসার কমে গেছে।

জিজ্ঞেস করি—ওর নিজের মা?

রেণু বলে—হ্যাঁ নিজের মা—

মেয়েটি দেখি রেণুর পিছনে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড়ের খুঁটটা চিবুতে চিবুতে

ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। কাল সকালের যে ট্র্যাজেডি সিন অভিনয় করে আমাকে ঠকিয়েছিল—তার জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয়।

রেণুকে কোন কথাই না বলে গাড়ির কাছে এলাম—রেণুকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা বিজলির সঙ্গে একটি আধবুড়ো ভদ্রলোককে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি যেন।

রেণু বলে--ও তো ওর···মানে বাপ ঠিক নয়, তবে ওর মার বাবু···মাতাল-চামার। বিজুলিদের একেবারে নাজেহাল করে ছেড়ে দিয়েছে, অথচ তাড়ালেও যাবে না।

রেণু একটু চুপ করে থেকে বলে—কি আর বলব বলুন, বড় নোংরা কথা সব। তবে মেয়েটা সত্যি ভাল!

গাড়িতে উঠতে গিয়ে বলি—না রেণু, আমি দেখলাম—যেমন দেবা—তেমনি দেবি। কাল সকালে আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমারই সামনে যা অভিনয় করে এসেছে তুমি অনায়াসে স্টেজে গিয়ে বেশ ভালো ভালো রোল দিতে পারো।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

সত্যিই এ পল্লীর যবনিকা সরে গিয়ে ভিতরে নিঘৃণ্য রূপ আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

গাড়িতে এসে এ ধরনের মেয়েদের আসা পাছে বেড়ে যায় বলে আমি প্রমোদ ও ললিতকে বলি, শ্যামবাজার অঞ্চলে একটি ঘর দেখতে। শ্যামবাজারের বাজারের ওপরেই ঘর পাওয়া গেল—যেখানে সুটিং-এর যাবতীয় জিনিসপত্তর, চা-তৈরীর সরঞ্জামাদি সরিয়ে দেওয়া হলো এবং সেখানে ললিত, মিণ্টু মিত্র—কখন কখনও প্রমোদও থেকে যেতো। নীহার ওখানে এসেই প্রমোদের কাছে সময় কাটাতো।

এদিকে আমি ও সুবোধদা তৈরী হয়ে ১৫ দিনের মধ্যেই সুটিং-এর ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠি। সুটিং শুরু হওয়ার দুদিন আগে প্রমোদ জানালো যে, নীহার-দি আজ দুদিন ধরে অ্যাবসেণ্ট—

আমি বললাম—অ্যাবসেণ্ট নাঃঅ্যাব্স্কণ্ড?

ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল—হঠাৎ জানলায় কে যেন উঁকি দিল—প্রমোদ বলে ওঠে—কে ওখানে?

প্রমোদ বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো—

একটি যুবতী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে—'আমি'

প্রমোদ বলে—কি চাই ? ভেতরে আসুন।

মহিলা ভেতরে প্রবেশ করে—আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছল্‌-ছল্‌ চোখে বললো—'ওর' যে বড অসুখ—ঘরে পয়সা নেই—ডাক্তার না দেখালে মারা যাবেন।

আমি প্রশ্ন করি—ওঁরটা—কে ?

মহিলা—ওঁর যে আবার নাম করতে নেই—ওই যে আপনাদেব ডিরেকটার—

প্রমোদ বলে—নীহারবাবু ?

মহিলা ঘাড নেডে জানায়—হ্যাঁ···

আমি বলি—তা আপনাকে তার নাম করতে নেই কেন ?

মহিলা কেঁদে বলে—হ্যাঁ—আজ এক মাস হয়েছে সবে আমাদেব বিয়ে হয়েছে—এত শীগগির যদি বিনা চিকিৎসায় চলে যান···বলতে বলতে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফ্যালেন।

প্রমোদ জিজ্ঞাসা করেন—তা আপনি কোথায় থাকেন ?

মহিলা কাপডের খুঁটটা পাকাতে পাকাতে বলে—১০নং দুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট।

আমরা পরস্পর মুখের দিকে চেয়ে দেখি। পরে আমি বলি অসুখটা কি ?

মহিলা চট্‌পট্‌ উত্তর দেয়—সেইতো কি যে অসুখ আমরা কি করে বুঝবো বলুন—ডাক্তার তো ডাকা হয়নি, পয়সা কোথায় ?

প্রমোদ বলে—চলুন যাচ্ছি—দেখি কি হয়েছে—

আমি বলি—দাঁড়াও প্রমোদ। তারপর মহিলার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলি—বলুন তো কত টাকা হলে অসুখটা এখনি ভাল হয়ে উঠবে ?

মহিলা ফিক্‌ করে হেসে ফেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন—কি যে বলেন ? পরশু আমার ওখানে গিয়ে খুব মদ খান—যত বারণ করি—তত বাড়ান—আমায় বলেন, আমার পেস্টিজ গ্যাছে—আমায় দেশ ছাড়তে হবে। [আমি ভোলাতে গেলে অকথ্য ভাষায় এক ভদ্দরলোককে গাল দিয়ে ওঠেন।

বললাম কি নাম করে গাল দিচ্ছিল প্রমোদবাবু না সুবোধবাবু—

মহিলা বলে—ঠিক বলেছেন—ওই সুবোধবাবুই হবে।

আমি বলি—ও কতদিন ধরে ওখানে যাতায়াত করে—

মহিলা—বরাবরই মানে কলকাতা এসে ইস্তক—

··টাকা কড়ি দেয় ?

··কখন দেয়···কখন পাবে না

···তবুও তুমি তাকে বিয়ে করলে···

···উপায় কি বলুন—বললেন পাগলী আজ আমায় হেনস্থা করছিস—কালই যে আমি ডিরেক্টর হয়ে যাচ্ছি সে খবর রাখিস ? দুদিন বাদে মটর-গাড়ি করে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবো—তখন বুঝবি।

প্রমোদ বলে —ও কি তোমার ওখানেই থাকতো— ?

মহিলা বলে—থাকবে না তো যাবে কোন চুলোয়···

আমি বলি—থাক থাক ওসব কথা—এখন বল কত টাকা হলে ওর রোগ সারবে।

মহিলা বলে—ও বলে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা না নিয়ে নড়বি না···

আমি বলি—চলো, বাইরে চলো. গাড়ি আছে, আমি এখনি তোমায় নিয়ে ওকে টাকাটা পৌঁছে দিয়ে আসছি—খালি পথে একবার পুলিস স্টেশনের বাইরে গাড়িখানা রেখে থানায় ঢুকবো যা যা বলেছ থানায় সব লিখিয়ে তোমায় টাকা দিয়ে দেবো।

মেয়েটির মুখ হঠাৎ মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলে····ও তো পেইলেছে···যাবাব সময় ওর কাঁছা টেনে ধরেছিলাম···ও বললে···তুইও যা···আমায় অপমান করছিস—আমার পাওনা টাকাটা তোকে দিয়ে গেলাম—ঠিকানা রইল, পারিস তো আদায় করে নিস···

আমি বলি—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই সমস্ত কথাই পুলিসে লিখিয়ে দেবো—তাইতো গাড়িতে উঠতে বলছি···

ও হঠাৎ কেঁদে ফেলে বলে—আমায় ছেড়ে দিন—টাকা আমার চাই না···

বললাম—টাকা না চাও—পুলিসে তো চলো—

হাউ হাউ করে কেঁদে মহিলা আমার পা জড়িয়ে ধরে বলে—আর কখনও আসবো না—দয়া করে আমায় যেতে দিন—

আমি ধমক দিয়ে বলি—ওঠো গাড়িতে—যা বলবার পুলিসে গিয়েই বলবে—

প্রমোদ—রঙ্গ থামিয়ে দিয়ে বলে—যাও পালাও—আর কথা নয়—কথা বাড়ালেই পুলিসে যেতে হবে।

মহিলা আর কথা না বলে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল।

আমি বলি—কেমন লাগছে ফিল্ম লাইন প্রমোদ ?

প্রমোদ বলে—গল্পটা নিভাননীকে শুনিও…

আমি বলি—আমায় বলতে হবে না—মৃগনাভি—আপনিই গন্ধ ছড়াবে।

হঠাৎ মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। প্রমোদকে বললাম, গাড়িতে উঠে বসো—

প্রমোদ গাড়িতে উঠে বসতে আমি ড্রাইভারকে বললাম—ড্রাইভার দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটে চলো।

বাড়ি খুঁজে গাড়ি তেরো নম্বরে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রমোদকে ভেতরে পাঠালাম।

…প্রমোদ একটি মধ্যবয়সী মহিলাকে নিয়ে নীচে নেমে এলো। তিনি বলেন সে ছোঁড়া তো—ফুলটুসীকে নিয়ে আজ দুদিন হলো সরে পড়েছে—আমরাই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি…আমাদের ঠকিয়ে কিছু গয়নাগাটি সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে।

আমি বলি—তার বিয়ে করা এখানকার বৌ ফেলে ?

মধ্যবয়সী মহিলা ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন—অ—পোড়ামুখী ফিরি…সেই তো নিত্যি ওকে মেয়ে জোটাতো…

আমি তিলার্ধ অপেক্ষা না করে গাড়ি চালাতে বলি…

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর প্রমোদ বলে ডেঞ্জারাস !

আমি বলি—কে ডেঞ্জারাস—আমাদের বাড়িতে যে গিয়েছিল সেই মেয়েটি, না—নীহারদি।

শ্যামবাজারের মোড়ে প্রমোদকে ছেড়ে দিয়ে আমি মিস লাইটের বাড়িতে রওনা হই—স্যুটিং এর দিনগুলো জানাতে। বলে গেলাম—নীহার এলে ঢুকতে দিও না, বলো পুলিস স্টেশন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

৮

এমনি করে বিল্বদলের ত্রিপত্রের মত আমাকে তিনদিকে সামাল দিতে প্রচুর পরিশ্রম ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল।

বেতারে মঞ্চ অভিনেতা সমন্বয়ে প্রথম নাটক আমার যতদূর স্মরণে আসে বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান অভিনীত হয়। প্রধান ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, দারার ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔরঙ্গজেব—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, জাহানারা করেছিলেন—ঊষাবতী পটল, নাদিরা—নীভাননী, পিয়ারা—বীণাপাণি ইত্যাদি।

বেতার নাটুকে দলের সঙ্গে মঞ্চ অভিনেতাদের সমন্বয়ে বেতারে নাটকাভিনয় বলিষ্ঠ হতে বলিষ্ঠতর হয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে থাকে। পূর্ণাঙ্গ এই সব নাটকের শিক্ষার ভার ছিল বীরেনবাবুর উপর, আবার সঙ্গীত বহুল চিরকুমার সভা. আলিবাবা, জয়দেব, চণ্ডীদাস, শকুন্তলা, মীরাবাঈ প্রভৃতির রূপকার ও সুরকারের দায়িত্ব থাকতো আমার উপর।

এছাড়াও বার মাসে তের পার্বণের প্রতিটি সঙ্গীতমুখর অনুষ্ঠানগুলিকে শুধু যে সুরধারায় সুললিত করে গড়ে তুলতে হতো তা নয় তার আবহ শব্দ যোজনায় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পূর্ণ আয়োজনের ভার আমার উপরই ন্যস্ত ছিল—তা শ্রোতাদের মনে সৃষ্টি করতো এক সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি। যেমন—বাণীকুমার রচিত শিবরাত্রি অনুষ্ঠানে নাটিকার প্রথমেই পরিকল্পনা করা হলো ঝরণার ঝর ঝর শব্দে—পাদদেশে উপলসংকুল পথে খরস্রোতের কলকল ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনিত উচ্চসুরে বেহালার তরঙ্গমালা—সত্যিই যা শ্রোতাদের শ্রবণে এক অভিনব শান্তি-শ্রুতির সমাবেশ ঘটিয়ে চলেছিল প্রভাতে আশ্রম দৃশ্যে ঊষার প্রথম মুহূর্তে পাখীদের কলকাকলীর সাথে সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এক অনবদ্য জলতরঙ্গের মত নতুন যন্ত্র—যার বর্ণনা আমি পূর্বেই বলে এসেছি। সমুদ্রবেলার দৃশ্যে শ্রোতারা সত্যই শুনতেন অগণিত বীচিমালার তরঙ্গায়িত আছাড়ি-পিছাড়ি—যা ঘটানো হয়েছিল 'শ্রীশ বসুর 'সন্দিগ্ধা' বইতে। আমার রচিত 'বেদনার শাশ্বত রাগিণী' নাটিকায় সামান্য সারিগানের পিছনেও নদী ও

নৌকার জলপথে দাঁড় টানার অনবদ্য ছপ ছপ শব্দের সঙ্গে দাঁড়ের বন্ধন স্থানের সূক্ষ্ম ক্যাঁচ ক্যাঁচ ঘর্ষণ ধ্বনি পর্য্যন্ত শোনাবার প্রচেষ্টাও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। নাটক ও তার পরিবেশকে কি করে প্রাণবন্ত করে তোলা হবে তার চেষ্টায় আমরা এতটুকু ত্রুটি করতাম না।

এইবার শুনুন আমাদের হাস। চুপের—তারপর কি হলো।

বি-কে পালের বাগানে দোলনার দৃশ্যটি সুষ্ঠুভাবেই তোলা সম্পন্ন হোলো। এরপর আমরা দরমাহাটার মল্লিক ওরফে ছুঁচো মল্লিক মশাইয়ের দমদমার বাগানে ছবি তুললাম গল্পের রোমান্টিক দৃশ্যের।

বাগানের মধ্য দিয়ে একটি সুদীর্ঘ ঝিল চলে গেছে—তার মাঝে মাঝে ব্রীজ পথ—ঝিলের দক্ষিণ গায়ে গডে তোলা একটি পাহাড—পাহাড বেয়ে একটি সিঁড়ি ঝিলে এসে নেমেছে।

নির্বাক চিত্রে তখন অভিনেতাদের বিশিষ্ট ডায়লগ ছবিতে চলিয়ে নেওয়া হোতো…যেগুলি পর্দায় টাইটেল লিখে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল।

পাহাড়ী সিঁড়ি পথের একটি ধাপে আমি বসে, তার দুটো 'তলার আসন নিয়েছে শ্রীমতী লাইট।

আমি বললাম—দেখুন ধরে বেঁধে জোর করে বিয়ে দিলে আমি বিয়ে করব না বলেই এখানে পালিয়ে এসেছি।

উত্তরে ও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে—আমারও ঠিক তাই।

কথাটা বলেই ও দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে পা ফস্কে সিঁড়ির ধাপে উল্টে পড়ে… বলে, উঃ! ওর পডে যাওয়া অবস্থা দেখে তাডাতাড়ি ওকে কোলপাঁজা করে তুলে নি। সুবোধদা বলেন—কাট।

ইলাহিবকসের দেওয়ানি বৈঠকে বসেছে বন্ধুদের নিয়ে গানের আড্ডা। আমার হাতে হারমনিয়ম—বাঁয়াতবলায় বসেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—পাশে বসে হাতে তাল দিচ্ছেন পঙ্কজকুমার মল্লিক—সামনে বসে সিগার মুখে সত্য দত্ত সমঝদার শ্রোতা—এছাড়া অনঙ্গ (পরে নৈহাটি সিনেমার মালিক—ডাঃ আদিত্য গুপ্ত (ডেণ্টাল সার্জন) আর বাংলা হিন্দীর আজকের নায়ক বিশ্বজিতের শ্বশুরমশাই মিঃ মৈত্র মহাশয়। সবাই মাথা নেড়ে তারিফ করছেন। এ সুটিংও শেষ হলো।

ঘড়িওয়ালা মল্লিকদের বরাহনগরের বাগান বাড়ি ঝিলে তোলা হলো— হিরো-হিরোইনদের চাঁদনী রাতে নৌকা-বিলাস।

এমনি করে এক এক করে সিন হয়ে চলেছে—বাকী মাত্র হিরো-হিরোইনদের বিয়ের সিন্।

এরই জন্যে দরমাহাটায় শ্রীছুঁচো মল্লিক মশাই এর কাছে গেলাম—ওঁদের চৌঘুড়ী গাড়িখানা চাইতে বরের গাড়ির আশায়··যাতে চড়ে বর বিয়ে করতে আসবে।

উনি বললেন—তা—আসবে কোথায়?

আমি বলি—ওটা এখনও ঠিক করিনি (অর্থাৎ লোকেশনটা কোথায়)।

উনি বলেন—যদি বলি বর আসবে আমারই বাড়িতে ক্ষতি আছে কি?

আমি বলি—সে তো সৌভাগ্যের কথা।

উনি জিজ্ঞেস করেন—কে হিরো···আর হিরোইন্ বা কে?

আমি বলি—হিরো আমিই—আর হিরোইন মিস্ লাইট।······

উনি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন—মেয়ের পক্ষের বাড়ির মেয়েরা কারা কারা জানতে পারি কি?

আমি বলি নিভাননী, বেদানাবালা (আঙুরবালার বোন), রেডিওর আভাবতী, প্রভাবতী, আশালতা, প্রফুল্লবালা—তাছাড়া থাকবেন চুনীবালা দিদিমার ভূমিকায়, আরও অনেকে।

উনি বললেন—বরযাত্রী কারা?

আমি বলি, বীরেনবাবু, পঙ্কজবাবু ইত্যাদি ইত্যাদি করে বিশ-ত্রিশজন··· বরকর্তা হচ্ছেন তুলসী লাহিড়ী।

খুশী হয়ে বলেন—বেশ। আমার বাড়িতে বর, বরযাত্রীসহ আসবেন—আমাদের চৌঘুড়ী চড়ে। বিবাহ বাসর হবে পূজার দালানে, ভেতরের উঠানে সাজানো হবে ছাতনাতলা···বর বসবে উঠানে বরাসন সিংহাসনে—দালানে লোকজন খাবে সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করব—এমনকি খরচ পর্যন্ত—কেমন রাজী?

আমি বলি—খরচ আপনি করবেন কেন?

উনি বললেন—আমার শখ—আমি বরকে আর কনেকে···আসল গহনা পরিয়ে সাজিয়ে দেবো।

তথাস্তু বলে—সুটিং-এর দিন ধার্য করে—বাড়ি ফিরে সুবোধদাকে খবর দিলাম—সুবোধদা বললেন সত্যিই সৌখীন ভদ্রলোক। তার পরদিনই লোকেশনে গিয়ে আলো ফেলার সুযোগ-সুবিধে বুঝে নিয়ে চলে এলেন সুবোধদা।

গ্র্যাণ্ড স্যুটিং শুরু হলো ধার্য দিনে।

মল্লিকমশাই আমার আঙ্গুলে হীরে, চুনী, পান্না ও মুকতার চারটে আংটি পরালেন—গলায় গার্ড চেন ঝোলালেন আর চন্দন চর্চিত করে—বর সাজিয়ে ফুলের গড়ে গলায় পরিয়ে চৌঘুড়ীতে বসালেন। ভিতরে নিভামার হাতে তুলে দিলেন কনের জড়োয়ার কণ্ঠহার মুকতার সাতনরী—হাতে হীরের চুড়ি ব্রেসলেট ও কানে কানপাশা—মাথায় ঝাপটা—সে এক পেল্লায় ব্যাপার। বললেন বেশ ভাল করে লাল চেলী পরিয়ে কনেচন্দন পরিয়ে এগুলি সব পরিয়ে আমার কাছে আনবেন আমি মাথায় ভেল পরিয়ে হীরের মুকুট পরিযে দেবো।

বাড়ির মেযেরা সবাই বেনারসীতে সুসজ্জিত হয়েছে কিনা জেনে নেন। যেন তাঁর বাড়িরই বিয়ে।

এরপর বর চৌঘুড়ী চেপে দরজায় এসে দাঁড়ালো গোলাপী পাগড়ি আঁটা কোচম্যানের পাশ থেকে গোলাপী কাপড পবা আমাদের বাড়িব পরামানিক বিশ্বনাথ টোপর হাতে নেমে দাঁড়ালো। ববকে বরণ করতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং কনের বাপ নেড়াদা···নিভাননী প্রমুখ মেযের দল শাঁখ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিযে বরকে বরাসনে বসালেন। ছাতনাতলায় ‘বব বড কি কনে বড’ থেকে নাপিতের গালপডা এস্তোক সেবে বিবাহ বাসরে বব-কনে বসলো। পুরহিত অনঙ্গ ভটচাজ বিবাহের মন্ত্র পডে ব্রহ্মা-অগ্নি সাক্ষ্য করে বিবাহ সমাপন করলেন। ওদিকে বরযাত্রীদের পাত পডেছে। সবাই খাচ্ছেন আসল লুচি, তরকারির সঙ্গে ভুরি-ভোজন। অবশেযে বর-বধূ উঠে গিয়ে বাসরে বসলে স্যুটিং সাঙ্গ হোলো। কি অপূর্ব ক্ষিপ্রগতিতে সেদিন সুবোধদা কাজ করে গেলেন ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

স্যুটিং শেযে মল্লিকমশাই মিষ্ট ভাষণে সবাইকে নিজের গাড়ি দিয়ে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সারা জীবনই চিত্র পরিচালকের কাজ করলাম কিন্তু এমন যজ্ঞ আমি কখন দেখেছি বলে মনে হয় না—বা কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি।

হাস! চুপের স্যুটিং পর্ব শেষ হলো। সুবোধদার হাত লেবরেটারিতে প্রতিদিনের স্যুটিং-এর ফিল্ম প্রতিদিনই ডেভালপ হয়ে যাচ্ছিল। শেষের কদিন বিশেষ করে দরমাহাটার সিকোয়েন্সের নেগেটিভ ডেভালপ হবার সময় আমার দিন সাতেক ছুটি পড়লো। রিফ্লেকটার ধরার ছেলেদের মধ্যে মিণ্টু মিত্তির,

কালী বাহা ও সূর্যকান্ত পুরাপুরিভাবে সুবোধদার লেবরেটারীতে কাজ শুরু করে দিল। ওদের প্রমুখ সুবোধদার যন্ত্র-সহকারীও বলাইবাবু।

সাতদিনের অবকাশে বিষ্ণু ভবনে ১৯৩০ রেকর্ডিং বিহার্সলে—গান তোলানো নিজেব গাওযা প্র্যাকটিস করায় মেতে গেলাম। সুধীরার—চৈতি রাতের শেষ প্রহবে মাতরে ফুলের বালা—অর্কেস্ট্রা সঙ্গতেব মহলা শুরু করে দিলাম, বিমলদাব শ্রীদামবাবাজী ছদ্মনামেব মানিক মালার সঙ্গে ভজন ডুয়েট সুর করা সাঙ্গ হয়ে গেল। এবং 'তুর্দিনেব মুখে মন শ্রীকৃষ্ণ চরণ বন্দো' ও 'নূপুব বাজিল মন মন্দিরে' উঠে গেল। সেদিন বিমলদা বসে আমাব শ্যামাসঙ্গীত গাওয়া শুনছিলেন—'কালী তোরে বাগে পেলে হাতের খাঁড়া মুচড়ে ফেলে বাঁশী ধরাব'। এবং 'কালী তোর কাল করেছে লোল রসনা'—হঠাৎ বলে বসলেন—এই গানখানা আমি গাইব আমায় দাও। তখনকার দিনে শিল্পীদেব মধ্যে এমনি প্রেমপ্রীতি গড়ে উঠতো যে কেউ কারোর অনুরোধে ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ হোতো না। আমি বললাম, অনায়াসেই গাইতে পারো—তাহলে এর একটা জোড়া লিখে সুর করেদি। বিমলদা বললেন তাই দিও।

'হাস-চুপ'এব পজেটিভ বডি—এবাব এডিটিং কবতে বলা হলো।

তখনকার দিনে পজেটিভগুলোব হতো কালার বেস (রঙিন জমি)। রাতেব সিন ব্লু-বেসেই বোঝা যেতো—বিশেষ করে চাঁদনী রাত। তেমনি আগুনের দৃশ্যে ব্যবহার কবা হতো লাল-বেস···বৈঠকঘর, বাড়ির মধ্যে—দিনের বেলায় দৃশ্য —ছাপা হতো এম্বার-বেসে। প্রেমের সিনে দরকার পড়তো সিপিয়া-বেসকে। এমনিতর যে বেস যে সিন বা দৃশ্যের উপযোগী—সেই বকম বংই ব্যবহৃত হতো।

শুভক্ষণে সুবোধদা আমায় এডিটিং-এর হাতে-খড়িও দিলেন। যতটুকু অভিনয়াংশ রাখার প্রয়োজন যে শটে—সেই টুকুই রেখে অপর শটের প্রথমাংশের একশানেব সঙ্গে কনটিনিউটি মিলিয়ে তুটি অংশের মিলনের জায়গা কাঁচি দিয়ে সুষ্ঠুভাবে কেটে কাঁচির ফলকে প্রতি অংশের একটি করে ফ্রেমের ধার চেঁচে, তুটিতে পরস্পরের ওপর চাপিয়ে সিমেণ্ট (ফিল্ম জোড়ার আঠা) দিয়ে জুড়ে গল্প এগিয়ে নিয়ে যেতে হতো।

সুবোধদা বলতেন—কোন দৃশ্যের কতটুকু অংশ থাকা উচিত—তার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি যার যত প্রখর, তিনি ততই ভাল এডিটার। আবার এডিটিং না জানা ডিরেকটারের মূল্য কিছুই নেই।

একদিন দুপুরে বসে বসে এডিটিং চলছে, এমন সময় বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল (ভূতপূর্ব ক্যামেরাম্যান—ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন) ও তার সঙ্গে একটি সুপুরুষ যুবক হাসি-হাসি মুখে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। যুবককে দেখলে চোখ যেন টেনে নেয় এমনিই বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। সুবোধদা আমার সঙ্গে এঁদের দুজনার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কৃষ্ণগোপাল বাবু ও শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া···ইনি সেই প্রখ্যাত প্রমথেশ বড়ুয়া—যিনি গৌরীপুরের রাজকুমার' বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

মিঃ প্রমথেশ শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি-জি) প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ডোমিনিয়নে তাঁর প্রথম ফিল্মী হাতে-খড়ি সেরে পশ্চিম পৃথিবী পযটন করে সবে ফিরে এসেছেন। ওখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজের বাসভবনের হল-ঘরটিকে স্টুডিওতে পরিণত করে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে ছবি তোলার চেষ্টা করছেন। ওঁর এই পদ্ধতিতে 'অপরাধ' নামক একটি ছবি তুলছেন। মিঃ কৃষ্ণগোপাল তাঁর ফোটোগ্রাফার···আর উনি নিজে হিরো এবং ডিরেক্টার।

মিঃ বড়ুয়ার আগে আলোক-সম্পাতে ছবি তোলার প্রচেষ্টা আর কেউ করেন নি। মিঃ বড়ুয়াকেই তাই সর্বপ্রথম এর প্রবর্তক নিঃসংকোচে বলা চলে।

ইলেকট্রিক আলোকে ছবি তোলার রীতি-নীতি, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনার পরে মিঃ বড়ুয়া সুবোধদার ওপরই ওঁর ছবির নেগেটিভের ভার দিলেন। আমাদের এই ল্যাবরেটরীতে অপরাধ ছবির ডেভলাপিং, প্রিন্টিং হবার সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল।

ওঠার সময় তিনি তাঁর নতুন ইলেকট্রিক স্টুডিওতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন—এ বিষয়ে সুবোধদা ও আমার দুজনেরই ঔৎসুক্য কম নয়···তা ছাড়া উনি আলোর ফিল্ম একসপোজের সম্বন্ধেও কৃষ্ণগোপাল বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন স্থির করলেন।

সময় করে একদিন দুজনেই মিঃ বড়ুয়ার স্টুডিও দেখতে গেলাম। দেখলাম ওর হল ঘরেই সেটিং লাগিয়ে স্যুটিং চলছে···ইসারায় অপেক্ষা করতে বলে শট্ শেষ করলেন, তারপর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রথমেই পরিচয় করালেন ডি-জির সঙ্গে। ডি-জির নাকি ইতিমধ্যে অনেক বিপর্যয় ঘটে গেছে, তাই স্টুডিও তুলে দিয়ে চুপটি করে তিনি ঘরে বসেছিলেন।

মিঃ বড়ুয়ার বহু অনুরোধে তিনি এসে ওঁদের প্রোডাকসনের দায়িত্ব নিয়েছেন। (ওঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটায় উনি তখন নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।)

দেখা হলো সমর ঘোষ মশাই-এর সঙ্গে···ইনি আমাদের পাড়ারই ছেলে—আমার পরিচিত। চীফ ইলেকট্রিশিয়ন হয়ে মিঃ বড়ুয়াকে সাহায্য করছেন। চুপি চুপি বললেন, মিঃ বড়ুয়া টকী মেশিন বুক করে এসেছেন—ওটা এসে গেলেই আমি সাউণ্ডে চলে যাবো। আর দেখলাম রেণু লাহিড়ী (নীরেন লাহিড়ী) ও সুশীল মজুমদার দুজনকে। ওঁরা দুজনেই আমার পরিচিত। রেণু সুগায়ক এবং নাটোর পরিবারের কুটুম্ব···গান বাজনার সুবাদে তার সঙ্গে আমার আলাপ—আর সুশীলের সঙ্গে আলাপ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের নাটক অভিনয় কালে। ইনি আবার প্রখ্যাত কংগ্রেসসেবিকা হেমপ্রভা মজুমদারের বড় ছেলে।

এই সূত্রে মিঃ কৃষ্ণগোপাল ও প্রমথেশ বাবু প্রায় রোজই ঝামাপুকুরের হাত-লেবরেটারীতে আসতে শুরু করলেন।

মিঃ বড়ুয়া লোকটিকে আমার খুবই ভাল লাগতো। চেহারায় যেমন ছিমছাম, কথাবার্তাতেও তেমনি অল্পভাষী—তবে অসম্ভব রসিক আর ভদ্রতায় তুলনাবিহীন। রাজকুমার হয়েও মনে এতটুকু গর্ব ছিল না। সুবোধদার মাদুরে বসে কালোসুতার বিড়ি পর্যন্ত তাঁকে হাসিমুখে টানতে দেখেছি। তার মুখে প্রায়ই বিদেশী স্টুডিওর গল্প শুনতাম···মনে হতো ভদ্রলোক বুঝি কোনো তীর্থভ্রমণ করে এসে তার পুণ্যাপুণ্যের ফলটুকু আমাদের মাঝে প্রসাদের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কত যে বিদেশী শিক্ষণীয়ের অমূল্য তত্ত্ব তিনি অকপটে ব্যক্ত করতেন তা বলা যায় না।

সুবোধদা ছবি প্রায় শেষ করে এনেছেন। একদিন বললেন, এবার হাউসে হাউসে ঘোরো হে—ছবি রিলিজ করার ব্যবস্থা তো করতে হবে।

আবার বুড়োদার শরণ নিলাম....

রাইচাঁদ বড়ালের বাড়ি গানের আসরে আমার গুণগ্রাহী ছিলেন শ্রীঅমর মল্লিক মশাই।

চিত্রা প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন করলেন মিঃ বি এন সরকার মহাশয় শ্রীসুভাস চন্দ্রকে এনে···এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের নির্বাক চিত্রে তা উদ্বোধিত হলো··· সেই সালে।

অমর মল্লিক মশাই শ্রীবীরেন সরকার মশাই-এর প্রায় ডান হাত ছিলেন বলা চলে এবং বুড়োদা ওঁদের চিত্র-পরিচালক হয়েও চিত্রার পাব্লিসিটি অফিসারের কাজ করতেন। তখন প্রেক্ষাগৃহের ম্যানেজার ছিলেন মিঃ হাফেজী (যিনি পরে মেট্রোর ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) কাজেই বুড়োদা ও মল্লিক মশাই-এর সূত্র ধরে নতুন প্রেক্ষাগৃহ চিত্রাতেই আমাদের ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম।

শুনলাম—শ্রীকান্ত ছবির পরই নাকি বুড়োদার লেখা ও পরিচালনায় 'চাষার মেয়ে' ছবি চলবে···আমাদের ছবি তার পরই মুক্তি পাবে।

হাতে সময় পেয়ে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।······তখনকার দিনের নির্বাক ইংরেজী চিত্রে ছবির সঙ্গতি রেখে পিয়ানো আর ভায়োলিন বাজানোর রীতি ছিল। এটা আমার খুবই ভাল লাগতো।

ছবির বুকিং করে এসে আমি সুবোধদাকে বললাম—'আমাদের ছবির পেছনে যদি আবহ-সঙ্গীত রচনা করে দৃশ্যানুযায়ী অর্কেস্ট্রা গঠন করে বাজাই, আপনার কেমন লাগে?'

উনি আমার মুখের পানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন—'স্পেলেনডিড।' আমার প্রোপোজালটা শুধু সুবোধদা কেন সুধীর নান মশাই-এর এতই মনঃপুত হলো যে, তাঁবা আমায় প্রতিমুহূর্তে উৎসাহ দিতে থাকেন।

আরফিক ক্লাবের পরিচয় আমি আগেই দিয়েছি—আমি ওদের ক্লাবে গিয়ে সব সভ্যদের সামনে আমাব এই নবতম পরিকল্পনা ব্যক্ত করি। ওঁরা প্রায় লাফিয়ে উঠে একযোগে আমার সমর্থন জানালেন।

বেহালার শ্রীযুক্ত তারক দে (গীটার বাদক হিসাবেও ভারতে প্রথম ইনি গীটার বাজাতে শেখেন), শ্রীজগন্নাথ দে (ম্যাণ্ডোলা) শ্রীযুক্ত সুরেন পাল (ম্যাণ্ডলিন), শ্রীযুক্ত প্রবল দে (ক্ল্যারিওনেট), শ্রীমন্টি সেন (অরগ্যান), শ্রীবীরেন দাস (ট্রাম্পেট ও কর্ণেট), শ্রীশান্তি বসু (চেলো), শ্রীপঞ্চানন বড়াল (ডবলবেস) প্রভৃতিদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাঝে আমি ছবির গল্পাংশ অনুযায়ী আবহসংগীত রচনা করলাম—ভাগ করে···অর্থাৎ হাসি, কান্না মান-অভিমান, প্রেম-সৌহার্দ—সুখ-দুঃখের প্রতিটি অনুভাবনায় সঙ্গীত রূপ গড়ে তার নোটেশন লিপিবদ্ধ করে রিহার্সাল বসিয়ে দিলাম। বাংলাদেশে তথা ভারতে এই সর্বপ্রথম আবহ-সঙ্গীতের শুরুয়াৎ বলতে পারেন।

শ্রীমল্লিক ও বুড়োদার সাহচর্যে শ্রীযুক্ত বীরেন সরকার মহাশয়ের চিত্রা

প্রেক্ষাগৃহের ওপরের বকসে আমাদের অর্কেস্ট্রা পার্টির বসার স্থান নিরূপিত কবল ··দেরি কেবল মুক্তি দিবসের অপেক্ষায়।

হাস চুপের মুক্তি-দিবসে (তারিখটা ভাই মনে পড়ছে না—কারণ ৪৭ বছর আগের কথা তো ··তবে পুরাতন ফিল্ম-পত্রিকা বা রিলীজ ডাইরিতেই তারিখ পাবেন) তবে ১৯৩০ সালের বোধ করি পূজার পর। চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে নির্বাক চিত্রে—এইরূপ অর্কেস্ট্রা যোগে আবাহসঙ্গীত শুনে যেমন দর্শকবৃন্দ নির্বাক বিস্ময়ে সুর-লহরীতে অবগাহন করেছিলেন তেমনি করেছিলেন—ইণ্টার ন্যাশনালের অধিকর্তা শ্রীবীরেন সরকার মশাই ও তাঁর বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা।

অরফিক্ ক্লাবের সভ্য সুহৃদবৃন্দ—যতদিন চিত্রায় ছবিখানি চলেছিল ততদিন, নিত্য দুটি শোতে তাঁদের এই সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকমণ্ডলীর আনন্দবর্ধন করেছিলেন। শুধু এক নতুনত্বের নেশায় বন্ধুপ্রীতির খাতিরে এঁরা এ অসাধ্য সাধন ঘটিয়েছিলেন···যার জন্যে এক পয়সা দক্ষিণা পযন্ত গ্রহণ করেন নি। তার জন্য আজও আমি অরফিক ক্লাবেব প্রতিটি সভ্যের কাছে ঋণী ও অনুগত।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সবকাব মহাশয় এই আবহ-সঙ্গীতে এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে 'হাস্-চুপ' ছবির পর তাদের শ্রীচারু রায় পরিচালিত 'চোর-কাঁটা' নির্বাক ছবিতেও শ্রীযুক্ত বাইচাঁদ বড়ালের অধিনায়কত্বে—এই অরফিক ক্লাবের সভ্যবৃন্দদের দিয়ে এই প্রথার পুনরাবৃত্তি করান। ···এবং এদের কয়েকজনকে পরে নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গীত বিভাগে নিযুক্ত করে নেন।

আমাদের ছবি রিলিজের দিন হওয়ার পরে, মেসার্স অরোরার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনাদি বসুর কাছ থেকে একটি ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন এবং অনাদি বসুর বাগবাজারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানান। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করে সদা হাস্যময় মিষ্টভাষী অনাদি বসুর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর ছবির ডিস্ট্রিবিউশন সর্তাবলী শুনে—আমার অংশীদারের মতামতের খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি কোট্প্যাণ্টধারী একটি গুজরাটি যুবক আমার প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে প্রমোদের সামনে বসে আছেন। ভদ্রলোকের নাম মি: 'পারেখ'। তিনি মেসার্স মানসাটা ডিস্ট্রিবিউটার-এর প্রতিনিধি। আমার ছবিখানি ডিস্ট্রিবিউশন সর্ত জানবার অপেক্ষায় বসে আছেন।

বাংলা দেশে ভীমজিভাই মানসাটা তখন ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবসায় এক নবীন যাত্রী। মাত্র দু-তিন খানি চিত্রের পর আমাদের ছবি নেবার তাঁর অভিপ্রায়। চিৎপুরে ঠাকুরবাড়ির নিকটে তাঁর বাসস্থান ও অফিস অর্থাৎ গদি। আজকের জ্যোতি-সিনেমার মালিক যমুনাভাই, শ্রীভীমজিভাই-এর কৃতী সন্তান। ওখানেই আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে মিঃ পারেখ বিদায় নিলেন।

ভীমজিভাই-এর সর্ত আমরা অনুমোদন করলাম—তবে চিত্রার রিলীজ আমদানী বাদ রেখে।

এদিকে এইচ-এম ভির রেকর্ডিং-এর রিহার্সাল পুরোদমে চলেছে··· ত্রিতলের ডানদিকের ঘরখানি খালি দেখে সেখানে হারমোনিয়ম নিয়ে নিরালায় বসে সুরের সঙ্গে লিখতে শুরু করি—'ঢং করে তুই নাচিস নে মা কালী, তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে—আবার নয়ন বারি ঢালি"···বিমলদার শ্যামাসঙ্গীত। এমন সময় হঠাৎ ধীরেন এসে ঘরে ঢোকে, সঙ্গে তার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক সুপুরুষ। পরিচয় করিয়ে দিলে ধীরেন—বললে, 'এঁর নাম জয়নারায়ণ মুখুজ্যে—আমাদের থিয়েটারের উঠতি অভিনেতা এবং ম্যাডান কোম্পানীর সবাক ফিল্মের আপাতত হিরো।' ভদ্রলোক আমায় বলেন—শুনলাম আপনি সুগায়ক—সুলেখক এবং সুরকার। তাই,—

এমন সময় কাজীদা ঘরে ঢুকলেন—আরও গুণ আছে ওর—হালফিল্ উনিও নির্বাক চিত্রের হিরো।

জয়নারায়ণ বলেন—কাজীদা—আপনি কখন এলেন ?

কাজীদা বলেন—কেন—তোমাদের সামনেই তো এলাম।

জয়নারায়ণ বলেন—একা বিপদে পড়ে এসেছিলাম ধীরেনের কাছে—ধীরেন রাজী হচ্ছে না—বলছে এ সময় গ্রামোফোন রিহের্সাল কামাই করলে ওর চাকরী চলে যাবে। তাই আমাকে হীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছিল —এমন সময় আপনি ঢুকে হীরেনবাবুর সম্বন্ধে আরও একটা সুখবর শোনালেন। এখন হয়েছে কি—

আমাকে একটি চার রীলার বইএ হিরোর পার্ট করতে হচ্ছে—অপোজিটে শ্রীমতি কানন। বইটি হচ্ছে টকীতে—'জোরবরাত নাটকের গল্প'। এখন তাতে হিরোকে একটি গান গাইতে হবে—অথচ আমি গাইতে জানি না। তাই এসেছিলাম একটি গাইয়ের অনুসন্ধানে, যিনি আমার হয়ে গানটি গেয়ে দেবেন। ওরা ঠিক করেছেন অরগ্যান বাজিয়ে আমি গাইব, ব্যাকসটে

আমি যেন গাইছি—অথচ গাইয়ে গানখানি মাইকেব সামনে দাঁড়িয়ে নেপথ্যে গাইবেন। তাই এসেছিলাম হীবেনেব কাছে। ও' বলছে··

কাজীদা কথা কেটে বলে ওঠেন—'ও যা বলছে—আমিও তাই বলছি—হীবেনকে নিয়ে যাও ·ওই ঠিক এ সব ম্যানেজ কবতে পারবে, কাবণ ও ছবিও বাঝে—বেকর্ডিং'ও বোঝে।

আমাব তখন মনে হচ্ছে,—যা হবাব হোক—ভদ্রলোকেব সঙ্গে গিয়ে একবাব টকীব ব্যাপাবটা তো বুঝে আসি। বেঁডেলি না কবে এক কথাতেই বাজী হযে বললাম—ওঁরা যখন বলছেন—তখন যেতেই হবে—কবে বলুন ?

জযনাবাযণ বসু বলেন—কবে না—এখনি যেতে হবে—উঠে পড়ুন।

শ্যামা সঙ্গীতেব কাগজখানা পকেটে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম।

নীচে নেমে এসে দেখলাম গাড়ি দাঁড়িযে—জযনারায়ণ বসু বলেন—উঠুন।

গাড়িতে একটি মহিলা বসে ছিলেন—তাঁকে সবে বসতে বলে আমায উঠিযে নিয়ে পাশে বসালেন। গাড়ি চলতে শুরু কবে। জয়নারায়ণ বাবু বলেন—দেখো ভাই হীরেন, ওসব বাবুটাবু ছেড়ে দিয়ে নাম ধবেই ডাকাডাকি কবি—ওতে দুপক্ষেবই সুবিধে—এই মহিলাটি হচ্ছে আমাদের ছবিব হিবোইন কানন—আব কানন এ হচ্ছে তোমাব অরিজিনাল হিরোব গাইযে সংস্কবণ।

তিনজনেই হেসে উঠি। ·গাড়ি মিনার্ভা থিয়েটারেব সামনে দিয়ে চলেছে·

পাশ দিয়ে জোড়া মড়া ডাক তুলে চলে গেল। জযনারাযণ হেসে বলে—এইরে—যে শুভক্ষণেব মাঝে তোমাদেব পবিচয় হলো—অরিজিনাল ছেড়ে তোমাব না গাইয়ে সংস্করণকে বেশী পছন্দ হয়ে যায়।

কানন—আবার হেসে ওঠে।

টালিগঞ্জে স্টুডিওতে ঢুকে জয়নারায়ণ আমায় আবার জোড়া জ্যোতিষবাবুব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। ডিরেকটর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় তস্য এডিটার জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মশাই আমার পূর্ব জানিত। বলতে ভুলেছি আমি মাঝে মাঝে শখের যাত্রায় অভিনয় করতাম—সেই সূত্রে মুখুজ্যে মশাই-এর সঙ্গে জয়নগরে 'সীতা' নাটকে যাত্রাভিনয় করেছিলাম। মুখুজ্যে বলেন—হীরেনকে ধরে এনেছিস—খুব ভাল করেছিস্, ওর গলা অপূর্ব।

বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই বলেন—তাহলে জ্যোতিষ্ তুমি হীরেনকে বুঝিয়ে দাও—জয়নারায়ণের হয়ে কিভাবে কি করতে হবে।'

মুখুজ্যে-জ্যোতিষকে বললাম—জয়নারায়ণ সবই বলেছে কাজেই চলো রিহার্সাল ঘরে বসে—জয়নারায়ণকে গানখানি শুনিয়ে দুচারবার রিহার্সাল করে নি।

জয়নারায়ণ আমায় ম্যাডাম কোম্পানীর পেছনের বাড়ীর দোতালায় একটি সোফা-সজ্জিত ঘরে নিয়ে বসালো এবং সেখানেই হারমোনিয়মের সঙ্গে রিহার্সাল দেবার চেষ্টা করতে শুরু করলো। কিন্তু ও হরি—ও যে গানের 'গ'-ও জানে না—কি করি? একটু ভেবে বললাম—আচ্ছা জয়নারায়ণবাবু পদ্য বলতে পারবেন তো—তবে আমি স্ক্যান-শ্যানিং করে পদ্য ছড়ার মত করে বলি—আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন।

জয়নারায়ণ বলে—আবার 'আপনি-আপনি'—যাক্ কিভাবে স্ক্যানশানে পদ্য বলাতে চাও—

আমি বার বার ছড়ার ছন্দে একটি দাঁড়ানো সুরে গানখানিকে আবৃত্তি করতে থাকি - জয়নারায়ণ হুবুহু আমায় নকল করে চলতে থাকে। এইভাবে সামনাসামনি বসে যখন দুজনে একসঙ্গে ছড়াগানের রিসাইটেল চলেছে আমি লক্ষ্য করলাম দুজনের ঠোঁটের উঠানামা একইভাবে সংগঠিত হয়েছে—দেখেই মগজের দরজাখানা হঠাৎ খুলে গেলো। গানের ছড়া রাজনারায়ণকে একেবারে রপ্ত করিয়ে নিয়ে—নীচে নেমে এলাম। জয়নারায়ণ মেক-আপে গেল। নীচে নেমে জ্যোতিষ মুখুজ্যেকে বললাম—হয়ে গেছে, এইবার তুমি আমায় টকী সুটিং দেখাও। ও খুশী হয়ে আমায় স্টুডিওতে নিয়ে গেল। চারপাশে বড় বড় লাইট জ্বলছে—শিল্পীদের রিহার্সাল চলেছে··· বলার ভঙ্গী সেখানোর পর—শিল্পীদের বক্তব্য শুনে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ওকে বলছে—ক্যামেরার সামনে নির্বাক চিত্রের মত স্লেটে নম্বর ধরে নম্বরের ছবি তুলে তারপর শট্ শুরু হবার আগে দুটি কাটে সংযোগ করে খট করে একটা আওয়াজ করে সরে যাচ্ছে—তখন শিল্পীরা তাদের অভিনয়াংশ আরম্ভ করছে।

সাট হয়ে যেতে ছোট জ্যোতিষকে জিজ্ঞেস করলাম—কাঠের আওয়াজ কেন?

বললো—ওটার নাম ক্ল্যাপস্টিক। ওতে করে সাউণ্ড ফিল্ম আর পিকচার ফিল্মের শুরুয়াৎ ঠিক করা হয়।

দুটো তিনটে সাট টেকিং দেখে বুঝে নিলাম—কাঠ দুখানিকে কব্জা দিয়ে জোড়া—ফাঁক করে হঠাৎ একসঙ্গে জোড় করছে বলে 'ফট্' করে আওয়াজ হচ্ছে। অর্থাৎ ছবিতে যখন কাঠ দুটো জুড়ে যাচ্ছে—তখনই আওয়াজটা ফুটে বেরুচ্ছে। কাজেই ছবি ও শব্দের নেগেটিভের শুরুয়াৎ সংযোগটা কোথায় হচ্ছে বুঝে ফেললাম।

ইতিমধ্যে জয়নারায়ণ মেক-আপ করে স্টুডিওতে এলো। জ্যোতিষবাবু বললেন—মারকনি সাহেব এবার হিরোর গানে শট নিন। …মারকনি সাহেব লাইটিংএ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মিঃ মারকনি ছিলেন ইটালিয়ন ক্যামেরায় যেমন পটু তেমনি পটু গীটার বাদ্যে।

ইতিমধ্যে ছোট জ্যোতিষ আমাকে একটি মাইকের সামনে দাঁড করিয়ে গান শুরু করতে বললেন—দুলাইন গাওয়ার পরই আর সি এর সাউণ্ড-ইঞ্জিনিয়ার সি আরমার্ড বললেন—ও-কে, ওখানে দাঁড়িয়েই গাইবেন।

আমি তখন ছোট জ্যোতিষকে ডেকে বলি—দেখো ভাই তোমরা হিরোর ব্যাক শট নিচ্ছ নাও—তবে আমার জন্যে তুমি হিরোর সামনের মিড্ শট—এবং ক্লোজ শটও নেবে। কারণ আমি যখন গানে স্ক্যানশান শিখাচ্ছিলাম তখন দেখেছি যে আমার ঠোঁটের ওটা-নামার সঙ্গে ওর ঠোটের ওঠানামা একবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে কাজেই গান তুমি ছবির মুখে লাগিয়ে নিতে পারবে।

ও বলে, কিন্তু ক্ল্যাপস্টিক পডার পর স্টার্টিং কোনখানেতে হবে—স্টার্টিং পয়েণ্ট এক না হলে তো —ছবিতে গানেতে মিলবে না।

আমি একটু ভেবে নিয়ে বলি—ধর যদি ক্ল্যাপ দিয়ে চলে যাবার ১ মুহূর্ত পরে আমি ১-২-৩ চেঁচিয়ে গুনে ৪ থেকে গান ধরি ও ধরাই—তুমি মিলিয়ে নিতে পারবে না?

ও বলে তাহলে তো অনায়াসেই পারবো।

আমি বলি— দেখা যাক না মেলে কিনা—না মিললে ব্যাক শট তো আছেই।

…সেই ভাবেই ছবি তোলা হোলো—এবং জয়নারায়ণবাবুর মিড-শট, ক্লোজ শটের লিপমুভমেণ্ট আমার গানের সঙ্গে হুবহু এক হয়েই ক্যামেরায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাই ১৯৩১খ্রীঃ ২৭ জুন 'জোর বরাতের' মুকতির সঙ্গেই প্লেব্যাক পদ্ধতির প্রথম সৃষ্টি হয়—যদিও সেটি ডাইরেকটর সিস্টেমে —যন্ত্রচালিত লাউড স্পীকারের গাওয়া গানের সঙ্গে ঠোঁট্ নাড়া পদ্ধতিতে নয়। —যা আবার আমারই সৃষ্টি ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে সাগর মুভিটনে। …সেকথা পরে আসছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ....১৯৭৩ দেশ পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায়—পঙ্কজবাবু বলেছেন (এমন কি বরাবর নীতিনবাবুও বলে আসছেন) যে ভাগ্যচক্র চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে তথা ভারতে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি চালু হয়েছিল। অথচ প্রবীণ নট জয়নারায়ণবাবু নবকল্লোল পত্রিকায় ১৩৮১ ফাল্গুন সংখ্যায় লিখেছেন —'ওই সময় টকী এলো কলকাতায়। জোর বরাত বলে একটি ৪।৫ রীলের ছবিতে আমি নায়ক করি। কাননদেবী ছিলেন আমার বিপক্ষে। বন্ধু হীরেন (অর্থাৎ চিত্রপরিচালক হীরেন বসু) আমার হয়ে এই ছবিতে গান গেয়েছিলেন। বোধহয় ভারতবর্ষে ওইটাই প্রথম প্লে-ব্যাক।' (পৃঃ ২৪৫)

সঙ্গীত পত্রিকা স্বরছন্দা দেশের বিনোদন সংখ্যায় পঙ্কজবাবুকে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন (ফাল্গুন ১৩৮২, ফেব্রুয়ারী ১৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা-২, ৫৬ পৃঃ)।

'পর্দায় দৃশ্যমান অভিনেতার অভিনেত্রীর গান নেপথ্য থেকে অন্য শিল্পীর গাওয়াকে যদি প্লে-ব্যাক বলা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে—সে পদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক হিসাবে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন হীরেনবাবু, আর অন্য কেউ নন। কাজেই পঙ্কজবাবুকে বা 'ভাগ্যচক্র' চিত্রের পরিচালক নীতিন বসু কিংবা সেই চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল কাউকেই প্লে-ব্যাকের পথিকৃৎ রূপে স্বীকার করা যাচ্ছে না বলে দুঃখিত। পঙ্কজবাবু বর্ণিত ভাগ্যচক্র মুক্তি লাভ করেছিল ৩রা অকটোবর ১৯৩৫ খ্রীঃ—আর জোর বরাত-এর মুক্তি ছিল ২৭ জুন, ১৯৩১ খ্রীঃ।...আগেই বলেছি ভাগ্যচক্র (নিউ থিয়েটারের ছবি) মুক্তি লাভ করেছিল ৩ অকটোবর ১৯৩৫—ঐ বছরের মার্চ মাসে বোম্বের মেহবুব পরিচালিত হিন্দী ছবি 'মনমোহন' রিলিজ হয়েছিল। এই ছবিতে নায়কের গানটি (১ম গান) সে সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—সেই 'তুমহিনে মুঝকো প্রেম শিখায়া' গানটি প্লে-ব্যাকে গৃহীত হয়েছিল। প্লে-ব্যাকে গেয়েছিলেন সুরেন্দ্র নায়ক।... সুরেন্দ্র একথা কয়েকবারই ঘোষণা করেছেন বিবিধ ভারতী মারফৎ। বোম্বেতেও প্রথম প্লে-ব্যাকের কৃতিত্বের জন্য পরিচালক মেহবুব উল্লসিত হয়ে হীরেন বসুকে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তার সারাংশ দেখুন :

I know Mr Hiren Bose. Director and Music Director since 1935, when I was working in Sagar Movietone as a Director. He is the first man to introduce play back system in Bombay

with it all devices......Sri Anil Biswas was his pupil and assistant............ Sd/-M. R. Khan.

(Mehboob Khan)

প্রসঙ্গত কয়েক সাল বেশ এগিয়ে নিয়ে এসেছি—আপনাদের তাই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আবার—১৯৩০ সালেই।

জোর বরাত ছবির প্লে-ব্যাকে আমার কণ্ঠ শুনে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়-মশাই আমার প্রতি এমনি আকৃষ্ট হলেন যে সারা ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন এবং ওঁর এ ছবির প্রস্তাবনা দৃশ্যের জন্যে একটি গান লিখিয়ে মিস শেরাবালাকে দিয়ে গাইয়ে নিলেন। দৃশ্যের পরিকল্পনাও করিয়ে নিলেন আমায় দিয়েই। ইংরাজী চিত্রকরের বিখ্যাত 'হোপ' ছবির অনুরূপ রূপসজ্জায় আমি মিস শেরাবালাকে একটি উজ্জ্বল গোলকের ওপর বসিয়ে চোখ বেঁধে—একটি হার্পের মত যন্ত্র হাতে দিয়ে এই গানখানিকে গাইয়ে ছিলাম। বোঝানোর চেষ্টা হয়েছিল যে লাভ ইজ ব্লাইণ্ড। গানখানি ছিল—'আজ চক্রী করে ঘোরে চক্র'। এ দৃশ্যটি এতই মনোরম হয় যে জোড়া জ্যোতিষবাবু দুজনেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমার কল্পনাকে অভিনন্দিত করেন এবং জ্যোতিষ বন্দোপাধ্যায় মশাই অনুরোধ করেন ওঁর পরের সবাক চিত্রে হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করতে। এডিটার জ্যোতিষ আমাকে দিয়ে জোরবরাতেই আরও তিনখানি গান গাইয়ে নেন—এক ভিখারির রূপসজ্জায়। মঞ্চে কলিকাতা সেণ্ট্রাল ক্লাবের মন্ত্রশক্তি অভিনয়ে অনুরূপ রূপসজ্জায় আমি একখানি গান করে ছিলাম। ২০ নভেম্বর ১৯৩০ সালের দীপালি পত্রিকায় যার সমালোচনা বেরিয়েছিল। লিখেছিল—মাত্র একবার অবতীর্ণ হইয়া অপরূপ রূপসজ্জায় 'একখানি মাত্র গানে ভিক্ষুক রূপে শ্রীমান হীরেন্দ্রকুমার বসু দর্শকগণের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছেন।' এ অভিনয় ছোট জ্যোতিষও দেখেছিলো। তাই আমায় এ জোরবরাতে সেই বেশেই নামিয়েছিলেন।

বড়ুয়া তাঁর অপরাধ ছবির পরই টকী শুরু করবেন। (এইখানেই বলে রাখি যে অপরাধ ছবির কাজের মাঝামাঝি ওদের সতীর্থ দেবকী বোস এসে অপরাধ ছবির পরিচালনার ভার নিয়ে—মিঃ বরুয়াকে খানিকটা কর্মের চাপ থেকে মুক্তি দিয়ে ছিলেন। কাজেই মিঃ বড়ুয়াই ছবির রিলিজে দেবকীকুমারকেই এ ছবির পরিচালক হিসাবে ঘোষণা করেন)।

অপর দিকে কানে আসছে শ্রীবীরেন সরকার মশাই চোরঙকাটার পরই—বিরাট স্টুডিও গড়ে তুলেছেন টালিগঞ্জে—তার কনস্ট্রাকশন চলেছে। আপনারা বোধহয় জানেন না মিঃ বি এন সরকার ওরফে সাহেব—সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে প্রথম শুরু করেন বিরাট কনস্ট্রাকশন কোম্পানী। সে কোম্পানীতে মিঃ হাফেজীও কাজ করেছিলেন। কাজেই স্টুডিও কনস্ট্রাকশনের ভার মিঃ হাফেজীব ওপরই ন্যস্ত ছিল। ওঁবা রিকো নামে একটি টকি মেশিনও আনিয়ে ফেলেছেন এবং শ্রীনীতিন বসুব ভাই শ্রীমুকুল বসুকে বেকর্ডিং ইঞ্জিনীয়ার নেবাব সাব্যস্ত করেছেন। সংস্থারও নামকবণ হয়েছে (হাতী মার্কা) নিউ থিয়েটার্স।

বাঙ্গালীর এতবড প্রতিষ্ঠানেব বাঙ্গালী হয়ে আমারও মনে আশার আলো জেগে উঠেছিল। কিন্তু হঠাৎ এমনি এক অঘটন ঘটে বসলো যে আমাব আশাব কণিকাগুলি জমাট বাঁধাব আগেই ছিন্নভিন্ন হযে ধূলাতে বিলীন হয়ে গেল।

তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি --যদিও ঘটনাটি তুচ্ছ—ও অতি সামান্য কিন্তু তাব ফলাফল এত তিক্ত যে আমাব ভবিষ্যৎ নিমেযে খানখান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল।

মিঃ সুধীর নান তাঁব চারজন বিশিষ্ট বন্ধুকে 'হাস চুপ' ছবি দেখার নিমন্ত্রণ কবেন এবং সেই মতই আমায জানান যে এই চাবজনকে টিকিট কাটতে যেন না দেওয়া হয় এবং যথাযথ অভ্যর্থনা খাতির করা হয়। আমি সেই সব মিঃ হাফেজীকে জানিয়ে বেখেছিলাম—যে শ্রীসুধীর নান মশাই-এব চিঠি নিযে তাঁবা আসবেন—আপনি দয়া করে চাবখানি ওপব তলায় সিটে তাঁদেব বসিয়ে দেবেন। তিনি চুপ করে শুনেছিলেন কোন জবাব দেন নি।

দুটোব শো বসে গেলে অর্কেস্ট্রার যথাযথ ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি বাড়িতে ৬টাব শোব জন্য তৈবি হতে চলে যাই। ফিবে এসে দেখলাম ৬টার শো প্রায় শুরু হয় হয়। ছুটে গিযে দেখি ওপব তলায় সুধীববাবুব বন্ধুবা বসে আছেন কিন্তু ম্যানেজাব মশাই সুধীববাবুর সে চিঠি গ্রাহ্য না করে তাঁদের টিকিট কবতেই অনুরোধ করেন—তাঁরাও তদ্রুপ কবে ঢুকেছেন।

শুনেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো—আমি মিঃ হাফেজীকে গিয়ে বললাম —এটা আপনি কি করেছেন—আপনি অন্তত চারটা পাশ ইস্যু করে আমাদের একাউন্ট থেকে সে টাকা কেটে নিতে পারতেন? কিন্তু প্রোডিউসারের পাশ আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না। কথার উপর কথা কাটাকাটিতে এক বিরাট দৃশ্যের সূচনা ঘটে গেল।

ওপরের উত্তর কোণের ঘরে মিঃ সরকার, মিঃ মল্লিক, মিঃ আতর্থী তখন বসেছিলেন, তর্কাতর্কি তাদের কানে পৌঁছিল। আমায় বুড়োদা ডেকে নিলেন। আমি মিঃ সরকারের সামনে সমস্ত পরিস্থিতিটা ব্যক্ত করলাম—এমন সময় মিঃ হাফেজি এসে ঢুকলেন। তারস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলেন—আজ যা ঘটালেন তাতে ভবিষ্যতে নিউ থিয়েটার্সের দরজা আপনার জন্যে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। জানবেন এর জন্যে যদি নিউ থিয়েটার্স নিশ্চিহ্নও হয়ে যায় তবু তারা আপনাকে নেবে না।

ইতিমধ্যে সুধীর নান মশাই—এসে গেছেন এবং আমাদের তর্কাতর্কির কথা সব শুনে—মিঃ সরকারের ঘরে প্রবেশ করে বলেন—চুপ করে যান হীরেনবাবু, মিথ্যে কথা কাটাকাটিতে নিজেদের অপমানিত করবেন না—চলে আসুন। এর পরের ছবি আমি হাউস তৈরি করেই রিলিজ করব।

উনি ঘরের বাহিরে চলে যান: আমি মিঃ সরকার, মিঃ মল্লিক, বুড়োদা ও হাফেজির সামনে বললাম—মিঃ হাফেজি সাহেব! আপনিও শুনে রাখুন যে হীরেন বোসকে যদি সবাক চিত্রের পরিচালনা করতে হয় তবে সে নিউ থিয়েটার্সেই প্রথম তা শুরু করবে। তারপর সে নিজেই অন্যত্র চলে যাবে।

আমি নিজেই জানিনা কিসের প্রেরণায় ও জোরে সেদিন মিঃ সরকারের সামনেই আমার এ আস্ফালন।

শুরু হয়ে গেল ম্যাডান্ কোম্পানীতে মিঃ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ণদীর্ঘ সবাক-চিত্র 'ঋষির প্রেম'। জ্যোতিষবাবু আমায় শুধু হিরো নিলেন না! আমি হলাম আংশিক গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক। অবশ্য ধীরেন দাসও আংশিক সুরকার ছিলো—তাই স্ক্রীনে দুজনেরই নাম ছিল।

বইখানি কবি শ্রীকৃষ্ণধন দে-র লেখা ছিল—তিনিও এতে কিছু গান লিখেছিলেন যার সুর ধীরেন দাস করেছিলেন। বাচনিক শিক্ষক ছিলেন—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, এডিটর জ্যোতিষ মুখার্জি। ঋষির প্রেম ছবিতে, যাজ্ঞবল্ক ঋষি—গণেশবাবু, (পদবী মনে নেই, তৎকালীন থিয়েটার অভিনেতা)—যাজ্ঞবল্কের শিষ্য কল্হন (নায়ক),—হীরেন বসু, কর্ণাটকরাজ—অহীন্দ্র চৌধুরী, ঋষি আশ্রম বালিকা চিত্রা—শ্রীমতী সরযুবালা (এখনকার নাট্য সম্রাজ্ঞী); কর্ণাটক-কন্যা—শ্রীমতী কানন (এখনকার কাননদেবী)—বিদেহরাজ—জয়নারায়ণ মুখুজ্যে, সভাকবি—ধীরেন দাস। আর যাঁরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম আমার স্মরণে আসছে না—তবে মেয়েদের দলে যারা ছিল সবাই থিয়েটার অভিনেত্রী। যেমন—ভুঁদি অর্থাৎ নিরুপমা, ফিরী—ফিরোজবালা, চারী—চারুবালা ইত্যাদি।

গল্পাংশ ছিল—যাজ্ঞবল্কের শিষ্য কল্হন প্রকৃতির পূজারী—নদী, ঝরনা, কুমুদ, পদ্ম, আশ্রমের শ্যামময় বনানী—এরাই তার প্রিয় হতে প্রিয়তর। খেলার সাথী বা সখী ছিল আশ্রম বালিকা তাও এইসব প্রকৃতি পুজোর অবসর সময়ে।...কর্ণাট রাজ-দুহিতার—(কানন দেবী) স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক। তাই তিনি পার্থিব রাজদরবারের রূপসজ্জা দেখাতে প্রকৃতির সেবক কল্হনকে সাথে নেন শিক্ষার জন্যে। রাজদুহিতা অন্তরে ভালবেসেছিলেন বিদেহরাজকে (জয়নারায়ণকে)। তাই স্থির চিত্তে সুসজ্জিত স্বয়ম্বর আসরে পুষ্পমালা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেন—রাজমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলী, নিকট বা দূরাগত অভ্যাগতদের মাঝখান দিয়ে। যে পথ ধরে তিনি বিদেহরাজের সম্মুখীন হতে যাচ্ছেন—তা স্তবকে স্তবকে পথের পুষ্পবৃষ্টিতে ভরিয়ে তুলছে রাজকুমারীর

সখীবৃন্দেরা।—কলহনের পাশ-পথ ধরেই পুষ্প স্তবকের রচিত পথ…কমল বিছানো পথের দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে কলহন—এমন সময় তারই চোখের সামনে কোমল-কমল বুকে রাজকুমারী পা উঁচিয়ে পদক্ষেপ বাড়িয়ে দেন। পাছে কোমলকমলটি রাজকুমারীর পদস্পর্শে দলিত হয়ে যায় তাই কলহন নিমেষে উঠিয়ে নিতে হাত বাড়িয়ে দেন। রাজকুমারীর পদক্ষেপ গিয়ে পড়লো কলহনের হাতের ওপর—চকিতে রাজকুমারীর হাতের মালা ছিটকে গিয়ে পড়লো কলহনের কণ্ঠে। বিপর্যয় শুরু হলো সভামধ্যে…কিন্তু কর্ণাটরাজ তাঁর কন্যাকে কলহনের হাতেই সমর্পণ করে যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ভাঙ্গা মন অবসন্ন দেহে রাজকুমারী ভূমিশয্যা নেয়। কলহন কিন্তু সারারাত জেগে তারই পাশে বসে ভেবে চলে—বিধির একি বিধান। হঠাৎ তার অজ্ঞাতেই গড়িয়ে পড়ে তার চোখ হতে এক ফোঁটা জল—যা ঝরে পড়লো রাজকুমারীর ক্লান্ত কপোলে। নিমেষে জেগে উঠে রাজকুমারী বলে, একি তুমি কাঁদছো…তুমি তাহলে আমাকে ভালবেসেছো…তবে আমি সব ভুললাম আমি চাই এমনিই এক ভালবাসা। কলহনকে নিজের কাছে টেনে নেয়… কল্হন বলে—সনাতনী প্রথায় তুমি আমার সহধর্মিণী—আজ তোমায় আমি ফুল দিয়ে সাজাবো‥ বলে গেয়ে উঠে—আজি এ চাঁদিনী রাতে। প্রত্যুত্তরে রাজকুমারী বলে—মেলাও আঁখি আঁখির পাতে।

সুরটা করেছিলাম—দরবারি কানেড়ার উপর—দু'জনের দ্বৈত সঙ্গীত সবাইকে তৃপ্তি দিতে পেরেছিল। আশ্রমে-কাননে ছুটে যায় কলহন পুষ্প চয়নে। সামনেই আশ্রম কুটীরের তুলসীমঞ্চ—তার তলায় প্রণাম জানিয়ে রাজকুমারী বলে—ওগো মোর গৃহদেবতা আমার মনে বল দাও।

মাথা তুলে চেয়ে দেখে তারই সামনে দাঁড়িয়ে বিদেহরাজ। তিনি বলেন—কথা নয়—রথ প্রস্তুত, চলে এসো—হাত ধরে রাজকুমারীকে নিয়ে আশ্রমকুটীর থেকে অন্তর্হিত হন। এর পর আর লিখলাম না…তবে হ্যাঁ মিলেছিল দুজনে বহু আয়াসে। …আর চিত্রা রাজকুমারীর তিরোধানে অসুস্থ কল্হনকে সেবায় যত্নে সে সুস্থ করে তুলেছিল—কলহনের মনের হলাহল সে নিজের অন্তরের শুভ্রতায় অমৃত করে তুলেছিল—কলহম তাকে কি বলে বিমুখ করবে—না—না…তা হয় না—যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে অকৃতজ্ঞতার স্থান নেই, তাই সে গ্রহণ করবে চিত্রাকেই জীবনসঙ্গিনীর আসনে বসিয়ে।

বিদেহরাজের রাজ অন্তপুরে কিন্তু কর্ণাটকুমারী বরাঙ্গনার মাঝখানে স্থান পেলো না—পেতে পারে সহস্র বারাঙ্গনা রঙ্গভূমিতে।...অসম্ভব। ছুটে পালিয়ে যায় পিতৃগৃহে...সে গৃহেও আজ তার স্থান কোথায়? রাজ সভাকবি তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে। কল্হনের পায়ে এসে মাথা খুঁড়ে মরে কর্ণাটদুহিতা—কিন্তু...কল্হন তাকে ক্ষমা করতে পারে—তবু গ্রহণ করতে পারে না—যে আসন কর্ণাটদুহিতা পুনরাধিকার করতে এসেছে সে যে আজ পূর্ণ হয়ে রয়েছে চিত্রার অক্লান্ত সেবার পরিচর্যায়।

চিত্রা শুধু বলে—সখা কল্হন আশ্রমের শিক্ষা ক্ষমা মানেই গ্রহণ...তারপর চিত্রা চলে অনন্তের পথে ঐ শুভ্র ঝরণায় অবগাহন করতে চিরদিনের জন্যে।

ম্যাডান কোম্পানীর ক্রাউন সিনেমায় (এখন যেটি উত্তরা) ঋষির প্রেম পূর্ণদীর্ঘ সবাক চিত্র আত্মপ্রকাশ করলো ২৪শে অক্টোবর ১৯৩১ (চৌদ্দ রীলের ছবি)।

ঋষির প্রেম চিত্রের আবাহ সঙ্গীতেই, তারক দেকে দিয়ে আমি গীটার বাজনার ভারতে স্বত্রপাত ঘটাই।

এখানে ম্যাডান কোম্পানীর সম্বন্ধে দু' একটি কথা জানান দরকার। ম্যাডান কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মিঃ জে, এফ, ম্যাডান (পার্শি ভদ্রলোক) ইনি প্রথম ময়দানে টেণ্ট খাটিয়ে ইংরাজী ছবি কলকাতায় দেখাবার ব্যবস্থা করেন। সারা ভারতে তিনি একশোর উপর প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন। কলকাতায় দুটি পার্শি থিয়েটার অর্থাৎ মঞ্চাভিনয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে হিন্দী নাটক অভিনয় করাতেন। একটি কোরিনথিয়ান থিয়েটার (ধর্মতলায়) যার আজকের নাম অপেরা হাউস—অপরটি হ্যারিসন রোডে এলফ্রেড থিয়েটার যা আজ গ্রেস নাম নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে পরিণত হয়েছে। এই সব মঞ্চের দৃশ্যাবলী দেখলে মনে হতো যা অসম্ভব তাও এঁরা মঞ্চে অনায়াসে ঘটাতে পারেন। যেমন ঝর ঝর করে ঝরণার স্রোত—ইহুদীকা লেড়কী—রামায়ণ—মহাভারতে এই ধরণের মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় তখনকার ইহুদী দর্শকদের হতবাক করে রাখতো। তাছাড়া ভদ্র মদ্য ব্যবসায়ী হিসাবে এঁদের প্রতিষ্ঠা ছিল। এঁদেরই ম্যাডান থিয়েটার কোম্পানী চিত্র: প্রতিষ্ঠান। প্রথম নির্বাক চিত্রের প্রযোজক আবার বাংলায় প্রথম টকী প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন এঁরাই। এঁর দুই ছেলে বড় ফ্রামজি ম্যাডান—অপরজন জাহাঙ্গীর ম্যাডান—জে এফ ম্যাডানের একটিমাত্র জামাই রুস্তামজি। রুস্তামজি জে এফ ম্যাডানের মৃত্যুর পর সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিকে নখদর্পণে রেখেছিলেন।

ওঁর আমলে স্টুডিওতে শিল্পীবৃন্দের জন্য রাখা ছিল—পাচক বাবুর্চি....দুই-ই। সমস্ত শিল্পীরা স্টুডিও এসে যাঁর যা অভিরুচির ফর্দ দিতেন এবং লাঞ্চের সময় তাঁকে সেইরূপই খেতে দেওয়া হোতো—নিরামিষ, আমিষ কোপ্তা-কাবাব-বিরিয়ানী ছাড়াও ছিল অঢেল মিষ্টি পানীয়ের ব্যবস্থা—যত ইচ্ছা তত খাও। এমনও দেখেছি যিনি—এসবও খাবেন না তাঁর জন্যে আসতো ফল মিষ্টি দুধ দৈ। আরও ছিল শিল্পীদের আসা যাওয়ায় গাড়ি। উপযুক্তের চেয়ে বেশী দক্ষিণা। কাজেই রুস্তমজীর সময় ম্যাডান কোম্পানীর ব্যবস্থাপনাকে রামরাজত্বের সঙ্গে তুলনা করা হোতো। ঋষির প্রেম ছবির সঙ্গে সঙ্গে এই রামরাজত্বের অবসান ঘটে কারণ রুস্তমজীর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। তাঁরই আনা টকী মেসিন, স্টুডিও ফ্লোর—বাগান পুকুর—দু ভাই-এর টক্কাটক্কীতে বার বার অর্থাভাবে বাঁধা পড়তে থাকে।

ফ্রামজি ভাই-এর স্নেহভাজন ছিলেন ডিরেক্টার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জাহাঙ্গীর ভাই-এর স্নেহভাজন ছিলেন প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশাই—

ব্যাপার জটিল দেখে প্রিয়নাথবাবু ছোট জ্যোতিষকে নিয়ে ম্যাডান কোম্পানী ছেড়ে নিজেই তৈরী করলেন কালী ফিল্মস যা আজ টেকনিসিয়ান স্টুডিও নামে চলছে। জ্যোতিষবাবু ওঁর অবস্থা বিপর্যয়ে আপনাকে জড়িয়ে ফেললেন।

টাকা বন্ধকীর ব্যবসায়ীরা এর পূর্ণ সুযোগ নিলেন। মতিলাল চামেরিয়া এঁদের টাকার পরিশোধে গড়ে তুললেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী।

আর এক কারবারি—রাধা চামেরিয়া—তিনি এদের পয়সার সুদে আসলে গড়ে তুললেন রাধা ফিল্মস (যা আজ দূরদর্শন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে)। আর এঁদের দেনা শোধের সুযোগ নিয়ে ম্যাডান স্টুডিওকে যিনি নিজের করায়ত্ত করলেন তিনি হচ্ছেন রায়বাহাদুর সুখলাল কারনানি। পূর্বের ম্যাড়ান স্টুডিওর নাম দিলেন তিনি তাঁর পৌত্র ইন্দ্রনাথের নাম অনুযায়ী ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। (আজও তা ট্রাম ডিপোর পেছনে বর্তমান)।

ম্যাডান কোম্পানীর হঠাৎ এই পতনের মাঝে গড়ে উঠলো তিন বাঙ্গালী ধনীর প্রতিষ্ঠান—মিঃ বি. এন. সরকারের নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড—মিঃ বড়ুয়া স্টুডিও এবং মিঃ নানের প্রতিষ্ঠান। মিঃ নান তখন চিত্রা প্রেক্ষাগৃহের অবমাননায় গড়ে তুলতে থাকেন নতুন প্রেক্ষাগৃহ। এঁদের প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হলেন—শ্রীরবীন দত্ত মশাই—ইনি মিঃ নানের ভগ্নিপতি।

সুধীর নানমশাই আমায় বললেন—জমি পাওয়া গেছে—কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপরই। রবীন দত্ত মশায়ের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে লাগলো নতুন প্রেক্ষাগৃহ··

সুধীরবাবু আবার আমায় ডেকে বললেন—সামনের বছরেই হাউসের উদ্বোধন করছি···কবিগুরুর কাছ থেকে হাউসের নামকরণ করিয়ে এনেছি রূপবাণী। আপনি এ হাউসের ম্যানেজার।

আমি এক মিনিট চিন্তা কবে বলি আমি স্বষ্টিধর্মী—আপনিই আমায় ডেকে এনে—ডিবেকটর প্রোডিউসার ছবির নায়ক কবেছিলেন—আজ সেই শিল্প স্বষ্টি ছেড়ে হাউসে ম্যানেজাব করার বাসনা আমার এতটুকু নেই।

উনি বললেন—তবে এখন বাইবে যেমন কাজ করছেন করুন পরে আমরা যখন চিত্র ডিস্ট্রিবিউটার হব তখন আপনাকে টাকা দিযে প্রোডিউসার করে চিত্র করিয়ে নেবো।

আমি ধন্যবাদ জানালাম।

টকী জগতের স্বষ্টি হওয়ার পর যেন রেসের মাঠে ঘোড়দৌড়ের মত সব প্রতিষ্ঠানই তৎপর হয়ে উঠলেন। জিতলেন কিন্তু নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড। ১৯৩১ সালের শেষেই (আমার যতদূর মনে পড়ে) ডিসেম্বর মাসেই ওরা ওঁদের প্রথম সবাক চিত্র—চিত্রায় রিলিজ করেছিলেন—শ্রীশরৎচন্দ্রের ষোড়শী। জীবানন্দের ভূমিকায় ৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ষোড়শীর ভূমিকায় শ্রীমতী নিভাননী। পরিচালক—বুড়োদা (শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী) এবং সঙ্গীত পরিচালক শ্রীরাইচাঁদ বড়াল।

ম্যাডান কোম্পানীর পতন ও নিউ থিয়েটার্সের উত্থান আমার মনকে যেন মুচড়ে ভেঙ্গে দিল। মনের মধ্যে সর্বদা বাজছে যে সবাক চিত্রের পরিচালনা যদি করতে হয় তবে নিউ থিয়েটার্সেই প্রথম করব—তারপর বাইরে চলে যাবো।

অমর মল্লিক মশাই একদিন বললেন, শুধু শুধু বিতর্কটা করলি? এমন একটা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাঙ্গালীর। তার মধ্যে প্রবেশ নিষেধ কথাটা জোর করে বলিয়ে নিলি। আমি আগেই বলেছি মল্লিকমশাই-এর আমার গানের প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল।

ভাবছেন টকির বিপাকে পড়ে রেডিও গ্রামোফোন সবই জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছি। কতকটাই তাই. বটে ১৯৩১ সালে ১ এপ্রিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং রূপান্তরিত হলো ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং কোম্পানীতে। অর্থাৎ সরকারের

কৈফিয়তের বেড়াজালে বাঁধা পড়লো। কাজেই মুক্ত বিহঙ্গের চলাফেরার পথে সবাই যেন বাঁধা পড়ে গেলাম অবশ্য প্রাণ ঢেলেই কাজকর্ম চলেছিল—কিন্তু শিল্প-সৃষ্টিকে যেন কাগজে-কলমের হিসাবে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেললো। ফলে সাবলীলত্ব ক্ষুন্ন হতে থাকলো।

১৯৩১-এর মাঝের রেকর্ডিং এইচ এম ভিতে হলো বটে কিন্তু যাও হলো সবার মনের অসন্তুষ্টির মধ্যে। সবাই আজ ক্ষেপে উঠেছে মনে মনে এদের বণিকপনার দুর্ব্যবহারে।

এমন সময় কাজীদা বড় সুখবর নিয়েই বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তার ধীরেন দাস। বললেন-দু মিনিটে তৈরী হয়ে নে এখনি আমাদের যেতে হবে মেগা ঘোষের অফিসে। আজই মেগা ঘোষের রেকর্ডিং কোম্পানীর উদ্বোধন হবে আমাদের নিয়ে।

এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে ?

হ্যারিসন রোডে মেগাফোন কোম্পানী রেকর্ড ডিলার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ১৯১০ সাল থেকে। আজ ১৯৩১-এর মাঝামাঝি—তাদের নিজেদের হরিণ মার্কা লেবেলের উদ্বোধনী—যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু হবে আজ এবং আমরা চারজনই তার প্রধান ঋত্বিক—ভাবতেই মনটা ভরে উঠলো।

পৌঁছে মেগা ঘোষ (জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার) মহাশয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। উনি হাসি মুখে বলেন—এসে গেছেন সব, এদিকে পাঁজির সময়ও আগত। চলুন পেছুনের হল ঘরটায় যাই। পেছনের হল ঘরে সতরঞ্জি বিছানো ফরাস পাতা। উনি ঘরে ঢুকে নিজে হাতে পিলসুজ রাখা একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন—ওঁর সুযোগ্য ভাই ধূপকাঠি জ্বালালেন। কর্মচারীর মধ্যে একজন একখানি নতুন চাদর এনে ওঁর হাতে দিলেন। উনি বললেন—এইবার আসুন এর চারকোণ আমরা চারজন ধরে এই সতরঞ্জের উপর বিছিয়ে দি। জিতেন বাবু, স্বয়ং কাজীদা, ধীরেন দাস ও আমি তৎপর হয়ে চাদর পাতা সাঙ্গ করলাম। বেয়ারা হারমনিয়ম এনে তারপর রাখলে ...কাজীদা তাতে সুর তুলে নিজের নতুন রচিত কয়েকখানি গান জিতেনবাবুকে শোনাতে শুরু করলেন—আমরা শ্রোতা হয়ে তাঁর পাশে—ধীরেন দাস তবলায়—তালটা রাখছিল। এমন সময় একরাশ খাবার এসে হাজির হলো। চপ কাটলেট থেকে রসগোল্লা রাজভোগ সন্দেশ কিছুই আনাতে বাকী রাখেননি। বলে রাখি জিতেনবাবু অত্যন্ত ভোজন বিলাসী ছিলেন—সবাইকে পেট ভরে খাওয়াতে তাই ভালবাসতেন।

ঠিক হলো আর যা চেনা জানা শিল্পী আছে তাদের আনার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই রিহার্সল শুরু করতে হবে। কারণ—সামনের পূজার রিলিজ তাঁর চাই-ই-চাই।

প্রথম সপ্তাহে রিহার্সল শুরু হয়ে গেল। দু-চারজন শিল্পী সমাবেশ দেখলাম। কে কাকে এনেছিলেন মনে নেই তবে আমি শ্রীমতী কাননকে এনে জিতেনবাবুর কোম্পানীতে গাইবার সুযোগ করে দিয়েছিলাম।

বিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানীর ডিলার এম এল সাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ সি সি সাহা এই সালেই সারা কন্টিনেন্ট ঘুরে একটি রেকর্ডিং মেসিন এনে অক্রূব দত্ত লেনের একটি বাড়ির উঠানকে ঘিরে রেকর্ডিং স্টুডিও স্থাপন করেন। কোম্পানীর নাম দিয়েছিলেন এইচ-এম- পি-ভি অর্থাৎ হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্ট এণ্ড ভ্যারাইটিস।

ইনি এই স্টুডিওটি উদ্বোধন করান শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়কে দিয়ে। বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি যেমন রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচায শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীর সমন্বয়ে তিনি এ সংস্থার পরিবেশ রচনা কবেছিলেন। নতুন নতুন সুরেলা কণ্ঠস্বরের চয়ন সংগ্রহে যথেষ্ট সুনাম সৃষ্টি কবেন। এঁদের লেবেল ছিল 'বাঁশুরীয়ার বাঁশরী বাদন'.....এঁদের প্রথম প্রকাশিত রেকর্ডের সুপার হিট্ গান হয়েছিল 'যদি গোকুল চন্দ্র'—রেণুকা সেনগুপ্ত গীত। পরে অবশ্য বহু শিল্পী-সৃষ্টির বিধাতা হচ্ছেন এই হিন্দুস্থান কোম্পানী—যেমন শ্রীশচীন দেব বর্মন, সুপ্রভা ঘোষ (পরে সরকার), উৎপলা সেন, সাবিত্রী ঘোষ, রাজেশ্বরী দত্ত, দেবব্রত বিশ্বাস, অনিল বিশ্বাস, পারুল বিশ্বাস, অনুপম ঘটক, সুধীরলাল, সত্য দত্ত প্রভৃতি। তাছাড়া তখনকার দিনেই এঁরাই নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাতিমার্কা লেবেল বার করেছিলেন—যাতে শ্রী কে এল সাইগল একাই একশ'।

কিন্তু ভারতের সব গ্রামোফোন কোম্পানীর ভাগ্যবিধাতা হচ্ছে এইচ-এম-ভি কোং। কারণ সারা এশিয়াতে রেকর্ড প্রিন্টিং মেশিন হচ্ছে একমাত্র ওঁদেরই ফ্যাক্টরিতে। তাই সব কোম্পানীতেই এইচ-এম-ভির গিল্ডের মেম্বার হতে হবে যার আইন-কানুনের বাধ্যবাধকতায় সব কোম্পানীই বেড়াজালে বাধা থাকেন এইচ-এম-ভির কাছে। যেমন শিল্পীরা যদি একবার এই কোম্পানীতে রেকর্ড করেছেন, তাঁকে সেই কোম্পানীর বিনানুমতিতে অন্ত কোম্পানীতে রেকর্ড করতে দেওয়া হয় না। শিল্পীর যদি সে কোম্পানীর

সঙ্গে মনের ভেদও ঘটে, তবে তিনি বছরের পর বছর আটকা পড়ে থাকেন ইত্যাদি।

মেগাফোন কোম্পানীতে জিতেন বাবুর চিন্তাধারা আবার অন্য রকম। তিনি তাঁর কোম্পানীতে সব শিল্পীরাই গান বরণ করে নিতেন, যদি সেই শিল্পীর কণ্ঠে চুম্বকী আকর্ষণ থাকতো। তাই ওর হরিণ মার্কা লেবেল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপাল শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞান গোস্বামী, এনায়েৎ খাঁ সাহেব, বেগম আখতার, শ্রীমতী কানন দেবী, শ্রীধীরেন মিত্র (অধুনা রবীন্দ্র, ভারতীর ডিন), ভবানী দাস, রবীন মজুমদার থেকে রাস্তার গাইয়ে অনন্তবালা পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।

যাক—যেদিন প্রথম রিহার্সাল শুরু হলো, সেদিন শুরু হয় শ্রীমতি কাননকে নিয়েই। কানন দেবীর আমিই চারখানি গান লিখে দি এবং সুর করে শেখাতে শুরু করেন ধীরেন দাস। তাঁর প্রথম গান রেকর্ড হয়েছিল—'যদি প্রাণে আমার এত ব্যথা দিলে ও প্রিয় তোমার লাগি জাগি সারারাত'। কাজী সাহেব নিয়ে বসলেন—শ্রীধীরেন মিত্রকে···এমনিতর।

১৯৩২ সালের শুরুতে দেখলাম আমার নিজের গাওয়া গান বা আমার বিবিধ সঙ্গীত বৈচিত্রাবলীর অবসান ঘটেছে। এইচ-এম-ভির অধিকর্তা মিঃ কুপার যেমন আমায় উৎসাহিত করে নতুন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিতেন—সে উদ্দীপনা যেন আমার নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ম্যাডান কোম্পানীর ছবি ও এইচ-এম-ভির সঙ্গীত-অনুপ্রেরণা স্রোতে যে বাণ ডেকেছিল তা যেন এক অদৃশ্য কূটনীতির অবরোধে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে···মনটা কেমন হু-হু করতে থাকে।

ঠিক এই সময় রেডিওতে প্রোগ্রাম শেষে নৃপেনদা বললেন—'হীরেন তুমি কাল সকালে একবার আমার বাড়িতে আসবে—ভুল না।'

পরের দিন সকাল হতেই নৃপেনদার বাড়িতে হাজির হলাম। তিনি আমায় বললেন—এইচ-এম-ভি ছেড়ে এখন কি করছো ?

আমি বললাম—মেগাফোনের চাদর পেতেছি—দেখি কি হয়।

উনি বলেন—ওটি ছেড়ে এবার আমার সঙ্গে এক নতুন রেকর্ড কোম্পানীতে চাদর বিছাতে হবে। কলোম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর নাম শুনেছো ?

আমি বললাম—নিশ্চয়! ওরাই তো এইচ-এম-ভি কোম্পানীর একমাত্র বলিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী। ইউরোপে ওরা গ্রামোফোন কোম্পানী থেকেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

উনি মৃদু হেসে বলেন—ওরাই এবার কলকাতায় ভারতীয় রেকর্ডের শাখা খুলবেন। এবং এখানেও এইচ-এম-ভি কোম্পানীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন কারণ ওদের তো আর এইচ-এম-ভি-র ফ্যাক্টরিতে রেকর্ড ছাপতে হবে না।

শুনে মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। বলি আমাকে কি করতে হবে······

উনি বলেন—সবই···যদিও আমাকেই তাঁরা বাংলা হিন্দীর প্রতিনিধি করেছেন, তবু করতে হবে তোমাকেই। তুমিই হবে এই কোম্পানীর ফাউণ্ডার-ট্রেনার এবং নতুন বৈচিত্র্যের রূপকার।

শুনে খুবই ভাল লাগলো—তবু বললাম—কিন্তু এইচ-এম-ভি কেন ছেড়েছি জানেন।

উনি বলেন—জানি। প্রথমটা এরাও রয়েলটি দেবে না—তবে গীতিকার সুরকারের নাম লেবেলে দেবে এবং রেকর্ড পিছু তুমি গ্রামোফোন কোম্পানীর বিশগুণ বেশী পাবে।

আমি চুপ করে থেকে বলি—আপনি যখন বলছেন করতে হবে।

বাড়ি চলে এলাম···জানিনা কতদূর কি হবে···তবে এইটুকু জানি যে মেগাফোন কোম্পানীর চেয়ে পূর্ণ স্বাধীনতায় নৃপেনদা আমায় কাজ করতে উৎসাহিত করবেন।

কলোম্বিয়ার রিহার্সাল-বাড়ি নিতে হলো চিৎপুরের ওপরেই একটি বাড়ির দোতলায়। কারণ ও অঞ্চলের শিল্পীদের কাছাকাছিই পাওয়ার সুবিধা হয়। বাড়িটির দোতলা ফ্ল্যাটে তিন-চারখানি বড় বড় ঘর ও রাস্তার ওপর বারান্দা। ওখানে আমাকে সকাল ৮৷টা ৯টায় পৌঁছতে হতো, দুপুরে বাড়ি থেকে লাঞ্চ যেতো, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে কাজ করে আমায় ফিরতে হতো। যেদিন রেডিও থাকতো সেদিন রেডিওর গাড়ি এ অঞ্চলের শিল্পী নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকেও তুলে নিয়ে যেতো। আবার বিকেলে ফুরসত পেলে নৃপেনদাও এখানে এসে যেতেন। আমার মেগাফোন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কানন দেবীও হঠাৎ এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন।

রিহার্সাল চলেছিল সেদিন কানন দেবীকে নিয়েই—আমারই সুরে আমারই লেখা গানের মহলা। গান দুখানি 'রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি পায়েল বাজে' এবং 'শ্রীরাধা নামের মুরলী আজ কেন বাজে'······সকাল সকালই কানন এসেছিলো। আজ আবার রাস পূর্ণিমা—সামনের রাস্তা দিয়ে পরেশনাথের জলুস যাবে তাই তাড়াতাড়ি রিহার্সাল সেরে ও বাড়ি চলে

গেল। আমি লাঞ্চ সেরে নিয়ে বসেছিলাম সুর করার জন্যে—এমন সময় হুড়-হুড় করে এক ঝাঁক মেয়ে দোতালায় উঠে আসে।...বলে আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পরেশনাথ দেখবো। আমি বললাম, যান তবে গোলমাল করবেন না। কালী চাকরকে বলে দিলাম নীচের সিঁড়ির দরজা বন্ধ রাখতে। বোধকরি এমন সময় প্রভাবতী (রেডিওর আভাবতীর দিদি) এলো...ওর রিহার্স্যল হবে...শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের লেখা 'সাগরে ভরিতে এলে কেন গাগরী' যার সুর করতেই আমি বসেছিলাম। গানখানির সুর আমি ধীরে ধীরে ওর কণ্ঠে তুলতে থাকি ..এমন সমর ইংরেজী ব্যাণ্ডের আওয়াজে বুঝলাম পরেশনাথের প্রোশেসন এসে গেছে তাই গান বন্ধ করে দুজনেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই এবং দেখতে থাকি। প্রোশেসন চলে গেলে আবার রিহার্স্যল ঘবে বসলাম। দেখলাম দূর দূর করে মেয়েরা নেমে গেল। তাদের মধ্যে দুটি মেয়ে এসে আমাদের ঘরেব দরজার সামনে দাঁডিয়ে পড়লো। গান থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি চাই।

ওরা দুজনেই যুবতী—একজন সুশ্রী সুন্দর স্বাস্থ্যবতী, অপরজন একটু মোটা ধরনের মুখখানি সুশ্রী তবে রংটা শ্যামবর্ণ। দেখলাম সুন্দরীই বেশী বোল্ড।

বললেন—গান শুনছি...এটাতো কলোম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীব রিহার্স্যল অফিস?

আমি বললাম—হ্যাঁ—তাই এখানে দরজায় দাঁড়িয়ে গান শোনা অশোভন। যদি সত্যি তোমাদের গান ভাল লাগে তবে ঘরে এসে বোসো।

বিনা বাক্য ব্যয়ে দুটিতেই এসে ঘবে বসে পড়লো। আমি গান শুরু করি। প্রভা বলে—আজ এই পর্যন্ত থাক। ভাল করে তুলতে হবে—আজ আবার একটু কাজ আছে—

আমি বললাম—তবে এলে কেন?

প্রভা হেসে বলে—ভুলে গিয়েছিলাম যে আজ রাস পূর্ণিমা...তাই যদি ছেড়ে দেন?

আমি কালীকে বলি—ওরে কালী প্রভাকে ছেড়ে দিয়ে আয়—রিকশ ডাক।

প্রভা চলে গেল। সুন্দরী মেয়েটি বলে—আমাদের গান নেবেন?

আমি বলি,—গান?—তোমরা গাইতে জানো?

দুজনেই মাথা নেড়ে জানায় যে তারা গান জানে।

আমি গাইতে বললে, বললে—আপনি হারমোনিয়ম বাজান—গাইছি। দুজনের গলা শুনে আমি ভারী খুশী হলাম। দুজনের গলাই অত্যন্ত সুরেলা। সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার নাম কি ?

বললে,—বাণীবালা, আমি প্রবোধবাবুর নাট্যনিকেতন স্টেজে কাজ করি।

আমি বলি—আর তুমি ?

ওটি বলে—আমার নাম স্নেহলতা…আমি কোথাও কাজ করি না।

বললাম—কে আগে শুরু করবে আগে তুমি না আগে রাণী ?

বাণী বলে—ওই আগে শিখুক—আমি বসছি। আজ আমার থিয়েটার নেই।

আমি বলি—এই নাও প্যাড নাও—ওখানে পেনসিল আছে গানটা আগে লিখে নাও। স্নেহলতা বলে—আমি লিখতে জানি না।

আমি বলি পড়তে জানো ? ও বলে না। আমি বলি—তবে শুনে শুনে তোলো—আমি গান ধরি—মলয়া শোন্ রে তোরে বলি। ও অনেকক্ষণ শুনে গেয়ে উঠল ময়লা শোনবে তোরে বলি। আমি হেসে ফেলে যতই ওকে শেখাবার চেষ্টা করি ওর মুখ দিয়ে ময়লা থেকে মলয়া বার করতে পারি না অথচ অসম্ভব সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠস্বর। যাই হোক অতি কষ্টে দু' লাইন কোনরকমে তুলে আমি বললাম—তোমায় কিন্তু রোজ রোজ আসতে হবে—ফাঁকি দিলে গান হবে না। ও খুশী মনে—হ্যাঁ বলে সরে বসে। এবার রাণীর পালা—ও—এগিয়ে আসে—নিজেই লেখার প্যাড পেন্সিল নিয়ে বলে—বলুন—গানখানি।

আমি বলি—লেখো—আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল। গানখানি যেমন নিমেষে লিখে নিল—তোলবার সময় দেখলাম সারা গানখানি অনায়াসে কণ্ঠে নিমেষেই তুলে নিল। রাণীর গলা ছিল উদাত্ত—ও সুরেলা। স্নেহলতার গলায় ছিল সুর ও কোমলতা। দুজনেই কলোম্বিয়ার সুগায়িকা হয়ে গেল।

কলোম্বিয়ার রিহার্সল সেরে যেদিন যেদিন সন্ধ্যায় আমায় রেডিও যেতে হতো না সেই সেইদিন আমি অবকাশটুকুর সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যার পর চিত্রা প্রেক্ষাগৃহে শ্রীঅমর মল্লিক মশাই এর ঘরে গিয়ে বসে বসে আড্ডা দিতাম এবং শেষ শো-এর শেষে মল্লিক মশাই-এর সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম। মনের নিভৃত বাসনা যা এতদিন অতলান্তে তলিয়ে গিয়েছিল—হাফেজি সাহেবের অতর্কিত ঘোষণায়, তাকেই সফল করার উদ্দেশ্যে আমি অধ্যবসায়ের পরীক্ষা দিতে শুরু করলাম।

ম্যাডান ছাড়ার পর যেদিন শ্রীমতী কাননকে নিযে নতুন প্রতিষ্ঠান রাধা ফিল্মসের নতুন বই 'মা' যা বোম্বের শ্রীযুত প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালনা করেছিলেন তাতে নিয়োগ করে এলাম—সেদিন মনটা খুবই ভেঙ্গে পড়েছিল কারণ সবাই একে একে টকী ফিল্মসে দাখিল হযে গেল—অথচ আমাকে আজও এ জগতের বাইরে ঠেলে রেখে দিলো। অপর প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করলে হয়ত একটা কিছু হতো কিন্তু আমার মনে রয়েছে শুধু একটা কথা—যে সবাক চিত্রের পরিচালনা যদি করি—প্রথম করব নিউ থিয়েটারে—তারপর বাইরে চলে যাবো। হাস-চুপ ও অপরাধ ছবির পরিস্ফুটন দেখে মিঃ সরকার সুবোধদাকে ১৯৩২ এর প্রথমেই নিউ থিযে-টার্সে ডেকে নিযেছেন। সুবোধদা তাঁর সহকর্মীদের নিযে আজ ওখানকার লেবরেটারি ইন-চার্জ। সঙ্গীত পরিচালকের আসনে রাইচাঁদ বড়ালের পরামর্শে অরফিক ক্লাবের যন্ত্রশিল্পীদেরও নিযোজিত করেছেন নিউ থিয়েটার্সে অথচ আমি আজও···

সুবোধদা ওখানে ঢোকার সময অবশ্য উপদেশ দেন যে আমি যেন অবসরমত মিঃ মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষে করে চলি···তারপর উনি তো আছেনই। তাই ১৯৩২ সালটি থেকেই আমি আমার নিশ্চুপ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি.... যখন সবাক চিত্রের গতি অতি দ্রুত তালে এগিযে চলেছে। মিঃ প্রমথেশ বড়ুযার নতুন টকী ফিল্মের 'বেঙ্গল ১৯৮৩' নানমশাইদের নব প্রতিষ্ঠিত রূপবাণী—প্রেক্ষাগৃহের দ্বার মুক্ত করলো। নিউ থিয়েটার্সের দেবকীবাবু পরিচলিত ও রাইবাবুর সঙ্গীত পরিচালনায় বাংলা চণ্ডীদাস রিলিজ হয়ে হাতীমার্কা ছবির কৃষ্টি ও কলার সৌরভ বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে থাকলো।

এই প্রসঙ্গে এইটুকু জানানো উচিত মনে হয় বলে লিখছি—নিউ থিয়েটার্সের ষোড়শী ছবিতে গাজনের দৃশ্যে যে উমাশশী বড় প্যাঁচে পড়েছে এবার ভোলা দিগম্বর—গানে গাজনের সন্ন্যাসিনী সেজে নেচেছিলেন—গেয়েছিলেন—তিনি চণ্ডীদাস ছবিতে উজ্জল তারকার আসনে অধিরূঢ়া হলেন। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গান ও অভিনয় চাতুর্যে চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন এই ছবিতেই।

এই বছরেই হিন্দী ফিল্মী জগতে হাতীমার্কা ছবি সবার মধ্যে নিজেদের আসন পেতে নিলেন—দেবকী বসু ও রাইবাবুর পরিচালিত—পুরণ ভক্ত ছবিতে। পেছিয়ে রইলাম শুধু আমি ··

অনেক ভেবে চিন্তে একদিন রাত্রে মল্লিকদাকে চিত্রার আড্ডায় বসে বললাম—মল্লিকদা আমি একটা চিত্রনাট্য লিখেছি মীরাবাঈ-এর জীবনীর ওপর।

মিঃ হাফেজির সম্মানে নিউ থিয়েটার্স আমায় না হয় নাই নিলেন—কিন্তু আমার লেখা গল্পতো নিতে পারেন যদি অবশ্য মিঃ সরকারের অপছন্দ না হয়। তুমি এভাবে একটা চেষ্টা করতে পারো ?

উত্তরে উনি বললেন—কথাটায় যুক্তি আছে···দেখি কি হয়।

কলোম্বিয়ার ১৯৩২ সালের রেকর্ড বাজারে বার হলো। আমার স্বরচিত ও সুরারোপিত বহু গানই শ্রোতা সমাজে সমাদৃত হলো। রাণীর নাম রেকর্ডে —রাণুদেবী দেওয়া হয়েছিল। তার গাওয়া আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল ও তোমার পূজার প্রদীপ করো মোরে (সর্বপ্রথম গীটার সম্বলিত রেকর্ড—যা শ্রীতারক দে বাজিয়েছিলেন)··সে বছরের শেষে প্রথমস্থান অধিকার করল। স্নেহলতার গাওয়া মলয়া শোনরে তোরে বলি ও আবার ফাগুন এসেছে ফিরে—গান দুখানি হিট করলো। ফুল্ল নলিনীর গাওয়া আমার প্রথম লেখা বাংলা গজল গান—কে আমারই বাতায়নে এলে আজ নবীন অতিথি—ও ঐ উতল হওয়া যে আজিকে সমাদৃত হলো। কাননদেবীর গাওয়া—রিনিকি ঝিনিক ঝিনী গানও বাজারে সমাদর পেলো এমন কি আমার গাওয়া—জাগোহে বিশ্বনাথ ও আবার বেজেছে ভেরী—আমার পূর্বের নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ্যামেচার ভদ্র পরিবারের মধ্যে শ্রীমতী উত্তরা দেবীর কীর্তন অত্যন্ত জনপ্রিয় হলো—এর জন্য অভিনন্দিত করা উচিত শ্রীনলিনীকান্ত সরকারকে···কারণ উত্তরা দেবীকে উনিই এনেছিলেন।

রেকর্ডে সর্বপ্রথম গীটার সংযোগে গান শুনে সব রেকর্ড কোম্পানীর এমন কি এইচ এম ভির-ও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।···

এমনি দাপটে কলোম্বিয়ায় ১৯৩৩এর প্রথমের রেকর্ডিং শেষ হলে সেবারের যত গান হলো—সে সঙ্গীত সম্ভারের প্রথম স্থান আমিই অধিকার করলাম। বিশেষ করে আমারই গাওয়া 'আজি এ শারদ প্রাতে' ও শরৎ এলে শ্যামল বনে, সবুজ আঁচল পেতে গান দুখানি সর্বজনপ্রিয় হলো—রাণু দেবীর সঙ্গে আমার ভজন ডুয়েট—এস শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও হে কৃষ্ণ মুরারী—গোপী মন চারী, এইচ এম ভির হরিমতী হীরেন বসুর মতই জোড়া মিলে গেল। রাণীর নিজের গাওয়া গান—তার আশে মোর কাটলো সারা বেলা—ফুল্লনলিনীর আমি গিরিধারী আগে নাচিব ও গিরিধারী তোমার বেণুর বোলে প্রভৃতি গানগুলির বিক্রয় তালিকায় লাভ্যাংশে প্রচুর পরিমাণ অঙ্ক পরিলক্ষিত হলো।

সবই চলেছে ঠিক···কিন্তু অন্তরের কোথা থেকে যেন হাহাকার শুনতে পাই।

···কেন জানি খুবই ক্ষুণ্ণ মনে সে দিন রাত্রে—চিত্রার আড্ডায় উপস্থিত হলাম। মল্লিকদা হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন···আমায় দেখে বলেন—'ঘরে গিয়ে বোস—আমি আসছি এখুনি।'

মল্লিকদার ঘবে গিয়ে বসলাম···প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকদা এসে ঢুকে বলেন দাঁড়া—আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক···উঃ, কী খাটনীটাই না আজ সারাদিন গেছে। তাছাড়া....এইতো সবে 'সাহেব'কে ছেড়ে দিয়ে ওপরে উঠছি এমন সময তুই এলি।

আমি বলি মিঃ সরকার আজ এতক্ষণ এখানে ছিলেন···ব্যাপার কি?

মল্লিকদা বলেন—উনি কি আর ছিলেন—আমিই বরং নানা কথায় ধবে রেখেছিলাম।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে···চাযে চুমুক দিয়ে মল্লিকদা বলে ওঠেন—কাল তুই তোর বই নিয়ে স্টুডিওতে চলে আয়—সাহেবকে শুনতে রাজি কবিযেছি··· আজই তুপুরে সুবোধও নাকি সাহেবকে তোর সম্বন্ধে কিছু বলেছিল···সেই রকমই তো সাহেবের মুখে শুনলাম···এনি ওয়ে কাল বেলা ৩টা নাগাদ চলে আসবি—আজই আমি তোকে একটা 'এডমিট স্লিপ' লিখে দিচ্ছি—তুই সেটা গেটে দেখিয়ে ঢুকে গিয়ে, আমি ঘরে থাকি না থাকি, ওখানে বসে থাকবি—বুঝলি?

আমি চুপ করে থাকি। মল্লিকদা বলে যান—তোর গান সাহেবের খুবই ভাল লাগে···বিশেষ করে তোর সাইলেণ্ট ছবিতে আবাহ-সঙ্গীত শুনে খুশী হয়ে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল এ সবই কি তাঁর রচনা··আমি বলেছিলাম—নিশ্চয়ই। তাই বলছিলেন ভদ্রলোক সত্যিই গুণী—তবে একটু রগচটা। শুনে আমি কিন্তু আজ বলেই ফেললাম—হাফেজিও সেদিন খুব অন্যায় করেছে চারখানা পাশ ইস্যু করতে পারলে না কেন—যখন এঁরা বলে গেছেন।

রাত এগারটা বেজে গেছে। লাস্ট ট্রামটাও বুঝি চলে যায়। দুজনে উঠে পড়লাম। মল্লিকদা যাবে কলুটোলার মোড়ে, আমি নামবো ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ির স্টপেজে। নামবার সময় মল্লিকদা স্মরণ করিয়ে দিলেন—নিশ্চয়ই কাল যাবি নইলে আবার সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

বাড়িতে এসে খেয়েদেয়ে রাত দুটো পর্যন্ত মীরাবাই-এর স্ক্রীপ্ট পড়তে থাকি কোথাও যদি কিছু খাঁমতি থাকে তাই দেখে নি। তারপর শুয়ে পড়েও সে চিন্তার শেষ নেই···কখন অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিন সকালে আর কলোম্বিয়ার রিহার্সাল ঘরে গেলাম না। নৃপেন-দাকে একটা ফোন করে জানিয়ে দিলাম।

বেলা দুটোর মধ্যেই বাড়ি থেকে টালিগঞ্জে প্রায় পৌনে তিনটে নাগাদ পৌছলাম। দরজায় পাঠান দাবোয়ান আমায় সেলাম জানিয়ে স্টুডিওর ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো।

স্টুডিও ফ্লোরের পূর্ব গায়ে লম্বা দোতলা বাড়ি। ওপর তলায় নিউ থিয়েটারের হাত লেবোরেটারি—যার সুবোধদাই এখন কর্ণধার। আর নীচের তলার ঘরগুলিতে (উত্তর হতে দক্ষিণে) পর পর সাজঘর, রংঘব, ইলেকট্রিক ডিপার্টমেণ্ট—তারপর মল্লিক মশাই-এর প্রোডাকশন অফিস এবং সর্বশেষ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় রিহার্সাল ঘর।

মল্লিকদা আমায় দেখেই বললেন—এসে গেছিস—পাশের ঘরে গিয়ে বোস আমি আসছি। পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত বড—মেঝেতে সতরঞ্জী চাদর বিছানো, বুঝলাম এটাই রিহার্সাল ঘর। এই ঘবেই বসবে আমার পরীক্ষার আসব। দেখলাম একটি তাকিয়া মাথায় দিয়ে—বুড়োদা অর্থাৎ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মশাই—বিশ্রাম নিচ্ছেন। উনি মৃদু হেসে বলেন—আবে এসো—কি খবর ?

বুড়োদা আমার বড় চেনা লোক তবু আজ স্টুডিওর আবহাওয়ায় তাঁকেও আমার মনে হচ্ছে যেন সুদূর পরাহত এক দুর্লভ ব্যক্তির দর্শন পেলাম। অত্যন্ত সঙ্কোচে বললাম—এমনি।

বুড়োদা বরং সানন্দে জানালেন—অম্‌রা বলছিল যে তুমি নাকি ভাল একটা বই লিখেছো।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি—হ্যাঁ সেইটা শোনাতেই তো আজ এঁরা আমায় ডেকেছেন।

বুড়োদা আমায় উৎসাহিত করতে ওঁর নিজের ধরনের কথাই বললেন—আরে। তা এতো জডভরত হচ্ছো কেন ? ···এ তো আর মেয়ে দেখা নয়··· মানে, তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি নিজেই বিয়ের কনে। জড়তায় আকৃষ্ট হয়ে উঠেছো—আরে অত লজ্জা করলে কি আর ফিল্মলাইনে বই শোনানো হয় ? ···এখানে চটপট চোখে মুখে কথা বলবে—যা নয় তা বা যা নও, তা ফলাও করে রং চড়িয়ে অনর্গল বলে যাবে, তবেই তো মন পাবে গো।

আমি হাসতে থাকি···

এমন সময় ঘরে ঢোকেন একটি ভদ্রলোক—যাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার অদম্য ইচ্ছা ছিল। তাঁর সঙ্গে বুড়োদা পরিচয় করিয়ে বলেন—'এ আমাদের হীরেন বসু আর ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান শ্রীনীতিন বসু। আগেই বলেছি—ওঁর দাদা হিতেনদার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—ছিল না নীতিন বসুর সঙ্গে। পরিচিত হয়ে বললাম—আমি কিন্তু, বরাবরই আপনার গুণগ্রাহী ভক্ত।

সত্যই আজকের অভিজ্ঞতাতেও আমি অকপটে বলবো যে নীতিনবাবু তার অদম্য চেষ্টায় ফিল্ম-চিত্র-গ্রহণে প্রথম স্তরের কর্মী। আজ বহু সুযোগসুবিধা আধুনিক টেকনিসিয়ানদের হাতের কাছে এসে গেছে—কিন্তু নীতিন বসু নিজে হাতে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেখানে জল বার করেছিলেন—বললে অত্যুক্তি হয় না।

এরপর ঘরে ঢুকলেন স্বয়ং সরকার সাহেব—সঙ্গে মল্লিকদা।

মল্লিকদা বললেন···দেরি করো না হীরেন শুরু করে দাও।

পরীক্ষক চারজনের মুখের দিকে চেয়ে গল্প শোনাতে শুরু করি···গলার স্বরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে···ভয়ে নয়···উদ্বেগে। নীতিন দা দুই ভুরুর মাঝখানের কপালটুকু আঙুলের টিপনীতে চেপে ধরে মাথা নীচু করে শুনে যাচ্ছেন। বুড়োদা আর মল্লিক দা—'হ্যাঁ'-না-বা-বেশ' বলে আমায় উৎসাহিত করছেন আর মিঃ সরকার ওরফে সাহেব···নির্বিকার মুখে চেয়ে আছেন। ভাল মন্দ··· সুখদুঃখের অভিব্যক্তি তাঁর প্রশান্ত মুখে এতটুকু দাগ কাটছে না। পরে বহু বহু সংঘাতের মাঝেও দেখেছি এই শান্ত মানুষটির—ঠিক এই অনুরূপ অভিব্যক্তি। নিউ থিয়েটাস যখন পুড়ে যায় তার মুখে এমনি প্রশান্তি ছিল—সে কথা আমি পরে বলবো।

আমার নিজের পড়ায় আমি নিজেই উত্তেজিত হচ্ছি আবার সম্বিতে ফিরে নজেকে সংযত করছি। গল্প শেষ হলো। বুড়োদা বিনা বাক্যব্যয়ে—ঘর ত্যাগ কিরলেন।

মিঃ সরকার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন। মল্লিকদাও তাঁকে অনুগমন করলেন। শুধু ফরাসে বসে রইলেন নীতিনদা—তিনি মুক্তকণ্ঠে সবার সামনেই ব্যক্ত করেছিলেন—বাঃ সুন্দর লেখা!

নীতিনদাকে নমস্কার জানিয়ে বাইরে এসে মল্লিকদাকে তার ঘরে পেলাম না। একটু ইতস্তত করে বাইরে যাবো বলে পা বাড়ালাম—ভাবলাম অপেক্ষায় বসে থাকলে মান যাবে। বরং রাত্রে নিরালায় মল্লিকদার কাছেই জেনে নেবো।

গেটের দিকে তাই আমার গতি···পেছন থেকে একটি 'বয়' ছুটে এলো—

বাবুজি—আপকো সাহাব বোলাতে হ্যায়। পিছু ফিরে দেখলাম অদূরে গোলঘর···গোলপাতার ছাউনীর নীচে সিমেণ্ট করা বেদীমণ্ডপ···তার মাঝে একটি গোল টেবিল—টেবিলের চারপাশে চারখানি ঠেস্ ও হাতলযুক্ত বেঞ্চি পাতা···সেইখানেই সবাই আমার অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই উঠে গেলেন রইলেন মিঃ সরকার, মল্লিকদা আর আমি। সাহেব অল্পভাষী—আমার দিকে চেয়ে বলেন—আপনার গল্পটি আমার ভাল লেগেছে···এর জন্য আপনার চাহিদা কি জানতে পারি কি ?

মুহূর্তে আমার জয়ের নেশায় আমি অভিভূত হয়ে পড়ি একটু সময় নিয়ে নিজেকে স্থির করে বলি···গল্পের দামের কথা বলছেন···আর ··

শান্ত স্বরে মিঃ সরকার বলেন—আর ডিরেকশন ? হয়তো তাও দিতে পারতেম কিন্তু আপনি সবে মাত্র একখানি নির্বাক ছবির পরিচালনা করেছেন অথচ যা শোনালেন তা এক বিরাট ক্যানভাসের গল্প—তার ওপর আমি হয়ত গল্পটিকে ডবলভারশন ছবিতে রূপায়িত করাব তাই সাহস হচ্ছে না···এবং আপনাকেও সাহস দিতে পারছি না। আমার এখানে দুজন পরিচালক আছেন —শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী আর শ্রীদেবকীকুমার বসু—যাঁকে আপনার পছন্দ তাঁকেই আমি এর পরিচালনার ভার দেবো—বলুন কাকে আপনার পছন্দ।

বিরাট সমস্যা···বুড়োদা আমার বহু পরিচিত···অথচ বুড়োদা এ ধরনের সাবজেক্ট-এ অভ্যস্থ নন। মীরাবাঈ ধর্মপ্রধান ঐতিহাসিক গল্প। ভাবলাম হালফিল ঐতিহাসিক ধর্মকেন্দ্রিক বই—চণ্ডীদাস শ্রীদেবকীকুমারই করেছেন ·· শুধু করেন নি···তার সাফল্য এনেছেন—লোকের মন হরণ করতে পেরেছেন··· তাই ধীর চিন্তা করে বললাম, 'বেশ—তবে দেবকীবাবুই এই বইএর পরিচালনা দিন···তবে গল্প ও সিনারিওতে আমার নাম থাকা চাই।

মিঃ সরকার রাজী হয়ে গেলেন—

এবার দক্ষিণার কথা···আমার দিকে চেয়ে থাকেন মিঃ সরকার।

আমি বলি—কি দেবেন—কি পাবো—তা আমি জানি না—জানতে চেয়ে-ছিলাম যা তা জেনেছি···আর মূল্য একটা যা হোক দেবেন ··এইটুকুই শুনলাম।

মাত্র চারশ টাকায় দশ বছরের কড়ারে আমার বই-এর সর্বভাষার সত্ব কিনে নিলেন মিঃ সরকার···এবং এর সঙ্গে লিখে নিলেন যে চিত্রনাট্য—ডায়লগ ছাড়াও গীতিকার—দরকার হলে সুরকার হিসাবেও আমার ওদের দুই পরিচালককে সহায়তা করতে হবে।

তবু মন সায় দিল—জয়ী হয়েছিস তো?…একটু চুপ থেকে বলি—এসেছিলাম পরিচালক হতে…কিন্তু—

কথা শেষ করতে দিলেন না সাহেব—শুধু স্মিত হেসে বললেন—'এ ছবিখানার সঙ্গে যুক্ত থেকে একটু দেখে শুনে নিন না—তারপর ওবিষয় আপনার সুযোগ করে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

যেদিন এই কথানুযায়ী মিঃ সরকারের পাকাপাকি চিঠি পেলাম সেদিনের তারিখটা আজও আমার মনে আছে…১৮ই এপ্রিল ১৯৩৩।

এই সময় মিঃ সরকার আনোয়ার শা রোডে একটি বাড়ি ভাড়া করে নিউ থিয়েটারের বি-ইউনিট খোলেন—পরে ওখানকার প্রতিনিধি হয়েছিলেন—শ্রীযতীন মিত্র মশাই·· নিউ থিয়েটার্সের বিখ্যাত ছোটাইদা।

বেঙ্গল ১৯৫৩ ছবির পর মিঃ বড়ুয়া তাঁর টকী স্টুডিও বন্ধ করে দেন এবং সেই স্টুডিওকে নিউ থিয়েটার্সের হেফাজতে ভাড়া হিসাবে দিয়ে নিজে এসে নিউ থিয়েটারে ঢুকে পড়েন।

এবং মিঃ বড়ুয়াও নিউ থিয়েটার্স ১নংএ যোগ দিয়ে বই শুরু করেন ডবল ভাবসনে—মহব্বৎ কি কসৌটি ও রূপলেখা। মিঃ কে এল সাইগল নিউ থিয়েটার্সে পূরণ ভকতের সময় যোগ দেন—ছবিখানি তখন শেষ পর্যায়—তাই একটি ভজন গেয়েছিলেন মাত্র ঐ ছবিতে, কিন্তু মিঃ বড়ুয়ার ডবল ভারসন মহব্বৎ কি কসৌটিতে বোধকরি প্রথম হিরোর অভিনয় করেন। এবং বাংলা রূপলেখার হিরো ছিলেন মিঃ বড়ুয়া আর হিরোইন—শ্রীমতী উমাশশী।

মীরাবাঈ-এর স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়ে দেবকী বসু আমাকে প্রথমেই অনুরোধ করেন যে, আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল গানখানি আমার চাই-ই চাই। কলোম্বিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি হয়ে আঁখিতে রহগো নন্দদুলাল মীরাবাঈ ছবিতে গাওয়া হয়। গেয়েছিলেন—মিঃ পাহাড়ী সান্যাল নেচেছিলেন তাঁর সঙ্গে সুনন্দার ভূমিকায় মিস মলিনা দেবি।

যাই হোক—ডবল ভারসন মীরাবাঈ-এর কাস্টিং হলো—হিন্দী রাণাকুম্ভের ভূমিকায়—পৃথ্বিরাজ (সে সময় তিনি সেকপিরিয়েন ড্রামা করে ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন)। মীরাবাঈ—মিসেস দুর্গা খোটে (উনি তখন মিঃ শান্তারাম পরিচালিত হরিশ্চন্দ্র-শৈব্যার অভিনয়ে নাম করেছিলেন)। লালবাঈ-এর ভূমিকায় (রাণার বোন) ছিলেন—মিস নাসির—পরে বদল হয়ে করেছিলেন খুব সম্ভব রতনবাঈ—সেই সময় বুড়োদার ইহুদী কা লেড়কীর হিরোইন (ঠিক

মনে নেই ভুল হলে অপরাধ নেবেন না—কারণ মীরাবাঈএর শেষ শুটিংগুলি আমার ভাগ্যে দেখা হয়ে জোটে নি—কেন জোটেনি পরে বলছি)। অভিরাম সিংহ—শ্রীঅমর মল্লিক। মীরার ভক্ত পরিবার চাঁদভট্ট ও তার স্ত্রী সুনন্দা—শ্রীপাহাড়ী সান্যাল (নবাগত) ও মলিনা দেবী। এবং চারণীর ভূমিকায়—শ্রীমতী ইন্দুবালা।

বাংলায়, রাণা—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা—চন্দ্রবতী দেবী (নবাগতা)। (পূর্বে তিনি নির্বাক চিত্র পিয়ারীতে হিরোইনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন) লালবাঈ—শ্রীমতী নিভাননী দেবী, চাঁদভট্ট—সুনন্দা ও অভিরাম সিংহ ও চারণী একই অভিনেতারা উভয় ভারসনে অভিনয় কবেন।

হিন্দী অনুবাদ করেছিলেন—পণ্ডিত নরোত্তম দাস। গীতকার—মীরার ভজন ও আমি। সুরকার—আমার লিখিত গানে—আমি। বাকী সঙ্গীত পরিচালক—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। ফটোগ্রাফার—শ্রীনীতিন বসু।

এখানে বলে রাখি—এই সময় নিউ থিয়েটার্সের দুখানি বই হচ্ছিল একই সঙ্গে—ইহুদী কা লেড়কী—পরিচালক শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ক্যামেরায়—শ্রীনীতিন বসু এবং মীরাবাঈ ও রাজরাণী মীরা ক্যামেরায় শ্রীনীতিন বসু। একই সঙ্গে এ দুখানি চিত্রের ফটোগ্রাফীতে ছবি অনুযায়ী যে মুড সৃষ্টি তিনি কবেছিলেন তা অবিস্মরণীয়।

ঠিক হলো বি-ইউনিটে ছবির রিহার্সাল ও অফিস হবে আনোয়ার শা রোডের নূতন বাড়িতে—বড়ুয়া স্টুডিওতে তার সুটিং হবে, আর ইহুদি কা লেড়কী চলবে 'এ' ইউনিটে। এ ইউনিটে তখন আবার শ্রীধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডিজি)ব একসকিউজ মি সার, হাসির সুটিং চলেছিলো। হিবো ডিজি স্বয়ং ও হিরোইন —শ্রীমতী ইন্দুবালা।

রিহার্সালে আমাকে শেখাবার ভার দেওয়া হয় চন্দ্রাবতী দেবীকে আব মলিনা দেবীর অাঁখিতে রহগো নন্দদুলালের নৃত্যাংশটুকু, কারণ আমি নিজে নাচ জানতাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথজী (কালকাবিন্দের ঘরাণা) ছিলেন আমার নাচের গুরু। আমার সুর যোজনার গানগুলি আর্টিস্টদের তুলে দেওয়াও আমার কাজ (মায় শ্রীমতী ইন্দুবালার গানগুলি পর্যন্ত) তাই এগুলি নিয়ে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতাম। অন্যান্য বিষয় আমি যদি দেবকী বাবুর সঙ্গে আলোচনা করবার চেষ্টা করতাম তা তিনি এড়িয়ে যেতেন কারণ আমার লেখা সিনারীও তিনি বদলে স্টেজের অভিনীত বই মীরাবাঈ যা শ্রীবসন্ত চাটার্জির

লেখা—তা অবলম্বনে বহু অদল-বদল করেছিলেন যা আমার মনোনীত মোটেই হয় নি।

বড়ুয়া স্টুডিও স্যুটিং-এর সময়ও মিঃ সরকার এসে চুপটি করে ফ্লোরে বসে থাকতেন। যা কিছু ঘটত তা তিনি দেখতেন লক্ষ্য করতেন কিন্তু কথা কইতেন না।

গান-নাচ-এই সব নিয়ে যখন আমি খুবই ব্যস্ত তখন একটা ঘটনা ঘটে গেল যা আমার কল্পনাতীত।

আমি মলিনা দেবীকে নাচ শেখাচ্ছি বলবো না বলব শেখাতে সাহায্য করছি (কারণ মলিনা নিজেও ভাল নাচিয়ে ছিল) তখন হঠাৎ এক টুকরো কাগজ আমাকে সাহেবের বয় এসে দিল। আমি দেখলাম—তিনি লিখেছেন—কাজের অবসর থাকলে একটু আসবেন।

আমি তাড়াতাড়ি ওঁর ঘরে এসে দাঁড়ালাম।

ওঁর ঘরখানির মাঝে গালিচা পাতা। একটি পূর্ণাঙ্গ সোফাসেট লাগানো —যার একখানি সিঙ্গল চেয়ারে মিঃ সরকার বসে আছেন। দেবকীবাবু সোফার উপর এবং নীতিনবাবু নীচের গালিচার ওপর আঙ্গুল দিয়ে ভ্রূটিপে ওর নিজের পদ্ধতিতে বসে।

আমি ঘরে ঢুকে ঐ অবস্থায় সবাইকে দেখে মিঃ সরকারকে বলি—আপনি আমাকে ডেকেছেন মিঃ সরকার?

নীতিনবাবু হঠাৎ মাথা তুলে বলে ওঠেন এই যে তুমি এসে গিয়েছো—আচ্ছা আজকে যদি তোমাকে তোমার বইখানি ডাইরেক্ট করতে দেওয়া হতে তাহলে তুমি যে বৃষ্টির সিনগুলোতে মীরা চাঁদভট্টের গান দিয়েছ—কি মনে পড়ছে তো…

আমি বলি হ্যাঁ।

উনি বলেন—ওই সিনগুলো কিভাবে ডাইরেক্ট করতে?

আমি বলি—ওগুলো তো প্রায় হাল্কা জঙ্গলের সিন যাকে বলা যায় বনপথ। তা আমি স্টুডিওর কর্ণারে অমন গাছপালা লাগিয়ে ওপরে থেকে বালতি দিয়ে বৃষ্টির অবতারণা করে খুব জোরে বাতাস চালনা করে—এক এক করে তুলে নিতাম। যাকে আপনারা বলেন কাট টু কাট শট তুলে দুজনকেই বৃষ্টির মাঝে পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে বেড়াতে দেখাতাম—গানেরও তো সেই রকম সুর হয়েছে—যাতে কেটে কেটে নেওয়া যায়—তারপর একটা বড় ফিক্সে বৃষ্টি ঝড়ের মাঝে ওদের দুজনের দেখা হয়ে গেল দেখাতাম।

উনি উদ্দীপ্ত হয়ে বলেন দ্যাটস দ্যাট।

দেবকীবাবু হঠাৎ তাঁর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—দেন লেট হীরেন ডিরেক্ট দি পিকচার। তারপর নিমেষে ঘর ছেড়ে চলে যান। ওরা দুজনেই নিশ্চুপ বসে—আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। কিছু জানি না, শুনিনি—শুধু নীতিনদার কথার উত্তরে যে এই পরিস্থিতি হতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মিঃ সরকার নীতিনদাকে বললেন—'আচ্ছা মিঃ বোস, দেবকীবাবু হীরেনবাবুকে স্ট্যাণ্ড করতে পারেন না কেন বলতে পারেন? সেদিন সেটে হীরেনবাবু আপনার ক্যামেরায় অ্যাংগেল অনুযায়ী সেট সাজাতে টেবিলে রাখা স্ক্রিপটা দেখতে যাবেন—এমন সময় দেবকীবাবু ওঁর হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ইউ ফুল। হু টোল্ড ইউ টু টাচ মাই স্ক্রিপট। হীরেনবাবু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটা কথাও উচ্চারণ করে জবাব দেননি তাই আমি থাকতে না পেরে বাচ্চুকে দিয়ে হীরেনবাবুকে কাছে ডাকিয়ে বলেছিলাম—কাজের সময় হয়তো ইরিটেটেড আছেন—তাই অমন বলে ফেলেছেন—আপনি কিছু মনে করবেন না—হীরেনবাবু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, না মিঃ সরকার আমি আপনাকে কথা দিয়েছি আমি পরিচালকদের সহায়তা করব। আজকার ব্যাপার দেখে মনে হলো—উনি তো হীরেনবাবুকে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। নীতিনবাবু মৃদু হেসে জবাব দেন—কি জানেন মিঃ সরকার 'এ রুম ক্যান বি প্রোভাইডেড ইনটু এ হাউস—বাট এ হাউস ক্যান নট বি প্রোভাইডেড ইনটু এ হাউস।'

এঁদের সব কথাগুলিই আমার স্বপক্ষে তবু কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই বললাম—আমি এবার যেতে পারি—

মিঃ সরকার বলেন—আসুন।

মলিনা দেবীর নাচখানির রিহার্সাল শেষ হয়েছে সবে—এমন সময় মিঃ সরকারের আরও একটি চিঠি······বিকেলে সময় থাকলে আপনি একবার আমার বাড়িতে দেখা করবেন—ঠিকানা কি জানেন—৩৬।১, এলগিন রোড।

আমি চিঠি নিয়ে পকেটে রেখে চা খেতে খেতে রিহার্সাল শেষ করে বাড়ির দিকে রওন দি—

বাড়ি নয়—এলগিন রোডের দিকে।

'এলগিন রোডের বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন ঠিক ছটা। দেখলাম একটি'

লম্বা হলে দাঁড়িয়ে সবাই বিলিয়র্ড খেলছেন—বুড়োদা, মিঃ বেগ (ভারতের খুব বড় বিলিয়ার্ড খেলোয়ার) হাফেজি সাহেব আর নীতিন বোস। মিঃ সরকার ভেতরে আছেন···আমি এলে বসতে বলেছেন। মিঃ হাফেজি বললেন, এই যে হীরেনবাবু কি খবর, ভাল তো? জিত আপনারই হলো—আমি হারলাম—কিন্তু, দুঃখ নেই, কারণ সেদিন ভুল আমিই করেছিলাম। আমি হেসে বলি—সে তো যখন আমাকে নেওযা হলো তখনই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

মিঃ হাফেজি এখন আব চিত্রার ম্যানেজার নন—স্টুডিওর ম্যানেজার।

মিঃ সরকার নীচে নেমেই—তাঁর নীচেরতলার ঘবে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি গিয়ে বসতেই বললেন—নতুন কিছু লিখলেন নাকি?

আমি বলি—বুদ্ধ যুগের একখানি বই—

উনি বলেন—ওটাবও যে 'বিগ ক্যানভাস' হয়ে যাচ্ছে, অন্য কোন বই—

আমি বলি—আমার লেখা আর কিছু নেই।

উনি বলেন—মিউজিক্যাল প্রোবেবলিটিস যাতে আছে, এমন বই-এর নাম কিছু আপনার মনে আসে।

আমি বলি—একখানা বই আমাদের বাংলাদেশের বহু পরিচিত—সেটা হচ্ছে 'মহুয়া'—মন্মথ রায়েব মহুয়া যা স্টেজে হচ্ছিল—তা আপনি দেখেছিলেন কি?

উনি বলেন—না। বেশ তো কাল বইখানা কিনে আনুন। এখানে বেলা তিনটার সময় আসবেন।

আমি বলি—স্টুডিও যাবো না?

উনি বলেন—না, আর আপনাকে মীরাবাঈ-এর সেটে যেতে হবে না, আপনি নিজে বই শুরু করবেন—তার জন্যেই বই চাইছি।

আমি মহুয়া নিয়ে এখানেই বেলা তিনটেতে পৌছে যাবো বলে উঠে পড়লাম। উনি বলেন—অনেকক্ষণ তো কিছু খান নি—খাবার আনছে খেয়ে যাবেন। আমি চলি—কাজ আছে। তবে না খেয়ে যাবেন না। বলে বেরিয়ে যান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাকর এসে আমায় এক প্লেট খাবার ধরিয়ে গেল। আমি তার যথাযথ সদব্যবহার করে ঘরে ফিরে আসি।

তারপর দিন যথাকালে মিঃ সরকারকে মহুয়া বই দিয়ে আসি। উনি বললেন—দুদিন আপনি স্টুডিওতে যাবেন না···আমি বইটা পড়ে নিয়ে আপনাকে মল্লিককে দিয়ে জানাবো।

আমার ১৯৩৩-এর শেষার্ধের রেকর্ডেও বার হয়ে গেছে বাজারে। এবারও

আমার শিখানো আর্টিস্টরা আমার মান বজায় রাখতে পেরেছে। রানী গেয়েছিল —'গাইবে যদি বসন্ত গান আজকে রাতে'। স্নেহলতা গেয়েছিল—'ওলো বকুল মঞ্জরী', ও 'মধু বনে বেণু বাজে রে'। এবারে ভজনডুয়েট ছিল আমার সঙ্গে শ্রীমতী ফুল্লনলিনীর—'দেবকীনন্দন কংস নিসূদন ও হৃদয় শ্রীবৃন্দাবনে'—এ রেকর্ডও জমে উঠেছে তবে এ 'শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারীর' মত নয়। তাছাড়া নতুন গায়ক গায়িকার মধ্যে ছিল—শ্রীমতী আশলতা (নুরী)—হোলির গান গেয়েছিল—ছাড় ছাড় অঞ্চল চঞ্চল কালা—ও লালিয়া ধীরে-ধীরে লো ছিটাও —জমে গেছে। শ্রীমতী লীলাবতী (ফকস) এর বাংলা ঠুংরী এত জমেনি। তবে শ্রীসুশীলবাবুর হোলির গান জমে উঠেছে শুনলাম—মম কৃষ্ণ মুরারী এলো এলোরে, ও রঙের খেলা খেলছে ব্রজরায়, প্রফুল্লবালা, পারুলবালা বাজারে প্রথম এসেও মন্দ করছে না। আমার নিজের গান—'জাগো নারী, দুঃখ দৈন্য, তাপ ধর্ষিতা ও বাংলাদেশের মা জননী' ঘরে ঘরে আসন পাতবে বলে মনে হচ্ছে। এ্যামেচার আর্টিস্টের মধ্যে নূতন শিল্পী নীলিমা বসুর রেকর্ড ক্যানটারও করছে— এই সমস্ত খবর কলম্বিয়ায় পা দিয়াই শুনলাম। কুমারী নীলিমা বসুর বয়স মাত্র ১৪ বছর, কিন্তু, তার গায়কী গান শোনার মত ছিল। দুখানি গান গেয়েছিল—'ওহে বিশ্বরূপ' ও 'চেতনা ধ্বনিও জগতের চিতে'—যা শ্রোতাদের সত্যি বিমুগ্ধ করেছিলো।

কলোম্বিয়া ক্লাব থেকে বেরিয়ে আজ দুদিন পরে চিত্রায় গিয়ে হাজির হলাম। আমায় দেখেই মল্লিক মশাই বলেন—এসে গেছো ভালই হয়েছে—নইলে আবার তোমার বাড়িতে হয়ত বাণীকে পাঠাতে হোতো। শোনো কাল থেকে স্টুডিও যাবে—নম্বর ওয়ানে, সেখানে তোমার ঘর ঠিক করে দিয়েছি···তোমার এসিস্‌টেণ্ট হিসাবে এখন কাজ করবে মিঃ বড়ুয়ার এসিসটেণ্ট শ্রীফণী মজুমদার—ও বেশ টাইফ-ফাইপ করে দিতে পারবে। চানী দত্ত থাকবে তোমার আর্টিস্ট সংগ্রহে। বুঝলে হে সাহেবের মহুয়া বই পছন্দ হয়ে গ্যাছে। তুমি এক কাজ কর— শ্রীমন্মথ রায়ের সঙ্গে জানাশুনো আছে? যদি থাকে তাহলে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেবে।

আমি হেসে বলি ডিরেক্টারী পদে অধিরূঢ় হয়েছি বলে আজ বুঝি আমাকে তুই থেকে তুমি ধরেছো। তা ভাল এসো তোমাকে একটি প্রণাম করি।

এই কি করছিস—থাম···থাম। আয় বোস অনেক কথা আছে। ওর ঘরে বসে পড়লাম।

শ্রীচানী দত্ত মহাশয়ের কিছুটা পরিচয় দি···ইনি নিজে সু অভিনেতা এবং পূর্ণ থিয়েটারে যখন শ্রীপুলিন অর্ণব আয়োজিত থিয়েটার হোতো, তখন সর্বজন প্রিয় এই মানুষটিই শ্রীমতী উমাশশীকে নিউ থিয়েটারে দাখিল করেছিলেন। ইনি এখন এখানকার প্রোডাকশন ম্যানেজার মিঃ মল্লিকের ডান হাত। এঁর ভাগ্নেই নিউ থিয়েটারের বিখ্যাত কচি মিত্র অর্থাৎ সুবোধ মিত্র মহাশয়—যিনি বহু চিত্রেরও আজ পরিচালক হয়ে নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছেন। চানী দত্তকে স্টুডিওর সবাই চানীদা বলেই ডাকতেন—আমি আজ পযন্ত ওঁর অন্য নাম জানি না।

ঘুরে এসেই মল্লিকদা বললেন—যাক তোর গোঁই বজায় রইল শেষ পর্যন্ত।

আমি বলি—তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বল।

মল্লিকদা বলেন—নারে না···পুরুষস্য ভাগ্য। তাছাড়া···এটাই ভাল হ'লো—তোর ইউনিট ঠিক করে নিয়ে তুই কাজ করে চল। কাকে ক্যামেরাতে নিবি।

আমি বলি—নীতিনদার সময় নেই—তাই ভাবছি সুবোধদাকেই নেবো।

মল্লিকদা বলেন—আমি ভেবেছিলাম ইয়ুসুফকে তোর সঙ্গে লাগিয়ে দেব···নীতিনের অ্যাসিসটেণ্ট। তবে সুবোধকেই নে···ও-ও তোর জন্যে সত্যিই ফাইট করেছে।

তার পর বলেন—মিউজিকে কাকে নিবি ?

আমি হেসে বললাম—যদি নিজে করি ?

মল্লিকদা বলে—সে তোমার খুশী।

দেখলাম মল্লিকদার মুখটা যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

বাংলা দেশের সবাক চিত্রে 'মহুয়া' ছবিটিই হচ্ছে সর্বপ্রথম জঙ্গল ছবি। এই ছবিতে কমপক্ষে দশ হাজার আদিবাসী পাহাড়িয়ার নাচের মাঝে যোড়শী মহুয়ার নাচ দর্শকবৃন্দকে হতবাক করেছিল। 'মহুয়া' মৈমনসিন গীতিকার একটি প্রাচীনতম লোকসঙ্গীত—উপাখ্যান যা আজ ক্লাসিকের পর্যায় স্থান পেয়েছে। যার মধ্যে বর্ণিত আছে অজগরপূর্ণ গহন জঙ্গল, পাহাড়, গুহা···তরঙ্গিত কুমীর সঙ্কুল ভয়াবহ নদনদী··গারো পাহাড়ের হিংস্র বেদের নৃশংস কাহিনী এক পরমপ্রেমের অফুরন্ত বাখানী।

গারো পাহাড়ের দস্যু-সর্দার হুমড়ো বেদে (শ্রীঅহীন চৌধুরী) আর তার সাঙ্গপাঙ্গ সুজন (শ্রীভূমেন রায়), মানকে (বোকেন চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে ব্রাহ্মণের শিশু কন্যাকে কেন্দ্র করে-তাকে ভানুমতীর খেল দেখাবার সুযোগ

করে তুলেছিল—সেই হচ্ছে 'মহুয়া' (শ্রীমতী মলিনা দেবী)—এবং তার সখি পালংকে (শ্রীমতি ফুল্লনলিনী)।

সাতখানি বড় বাচে…তোতা, ময়না, টিয়া—ঘোড়া, গাধা, কুকুর…রাও চণ্ডালের হাড়-ভোজের বাজী, সামগ্রী ভর্তি করে একশ দাঁড়ে গান তুলে এগিয়ে আসচে বামনকান্দার রাজা 'নদের চাঁদের' (দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) রাজমহলে —খেলা দেখাতে—

"হেঁইয়া—হো-হো—হঁইয়ো।
লা চালাইয়া চলো ভেইয়া ‥মহুয়া মহুয়া—
আইল রে মাইয়া মোদেল। (মোদের)
আই—আই। দিখবি আই রে
ধমকে মাদোল, নাচনী ঠমকে—ঝুনঝুনিয়া—
দিখবি আইরে ভানমতী খেল।"
(গীতিকার, সুরকাব : হীরেন বসু)

"তীরে ছোটে ল্যাংড়া মহেন্ (চানী দত্ত)
নদের চাঁদের ভাঁড়।
হুমড়া দেইখ্যা হুম্‌রি খাইয়া
সভায় দিল সাড়॥"

খেল দেখাবার কালে হুমড়ো বলে উঠে—

"সামাল সুজল-সামাল মাইন্‌কে-সামাল।
চারি চক্ষের মিলন হইলে
অইব সব বেসামাল॥"

খেলা সাঙ্গ কয়ে মহুয়া বলে—'বাজী করলাম
তামসা করলাম ইনামবক্‌শিষ চাই।
মনে বলে যে নথ্যার ঠাকুর
—মন যেন তোর পাই॥"

নিমন্ত্রণ পেয়ে ল্যাংড়া মহেন্দ্রকে নিয়ে নদীর খরস্রোতে নৌকা ভাসায়— ….. নদের চাঁদ…ওপারে মোহনা দ্বীপে—পাড়ি দেয় অন্তরীপে। মকর কুম্ভীর পিছে ধায়।

ছবিতে ল্যাংড়া মহেন্দ্রকে জলজ্যান্ত কুমীরে টেনে নিয়ে যায়।…নদের চাঁদকে পাহাড়ী গুহার অন্তরালে লুকিয়ে ফেরে মহুয়া। পাহাড়ী গুহার ফাটলে ফাটলে নেমেছে অশত্থের ঝুরি—যার গা বেয়ে জড়িয়ে থাকে অসংখ্য সাপ। নদের চাঁদের অন্তর কেঁপে ওঠে। মহুয়া বলে—ভয় কি ঠাকুর আমি বেদের মেয়ে।

প্রথম মুহূরৎ শটে শুরু হলো এমনি এক দৃশ্য···গুহামধ্যে নদের চাঁদ ঘুমে অচেতন···বাইরে বেরিয়ে মহুয়া অনুসন্ধান করে বেদে শিকারী কুকুরের দল পিছু নিয়েছে কিনা। এই অবসরে ভয়াল কাল গোখরো নেমে আসে অশত্থ ঝুরী বেয়ে···নদের চাঁদের বুকের ওপর দিয়ে তার পথ করে নেয়। গুহায় ঢুকতে গিয়ে মহুয়ার দৃষ্টি পড়ে—এই দিকে। নিঃশব্দে অপেক্ষা করে—সাপটিকে নদের চাঁদেব বুক থেকে নেমে আসার সময়টুকু পর্যন্ত, তারপর কোমরের কুকুরী হাতে নিয়ে নিশানা করে ছুঁড়ে দেয় সেটিকে।—অব্যর্থ লক্ষ্য···সাপের মাথাটা ফুঁড়ে কুক্‌রী মাটিতে গেঁথে যায়।···মিঃ সরকার দাঁড়িয়ে দেখছিলেন—বললেন প্রথম দিনেই হত্যাকাণ্ড দিয়ে আবম্ভ করলেন?

যেদিন চিত্র-নাট্য, সুরকার, গীতিকার, পরিচালনা—সবকটাব ভারই শ্রী সরকার আমার হাতে নিশ্চিন্ত মনে তুলে দিলেন সেদিন বুঝেছিলাম পূর্বে থেকেই আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল···আমার সুর-সৃষ্টি তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছিল। সহকারীবৃন্দের মধ্যে তিনি এমন কি শ্রীহেমচন্দ্র চন্দ্রকে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি···কিন্তু সেই সময় উর্দু লেখক ও নাট্যকার আগা হাসান সাহেব শুরু করেছিলেন 'সোরাব-রুস্তাম' ছবি। যার হিরোইন হয়েছিলেন বেগম মুকতার বাঈ। ফিল্ম টেকনিক সম্বন্ধে আগা সাহেব ওয়াকিবহাল ছিলেন না বলে তিনি হেমচন্দ্রকে ওই প্রোডাকশনের পরে যুক্ত করে দেন। আমার সহকারীবৃন্দের মধ্যে সবাই ফিল্ম জগতে নাম করেছিলেন—প্রথম শ্রীফণী মজুমদার (যাঁর অ্যাসিসট্যাণ্ট ছিলেন শ্রীশক্তি সামন্ত) দ্বিতীয় শ্রীবিনয় চাটুজ্যে (আজকের যুগের অদ্বিতীয় স্ক্রিপ্ট রাইটার), আর সঙ্গীত সহকারী ছিলেন অনুপম ঘটক। আমিই অবশ্য অনুপমকে ফিল্মীজগতে ডেকে এনেছিলাম। ওর সঙ্গে আমাব পরিচয় ঘটে—একটি গানের আসরে। আসর বসেছিল স্যার রমেশ মিত্র মহাশয়ের নাতি শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে। গোপাল ছিল আমার আপন ভাগ্নে। অনুপমের গান শুনে তাকে আমি বলেছিলাম—কি ফিল্মে নামবার ইচ্ছা আছে? (অবশ্য সঙ্গীত-সহকারী হিসাবে)। ওর মুখ খুশীতে ভরে ওঠে···। তারপর দিন থেকে ও হলো আমার সঙ্গীত সহকারী।

উত্তাল নদীর বুকে কুমীরের পেছু ছুটে ফোটো নেওয়ার বিপত্তি, ভয়সঙ্কুল পাহাড়-অরণ্যে ঘোরাঘুরির বিবৃতি বা পাহাড়তলীর বন্য উৎসবের ছবি তোলার কঠিন অভিজ্ঞতার কথা পাতায় পাতায় দিয়ে আমি আমার চিত্র জগতের

অগ্রগতিকে ব্যহত করতে চাই না। প্রয়োজন হয় ওসব অভিজ্ঞতার ইতিকথা আবার শোনাব কিন্তু, এখন স্থগিত রাখতে বাধ্য হচ্ছি।

কলোম্বিয়া রেকর্ডিং-এর কাজও ইতিমধ্যে শেষ করে দিয়েছিলাম—এবার আমাদের পুরানো শিল্পীর গানের সঙ্গে—আরও যাঁদের ভাষণ রেকর্ড করে নেওয়া হলো তাঁরা হচ্ছেন ভারত বিখ্যাত নেতা। ইসলাম জগতের উদ্দেশ্যে মহামান্য আগা খাঁর বাণী। মহাত্মা গান্ধীজির হৃদয়স্পর্শী আবেদন এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপদেশবাণী। শ্রীমতি সরোজিনী নাইডুর ইংরাজি আবৃত্তিও এই সিজন-এ রেকর্ড করা হলো। কাজেই কলোম্বিয়ার সব কর্মীদেরই বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হলো।

ঘন বনস্পতি ঘেরা গহীন জঙ্গলের কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করতে করতে আমাদের কেটে গেল ১৯৩৩ সাল। ১৯৩৩-এর শেষ বা ১৯৩৪ সালের প্রথমার্ধেই আমার মীরাবাঈ শ্রীদেবকীবাবুর পরিচালনায় ও শ্রীরাই চাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় বাজারে বার হলো। গীতিকার হিসাবে চিত্রজগতে এই ছবিতে আমি প্রতিষ্ঠা পাই…যদিও জোর বরাত ঋষির প্রেম ছবি থেকেই আমি গীতিকার ও সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করেছি ও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। (মীরাবাঈ ছবির হিন্দী রাজরাণী মীরার রিলিজের পূর্বে বাংলা মীরাবাঈ রিলিজ হয়েছিল…এবং সর্বজন সমাদৃত হয়েছিল)। নবশক্তি, দীপালি, খেয়ালি, সব কাগজেই অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে এর গীত-গুলিকে অভিনন্দিত করেছিল। মনে রাখবেন তখনকার ছবির গানগুলি রেকর্ডে বার হোতো না....। মীরাবাঈ-এর মাত্র 'আমার আঁখিতে বহোগো নন্দদুলাল' গানখানি পরে শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল মশাই রেকর্ড করেছিলেন (এর আগে এইখানি রাণুদেবী রেকর্ড কবেছিলেন কলোম্বিয়া রেকর্ড।) কাজেই আমার চিত্রে লেখা কোন গানই এর পূর্বে ডিস্ক বেকর্ডে বার হয় নি।

মীরাবাঈ-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জনের খবর কানে এলেও আমি এ ছ'বি দেখতে কোনদিনই যাইনি তার কারণ মীরাবাঈ-এব চিতোর ত্যাগ উপাখ্যানে দেবকীবাবুর ছবিতে এনেছিলেন মীরাবাঈ প্রতিষ্ঠিত মন্দির রাণাকুম্ভ কামান দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। যা—কালাপাহাড় ব্যতীত কোন হিন্দু এভাবে করতে পারেন বলিয়া আমি মনে করি না। ইতিহাসেও পাই না অথচ…আমার স্ক্রিপ্ট ছিল রাণা, মীরার ওপর সন্দেহে যখন 'দূর হও কুলটা-স্বৈরিণী' কথা উচ্চারণ করলেন তখন মীরা স্বচক্ষে যেন দেখলেন—এক বিদ্যুৎ ঝলক গিরিধারী-

লালের বিগ্রহ থেকে ছিটুকে বার হয়ে আকাশপথে বিলীন হয়ে গেলো—মীরা তারস্বরে কেঁদে উঠে বলেন—গিরিধারীলাল রাণা আমায় মন্দ বলেছেন—তোমায় নয়—তুমি কেন মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছো। পাগলিনীর মতো মীরা মন্দিরকক্ষ ত্যাগ করেন এবং সেই সঙ্গে বজ্রাঘাত এসে লাগে মন্দির চূড়ায় এবং তার কতকাংশকে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। আজও চিতোর গড়ের মীরার মন্দির পরিদর্শন করলে দেখবেন মন্দিরের একাংশ বজ্রাঘাতে ভগ্ন। এই নিয়ে দেবকী বসুর সঙ্গে মতান্তর ঘটে, যার জন্যে শ্রীসরকার আমায় সরিয়ে নিয়ে স্বাতন্ত্র্যতা দিয়েছিলেন। ছবির পর্দায় আমার এগ্রিমেণ্ট অনুযায়ী সিনারি ও গল্পাংশে নাম থাকায় এ সবের কৈফিয়ৎ দর্শকদের কাছে আমাকেই দিতে হবে মনে করে আমি এ ছবি কোনদিন দেখিনি।

মহুয়ার আউটডোরের বনবাস ছেড়ে যেদিন আমি কলকাতায় এসে পৌছলাম সেইদিনই রেডিওতে গিয়ে শুনলাম যে সামনের ২রা আশ্বিন তারিখে শ্রীশরৎচন্দ্রের রৌপ্য জয়ন্তীর অভিনন্দন উৎসব ঘটতে চলেছে—কলিকাতা টাউন হলে।

কথাটা শুনেই মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে…এইদিনে বেতার থেকে কিছু করলে কেমন হয়? বাড়িতে এসে…ঠিক করলাম যে বেতার নাটুকে দল থেকে ওঁর একটা নাটক করলে কেমন হয়?…পাড়ায় থিয়েটার করব বলে তখন আমি শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দিচ্ছিলাম। স্থির করলাম এই নাটকেই রচনা করবো এক 'শরৎ-শর্বরী'…ওঁর রৌপ্যজয়ন্তীর গৌরবে।

বেহালার রায় বাড়িতে তিনি এই উপলক্ষে একবার আসছেন…কাল কিংবা পরশু। বেহালায় রায় পরিবারের 'অমর রায় থেকে মণি রায়' পর্যন্ত সবার সঙ্গেই আমার জানাশুনা তাই যথাসময় হাজির হলাম সেখানে তিনদিন পরে। সেদিন রবিবার শুনলাম শরৎচন্দ্র গতকালই এখানে এসে গেছেন। মণিবাবু আমার কথা শুনে তখনই শ্রীশরৎচন্দ্রের সামনে আমায় নিয়ে উপস্থিত করলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি শ্রীশরৎচন্দ্রের সঙ্গে পূর্বেই আমি পরিচিত যা আমার জাতিস্মরের শিল্পলোকে লিখে গেছি।

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—'এই যে হীরেন তোমাদের বেতার নাটুকে দলের খবর কি? পানিত্রাসে বসে তোমাদের সব নাটকই শুনি—শুধু কি তাই, গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে নাটক শুনতে।

আমি পায়ের ধুলো নিয়ে বলি—'আপনার বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসটির নাট্যাকৃতি দিয়েছি অভিনয় করবো বলে—তাই অনুমতি অপেক্ষায়।

শরৎদা বলেন—কবে করবে ?

আমি বলি—২রা আশ্বিন 'শরৎ-শর্বরী' উৎযাপন করবো। কাজেই আমরা বেতার কেন্দ্রে এটির অভিনয় করতে চাই এবং আপনাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একবার সময় করে সেখানে উপস্থিত হতে হবে।

শরৎদা গুড়গুড়ি থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে বলেন—ওর চাইবার আগেই ঠিক করে এসেছো কি কি বর নেবে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দুই-ই—চাই ?

আমি হেসে ফেলে বলি—দেবতা যখন তুষ্ট তখন দুটির জায়গায় চারটি বব চাইলেও দেবতা মুখ ফেরাবেন না জানি।

উনি চোখ বুজিয়ে ভেবে নিয়ে বলেন—না বাপু, রাজকন্যে পাবে কিনা জানি না। কারণ সেদিনটা আমি অপরের হাতে পড়ে থাকবো। তারা যেমন প্রোগ্রাম করবে আমায় মেনে চলতে হবে—তাই তোমার বেতারে উপস্থিত হতে পারবো বলে কথা দিচ্ছি না। তবে বৈকুণ্ঠের উইল নাটক নিশ্চয়ই করবে।

আমি নাট্যলিপি হাতে তুলে দিয়ে বলি—আপনাকে অনুমোদন করে দিতে হবে। শরৎদা হাত থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে তার ওপর লিখে দিলেন—আমি অনুমতি দিলাম ইতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আমি বলি পড়া হলো না যে—

শরৎদা হেসে উত্তর দেন—সেদিন তোমার মীরাবাঈ নাটকে রাণা কুম্ভের ভূমিকা শুনলাম। কখন কখন তুমি শিশিরকেও অতিক্রম করে যাচ্ছিলে।

আমি কুণ্ঠায় মরে যাই—বলি—কি বলছেন শরৎদা কোথায় শিশিরদা আর কোথায় আমি।

উনি পিঠে মৃদু আঘাত করে বলেন—তোমার অভিনয় চাতুর্য আমায় সত্যিই সেদিন মুগ্ধ করেছিল। তুমি যখন বেতার নাট্যকে দলের পরিচালক তখন তোমায় শুধু বৈকুণ্ঠের উইল কেন আমার সমস্ত উপন্যাসগুলিকে নাট্যাকারে পরিবর্তন করার অনুমতি দিলাম।

এ অবকাশে তিনি লিখিত অনুমতি আমায় দিতে পারেন নি বটে তবে লিখিতভাবে অনুমতি পত্র আমায় ১৯৩৬ সালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন···তখন আমি বোম্বাইতে। লিখেছিলেন—

কল্যাণীয় শ্রীমান বোস—

তুমি আমার বই থেকে রেডিওতে নাট্যকারে পরিবর্তিত করে

অভিনয় করতে পারো। কিন্তু, এ অনুমতি শুধু তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে দিলাম।

ইতি শুভার্থী—

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাড়ি ফিরেই উপেনদার চিঠি পেলাম। উপেনদা মানে শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়…(শরৎচন্দ্রের মামা) ও তৎকালীন বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদক।

উপেনদা তখন থাকতেন শ্যামবাজার ফোড়েপুকুরে। সেইদিনই ছুটলাম তাঁর কাছে। তিনি বললেন—শুনলাম শরতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তার ইচ্ছা যে টাউন হলের সংবর্ধনায় তুমি একটি গান করো। তোমার গলা তার বড ভাল লাগে।

বললাম— কি গান করব ?

উনি বলেন—তোমার নিজের লেখা হলেই ভাল কাবণ শরৎ তোমার রচিত গানেব খুব সুখ্যাতি করছিল। পঙ্কজের কাছে উদ্বোধনী সঙ্গীতের কথা জানাবার পর শরতের ফোন পেলাম। তুমি না হয় শেষ সংগীত বিতরণ করো।

গান লিখে সুব কবে উপেনদাকে শুনিয়ে এলাম। গানখানির স্বরলিপি সমেত উপেনদা বিচিত্রা আশ্বিন ১৩৩৯ সাল পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেই সঙ্গে টাউন হলের নিমন্ত্রণ পত্র হাতে তুলে দেন। দেখলাম শ্রীরবীন্দ্রনাথ আসছেন এ সংবর্ধনার সভাপতি হ'য়ে।

রেডিওতে বেতাব নাটুকে দলের শরৎ শর্বরীর আয়োজনে 'বৈকুণ্ঠের উইলের' মহলা চলেছে। রায় মশাই—শ্রীবীরেন ভদ্র, বিনোদ—শ্রীধীরেন দাস, ভুবনেশ্বরী—শ্রীমতী নিভাননী, রমা—শ্রীমতি বীণাপাণি, গোকুল—হীরেন বসু ইত্যাদি ইত্যাদি।

এগিয়ে এলো ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ বোধকরি)—টাউন হলে সাহিত্যিকদের সু-সমাবেশ। এছাড়াও কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সবাই উপস্থিত। উপেনদা কানে কানে বললেন—রবীন্দ্রনাথের শরীর খারাপ বলে আসতে পারলেন না—লেখা পাঠিয়েছেন। এদিকে সময় হয়ে এলো পঙ্কজেরও দেখা নেই, তুমি প্রস্তুত থেকো হয়তো তোমাকেই না শুরু করতে হয়।

আমি বলি ভালই হবে। রাত আটটায় শরৎ শর্বরী শুরু হবে—তাই প্রথমে হলেই ভাল হয়।

এমন সময় জোড়া শাঁখ বেজে উঠলো—সহস্র জনমণ্ডলীর হর্ষধ্বনির মাঝে শ্রীশরৎচন্দ্র টাউন হলে উদয় হলেন। উপেনদা ছুটে এসে বলেন—হীরেন তৈরী হয়ে নাও—ডায়াসে হারমোনিয়ম আছে—ওখানে গিয়ে দাঁড়াও—শরৎ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তোমায় গান ধরতে হবে।

রায় পরিবারের কিছু মেয়েরা—শ্রীরাধারাণী দেবী প্রমুখ মহিলাদের অগ্রণী করে শরৎদা হলে পদার্পণ করলেন। আমি আমাব গানেব জন্য প্রস্তুত। উপেনদা ডায়াসে দাঁড়িয়ে আমাব পরিচিতি বলে দিয়ে সবে দাঁড়ালেন।

আমি গাইলাম—শরৎ আলো—প্রাণের আলো—এলো এলো এলোরে। পরাও ভালে তিলক লিখা বিজয় বিষাণ তোলোবে।

ডায়াসে এসে বসলেন শবৎদা···গান শেষ হলে উপেনদা শবৎদার হাত দিয়ে আমাকে একখানি বই উপহার দেওয়ালেন বইখানির ওপর লেখা 'শরৎ বন্দনা' ···রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু কবে বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের লেখা। শরৎ বন্দনার শেষ পাতায় আমার গানখানিও দেখলাম ছাপা রয়েছে।

রাত ৮টায় শবৎ শর্বরীর উদ্বোধনে বেতার নাটুকে দল বেতার কেন্দ্রে অভিনয় শুরু করেছে বৈকুণ্ঠের উইল শরৎদার সম্বর্ধনায়। রাত নটায় হঠাৎ স্টুডিওর ঘরে আমাদের সামনে এসে দাঁডালেন শ্রীশরৎচন্দ্র। সঙ্গে আছেন শ্রীরাধারাণী দেবী—আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা বোধকরি বাইরে অপেক্ষায়। আমি এখন মাইকের সামনে ছিলাম না—রায়মশাই হিসাবে বীরেনবাবুই তখন অভিনয় করছেন। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। নৃপেনদা·নলিনীদা আমি সবাই শরৎদাকে নিয়ে ধীরে ধীবে স্টুডিওর বাইবে এসে দাঁডালাম। আমার কাঁধটি ধরে নিতান্ত অগ্রজের মতো বললেন—শুধু তুমি মনে কষ্ট পাবে বলে পালিয়ে এসেছি—এক মিনিটও থাকতে পারব না···চললুম···এক পা এগিয়ে আবার বলেন—আজ অভিনয় শোনা হলো না—আর একবার করো—পানিত্রাসে বসে শুনবো।

চোখ দুটো আমার—কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে উঠলো। উনি নরেনদা ও বৌদির সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন। শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী।

শরৎদাকে আমরা যত না ভালবাসতে পেরেছিলাম—তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি ভালোবেসেছিলেন আমাদের। এর পরিচয় আবার আপনারা পাবেন।

১১

মহুয়ার সুটিং শেষ।…অবসব সময় কলোম্বিয়ার '৩৪-এর প্রথমার্ধের রেকর্ডিং-এর গানেব মহলা শুরু করে দেওয়া হয়েছে। গতবারের সুপ্রতিষ্ঠিতা কুমারী নীলিমাব দুখানি গানের ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। গান দুখানি—'এই মরমের ঝারি আমার পিচকারি ও বৃন্দাবনচন্দ্র মম অন্তরতম স্বামী' কুমারী নীলিমাকে আমি মন দিয়ে শেখাচ্ছি যাতে বাজাবে ছাড়লে যদি গোকুলচন্দ্রের চেয়ে বেশী বিক্রি হয়। এছাড়া গতবারের সমস্ত শিল্পীরাই আমার গানের প্রত্যাশী—কাজেই স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রোতাদের হৃদয়গ্রাহী রচনা ও সুর করতে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অপরদিকে মহুয়ার শেষ পর্যায়। রেডিওতে অবশ্য এখন বিশেষ প্রোগ্রামের ব্যস্ততা নেই। তার উপর ১৯৩১-এর পয়লা এপ্রিল থেকেই ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীকে অর্থাভাবে সরকারী সাহায্য নিতে হয়েছিলো—তাই আগের নাম বদলে সে এখন হয়েছে ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসেস আই এস বি এস। সরকারী হস্তক্ষেপ মানেই সৃষ্টির উৎস শুখিয়ে আসা এবং কাগজ-কলমের কৈফিয়ৎ জারি বেড়ে ওঠা। তবু ১৯৩২ ও ৩৩ সালের স্রষ্টধর্মীয় দুটি বড প্রোগ্রাম পরিবেশিত করা হয়েছিল। মহালয়ায় মহিষাসুর মর্দিনী ও বেতার নাট্যকে দলের শরৎ শর্বরী—যা পূর্বের অভ্যাসের শেষ প্রয়াস বলা চলে। সরকারী আমলে রেডিও স্টেশনে বইতে শুরু করেছিল—ইণ্টারন্যাল পলিটিকসের এক ফল্গু স্রোত। নতুন পুরাতনের অন্তর্দ্বন্দ্বে যেন সৃষ্টিধররা যে যার নিজের দল পাকাতে শুরু করে দিল, কাজেই সৃষ্টির মাঝে নতুনত্ব দেখাবার—তাদের সময় কোথায়? সবাই তখন নিজের দলকে সামাল করতে ব্যস্ত।

এদিকে কলম্বিয়া কোম্পানীর উপরো উপরি তিন বছরের নতুন নতুন রেকর্ডের ধাক্কায় টলমল করে উঠেছে গ্রামোফোন কোম্পানী। তার সঙ্গে ওদের নিজেদের গিল্ডে বাঁধা মেগাফোন ও হিন্দুস্থান কোম্পানীও কিছুটা বেগ দেবার প্রয়াস পাচ্ছে। কাজেই ইংরেজী দুই কোম্পানীর ওপর তলায় গুঞ্জন কানে এসে পৌছতে থাকে। এ আবার বিলেতী পলিটিকস্। শুনেছিলাম গ্রামোফোন

কোং এবং আর সি এ কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার এক হয়ে গিয়ে দুটি কোম্পানীই নামে ভিন্ন থাকলেও অন্তরে অভিন্ন হয়েছেন। এবার আবার শুনছি বিলেতে কলম্বিয়া ও হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানী যোগ সাজসের চেষ্টা চলেছে প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানীকে কিভাবে নিজেদের কোম্পানীর সঙ্গে একীভূত করা যায় তার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে বিলেতে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানদের হঠাবার জন্যে। কাজেই হয়তো ১৯৩৭-এর রেকর্ড বার হওয়ার পর দুটি কোম্পানী হাত মিলিয়ে এক হবার এক সুদূর সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে।

১৯৩৪ এর রেকর্ডিংয়ে তাই আমার শেষ অবদানগুলি যাতে আরও মনলোভা হৃদয়স্পর্শী হয় তার চেষ্টায় আমি উঠে পড়ে লেগে গেলাম। কাননদেবীকে শেখানো হচ্ছে 'এলো মোর আঙ্গিনায় অবেলায় আজিকে'—ভাঙ্গা ঠুংরি নিজের গানের নিজ সুর না করে সুর ও শিক্ষা দিচ্ছেন বিনোদ গাঙ্গুলী মহাশয় (যিনি জবদান বাঈ-এর খাস শিষ্য ছিলেন) আমি শেখাচ্ছি রাণুদেবীকে 'তার আশে মোর কাটলো সারা বেলা' ও 'আজ সে কোন অতিথি'—শ্রীমতী স্নেহলতা শিখছে—'দোলে ভুঁই চাঁপা আজি' আমি নিজে গাইছি দুখানি স্বদেশী গান। আমি ও রাণু দেবীর ডুয়েট যথারীতি হচ্ছে। শ্রীমতী ফুল্লনলিনী গাইছেন—'আজি ঝুলন দিনে ঝুল লেগেছে দোলনায় ও রহ গিরিধারী মন মন্দিরে'—শ্রীমতী প্রফুল্লবালা গাইছেন 'চৈতী হাওয়া হোলরে আমার কনকলতা' ও 'এতো হাসির ঝরণাধারা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহুয়ার এডিটিং পুরোদমে চলেছে। আমার ইচ্ছা ছবিখানির পেছনে আবহসংগীত রচনা করি কিন্তু টকিতে আবহসঙ্গীত ব্যবহার করতে হলে চাই রি-রেকর্ডিং। নিউ থিয়েটার্সের সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার ছিলেন শ্রীমুকুল বসু (নীতিন বসুর ভাই)। আমার ছবিতে এদেরই খুড়তুতো ভাই শ্রীলোকেন বসু ছিলেন আমার রেকর্ডিস্ট। তাঁকে গিয়ে মনের বাসনা জানালাম। তিনি বললেন, মুকুলবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। ১৯৩৩ সালেই মিঃ সরকার রি-রেকর্ডিং-এর যন্ত্রপাতি আনিয়েছেন শুনেছি। আমি মুকুলদার কাছে গিয়ে সেই কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন—হ্যাঁ রি-রেকর্ডিং মেসিন এসে তো পড়েই আছে অথচ কেউই এর সদ্ব্যবহার আজ পর্যন্ত করছেন না—অর্থাৎ কোন ডিরেক্টারই এর ফায়দা উঠাতে চাচ্ছেন না। আমি বলি কেন? উনি বলেন—বোধহয় ভয় পাচ্ছেন শেষমেশ ছবিটি ভাল হতে গিয়ে যদি মন্দ হয়ে যায়? আমি বললাম—আমি সেই ভয় করি না মুকুলদা—আমার সারা ছবিই রি-রেকর্ডিং

হওয়া চাই—তুমি প্রস্তুত হও। মুকুলদা বলে—বেশ খুবই ভাল কথা আমি মেসিন রেডি করি কিন্তু আমার মাসখানেক সময় চাই। আমি বলি—সে সময় তুমি পাবে।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি যে সে সময় গান ডাইরেক্ট টেক হোতো, প্রব্যাক হতো না—যদিও এ বিষয়ও আমি মুকুলদাকে বলেছিলাম ডাইরেক্ট প্রব্যাকের কথা—আমার জোর বরাতের ইতিহাস। উনি হেসে বলেছিলেন—এর উত্তর তুমিই দিয়েছে। ভাই তোমার জোর বরাত তাই মিলে গিয়েছিল কিন্তু এর যথাযথ পদ্ধতি আজও ভারতে শুরু হয়নি।

আবহ সঙ্গীত রচনা কালে বুঝলাম যে—১৯৩৭ সালে পলিটিকসের স্রোত রেডিও গ্রামোফোনে তো বটেই এমন কি চিত্রজগতেও শুরু হয়ে গিয়েছে। নিউ থিয়েটার্সের মিউজিক ডিপার্টমেণ্ট তাঁদের যন্ত্রসঙ্গীত আমার জন্যে ছেড়ে দিতে পারেন না কারণ তাতে তাঁদের কাজের ব্যাহতি ঘটবে। অতএব যত কিছু বাদ্যযন্ত্র দরকার তা আমাকে নিজেই সংগ্রহ করে আনতে হবে। মেসার্স বিভান এণ্ড কোম্পানী ছিলেন কলম্বিয়া রেকর্ডিং কোম্পানী ইংরেজ রেকর্ডের একমাত্র এজেণ্ট তাই আমার, কলম্বিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁদের কাছ থেকে পিয়ানো অরগ্যান ডবল বেস—জ্যাজ সেট সবই জোগাড় করার সুবিধে ঘটে গেল এইভাবে অর্কেস্ট্রাদল সংগঠন করে আমি একই দিনে মহুয়া ছবির ছ হাজার ফিট আবহসঙ্গীত রি-রেকর্ড করালাম। এন্-টিতে মহুয়াই হচ্ছে সর্ব প্রথম ছবি যার রি-রেকর্ডিং হলো এবং যা তুললেন স্বয়ং শ্রীমুকুল বসু মহাশয় নিজ হাতে।

১৯৩৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'মহুয়া' চিত্র৷ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে। এবং এই ছবিখানিতে শ্রীমতী মলিনা দেবী—নায়িকার ভূমিকায় প্রথম অবতীর্ণা হলেন।

এই সময় সারা কলকাতায় এপিডেমিক ড্রপসিতে প্রায় শতকরা আশীজন ব্যক্তি আক্রান্ত হন। ঘরে ঘরে বেরিবেরির উৎপাতে ত্রস্ত এবং আমি একজন এ পীড়ার কবলে কবলিত রোগী হয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে মাথায় জল হয়ে আমি দৃষ্টি হারালাম।

ডাক্তাররা রায় দিলেন চোখে গ্লুকোমা হয়েছে, কাজেই চোখ ফিরে পেতে হলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই। উপায়ান্তর না পেয়ে আমি বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজের বেডে দাখিল হলাম—অপারেশন করবেন ডাঃ শ্রীসুশীল

মুখার্জি মশাই, তৎকালীন চোখের চিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার।

বেডে অপেক্ষাকালীন সময়ে হঠাৎ অনুপম ঘটক আমায় দেখতে এলেন। আমি তাঁর কাঁধ ধরে দৃষ্টিহীন অবস্থায় নীচে নেমে এসে ওখানকার মাঠে বেড়াতে বেড়াতে আমার রোগের সারা ইতিবৃত্ত বললাম। অনুপম বললো— হীরেনদা, আপনি গীতিকাব, লেখক, তার উপর চিত্র-পরিচালক। যদি ধরেন, চোখদুটি: অপারেশন কবতে গিয়ে কিছু বিপযয় ঘটে, আপনি সারাজীবনের মত নিঃশেষিত হয়ে যাবেন—তার চেয়ে আপনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসককে একবার দেখালেন না কেন? আমি বলি, জানো তো আমি ডাঃ জগদ্বন্ধু বসুর (যিনি আর জি কর মেডিকেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং কলকাতা ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় এম-ডি) ভাইপো। আমার কাকা, তিনিও ডাক্তার, এই কলেজের সেক্রেটারির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—আমার নিজের দাদাও এলোপ্যাথি ডাক্তার, কাজেই আমার বাড়ি ভাবে, হোমিওপ্যাথি মানে 'জলপড়া'। তাঁদের বললে হেসে উড়িয়ে দেবেন এবং দিয়েওছেন।

অনুপম বলে—আপনার নিজের সঙ্গে কোনো হোমিওপ্যাথের আলাপ-পরিচয় নেই?

আমি বলি—একজন আছেন, বন্ধুর সমান, তবে তাঁকে আমি দাদাই বলি। তিনি শিকাগো থেকে হোমিওপ্যাথি পাশ করে এখানে এসে ক্লিনিক খুলেছেন। কি যেন বস্‌টোন ক্লিনিক না কি—গ্লোব থিয়েটারের ওপরের তলায় তাঁর চেম্বার।

অনুপম বলে—বেশ তো, একবার সেখানেই যান না।

আমি বলি, যাবো কি করে—এ-অবস্থায় কেউ তো সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চাই—বাড়ির দাদাদের বললে তাঁরা একেবারে গ্রাহ্য করবেন না।

অনুপম বলে—যাবেন আমার সঙ্গে এখুনি?

আমি বলি—সে কিরকম করে সম্ভব?

ও বলে—আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রামে উঠে বসছি—তারপর গ্র্যাণ্ট স্ট্রীটে নেমে একটা রিক্সা করে চলে যাবো—আপনি নেমে নীচে দাঁড়াবেন, আমি ওপর তলায় সন্ধান করে ডাক্তারকে পেলে আপনাকে লিফ্‌টে করে ওঁর কাছে নিয়ে যাবো।

ও আমাকে ভাবতে সময় দিলো না—প্রায় জোর করেই আমায় নিয়ে ট্রামে উঠে বসলো। গ্লোবে পৌছে বললাম—ডাঃ যতীন হাজরা ওঁর নাম। (এটর্নী

হাজরা এণ্ড ব্যানার্জির শ্রীরবীন হাজরার পরের ভাই। এবং পরবর্তীকালে আগ্রা সৎসঙ্গে চিফ মেডিকেল অফিসার হয়েছিলেন।

অপেক্ষায় আমি নীচে দাঁড়িয়ে—অনুপম এসে বলে, হ্যাঁ উনি আছেন—চলুন।

ডাঃ যতীন হাজরার অনুকম্পায় পনর দিনের মধ্যেই আমি দৃষ্টি ফিরে পেলাম। আমি একটু সুস্থ হয়ে মেসার্স মানসটায় গিয়ে ভীমজিভাইকে (এখনকার যমুনাভাই-এর বাবা) বলি—বোম্বাইতে একটা এসাইনমেণ্ট পেলে আমায় জানাবেন। ভীমজিভাই আমার মহুয়া ছবির খ্যাতি করে বলেন—নিশ্চয়ই করে দেবো। এ-ছবির পর বোম্বাই-এর দরজা আপনার খুলে গেছে—তবে যাবেন তো? আমি হেসে সম্মতি জানাই।

বাড়ি এসে ভাবছিলাম, বোম্বাই এ কাজ পেলে নিউ থিয়েটারে একটা রেজিগনেশান দিয়ে চলে যাবো—তাহলে আমার চ্যালেঞ্জের পরিপূর্তি হবে।

মহুয়া ছবি রিলিজের আগে একটি বিশেষ ঘটনা বলতে ভুলে গেছি—সেইটা বলে নি।

শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের ভাই শ্রীজলু বড়াল একদিন সকালে আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। আমি ভাবলাম নিশ্চয়ই আমার শরীর খারাপের কথা শুনে উনি ছুটে এসেছেন আমায় দেখতে। এখানে বলে রাখি—মহুয়া ছবিতে উনি খুবই খেটেছিলেন (কার জন্যে তা আপনাদের না জানাই ভালো)। উনি এসে আমার শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন না করেই বললেন—হীরেন, আমি এসেছি একটা কথা তোমাকে জানাতে যে, রাই মিউজিক ডাইরেক্টর হিসাবে নিউ থিয়েটার্সের অ্যাবসোলিউটলি ওয়ান এণ্ড অল ইন দি মিউজিক সেক্টর। এই তার মিঃ সরকারের সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট। কাজেই মহুয়ার মিউজিক ডাইরেক্টর হিসাবে তার নামই পাওয়া উচিত।

আমি অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলি—তা মিঃ সরকার কি বলেন?

জলুদা বলেন—মিঃ সরকার বললেন কন্‌ট্রাক্ট তাই বটে, তবু যাঁকে দাঁড়িয়ে এক নিমিষে ছ' হাজার ফিট মিউজিক কম্পোজিসন করে রি-রেকর্ড করতে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর নাম কি করে বাতিল করতে পারি আপনারাই বলুন।

আমি হেসে বলি—জলুদা, রাই আমার বাল্যবন্ধু, আপনাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই দাদা বলি। আপনি আগাগোড়াই মহুয়া ছবিতে ছিলেন,

কাজেই সচক্ষে দেখেছেন—তা সত্ত্বেও এই প্রোপোজালটা আনলেন কি করে ?

জলুদা বলেন—ওর যে কনট্রাক্ট ওই।

আমি বলি - সে-কনট্রাক্ট মিঃ সরকারের সঙ্গে, আমার সঙ্গে নয়। আমি একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থে আমার সৃষ্টিকে অপমানিত করতে পারি না। মিঃ সরকার মীরাবাঈ-এর সময় আমায় যেমন লিখিয়ে নিয়ে, মীরাবাঈ-এর সুরারোপ রাই-এর নামে তুলে দিয়েছিলেন উনি এবারও সেই রকম শর্তে আমার ডাইরেকশান দিলেই পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। কাজেই আমি তাঁর বিরুদ্ধেই বা যাবো কেন বলতে পারেন ?

জলুদা সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন কিন্তু তারপর দিন সকালেই এসে হাজির হলেন। বললেন—বেশ রাইবেন, তুমি রাই-এর নামে মিউজিক ডিরেকশন না দাও, আমার নামে দাও, আমি তো তোমার মতুযা ছবিতে সমানে খেটেছি।

কথা শুনে আমার হাসিও পেলো এবং এই নীচ পলিটিক্স শুনে মনে মনে ঘৃণাও এলো। বললাম—বেশ, আপনার নাম দিতে চান তো দিন, তবে রাই-এর নাম আমি কিছুতেই দিতে দেবো না—যখন মিঃ সরকারের তাতে অনুমোদন নেই।

উনি খুশী হয়ে বললেন—বেশ বেশ, তাই হবে, তবে মিঃ সরকারকে এক লাইন লিখে দাও।

সামনেই কাগজ ছিল, আমি লিখলাম,

If Mr. Sirkar think that Jalue's name should be put as music director—then let it be done.

ফলে ছবির টাইটেলে দেখলাম, লেখা আছে—মিউজিক কনডাক্টেড বাই জলু বড়াল। নিউ থিয়েটার্সের এই একখানিই ছবি যাতে মিউজিক ডাইরেক্টারের নাম নেই…

এরপরও কি আপনারা বলেন আমার নিউ থিয়েটার্সে থাকা উচিত ?

ভাবছিলাম রেজিগ্নেশানটা দিয়েই দি, কিন্তু মিঃ সরকার-এর মুখ চেয়ে তা আমি দিতে পারিনি। কারণ মিঃ সরকারই আমাকে আজ ডিরেক্টারের আসনে বসবার যোগ্যতা দিয়েছেন, তাঁকে এভাবে চিঠি দিলে অপমানকর হতে পারে।

ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। এই রিলিজের তিন সপ্তাহ পরে মিঃ সরকার-এর সই করা একখানি চিঠি পেলাম।

Your services is no longer required.

ভাবলাম, যে মিঃ সরকার স্টুডিওর একটি গাছও কাটতে দেন না তিনি তাঁর তালিকা থেকে আমার নামটা এভাবে কাটতে পারলেন?···বিশ্বাস হলো না। আমি চুপি চুপি তাঁর কাছে গিয়ে একদিন দাঁড়ালাম। তিনি প্রথমেই বললেন—শুনলাম। .বরিবেবিতে আপনার নাকি দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল, আপনি এখন কেমন আছেন?

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল আমি বললাম, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে ভাল হয়ে গেছি।

উনি বললেন—যেখানেই যান সাবধানে থাকবেন।

আমি বলি—আপনি আমায় একটা চিঠি দিয়েছিলেন।

উনি খানিক চুপ করে থেকে বলেছিলেন—জলে বাস করে কুমীরদের সঙ্গে ঝগড় করে পেরে উঠবেন কি? তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে রিলিজ দিলাম।

আমি নিশ্চুপ বসে উঠে দাঁড়ালাম।

উনি বললেন—নতুন কোনো এসাইনমেণ্ট পেয়েছেন নাকি?

আমি বললাম—পাইনি, তবে চেষ্টায় আছি।

উনি বললেন—আই উইস ইউ অল সাক্‌সেস।

এরই পর পুজো কেটে গেল—নভেম্বর '৩৩ সালে ভীমজিভাই-এর ডাক এলো, তখন আমি শিমুলতলায় একটু চেঞ্জে গেছি। টেলিগ্রাম পেয়ে আমি কলকাতায় নেমে এলাম এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সেই দিনই আমার সঙ্গে মিঃ ভি এম ব্যাসের পরিচয় করিয়ে দেন—উনি হচ্ছেন বোম্বাইতে 'কুমার মুভিটোনে'র অধিকর্তা। উনি ওখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন ডিরেক্টর এবং মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে। আমার সঙ্গে নিতে দেবেন মিউজিক অ্যাসিসটেণ্ট ও ছ'জন মিউজিসিয়ানকে। পরের দিনই সই-সাবুত হয়ে গেল—খালি এক সপ্তাহ থেকে আমার অ্যাসিসটেণ্ট ও মিউজিক-হ্যাণ্ডসদের সই করে টাকা দিয়ে বোম্বাই ফিরে গেলেন। আমরা রওনা হবো ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৪, মানে মাত্র দশদিন বাকী।

সই-সাবুতের পরই আমি গেলাম অনুপমের বাড়িতে কাঁকুলিয়ায়। ওকে

সব বলে বললুম—তোমাকেও আমার সঙ্গে বোম্বাই যেতে হবে। ও খুব খুশী হয়ে বললো, এত বড় সুযোগ আমাকে হারাতে হচ্ছে, কারণ আমার বাবা পীড়িত, জীবন-মৃত্যু সমস্যা, এ-অবস্থায় আমার কলকাতা ছাড়া উচিত হবে না। তবে আজ বিকেলে আপনি একবার হিন্দুস্থান রেকর্ডে আসুন, ওখানেই একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো, যাকে অ্যাসিসটেণ্ট হিসাবে নিয়ে গেলে আপনার কোনরকম অসুবিধা হবে না অথচ ছেলেটিরও বিশেষ উপকার হবে। অগত্যা, সেইরকম ঠিক করে আমি ভবানীপুরে আমার ভাগ্নে শ্রীগোপাল মিত্রের বাড়িতে এলাম। এইস্থানেই অনুপমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, দেখলাম একটি ছেলে নেটিপেটি হয়ে ও-বাড়িতে ঘুরছে—আমার দিদিকে সে মা বলে ডাকছে, পরিচয় পেলাম যে, ছেলেটি বড় দুঃস্থ, অথচ অদ্ভুত গুণী। গানের গলাও অত্যধিক ভাল। আমি আমার বোম্বাই-এর যাত্রা করার সময় কেমন করে অনুপম না যাওয়ার অক্ষমতায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, গল্প করতে করতে বলে ফেলি। সঙ্গে সঙ্গে আমার দিদি ও ভাগ্নে বলে ওঠে—তবে এই ছেলেটিকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও—একেই অ্যাসিসটেণ্ট করে গড়ে তোল। ছেলেটি বেঁটেখাটো। গান শোনালো। খুবই সুরেলা গলা—নাম বললো অনিল বিশ্বাস। আসার সময় বলে এলাম - অনিল, কাল তুমি একবার সকালে আমার বাড়ি এসো—ঠিকানাও দিয়ে এলাম। ফেরার পথে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে অনুপমের কথামত উপস্থিত হলাম। অনুপমের ক্যাণ্ডিডেটের কথা সবাই রেকমেণ্ড করলেন। ওখানকার প্রতিনিধি যামিনী মতিলাল আমার ছোড়দার ক্লাসফ্রেণ্ড, তিনি তো খুব জোর সমর্থন জানালেন। কথায় কথায় প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় · এমন সময় ছেলেটি এলো—সবাই ওকে ঢুকতে দেখে বলে ওঠেন—এই অনিল,' এদিকে, শোন্। নামটা শুনে ডাকতে যাবো—দেখি আমার দিদির ও ভাগ্নের বাড়িতে যাকে কাল সকালে দেখা করতে বলে এলাম—এ সেই। কাজেই দুজনেই অবাক হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিকই হলো যে, শ্রীঅনিলকেই আমি অ্যাসিস্টেণ্ট করে বোম্বাই নিয়ে যাবো। ওদের টার্মস এবং কণ্ডিশনস্ সব জানালাম। অনিল সবেতেই রাজি। আমি বললাম কাল সকালে একবার অতি অবশ্যই আমার বাড়িতে আসবে। মিউজিসিয়ানরা—যারা আমার মহুয়া ছবিতে বাইরে থেকে এসে বাজিয়েছিল, তাদের মধ্যে দু'জনকে নিলাম। গীটার ও ভাইয়োলিন বাজায় মিঃ পাওয়ার, ট্রামপেট, কর্ণেট-বাজিয়ে মিঃ এবলস্, চেল্লো বাজায় মিঃ

কৈলো, আরও তিনজন বাঁশী ক্লারিওনেট আর একটি জাজপ্লেয়ার—ওদেরই রেকমেনডেশনে···সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা হলো।

আমার বোম্বাই যাবার খবর পেয়ে আমার আত্মীয়স্বজন আমার বাড়িতে দেখা করতে আসছেন। সকাল ৭টায় আমার আলপনা পত্রিকার কবি বন্ধু, শ্রীপরিতোষ বসু এসে হাজির হলো। শ্রীপরিতোষ আমার বন্ধু, ডাঃ অমিয়-কুমার বসুর (ইউ) ছোট ভাই···কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমারও বন্ধু। ও এসে বললো—শুনছি নাকি তুমি বোম্বাই যাচ্ছো?···আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবো। আভাসে ইঙ্গিতে জানালো যে তার এখানকার চাকরি গেছে···সে বেকার এখানে বসে থাকতে চায় না। ইতিমধ্যে অনিল এসে হাজির। আমি অন্য কাজে একটু ব্যস্ত হবার অবকাশে অনিল ও পরী বেশ বন্ধুত্ব জমিয়ে তুলেছে। অনিল আমায় বললো—ওঁকেও সঙ্গে নিচ্ছেন তো? আমি বলি···ট্রেনে ভাড়ার টাকা যা মিঃ ব্যাস দিয়ে গেছেন তাতে কুলালে হয়। হ্যাঁ তোমায় ডেকেছিলাম—এই টাকা নাও—তুমি সেকেণ্ড ক্লাস একখানা—আর তোমার ইণ্টারে একখানা দু-খানা টিকিট তো আপাতত কিনে আনো। মিউজিসিয়ানদের টাকা আমি দিয়েছি। টাকাটা হাতে নিয়ে বলে—আরও দশ টাকা দিন—দেখি ইণ্টারের বদলে দুখানা থার্ডক্লাস যদি হয়···পরীবাবু আর আমি দুজনেই চলে যেতে পারব। তখনকার দিনে ২০ টাকা থার্ডক্লাস— ৩০ টাকা ইণ্টার আর ৪০ টাকা সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল। আমি আরও দশটা টাকা অনিলের হাতে দিয়ে দিলাম। দেখলাম অনিল ও পরী দুজনেই টিকিট বুক করতে উঠে গেলো। ···বিদেশে বন্ধু পেলাম···তাই তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললাম।

কলোম্বিয়ার রেকর্ডিং রুমের চার্জ দিলাম—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্তের হাতে। রেডিওর সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমি বাসায় ফিরলাম। পরদিনই আমাদের যাত্রা—সবাইকে সি-অফ্ করতে আসতে বলেছি। স্টেশনে এসে দেখলাম—ভীমজি মানসাটার ছেলে যমুনাভাই আমাকে ট্রেনে রওনা করে দিতে এসেছেন। রেডিও থেকে স্বয়ং নৃপেনদা উপস্থিত, সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের দল। আমার ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ ঘোষ (হেমচন্দ্র—কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী লেখক) তিনি তাঁর সাথে করে আমার ভাগ্নী রুবিকে নিয়ে এসে হাজির হয়েছেন। যাত্রার পূর্বেই শ্রীমিণ্টু এসে পৌছালো—হাতে মালা ও একটি তোড়া। সবাই প্রাণ ঢেলে সে মালা আমায় পরালেন—হাতে তোড়া ধরিয়ে দিলেন। ট্রেন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমার চোখে জল ঝরে পড়লো।

১৫

অনিল ও পরীকে নিয়ে আমি বোম্বাইয়েতে প্রথম উঠি হর্ণবি রোডে—শ্রী পি. এন মিত্র মশাই-এর প্রশস্ত কোয়ার্টারে। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন আমার মেজদার শ্বশুর ও স্যার বি এন মিত্র মহাশয়ের আপন ন'ভাই। শ্রী পি. এন. মিত্র তখন বোম্বাই-এর পোস্টমাস্টার জেনারেল। ওঁর বাড়িতে আমরা প্রায় সারা পৌষ মাসটাই ছিলাম—জানুয়ারী ১৫ তারিখের পর আমি দাদরে হিন্দু কলোনীতে মিঃ ব্যাসের পরিচয়ায় বাড়ি পেয়ে উঠে যাই। শ্রী পি এন মিত্র মহাশয়ের সংস্পর্শে এসে একটি মাসের মধ্যেই আমার সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকজন বোম্বাই-এর বিশিষ্টের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার রিচার্ড টেম্পল, রেডিওর তৎকালীন স্টেশন ডিরেক্টর মিঃ সেট্‌না, স্যার চিমনলাল চিনয়, শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুন্সী প্রভৃতিদের। পরবর্তীকালে এঁদের সবাইকে আমার চিত্রজগতে প্রয়োজন হয়েছিল যখন তাঁরা আমায় অন্তর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

কুমার মুভিটোনের স্টুডিও ছিল 'আন্ধারিতে' (এখন এটি মোহন স্টুডিও) এই স্টুডিওতে আমার স্থিতি মাত্র দেড় দু মাসের…মিঃ ব্যাসের অত্যধিক অভদ্রতায় আমায় এ কোম্পানী পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। কাজেই বোম্বাই-এ পৌঁছে আমায় দু-আড়াই মাসেই অসম্ভব দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়।

আমার বোম্বাই আসার অনতিপূর্বে বুড়োদা অর্থাৎ শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মিঃ হাফেজি ও শ্রীমতী রতন বাঈ (ইহুদী কা লেড়কীর হিরোইন) নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বোম্বাইতে তখন মিঃ দরিয়ানীর ইস্টার্ন আর্ট স্টুডিওতে যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল আমার দৃষ্টিহীন হওয়ার সময়—কাজেই এ বিষয় আমি ওয়াকিবহাল ছিলাম না। বোম্বাই এসে এদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কুমার মুভিটোনে যোগ দেওয়ার পরই। এরা তখন ছবি করছেন 'ভারত কী বেটি'।

মিঃ ব্যাসের সংসর্গ ছেড়ে আমি বাড়িতে বসে যাই…মাথায় পর্বতপ্রমাণ দুশ্চিন্তা—বিদেশ বিভুঁয়ে খাব কি—এদের খাওয়াব কি করে। এমনি সময়

মিঃ হাফেজি এসে আমার বাড়ি উপস্থিত। বললেন—কাগজে দেখলাম—কুমার মুভিটোনের সঙ্গে তোর কেস পর্যন্ত হয়ে গেছে—মিঃ ব্যাস হেরে গেছে……এখন কি করছিস্। আমি বলি—বসে বসে হাওয়া খাচ্ছি। হাফেজিদা—আমায় টেনে নিয়ে তাঁদের স্টুডিও গেলেন—ওখানে মিঃ দরিয়ানীর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে বলেন—এতো ভালো মিউজিক দেন যে কী বলবো। মিঃ আতর্থীর বইয়েতে ২ খানি ভজন গান আছে—উনি বলছেন—হীরেনবাবুকে দিয়েই সুর করিয়ে নিতে চান। মিঃ দরিয়ানী বলেন, তাহলে ওঁর সঙ্গে একটা কনট্রাক্ট করে নিন—দু'খানা ভজন আর ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক—তাহলেই তো চুকে গেল। সেই দিনই কনট্রাক্ট ড্র করে এক হাজার এক টাকা হাতে দিয়ে বিদায় দিলেন।

কুমার মুভিটোন ছেড়ে বাড়িতে বসাকালীন বোম্বাই-এর স্টেশন ডিরেক্টার মিঃ সেটনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি কলকাতার বেতারে আমার নাটুকে দলের সুবাদে ৪ খানি রেডিও ড্রামা প্রোডিউস করার ভার দিয়েছিলেন। এই সুযোগটুকুই ভগবান আমায় অযাচিতভাবে পাইয়ে দেন। আমার প্রথম রেডিও প্রোডাকসন ছিল মীরাবাঈ। মীরাবাঈ-এর সুর শুনেই মিঃ দরিয়ানী হাফেজি সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন সে কথা পরে বুড়োদা আমায় বলেছিলেন। ইস্টার্ণ আর্ট থেকে বাড়ি ফিরে দেখি শ্রীযুক্ত অশোক ঘোষ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। অশোক কলকাতা রেডিও স্টেশনে স্বরোদ বাজাতেন (ইনি শ্রীহরেন শীল মশাই-এর সাগরেদ)। ইনি এখন সাগর মুভিটোনের মিউজিক ডিরেক্টার হয়ে মিঃ মেহ্‌বুবের 'মন-মোহন' ছবিতে কাজ করছেন। উনি আমায় নিরালা ডেকে বললেন, মনমোহনের গান শেষ হয়ে গ্যাছে…খালি প্রথম গানখানা মেহ্‌বুবের পছন্দ হচ্ছে না—তাই তোমার একটু সাহায্য নিতে এলাম। আমি বললাম বেশ করেছো। আমার ফ্ল্যাটটা তিনতলায়—ঘরের সামনেই একটা খোলা টেরাস আছে সেইখানে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে আমায় সুরটা শোনালো—আমার বেশ ভাল লাগলো! ও বললে, হয়েছে কি হিরো অর্থাৎ সুরেন্দ্র হিরোইনের একটা পোর্ট্রেট আঁকতে আঁকতে গানটি গাইছে, তাই মেহ্‌বুব বলছেন যে ঠিক আঁকার মুডের সঙ্গে সুরটা টালি করছে না। আমি একটু ভেবে বলি…তা এক কাজ করো না…তুলির টানের সঙ্গে সুরের তালটা ভেঙ্গে একটু টেনে টেনেই গাক না, তারপর তুমি যেমন করেছো সুর তেমনি ধরবে। ও বলে কাল তোমায় গাড়ি পাঠিয়ে দেবো তুমি যদি একবার আমাদের

স্টুডিওতে আসো। তাই ঠিক হলো। পরের দিন সকালে ন'টায় গাড়ি এসে উপস্থিত হলো। আমি যথাসময়ে নেপিয়ন্ সি রোডে সাগর স্টুডিওতে পৌছলাম। অশোক আমার সঙ্গে মিঃ মেহবুবের আলাপ করিয়ে দিল। মিঃ মেহবুব আমাকে বেশ করে সিচুয়েশন বুঝিযে দিলেন। আমি যা বলেছিলাম— সেইরকম করে অশোকের সুরেই গানখানিকে ডিমন্স্ট্রেট করলাম—মেহ্‌বুব··· সুরেন্দ্র—হিরোইন 'বিব্বো' সবাবই পছন্দ হলো। গানখানি সেইদিনই তুলতে হবে কেননা রিলিজ ডেট্ অ্যানাউন্স হযে গেছে। আমি ভাবলাম যদি এটা অপবের মুখের গানে হিবোব ঠোঁট নাড়া হোতে পারতো তবে ডাইরেক্ট প্লেব্যাক কবে দেখতে পাবতাম-কিন্তু এগানে হিবোব গলায় হিবোই গাইছে কাজেই ভাবনায় পড়লাম। অথচ ডাইবেক্ট গান গেযে অ্যাকশন দিতে গেলে সুবেন্দ্র কেমন আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তাই আমি মিঃ মেহ্‌ববকে বললাম—আপনাদের সাউণ্ড রেকর্ডিস্টকে একটু ডেকে দেবেন। মেহ্‌বুব বললো নিশ্চযই। মিঃ চন্দ্রকান্ত সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট পাশেই ছিলেন—তাঁকে দেখিয়ে মেহবুব বললেন—ইনিও একজন রেকর্ডিস্ট।

আমি চন্দ্রকান্তভাইকে বললাম—আপনাদের তো প্রোজেকশন মেসিন রয়েছে তাই স্ক্রীনেব পেছনের লাউডস্পিকারটাতে তার যোগ কবে ওটাকে স্টুডিওতে লাগাতে পারেন ?

উনি বললেন—কেন কি হবে ?

আমি ওকে আমার আইডিয়াটা বুঝিয়ে বললাম যে, এখনি আপনারা প্রোজেকশনের আপনাদের ঐ সিনটা আমাকে দেখালেন। আমি শুধু সাউণ্ডটা এই স্টুডিওতে দাঁড়িযে শুনতে চাই—যদি শোনাবার ব্যবস্থা করতে পাবেন তাহলে এ সিনে আপনাদের ফুল ফুটিয়ে দেবো। চন্দ্রকান্তেব ইতস্ততঃ ভাব দেখে মেহবুব বলেন—আবে লাগাও না চন্দ্রকান্ত—বোসবাবু ক্যা করণে চাহ্‌তা হায় থোরা দেখনে দেও না।

চন্দ্রকান্ত প্রায় আধ ঘণ্টা পরে লাউডস্পিকারকে স্টুডিওয় ফিট কবে—রীল প্রোজেকশন মেশিনে চড়ালো। আমি সুরেন্দ্রকে বললাম—ভাই সুরেন্দ্র তুমি আমার গাওয়া গানটার সঙ্গে শুনে শুনে এখানে বসে গাইতে পাববে। ও বললো—জরুর। চন্দ্রকান্ত শুরু করতে বলল প্রোজেকশনকে। গান শুরু হতেই সুরেন্দ্র তার গাওয়া গানের সঙ্গে গলা দিয়ে গাইতে লাগলো। আমি বললাম—ব্যস হয়ে গেছে। এইবার ওর গানখানি আমি যেভাবে শেখালাম

সেইভাবে রেকর্ড করে নাও। আজই রাতে ডেভালাপ করে কাল সেটে ছবি আঁকতে ওর গানের সঙ্গেই আবার গাইবে ফারদুন ইরানী ক্যামেরাম্যান বলেন—আপ সমঝা—সাবাস্।

সারাদিন রিহার্সাল করে নিয়ে বেলা তিনটা নাগাদ নতুন করে গান টেক করা হোলো—এবং সেই গানই প্রোজেকটারে ফেলে স্টুডিও লাউডস্পিকারে রিপ্রোডিউসড্ হয়ে ছবি তোলার গান সমাপ্ত হলো। এইভাবে মেসিন মাধ্যমে ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারীতে প্লেব্যাক প্রথম গান গাওয়া হলো—'তুমনে মুঝকো প্রেম শিখায়া'। এর আগেই সুরছন্দায় উক্তি জানিয়ে এসেছি—সঙ্গে পেয়েছেন মেহবুবের প্রশংসাপত্র।

ভারত কী বেটির দু'খানি ভজনের মধ্যে আমীরবাঈ-এর গীত 'তেরে পূজনকে লিয়ে ভগবান' সুপার হিট্ করেছিল। ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক সাঙ্গ হতেই মিঃ দরিয়ানী আমার সঙ্গে পাকাপাকি কণ্ট্রাক্ট করলেন, ওঁর একখানি গল্প 'ধরম কা দেবী'-র চিত্র ও সঙ্গীত পরিচালক রূপে। এই ছবিতে আমি শ্রীগোবর্ধন ভাইকে ক্যামেরায় এনেছিলাম—এনেছিলাম তার অ্যাসিস্টেণ্ট হিসাবে দয়া ভাইকে। আজ যাঁরা অপটিক্যাল প্রিন্টিং ও ট্রেলার করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

ধরম কী দেবীতে ছিল একটি 'শিপ-রেক'—জাহাজ ডুবির দৃশ্য, এ দৃশ্য এতই সুন্দর হয়েছিল যে মিঃ শান্তারাম পর্যন্ত আমায় ডেকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। তখনকার দিনে ছবি প্রশংসনীয় হলে বড় বড় পত্রিকায় **Honour Page** দিতেন। এ ছবি সেই অনার পেজ অর্জন করেছিল।

ছবিখানিতে নায়ক ছিলেন—কুমার (যিনি নিউ থিয়েটার্সের পূরণ-ভকত ছবির নায়ক ছিলেন)। নায়িকা ছিলেন আখতার (পরবর্তীকালে মিসেস মেহ্বুব হয়েছিলেন) আর ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে 'গোপ' ও ফিরোজ দস্তুর (গায়ক) বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তাকুমারীও এই ছবিতে জাহাজ ডুবির দৃশ্যে তাঁর কলাচাতুর্যে দর্শক-মণ্ডলীকে অভিভূত করেছিলেন। সঙ্গীতাংশে এই ছবিতেও বাংলা ছবি জোর বরাতের মত ডাইরেকট প্লে-ব্যাক ছিল! শ্রীঅনিল বিশ্বাস গান করেছিলেন; সে গানে ছবিতে কুমার লিপমুভমেণ্ট দেন। ছবিখানি ১৯৩৫-এর মার্চেই রিলিজ হয়।

ইস্টার্ন আর্ট প্রজেকশন থিয়েটার ছিল না বলেই আমাকে আবার এই

পদ্ধতির প্লে ব্যাক করাতে হয়েছিল। তখনকার দিনে পথচারী ফকীরের গানের সময় ডাইরেক্ট মাইক গায়কের মুখের সামনে ধরে ক্যামেরার field-এর বাইরে রেখে যেমন পথচারীর মত পিছু হেটে চলতে হয়েছিল তেমনি ক্যামেরার ট্রাকের মত Music truck-এ অর্কেস্ট্রা বাদকদের বসিয়ে গাইয়ের সামনে সামনে টেনে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

উত্তাল তরঙ্গমালা পরের পর এসে দাড়ুল্যমান ভগ্ন জাহাজখানির ওপর দিয়ে প্লাবন সৃষ্টি করে চলেছিল—সেগুলি স্টুডিওর সেটে বসেই নিতে হয়েছিল। তার কিছুটা বর্ণনা করে আপনাদের সামনে রাখছি। তরঙ্গমালায় যখন জাহাজ দোলে, তার দোলন স্থির জায়গাতে দাঁড়িয়েই যেমন প্রতীয়মান হয় তেমনি সেট যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে ক্যামেরাকে দোলালেই এই ছবিই আপনারা দেখতে পাবেন। আমাদের ক্যামের তাই Rocking chair-এর ওপরই রক্ষিত হয়েছিল। তৈরী ডেকের সামনে অর্থাৎ ক্যামেরার দিকেই বড় বড় বেঞ্চ ফিট করে প্ল্যাঙ্ক ফিটেড ছিল। ৪৮টি জলভরা বালতির ব্যবস্থা ছিল। যার ১২টি করে বালতি ভর জল এই বেঞ্চের কাঠের ওপর দিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল—এবং কাত কর প্ল্যাঙ্কে ধাক্কা খেয়ে খরস্রোতে ডেকে ছিটকে ছিটকে পড়েছিল—সঙ্গে সঙ্গে অপর ১২ বালতির জলপ্লাবন এসে পড়ছিল—সেটা থামলে আবার ১২ বালতি জলস্রোত এসে পড়ছিল—এমনি করেই ক্রমান্বয়ে এইভাবে ডেকের জলপ্লাবনের সৃষ্টি করা হয়েছিল। সামান্য একটু দৃষ্টান্ত তুলে বোঝাতে চাইলাম যে কি করে বালিং সমুদ্রের তরঙ্গক্ষেপ জাহাজের পাটাতনকে জলপ্লাবনে বার বার বিচলিত করে তুলতে পেরেছিল অবশ্য বন্দরে দাঁড়ানো একটি ইতালিয়ন Ship S. S. Victoria-র উপর থেকে জাহাজের Boating, unboating ও অন্যান্য দৃশ্য গ্রহণ করেছিলাম।

এই ছবি দেখে এবং মেহবুবের মদনমোহন ছবির গানের সুরাহা দেখে সাগর মুভিটোনের মালিক শ্রীচিমনলাল দেশাই আমায় তাঁর স্টুডিওতে যোগদানের নিমন্ত্রণ জানান সঙ্গীত ও পরিচালনার ভুটির ভারই তিনি অর্পণ করতে রাজী আছেন। আমি সেখানে যোগদান করবার প্রতিশ্রুতি দি। কিন্তু, ইতিমধ্যে মিঃ দরিয়ানী তার বন্ধুর গোল্ডেন ঈগল প্রতিষ্ঠানের একটি ছবির জন্য আমাকে চুক্তিবদ্ধ করেন। তাই চিমনভাইকে কথা দিই যে এ ছবির শেষেই আমি সাগর মুভিটোনে যোগদান করব। এ ছবির নাম ছিল 'পিয়া কী যোগন'।

এর মাঝে আবার রেডিওতে নাটক প্রযোজনা করা হলো 'কৃষ্ণসুদামা'—কাজেই কলকাতার মত বোম্বাইতে এলেও রেডিও—চিত্রজগৎ দুই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে চলছিল।

এই সময় এক মজার ঘটনা ঘটে গেল।....

বোম্বাইতে একটি নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলো—যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেন—শেঠ গোবিন্দ দাস এম-পি এবং শ্রী ডি. পি. মিশ্র (পূর্বতন এম-পির মুখ্যমন্ত্রী)। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল—আদর্শ চিত্র লিমিটেড। এরা চিত্রজগতের কোন ব্যক্তি বা শিল্পীদের না নিয়ে শিল্পী সংকলন করলেন এলাহাবাদ থেকে। মীরা এলেকজেণ্ডার (যিনি বোম্বে টকীজের ভাবীর নায়িকা হয়েছিলেন), শ্রীএস এন ব্যানার্জি ওরফে পিটুবাবু (ইনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের লেকচারার ছিলেন)—শ্রীমতী লীলা চিটনীস (যিনি মহারাষ্ট্র স্টেজের অভিনেত্রী ছিলেন)। এঁদের ছবির নাম 'ধোয়াধার' মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ও রাজাদের নিয়ে উপাখ্যান: পরিচালক হয়েছিলেন—শ্রীসুকুমার চ্যাটার্জি (যিনি হলিউডে কুড়ি বছর কাটিয়ে এসেছিলেন)। মিউজিক করছিলেন—এলাহাবাদের একজন বিখ্যাত বেহালাবাদক (এখন নাম মনে নেই)। ক্যামেরাম্যান স্বয়ং আম্বালাল প্যাটেল (যিনি পরে প্যাটেল ইণ্ডিয়ার মালিক হয়েছিলেন—যাঁর প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম সেণ্টার)। এইসব রথী মহারথী সম্মিলনে গড়ে তুলেছিলেন—আদর্শ চিত্রকে।

বোম্বের গিরগাঁও অঞ্চলে প্রকাণ্ড একটি বাড়িভাড়া করে এরা এঁদের শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের রেখে রিহার্সাল চালাতেন—এবং আরবদেশী ইরানীয় ইম্পিরিয়ল কোম্পানীর স্টুডিওতে শুটিং করতেন। ইম্পিরিয়ল কোম্পানীই সর্বপ্রথম ভারতে টকী ছবি 'আলমারা' দর্শকদের উপহার দেন।

আমার বন্ধু শ্রীবিমল মিত্র (ক্যামেরাম্যান ভবনানী স্টুডিও) এসে আমায় বললেন, প্রোফেসর ব্যানার্জি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান—আপনার ছবির তিনি ফ্যান। কাল তাকে নিয়ে আসবো। তাঁর মুখেই শুনবেন আদর্শ চিত্র প্রতিষ্ঠানের আদর্শর কথা—সত্যই এই প্রতিষ্ঠানটি সারা বোম্বাইতে চমক জাগিয়েছে। শুনলাম হলিউড স্পেশালিস্ট চাটুজ্যে মশাই জঙ্গলের বাঘের আক্রমণ কারটুনে তুলে প্রাণবন্ত করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। জগতে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই তাই অকপটে বিমলবাবুর কথাগুলি বিশ্বাস করলাম।

পরদিন বিমলবাবু প্রোফেসর এস-এন ব্যানার্জিকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে

উপস্থিত হলেন। আমি অনিল পরিতোষ তিনজনেই তাঁকে আপ্যায়িত অভ্যর্থনা জানালাম। তিনি বেশ সুন্দর জমিয়ে কথা বলতে পারেন, তবে ফিল্মে নবাগত বলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কাছে আলোচনা করতে এসেছেন। পূর্বের বর্ণিত সমস্ত ব্যাপারটি বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করলেন—এখন বলুন দেখি মিঃ বোস আমার ফিল্ম লাইনে যোগ দেওয়াটা ভুল না ঠিক।

উত্তরে আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম—কি জানেন, কথায় বলে সাতটা গাধা মরে একটা টিচার হয়। সাতটা টিচার মরে তবে একটা প্রোফেসর হয—আর সাতটি প্রোফেসর মরলে তবে একটি ফিল্ম ডিরেক্টর হয়—এই আমার অভিজ্ঞতা; এখন আপনি নিজেই ভেবে দেখুন—কাজটা আপনি ভাল করছেন কি মন্দ করছেন।

এমনি হাসি-ঠাট্টার মাঝে তিনি বিদায় নিলেন—আমাকে তাঁদের গিরগাঁও চিত্র-প্রাসাদে নিমন্ত্রণ জানালেন। এর কদিন পরে শ্রীবিমল মিত্র মশাই আমায় ওঁদের চিত্র-প্রতিষ্ঠান ভবনে নিয়ে গেলেন, সবার সঙ্গে আলাপ করালেন। মিঃ চ্যাটার্জির কাছে হলিউডের রাজনীতি সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনলাম। তাঁর বাঘ লাফাবার প্রচেষ্টা দেখাতে নীচে নিয়ে গেলেন। একটি ঘরে রাশিকৃত ট্রান্সপ্যারেণ্ট সেলুলয়েড সিটে ব্যাঘ্রের লাফ দেওয়ার ক্রমবিকাশ চিত্রিত হচ্ছে, তাও দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই ছবির প্রকল্পে হয়ত বাঘের ঝাঁপিযে পড়া হতে পাবে, কিন্তু সেটা প্রাণবন্ত করে কীভাবে ছবির পর্দায় আনবেন? উনি একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলেন, ওটা স্ট্রিকট্‌লি প্রাইভেট। ওটাই তো এসব শটের সিক্রেট।

ভদ্রলোক হলিউডের প্রায় সব ডিরেক্টারেরই লেখা সার্টিফিকেট ঘরের চার দেয়ালে ফ্রেমবদ্ধ করে টাঙিয়ে রেখেছেন। তার 'মধ্যে একটি প্রশংসাপত্র দেখলাম যে ডিরেক্টার সিসিল বি. ডি. মিল লিখছেন যে তাঁর সঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জির পরিচয় বিশ বছরেরও অধিক। এসব দেখে থ' মেরে বিমলবাবুকে নিয়ে ঘরে ফিবে এলাম। দেখলাম ওঁদের ইউনিটের আর্ট ডিরেক্টার হয়ে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছেন মিঃ শীল, যিনি নিরহংকারী পণ্ডিত, মুখে সদাই হাসি। উনি জব্বলপুরের অধিবাসী হয়ে গেছেন। মিঃ ডি. পি. মিশ্রের অনুরোধেই এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, শখ করে।

গোল্ডেন ঈগলসের মিঃ লালা আমায় গল্পাংশ শোনালেন এবং সিনারিও তৈরীর আহ্বান জানালেন। 'পিয়াকী যোগন' অর্থাৎ প্রিয়ার জন্যে যোগিনী

সাজিব। কাজেই এই যোগিনীর খোঁজে সবাই চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসলাম। এলেন এক সুন্দরী নাম কৃষ্ণকুমারী! যার জন্যে যোগিনী হবেন কৃষ্ণকুমারী তার খোঁজ বোম্বাইতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাঁর খোঁজ করবো বলে সিনারিও লিখতে ভারসোভা বিচের কটেজে চলে যাই নিরালায় বসে কাজ করবার জন্যে।

পরি, অনিল ও আমি একদিন খোলা সমুদ্রের বালিরাশির ওপর বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে এই ছবিখানির একটি দৃশ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করছি, এমন সময় শ্রীবিমল মিত্র মশাই প্রোফেসর এস. এন. ব্যানার্জিকে নিয়ে ভারসোভায় এসে হাজির। দুজনকেই অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? আপনাদের ছবির কতদূর এগুলো?

প্রফেসর ব্যানার্জি বললেন, সেইজন্যেই তো আপনার শরণাপন্ন হতে এসেছি।

মুখের দিকে চেয়ে থাকি—উনি ধীরে ধীরে বলেন, আমাদের ডিরেক্টর পালিয়ে গেছেন।

আমি বলি, সে কি রকম? ছবি এতটুকু এগোয় নি? বললেন—প্রায় ১০/১৫ হাজার ফিট্ এক্সপোজ করিয়ে তিনি সরে পড়েছেন অথচ এই এক্সপোজড্ ফ্লিমের কিছুই আমাদের কর্তৃপক্ষের মনোমত হয়নি। সে যাক, এতদূর এগিয়ে তো আর ফেলে দেওয়া যায় না তাই ওরই মধ্যে রেখে ঢেকে এখনও কম করে ৭/৮ দিন শুটিং করলে তবে একটা রূপ দাঁড়াতে পারে। মিঃ ডি. পি. মিশ্র তাই একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান ও-বিষয়ে একটু আধটু পরামর্শের জন্যে।

আমি বললাম—এটা সুখের কথা, তাকে নিয়ে কবে আসবেন বলুন? সামনের রবিবার আমার দাদরের বাড়িতে এলেই ভাল হয়, কারণ আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি শনিবার।

রবিবার বেলা ৩টা নাগাদ প্রোঃ ব্যানার্জি—মিস্টার ডি. পি. মিশ্রকে নিয়ে আমার বোম্বাই-এর বাড়িতে পৌছলেন। মিঃ মিশ্র ওঁদের চিত্র-দুর্যোগের কথা সংক্ষেপে সেরে নিয়ে স্টোরির খামতি দৃশ্যগুলি পড়ে শোনাতে থাকেন এবং আমায় অনুরোধ জানান যে আমি যদি এ দৃশ্যগুলির শুটিং করে ছবিখানাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি।

আমি বলি—আমি যে অপর কনসার্নের কাছে কাজ করছি—তবে

আপনাদের যদি একান্ত আমায় পেলেই উপকৃত হন মনে করেন তবে রাত্তে শুটিং ফেলুন আমি করে দিয়ে আসবো।

কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে গেল···যে আজ আমি সারা স্ক্রিপটা পড়ে কিছু সাজেস্ট করবার থাকলে কাল বসে সব ঠিক করবো।

ওঠাব সময় মিশ্রজী বলেন—আপনার কত দক্ষিণা জানালে বাধিত হব।

আমি বলি—আপনি বিপদে পড়ে এসেছেন—আমি আপনার বিপদটুকু থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে পাবলেই ধন্য হব, দক্ষিণা লাগবে না। দক্ষিণা নেবই বা কেন? আমি তো অপর জায়গায় চাকর—ডবল চাকরি করা কি উচিত?

উনি হেসে কাল আবার আসাব কথা জানিয়ে নীচে নেমে যান। নামতে নামতে আবার উঠে এসে জানান—যে দৃশ্যে হিরোইন উদাস চোখে বাতায়নে বসে আছে তার পেছনে একটি সুরদাসের ভজন দেবো ভাবছি। আপনাকে ভজনের কথাগুলি দিয়েই যাই, সুর করে রাখবেন। কাল ডিসকাস করে ওটার সঙ্গতি করা যাবে।

আমি ওর লেখা কাগজখানি হাতে নিয়ে নি, উনি নেমে গেলেন। দেখলাম কাগজে লেখা সুরদাসের বিখ্যাত ভজন 'নিশিদিন বরষত নয়ন হামারি'—এইরকমই হবে।

একটু পরে আবার মিঃ ব্যানার্জি ফিরে এলেন—উনি আমায় নামিয়ে দিয়ে গেলেন—বললেন, আপনার দক্ষিণাটা আপনাকে নিতেই হবে।

আমি বললাম—কেন ক্রিমিন্যাল-এ ফেলতে চান? যান-যান বসকে বলুন ছবি শেষ করতে চান তো আমার কাছে আসবেন আর টাকা যদি দিতে চান তবে ফিল্ম লাইনে অপর সুকুমারবাবু অনেক জুটবে।

শেষবেশ বিনা দক্ষিণাতে শুটিং চালু করবার দিন ধার্য হলো—এবং শ্রীমতী লীলা চিটনিসকে নিয়ে প্রোফেসর ব্যানার্জি আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—সিনগুলো একটু রিহার্সাল করিয়ে দিন। লীলা দাদরেই থাকে ও এসে আপনাকে কয়েকদিন বিরক্ত করবে।

শ্রীমতী লীলা চিটনিস বি-এ মহারাষ্ট্র স্টেজের একজন সুদক্ষ অভিনেত্রী। ওঁর স্বামী ডাঃ চিটনিস একজন জার্মানীর ডক্টারেট। দুজনের সঙ্গেই আমার পরিচয় হলো। লীলাও তারপর থেকে নিতান্ত অনুগতার মতই আমার কাছে আসা-যাওয়া করতেন।

পিয়া কী যোগনের হিরোর জন্য প্রফেসর ব্যানার্জি—এলাহাবাদ থেকে তাঁর এক জানিত যুবককে আনিয়ে দিলেন—ইনিই হলেন এখন চিত্র, বেতার ও মঞ্চজগতের শ্রীপ্রমোদ গাঙ্গুলি। কাজেই পিয়াকি যোগনের কাস্টিং ঠিক হলো—প্রমোদ, কৃষ্ণকুমারী, সরদার আখতার, আশালতা, আগা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ছবিই আগার প্রথম ছবি। ক্যামেরায় গোবর্ধনভাই। দয়াভাই, সুধীর বাসু ইত্যাদি তাঁর অ্যাসিস্‌টেণ্টের দল। পবিকে আমি সাউণ্ড অ্যাসিস্‌টেন্ট করে সাউণ্ড এঞ্জিনিয়ার মিঃ দেশাই-এর সাথে জুড়ে দিয়েছি। সুধীর বসু—আমার ছোড়দির দেওর—ওকে বোম্বাইতে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন ক্যামেরার কাজ শেখার জন্য—তাই গোবর্ধনভাই-এর হাতেই তুলে দি। মিউজিকে আমি—অনিল বিশ্বাস সহকারী সঙ্গীত পরিচালক।

শ্রীমতী আশালতা ও শ্রীমতী লীলা চিটনীসকে পেয়ে আমার খুবই সুবিধা হলো—রেডিও-নাটকে। আমার বোম্বাই রেডিওতে তৃতীয় নাটক অভিনীত হলো—তুফান কী রাত (ঝড়ের রাতের হিন্দী)। প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রফেসর ব্যানার্জি, অনিল বিশ্বাস, আমি এবং দুজন অভিনেত্রীদের নিয়ে।

এদিকে 'ধোঁয়াধার' শুটিং রাত্রে, ইম্পিরিয়েল স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। শ্রীঅনিল বিশ্বাস সুরদাসের ভজনখানি একটি ভিখারীর রূপসজ্জায় সেজে উদাসীন রাজকুমারীর বাতায়নতলের রাস্তা দিয়ে গেয়ে চলে গেলেন··· ইত্যাদির শুটিং চলছে। দুবার শুটিং-এর পর ক্যামেরাম্যান মিঃ আম্বালাল প্যাটেল আমায় নিভৃতে নিয়ে বললেন—মিঃ বোস আমি ভেবেছিলাম ছবিখানি আমিই ডাইরেক্ট করে শেষ করে নেবো—আপনি এসে গিয়ে আমি সে সুযোগ হারাচ্ছি।

আমি বলি—অতএব কাল থেকে আমি সিক্ আপনিই এগিয়ে চলুন।

সেই কথা মতই কাজ হলো মিঃ আম্বালাল প্যাটেলই ধোঁয়াধার শেষ করলেন। আমি অসুস্থতার ভান করে ডুব মারলাম।

আমি পিয়াকি যোগনের শুটিং শুরু করলাম। আদর্শ চিত্রের শেষ পরিণতি দেখার আগেই প্রোফেসর ব্যানার্জি এলাহাবাদের টিকিট কিনে আমার কাছে বিদায় নিতে একদিন দুপুরে এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে আমি প্রথম দিনে যে শেষ উক্তি করেছিলাম—সিনেমাজগত তাই—সেইজন্য ফিরে যাওয়াই সমীচীন।

আমি বলি—সত্যিই আপনি এলাহাবাদে ফিরে চললেন না টিকিট কেটেছি বলে আমাকে···

উনি বলেন—ব্লাফ দিচ্ছি ভাবছেন—এই দেখুন টিকিট আজ সকালেই বুক করে তবে আপনার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছি।

টিকিটখানা হাতে নিয়ে আমি অনিল আর পরিকে বলি তোরা দুজনে চলে যা ভি. টি.তে (ভিকটোরিয়া টারমিনাস´) টিকিট রিফাণ্ড করে গিরগাঁও থেকে মিঃ ব্যানার্জির পোঁটলাপুঁটলি তুলে নিয়ে আয়।

মিঃ ব্যানার্জি ওরফে পিটুবাবু বলেন—সে কি মশাই, বাড়িতে তার করে দিয়েছি আমি যাচ্ছি···

আমি বলি—আবার তার করুন যে আমি যাচ্ছি না। কদিন বন্ধুর বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

উনি বলেন—মানে?

আমি বলি—দুদিন আমার কাছে থেকে যান। আমার অ্যাসিস্‌টেন্ট হয়ে পিয়াকি যোগনে কাজ করুন। অভিনয় করতে চান তবে পিয়াকি যোগনে যে স্টেটের রাজার-রোল রয়েছে সেই অংশটি অভিনয় করুন। বোম্বাই তেতো খাইয়ে অতিথি বিদায় দেবে এ ঘটতে দেবো না। পোলাও বিরিয়ানী না খাওয়াতে পারি বাঙ্গালীর ছেলেকে মাছ ভাত খাইয়ে মিষ্টি হাতে দিয়ে বিদায় দেবো। সেই অবধি পিটুবাবু আমার অ্যাসিস্‌টেন্ট হয়ে রয়ে গেলেন। ছবিতে পার্টও করেছিলেন।

আমার বাড়িতে এখন বেশ ভিড়। পরি, অনিল, আমি ব্যতীত প্রোফেসর ব্যানার্জি (পিটুবাবু), সুধীর বসু ও প্রমোদ গাঙ্গুলি। সবাই আমার কাছেই রয়ে গেল, ফলে বিদেশে সময়টা যেন সুখেই কাটতো। ছুটির দিন প্রায়ই সঙ্গীত প্রধান পণ্ডিত দিলীপ বেদী, আর হরিশ্চন্দ্র বালি এসে আসর জমাতেন। আমার বাড়ির তিনখানা বাড়ির পাশেই থাকতেন শ্রীমতী রোশেনারা। ইনি আবদুল করিম খাঁর ছোট কন্যা। নিশ্চয়ই জানেন যে আবদুল করিম খাঁর বড় মেয়ে হচ্ছেন শ্রীমতী হীরাবাঈ বরদকার। এঁদের কথা আমি আমার জাতিস্মরের শিল্পলোকে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছি। শ্রীমতী রোশেনারা এলে সঙ্গীতের আসর বসতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার গান শুনেছি। পিটুবাবুও ছিলেন একজন সঙ্গীত সমঝদার। অনিলের তো কথাই নেই। রবিবার বিকালে কখন কখন আমার সঙ্গে যাঁরা বাজনদার গিয়েছিলেন তাঁরা এসে অর্কেস্ট্রা বাজাতেন—তাদের চালনা করতো অনিল। কাজেই আমার বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল সঙ্গীতের আসর। সে আসরে কখন কখন উপস্থিত থাকতেন শ্রীমতী আশালতা, শ্রীমতী লীলা চিটনীস এবং বহু প্রোডিউসাররা।

পিয়া কি যোগনের স্যুটিং কালেই আমি সাগর মুভিটোনে যাতায়াত করতাম। ওঁরা আমার লেখা একখানি বই মনোনীত করে ইতিমধ্যেই রেখেছেন নাম তার Eternal মিউজিক বা মহাগীত। যার প্রতিপাদ্য বিষয় সামাজিক হলেও হিরো ছিল এক শব্দ বৈজ্ঞানিক যে প্রমাণ করে ফেলেছে যে জগতের যত শব্দ সবই ইথারে জমা থাকে—যাকে প্রতিধ্বনির মত জগতে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক রীতিতে টেলিভিশন মারফৎ। ১৯৩৫ সালেই আমি এর জন্য সাগরে প্রোজেকশন মেসিন মারফৎ প্লেব্যাক সিসটেমের পূর্ণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করি এই ছবিতে যা প্রতি মুহূর্তেই দরকার পড়বে। মেহবুবের ছবির গানের সময় যা ক্ষণিকের বন্দোবস্ত হয়েছিল তা আজ পূর্ণভাবে সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার চন্দ্রকান্তর দ্বারা সংগঠিত করে তুলি।

পিয়া কি যোগন সাধাসিধে ছবি তাই তিন মাসের মধ্যেই তার কাজ সুসম্পন্ন করে আমি সাগর মুভিটোনে পাকাপাকি ভাবে যোগ দিলাম। কিন্তু ইস্টার্ণ আর্টের ছবি সংদিল সমাজ যা মিঃ দরিয়ানীর ভাই শ্রীরাম. দরিয়ানী (আমার ধরম কী দেবীর অ্যাসিসটেণ্ট) করছিল তার সঙ্গীতাংশের শেষ আবহ সঙ্গীতের জন্যে অনিল বিশ্বাস ওখানেই রয়ে গেলেন। এবং পরি ও সুধীর যথাযথ মিঃ দেশাই ও গোবর্ধন ভাই-এর সঙ্গে ইস্টার্ণ আর্টসেই রয়ে যান। এই সময় পিটুবাবু ও প্রমোদ এলাহাবাদ ফিরে যান। সাগর মুভিটোনে আমি কেবল আমার সঙ্গীতের জন্যে যে যন্ত্রীগুলি আমি কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের ঢুকিয়ে নি। শ্রীনওশাদ (এখানকার বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক) ছিলেন আমার অর্কেস্ট্রার হারমনিয়ম বাদক।

আমার ছবির সুরুয়াতের পূর্বেই আমার উপর ভার পড়লো ডাইরেক্টর বাদামীর পরিচালনায় শ্রীযুত কানাইলাল মুন্সীর লেখা বই কুলবধুর সঙ্গীতাংশ ও ডাইরেক্টর লোহার সাহেবের ছবির সঙ্গীত পরিচালনার ভার। শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর (পরে বিখ্যাত ডিরেক্টর হয়েছিলেন) হলেন আমার পরিচালনার সহকারী। কিন্তু সঙ্গীত সহকারী অনিলই রইল। কুলবধুর হিরোর রোল করছে শ্রীমতিলাল —আর লোহারের ছবির হিরো তখন সুরেন্দ্র ও বিব্বো (মেহ্‌বুবের মনমোহন ছবির হিরোইন)। এছাড়া আমার কাজ চলেছিল মহাগীতের সিনারিও তৈরি, বৈজ্ঞানিক ছবির জন্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেণ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি; অর্থাৎ সাগরে ঢুকে পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না তখন হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে ফিরে এলেন পিটুবাবু। এবং আমার কাছে না উঠে উঠলেন আদর্শ চিত্রের

অফিসে কারণ ধোঁয়াধার আজও রিলিজ হয়নি···তার ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত হলেন।

আমার এই কর্ম দুর্যোগের মাঝে হঠাৎ উনি মিঃ ডি. পি. মিশ্রকে আবার আমার বাড়িতে নিয়ে এসে হাজির হলেন। ব্যাপার কি? না ধোঁয়াধার ছবির এডিটিং আমায় বসে করে দিতে হবে···নইলে ছবি তোলা হয়েছে দেড লাখ ফিট—কি করে যে তাকে রূপ দেবে—এমন লোক ওরা খুঁজেই পাচ্ছেন না। মিঃ মিশ্রকে আমি বললাম···এ কাজ আমার করতে হলে আমার সময় মাত্র রাত্রে···কাজেই সারারাত জেগে কাজ করতে হলে আমার শরীর ভেঙ্গে যাবে। তিনি বললেন—বেশ ৬টার পর আপনি সটান এডিটিংএ চলে আসবেন—এবং রাত বারটায় আপনাকে ছেড়ে দেবো। আমি বুঝলাম ওরা আমায় নিতান্তভাবেই চাচ্ছেন কাজেই আমার মত, বিনা দক্ষিণায় করতে দিলে করব বলে কথা দিলাম।

এই এডিটিং-এর কথাটুকু বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে আমাদের ছবি শেষে এডিটিং-এ সময় সময় কি রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তাই আপনাদের জানাতে। প্রথম রাত্রে ছবির টাইটেলের পিছনে নর্মদা প্রপাতের ওপর টাইটেল আসবে বলে নর্মদা প্রপাত দৃশ্যাবলীর ডাব্বাগুলি (অর্থাৎ টিনের ডাব্বা যার মধ্যে ১০০০ ফিট করে ফিল্ম ধরে) বার করা হল শুধু নর্মদা প্রপাতের ছবি এরা দশ ডাব্বা তুলে রেখেছিলেন। তা থেকে নেগেটিভ বাছাই করতে গিয়ে দেখলাম যে এমন একটি শট নেই যেখানে জলপ্রপাত নীচে ঝরে না পড়ে ওপর দিকে জলধারা উঠে আসছে।···অবাক কাণ্ড···এ কি করে সম্ভব হলো···রিভার্স নেগেটিভ চললেও তো এ কাণ্ড হতে পারে না। কাজেই প্রথম রাতে- রাত দুটো পর্যন্ত এভাবে প্রত্যেক নেগেটিভের একই দৃশ্য দেখে একটুখানি নেগেটিভ কেটে নিয়ে গেলাম। পরের দিন সেই টুকরোটিকে গোবর্ধন ভাই (ক্যামেরাম্যান) এবং যিনি ট্রিক ছবির রাজার বলা চলে তাঁকে দেখলাম। তিনি সেটি নিজের লেবরেটারিতে নিয়ে গিয়ে তারপর দিন তথ্য জানালেন। জানেন বোধ হয় আইমো নামে একটি হাত ক্যামেরা আছে। তার হাণ্ডেলটা ক্যামেরার নীচে ফিট করা। এবং এই দৃশ্যটি ডাব্বার যত ফিল্ম এই আইমো দিয়েই তোলা—ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাটিকে রিভারটেড করে ছবি তুলেছিলেন—অর্থাৎ হাণ্ডেলটিকে ধরে ক্যামেরাকে নীচে দিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে—উঁচু পাথরের ওপর শুয়ে পড়ে ফোটো

তুলেছিল তাই প্রপাতের সব জলই ওপর মুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। কাজেই সব কটা ভাব্বাই অর্থাৎ দশ হাজার ফিট ফেলে দিয়ে নূতন করে ছবি তুলতে জব্বলপুরে আবার ক্যামেরাম্যানকে পাঠানো হলো। এভাবে নতুন নতুন বিপত্তির মাঝে ধোঁয়াধারের কাজ রাত জেগে সাঙ্গ করা হয়।

সাগর মুভিটোনে আমার নিজের ছবি মহাগীত শুরু হলো...৩৫-এর ডিসেম্বর ; এতেই প্রথম টেলিভিশনের গায়ক ও যার পর্দার ছবি, একই সঙ্গে গান করছে দেখানো হয়, তাই পূর্ববর্ণিত প্লেব্যাক মেসিনের দরকার হয়। এই ছবির হিরোইন ঠিক করতে আমি ও চিমনভাইয়ের বড় পুত্র বুলবুলভাই কলকাতায় আসি। সেই সময় ডিরেক্টর কালীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁর পূর্ণ চুক্তি অনুযায়ী সাগর মুভিটোনে শরৎচন্দ্রের দত্তা করার প্রপোজাল দেন। কাজেই বুলবুলভাই আমার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় আছে জেনে আমাকে নিয়েই তাঁর কাছে আসার জন্য আমায় অনুরোধ করেন। আমি উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে শরৎদাকে ফোনে জানাই। বেশ মনে আছে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন—বই-এর দাম কত দেবে ? আমি বলি—পাঁচ হাজার বলেছি। উনি বলেন—আমি হাজার টাকা নি অত বেশী বললে পালিয়ে যাবে। উত্তরে আমি বলি—আপনি পাঁচ হাজার চাইবেন। ওঁরা জোরাজুরি করলে আমার উপর ছেড়ে দেবেন। আমি মধ্যস্থ হয়ে ঠিক করে দেবো।

কথানুরূপ ওঁর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে তারপর দিন সকালেই বুলবুলভাইকে নিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং শরৎদা পাঁচ হাজার চাইতে বুলবুলভাই ওঁকে কিছু কমাতে অনুরোধ জানান। উনি আমায় দেখিয়ে বলেন—ও হীরেনই তাহলে ঠিক করে দিক।

আমি মধ্যস্থ হয়ে বলি—বেশ এক হাজার টাকা আমার অনুরোধে উনি ছেড়ে দেবেন।

বুলবুলভাই চার হাজার ক্যাশ দিয়ে দত্তার চিত্র-রাইট কিনে নেন। শরৎদা আমাকে তাঁর চন্দ্রনাথকে নিয়ে ছবি করতে বুলবুলভাই-এর সামনেই প্রস্তাব করেন। বুলবুলভাই রাজী হওয়ায়—চন্দ্রনাথের জন্য আরও এক হাজার আগাম দিয়ে দিলেন। কথা হলো মহাগীত ছবির পর আমি ছবির মুহুরত করলে বাকী টাকা পাঠিয়ে দেবেন! শরৎদার উপন্যাস এই সর্বপ্রথম রূপায়িত হতে চলেছে।

এখানে এসে আমার মহাগীতের জন্য রমা ব্যানার্জি বলে একটি খ্রীস্টান

বাঙ্গালি মহিলাকে আমরা নিয়ে যাই এবং মহাগীতে মায়ার ভূমিকা অভিনয় করে এতই বিখ্যাত হন যে তিনি রমা ব্যানার্জির বদলে লোকমুখে মায়া ব্যানার্জি নামেই প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন। সুরেন্দ্র হলেন আমার ছবির হিরো। বাকী সুনলিনী দেবী (মিসেস সরোজিনী নাইডু ও শ্রীহারিন চট্টোপাধ্যায়ের বোন) পিয়াকি যোগনের কৃষ্ণকুমারী কানহাইয়ালাল তৎকালীন বিখ্যাত কমিডিয়ন মিঃ য়াডোয়ানি, শ্রীমতী সিতারা প্রভৃতিদের নিয়ে মহাগীত শুরু হলো। বেতার বার্তা প্রেরণ সেণ্টার তখন পুণার কাছে কিরকিতে ছিল। স্যার চিমনলাল চিনায় আমার পরিচিত ছিলেন—তাঁর সুবাদে আমার টেলিভিশন ল্যাব এর ট্রান্সমিশন সেণ্টার হলো কিরকির ট্রান্সমিশন সেণ্টারটি। এইভাবে বৈজ্ঞানিক চিত্র সংগঠিত হয়েছিল। (আমাদের সাগর মুভিটোনের পাবলিসিটি অফিসার—ফিল্ম ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বাবুরাও প্যাটেল আমার গল্পের পাবলিসিটি করতে গিয়ে—তাঁর এডিটোরিয়ালে গালাগালি না দিয়ে ঠেস দিয়ে লিখলেন—

A fanatic Bengali gentleman has given a fanatic story which he himself is directing. The name of the Funniman is Hiren Bose. He wants that people should believe that all the sounds of our world are ever kept in the Ether which the Hero of the picture is bringing back through Television. Yes, Television is a new subject which may be interesting to the public etc. etc.

মিঃ কানাইলাল মুন্সী মহাশয়ের কুলবধুর স্তব দেওয়ার পর থেকে আমি ওর বাড়িতে খুবই আদৃত হয়েছিলাম। সেইখানে আমায় নিয়ে গানের আসর বসতো। যেখানে গেলাম ফিল্ম ইণ্ডিয়ার এই রিভিউ। শ্রীকানাইলাল মুন্সী বললেন—এখনও পর্যন্ত টেলিভিশনের প্রতিষ্ঠাই ভাল করে জগতে হয়নি তুমি এমন একটি কল্পনা কোথায় পেলে হীরেন ?

আমি তখন ওঁরই বাড়িতে বসে ইলাসট্রেটেড উইকলির পাতা উল্টাচ্ছিলাম —হঠাৎ নজরে পড়ে গেল—এক পাতায় এসে। তার হেড লাইন হচ্ছে।

Disturbances of Etherial Sound in Radio Wave.

নিশ্চুপ বসে দু-চার লাইন পড়ে নিয়ে ম্যাগাজিনটা ওঁর হাতে তুলে দিলাম। উনি কিছুটা মনে মনে পড়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলেন—

While Her Hitler was sending message to Musolini a peculiar sound was heard which comes from Ether—the

scientists of Germany explains that all the pronounced and produced sound of the World are ever kept in Ether etc. etc.

উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীমুন্সী ওর পবিবারবর্গকে জানালেন—সত্যি এই ইয়ং হীরেনের কল্পনা তো ফ্যানাটিক নয়? বাবুরাও প্যাটেলও এইটি পড়ে তার পরের সংখ্যায় আমার গল্পের ও কল্পনার উচ্ছ্বসিত সুখ্যাত করেছিলেন।

মহাগীতের ইটারন্যাল মিউজিক সমস্ত নেগেটিভ ও পজেটিভ অটোমেটিক ল্যাবেতে সর্বপ্রথম পরিস্ফুট করে তোলেন শ্রীগঙ্গাধর....ইতিপূর্বে যা কোন ডিরেক্টারই এঁর নেগেটিভ ব্যবহারের ভরসা পাননি। আমার এবারের ক্যামেরাম্যান শ্রীরজনীকান্ত প্যাটেল ও সাউণ্ডে চন্দ্রকান্ত প্যাটেল এঁরা দু' ভাই আমারই মত দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। (পরে এই দুভাই প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীসাউণ্ড স্টুডিও। তাই সম্ভব হয়েছিল প্লেব্যাক মেশিন এবং অটোমেটিক ল্যাব চালু করার।

ফজলভাই লিমিটেডের স্বত্তাধিকারী শ্রীআকবর আলি আমাব বন্ধু ছিলেন স্যার চিমনলাল চিনাই-এর দৌলতে। আমি তাঁর কাছে পরি ও সুধীরকে নিয়ে গিয়ে একদিন বলেছিলাম—মিঃ আকবর আলি ক্যান ইউ গিভ দিস টু চ্যাপস সাম সার্ভিসেস, ইন দেয়ার ইনডিভিজুয়্যাল ক্যাপাসিটি। উনি বলেছিলেন, চেষ্টা করব।

আজ হঠাৎ তাঁর ডাক পডলো—স্পেশাল চিঠি স্ট্রিক্টলি কন্‌ফিডেনসিয়াল—সেইদিন বিকেল চারটা নাগাদ আমি তাঁর অফিসে উপস্থিত হলাম। তিনি আমায় ডেকে বললেন—ভাই এদের এক একটা চাকরী হয়—যদি আপনি আমার একটা প্রোপজাল গ্রহণ করেন। আমি বিস্মিত মুখে ওঁর পানে চেয়ে থাকি। উনি বলেন, শুনুন ভিজেগাপটমে ছত্রিশগডের রাজারা মিলে এক বিরাট স্টুডিও গড়ে তুলেছেন—তার নাম অন্ধ্র সিনেটোন। মনে করুন একশ বিঘা জমি—যার এক পাশে পাহাড় আর এক পাশে সমুদ্র এমন স্টুডিও আমাদের সারা ইণ্ডিয়ার কোথাও লোকেটেড্ নয়। আমি ওঁদের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মেশিনারী সাপ্লাই করেছি। অথচ ওঁদের ভাল ডিরেক্টার আজ অবধি পাননি। আমায় তাঁরা ভার দিয়েছেন এ বিষয়। তাই আমি প্রোপজ করছি আপনি এইখানে যোগ দিন। মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাবেন ··এবং ওখানে আপনার দুই ভাইকে সাউণ্ড এবং ক্যামেরাতে স্বতন্ত্র সুযোগ করে দিতেও পারবেন। আমি

বলি—সাগর মুভিটোন আমার পরের ছবির জন্য শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস কিনেছেন···এ অবস্থায়? আকবর আলি বলেন—আরে সে ছবি আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন আমি চিমনভাইকে সামলে নেবো—আপনি ওখানে গেলে—আমার ৪০ লক্ষ টাকার মেসিনেরও সংরক্ষণ হবে—কারণ স্টুডিও চালু হলেই আমার ইনস্টলমেন্টগুলো ঠিক ঠিক আসবে। আমি বলি চিন্তা করে দেখি।

বাড়িতে এসে পরামর্শ করতে সবাই নেচে উঠলো। অনিলকে তারপর দিনই আমি এনে চিমনভাই-এর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলি—আমার নিজের ছবি করতে গেলে মিউজিকের সময়ের অভাব হচ্ছে, কাজেই অনিলকেই দিন না কেন সারা মিউজিকের ভার—ওর যোগ্যতার পরিচয় ইতিমধ্যেই আপনি পেয়েছেন। সেদিন থেকেই শ্রীঅনিল মিউজিক ডাইরেক্টর হয়ে সাগর মুভিটোনে বসলো। তার প্রথম ছবি—মেহ্‌বুবের 'ওয়াতন'। সে ছবির প্রথম গানের সুরও আমাকেই করতে হলো—কারণ মেহবুবের বিশ্বাস যে আমি ওঁর একমাত্র পয়মন্ত সঙ্গীত পরিচালক। আমার বেশ মনে আছে গানখানি গেয়েছিলেন শ্রীমতী সিতারা—'কিঁও তুমনে দিয়া দিল কিসকো ইশারায়'।···এর মধ্যে শরৎদার একখানি চিঠি পাই···তাতে তাঁর কি কি বই গুজরাটি হিন্দীতে অনুবাদিত হয়েছে জানতে চেয়েছেন এবং পরিশেষে জানিয়েছেন···'চন্দ্রনাথ' যদি আরম্ভ না করি তাহলে তিন মাস পার হলে টাকা না নিয়ে বইখানি যাতে ফিরত যায় তার অনুরোধ। তলে তলে সবই ঠিক হয়ে গেল আকবর আলির সঙ্গে। আমি বললাম, কিন্তু চিমনভাইকে সামলাতে হবে আপনাকে। শরৎদাকেও চুপি চুপি লিখে দিলাম—আমি চন্দ্রনাথ ছবি···বন্ধ করছি ...আপনার বই-এর রাইট আপনার কাছেই ফিরত পাঠাচ্ছি।

শুভক্ষণে কি দুর্যোগে জানি না, আমরা ভিজেগাপটামের অন্ধ্র সিনেটোনে পৌঁছলাম গাড়ি-বাড়ি-ও পাঁচ হাজার টাকার মূল্যে। কলকাতায় তখন আদর্শ চিত্রের দ্বিতীয় ছবি হচ্ছিল 'দলিত্ কুসুম'। মিঃ ব্যানার্জি (পিটুবাবু) ওখানেই কাজ করছেন। তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করে সমস্ত বাঙালি টেকনিশিয়ন নিযুক্ত করলাম অন্ধ্র সিনেটোনে। ক্যামেরায়—শ্রীজিৎ সিং এবং তাঁর সহকারী দেওজীভাই, সাউণ্ডে—ডাঃ শিশির চাটুজ্যে, তাঁর সহকারী—পরি বোস, লেবরেটারিতে—শ্রীকুলদা রায়,' সহকারী শৈলেন ঘোষাল, শৈলেন মুখুজ্যে, মিউজিক অ্যাসিস্টেন্সিতে নিলাম—শ্রীসুধীর ঘোষ দস্তিদারকে। এডিটার আনালাম বোম্বাই থেকে

আমার ধরম কি দেবী ও পিয়া কি যোগনের সম্পাদক—শ্রীআর জি গোরেকে। তার অ্যাসিস্‌টেণ্ট হিসাবে—শ্রীবিনয় ব্যানার্জিকে।

কিছু কিছু মিউজিশিয়ানও আনিয়ে নিলাম—যেমন মিঃ কৈলো, মিঃ এব্‌লস—তাছাড়া নিলাম বিখ্যাত তবলা ও সরোদ বাদক শ্রীআজীম খাঁ সাহেবকে। পিটুবাবু-অশ্বিনীকে (এলাহাবাদ) নিলাম আমার অ্যাসিস্‌টেণ্ট করে। সারা স্টুডিওর গঠন শেষ হলো—মিঃ মনি আর্ট ডিরেকটর। মিঃ জগন্নাথ রাজু (ওখানকার বিখ্যাত পাবলিক প্রোসিকিউটার) ছিলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং জে-পুরের মহারাজ—তখনকার অন্ধ্র ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সলার ছিলেন আমাদের চেয়ারম্যান অফ দি বোর্ড।

ছত্রিশগড়ের রাজারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন—এঁদের টাকায় এই বিরাট স্টুডিও—ওয়ালটেয়ার স্টেশন থেকে দু মাইল দূরে।....এর জন্য নতুন রাস্তা তৈরী পর্যন্ত এঁরা খরচা করেই করেছেন। সব কটি রাজাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো.... সবই যেন রাজসিকভাবে চলেছে। ছবি মহাভারতের....এক অংশ...জতুগৃহ দহন থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর পর্যন্ত। এর জন্যে দেখলাম মিঃ ম্যনি থ্রি পিস্ উড্ দিয়ে ফ্লাট-রথ—সবই তৈরী করে ফেলেছেন। সারা স্টুডিওর মাঝে জায়গায় জায়গায় বাঘের খাঁচায় বাঘ, হরিণের এন্‌ক্লোজার-এ হরিণ। ময়ূর.... ইংত্যাদি ইত্যাদি করে সারা স্টুডিওর প্রশস্ত উঠোনকে জু গার্ডেন করে সাজিয়ে রেখেছেন। স্টুডিও উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছে···মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্ণর এসে উদ্বোধন করবেন—প্রধান হতিথি হচ্ছেন শ্রীমতী সরোজনী নাইডু। এঁদের স্টেশন থেকে স্টুডিও আসার নবনির্মিত পথের দু-পাশে চুনকাম করা শ্বেত টবে টবে বাঙ্গালোর থেকে ক্রোটন গাছ কিনে সাজানো হচ্ছে। স্টুডিও স্টাফের ডিপার্টমেণ্ট অনুযায়ী পরনের অ্যাপ্রোণ করা হয়েছে··অতিথিদের ডিপার্টমেণ্টাল অভ্যর্থনা করার জন্য। অর্কেস্ট্রা পার্টির নবতম সুর যোজনা করা হয়েছে··· উদ্বোধনের আবহ সঙ্গীত উপলক্ষে।

যথাসময় মাদ্রাজের ইংরেজ গভর্ণর সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে প্রধান অতিথিও এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো···চালনা করছি আমি। প্রতিটি ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিয়ে আমি বুঝিয়ে দিয়ে ডিপার্টমেণ্টাল হেডদের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি···মিঃ জগন্নাথ রাজু এ ভার আমার উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। গভর্নর সাহেব (নামটা এখন ভুলে গেছি) আমার উপর খুব খুশী। সমস্ত পরিদর্শন করে স্টুডিওর উদ্বোধনী হলো—উদ্বোধনী

সভায় ছত্রিশগড়ের প্রায় ছত্রিশজন রাজাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের প্রমুখ মহারাজ অফ-জে-পুর। উদ্বোধন পর্ব শেষ হলে বেলা তিনটায় পুলিস ক্লাবে চায়ের নিমন্ত্রণ। সেখানে একটি টেবিল ঘিরে বসলাম—গভর্ণর সাহেব, আমি, মিসেস সবোজিনী নাইডু ও মিঃ জগন্নাথ রাজু। ওখানে বসেও গভর্ণর সাহেব ফিল্ম সংক্রান্ত প্রশ্নই আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম আমার বাড়িতে দেওয়ানজি (মানে জে-পুর মহারাজার দেওয়ান) আমার অপেক্ষায় বসে। আসতেই বললেন—কাল সন্ধ্যায় মহারাজ গভর্ণর সাহেবকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেছেন·· আপনাকেও ডিনারে যোগ দিতে হবে—তারই নিমন্ত্রণে আমি এসেছি। চা খেয়ে, গল্প করে দেওয়ান সাহেব বিদায় নিলেন।

এর পরদিন সকালেই মজা জমে উঠলো। ভোর না হতেই দেওয়ান সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। ব্যাপার কি? উনি বলেন—মহারাজ বললেন আপনার বোধহয় ডিনার স্যুট্ নেই···তাই আমায় পাঠালেন আপনার ডিনার স্যুটের জন্য ···যাতে আপনাকে নিয়ে এখানকার রাজবাড়ির টেলারের ওখানে পৌঁছে যেতে পারি। তাঁকে ফোন করে মহারাজ বলে দিয়েছেন যাতে সন্ধ্যার মধ্যেই আপনার ডিনার স্যুট আপনার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়।

আমি বলি ডিনার স্যুট কি হবে? আমি বাঙালী বাংলা পোশাকেই ডিনার খেতে যাবো—এ তো আর অফিসিয়াল কিছু ফাংশন নয়?

উনি বলেন—না স্যার গভর্ণর সাহেব ফোন করে মহারাজকে জানিয়েছেন যে যেন তাঁর সিটের পাশেই আপনার সিট পড়ে—যাতে করে তাঁর ফিল্ম সম্বন্ধে আরও কিছু জানার সুযোগ হয়।

আমি বললাম—ঠিক আছে আপনি মহারাজকে গিয়ে বলুন বাঙালি পোশাকেই যাবো···এতে কোন দোষ হবেনা। ···উনি ফিরে গেলেন কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এলেন···বললেন—না স্যার তা হবার জো নেই। মিঃ জগন্নাথ রাজু, মহারাজ বব্‌লি, মহারাজ পারলাম কুডি, মহারাজ পাবলা কেমডি —মহারাজ নিজে এঁরা সবাই বিচার করে দেখেছেন যে আপনার বাঙালি বেশে ওখানে যাওয়া উচিত হবেনা···তাই চলুন আর দেরী করবেন না···তাহলে সন্ধ্যার মধ্যে স্যুট্ ডেলিভারি দিতে পারবে না টেলার।

আমি হেসে বললাম—যা বাবা···দোষী নিজে জানিল না কি দোষ তাহার— বিচার হইয়া গেল। অর্থাৎ আমি কি পরে যাবো—এবং তা পরা উচিত অনু-

চিতের বিচার পর্যন্ত হয়ে গেল। ধরুন যদি বলি—তবে থাক—আমার ডিনারে খেয়ে দরকার নেই।

তুড়ীলাফ মেরে দেওয়ান সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বলেন—বলেন কি মশাই, স্বয়ং গভর্ণর সাহেব আপনাকে ডেকেছেন ডিনারে, আপনি সেই ডিনারে—যাবেন না ?

আমি একটু স্থির থেকে জিজ্ঞাসা করি—এ ডিনারে মিসেস সরোজিনী নাইডুও আসছেন নাকি ?

উনি বলেন···নিশ্চয়ই। গভর্ণরের একপাশে আপনার সিট্ অপর পাশে তাঁর সিট্।

আমি বলি—সরোজিনী দেবী কি ডিনারে গাউন পরে আসছেন ?

হক্‌চকিয়ে গিয়ে দেওয়ান সাহেব বলেন—না, না, তিনি গাউন পরবেন কেন—উনি যেমন শাড়ি পরেন তেমনিই আসবেন।

আমি বলি—তবে ? উনি শাড়ি পরতে পারেন—আমি ধুতি পাঞ্জাবি চাদর কেন পরতে পারবো না ?

উনি আমতা আমতা করে বলেন—আপনার এ আপত্তিতে মহারাজ ভয়ানক বিপদে পড়বেন।

আমি বলি একটুও বিপদে পড়বেন না। বরং আপনি বা মহারাজ নিজে গভর্ণর সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন···আমি আমার ন্যাশনাল ড্রেস পরে এলে··· তাঁর আপত্তি আছে কিনা ?

দেওয়ান সাহেব খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরলেন। এবং আধ ঘণ্টা পরেই নাচতে নাচতে ফিরে এসে জানালেন—অনেক ভেবে চিন্তে গভর্ণর সাহেবকে ফোনে জিজ্ঞাসা করায় উনি বলেছেন—নো-নো মিস্টার বোস সার্টেনলি। শ্যাল কাম ইন হিজ ন্যাশনাল কস্‌টিউম। খুব মশাই। আপনার মত জেদী লোক আমি কদাচ দেখিনি ইত্যাদি বলে বিদায় নিলেন। সে রাত্রে যথারীতি বাঙ্গালি বেশেই ডিনার খেলাম এবং গভর্ণর সাহেবের ফিল্মী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

এর এক সপ্তাহের পরেই মহারাজ জে পুরের বাড়িতে এক গোপন বৈঠকে জানতে পারলাম যে বাহ্যিক আড়ম্বরে—এদের সমস্ত টাকা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তাই মহাভারতের অংশের বদলে একটি ছোট ছবি প্রয়াস করাই এখন সমীচীন। জয়দেব ছবির মতলবটা আমিই দিলাম। মহারাজা অনুমোদন করলেন। এবং ফলে হিন্দী ও তেলেগু দুই ভারসনে ভক্ত জয়দেব ছবির মুহুরত সংগঠিত হলো।

কিন্তু টাকার সঙ্কুলান না হওয়ায় মাঝ পথেতে হিন্দী সংস্করণ বন্ধ করে শুধু তেলেগু সংস্করণই হতে থাকলো। এবং বহু আর্থিক অনটন ঝঞ্চার মধ্যে কোনক্রমে এই প্রোডাকশন শেষ হলো। এতো সমস্যার পর ভক্ত জয়দেব ভাইজাগে রিলিজ হলো—মাদ্রাজেও সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ পেলো—যাকে বলা যায় সুপার-সুপার হিট—তাই ফলাফল ঘটলো। দক্ষিণ অঞ্চলের এই প্রথম ছবি যার সঙ্গীতাংশ উত্তর ভারতীয় রাগরাগিণীতে হয়—এবং যা দর্শক শ্রোতাদের মনে সঙ্গীতের এক নতুন সুর বেজে উঠেছিল। এরপর আমি শুধু সিনেটোন ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসি—এর কারণ অর্থের অনটনে অনেক ভুল বোঝাবুঝি পরিস্থিতি ঘটেছিল। মিঃ জগন্নাথ রাজু কিন্তু অদ্ভুত ভদ্র, বিনয়ী ও সুবিবেচক ছিলেন···মহারাজ জেপুরের ততোধিক অমায়িকতা সত্ত্বেও আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করতে হয় আমার নিজের কারণে। এবং ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বরের গোড়ায় আমি কলকাতায় ফিরে আসি এক রকম ওঁদের না জানিয়ে।

সেই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমি শেঠ গোবিন্দ দাসজীর আমন্ত্রণ পেলাম আফ্রিকা অভিযানের। যার কথা আমি অমৃতেই সাফারি লেখায় বর্ণনা করেছি। ছবিখানির আফ্রিক্যান আউটডোর শেষ করে আমার মার রোগ শয্যার খবর পেয়ে আমায় কলকাতায় ফিরতে হয় এবং এখানে কালী ফিল্মসে 'অধুনা টেকনিশিয়ন স্টুডিওতে এই ছবি শেষ করতে হয়। আফ্রিক্যান কন্টিনিউটি মিলাতে আমাকে আর্টিস্ট নিয়ে চিটাগংগ-রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার প্রভৃতি জায়গায় সুটিং করতে হয়। ১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি আফ্রিক্যামে হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া ইন আফ্রিক্যা রিলিজ হয়।

১৯৩৮ সালে কলকাতায় ফিল্ম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়। এঁদের কর্মকর্তারা আমার বোম্বাই-এর বন্ধু। কলকাতায় কালী ফিল্মসে সুটিং কালে এঁরা আমায় আমন্ত্রণ জানান এক বিজ্ঞান ভিত্তিতে ছবি করার জন্য এবং ওরা আমার 'মহাগীত ছবি দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বলেন ওটারই বাংলা সংস্করণ করে দিতে। তারই বাংলা ছবির জগতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শুরু হলো অমর-গীতি ছবি—যা মহাগীত নামে সাগরে করে এসেছিলাম। এতে হিরোর পার্ট করার জন্যে শ্রীপ্রমোদ গাঙ্গুলীকে এলাহাবাদ থেকে আনিয়ে নি। সাবিত্রী (পত্নী) হিরোইন—এবং অহীনবাবু, ছায়া দেবী, ছোট ছায়া, হরেন রায় (শ্রীরবি রায়ের ছোট ভাই)—ছোটদের রোলে (শ্রীসুনীল মিত্র অকালে

মৃত) এবং মায়া মিত্র (আজ-কালের বিখ্যাত বীণা ও সেতার বাদিকা) রাজলক্ষ্মী দেবী, রেবা দেবী প্রভৃতিরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ক্যামেরায় ছিলেন শ্রীঅজিত সেন (মিঃ অশোক সেনের ছোট ভাই) সাউণ্ডে শ্রীযুত মধু শীল। সঙ্গীতে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, সহকারী ছিলেন—শ্রীশচীন দেববর্মন। গীতিকার লেখক ও পরিচালক ছিলাম আমি। এখানেও কাশীপুর ট্রান্সমিশন সেণ্টারের সাহায্য আমি এ ছবিতে নিয়েছিলাম। আর্ট ডিরেকশনে ছিলেন—শ্রীঅর্জুন রায়, সহকারী—গোপী সেন।

এ ছবির সঙ্গে দুটি বিশেষ ঘটনা জড়িত থাকায় আমি উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। প্রথমটি খুবই দুঃসংবাদ দ্বিতীয়টি সুসংবাদ।

দুঃসংবাদ এই জন্যে বললাম যে অমর গীতির সুটিং কালে মিঃ বড়ুয়া ছুটে এসে খবর দেন নিউ থিয়েটারে আগুন লেগে গেছে। সুটিং বন্ধ করে তখনই দুজনে দৌড়ে চলি নিউ থিয়েটারে। দেখলাম লেবরোটারী বাড়ি থেকে ধোঁয়া ও আগুনের ঝলক বেরুচ্ছে। পিছনেব দোতলার জানলা থেকে লেবরেটারী অ্যাসিস্‌টেণ্ট পঞ্চুবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একতলায়-নীচে টিনের ডাস্টবিন থাকায় তাঁর উরুতটা দু ফাঁক হয়ে গেছে। যতশীঘ্র পারা গেল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে—ছুটে চলে আসা হলো ফিল্ম করপোরেশনে। গোপী সেনকে দিয়ে সেটিং ডিপার্টমেণ্টকে দিয়ে ডজনখানেক বাঁশের লগি চিরে তার মধ্যে নিউ থিয়েটার্স অন ফায়ার বোর্ড পুরে (যা তখনই লেখানো হয়েছিল টাইটেল লেখককে দিয়ে)···আমি ও মিঃ বড়ুয়া বেরিয়ে গেলাম মোটর ছুটিয়ে কলকাতা ফুটবল গ্রাউণ্ডের দিকে। সেদিন এখানে মোহনবাগান শীল্ড খেলা খেলছিল। কাজেই স্টুডিওর ছেলে বুড়ো থেকে শুরু করে মিঃ সরকার অবধি এই মাঠের দর্শক। আমরা মোটর থেকে নেমে ওখান থেকে ছোট ছোট ছেলে যোগাড় করে—তাদের কাঁধে ওইগুলি দিয়ে মাঠের ভিড়ের মাঝে ছেড়ে দিলাম। এবং স্টুডিওতে ফিরে এলাম। ১৫।২০ মিনিটের মধ্যেই দেখলাম ফল ফলেছে কারণ একে একে সবাই ছুটে এসে পড়লেন স্টুডিও কম্পাউণ্ডে—তখন নিউ: থিয়েটার্সের ১১২।১৪ খানা ছবির নেগেটিভ পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। মিঃ সরকার এসে ঢুকলেন—চেহারায় এতটুকু দুঃখ মালিন্য নেই। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন পঞ্চুবাবু কেমন আছেন তাঁর জ্ঞান ফিরেছে কিনা। তারপর এসে গোলঘরে বসে সিগারেট খেতে খেতে বললেন—গেছে আবার হবে। সবাই নিশ্চুপ, উনি মোটরে উঠে বাড়ি চলে গেলেন। এ দৃশ্য আজও ভুলতে

পারিনি বলেই লিখলাম। মিঃ সরকারের সহগুণ, বিপদে স্থিরতার মূর্তি আমি আজও ভুলিনি।

আমার অমর গীতির শেষাশেষি মিঃ বড়ুয়া শাপমুক্তি ছবিখানি শুরু করতে যাচ্ছিলেন যখন এই ঘটনাটি ঘটে। ফিল্ম করপোরেশনেই ওঁর শুটিং হবে—মিঃ দরিয়ানীর ছবি এটি (আমার ইস্টার্ণ আর্টের বস)। অনুপমকে মিঃ বড়ুয়ার শাপমুক্তিতে সঙ্গীত পরিচালক করে নিতে মিঃ বড়ুয়াকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সহকারী ছিলেন—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়। এই ছবিতে বোম্বাই-এর প্রথম কালাব কুইন শ্রীমতী পদ্মাদেবী হিরোইন ছিলেন—এবং (পরে আমার রচিত আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ যদি নাইবা জ্বলে-র গাইয়ে শ্রীরবীন মজুমদার—সেজেছিলেন—হিরো। এই সূত্রে মিঃ বড়ুয়া আর আমি আবার মিলিত হলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি অত্যন্ত সুখকব এই জন্যে—যে এই অমব গীতি ছবির ফলাফলে ফিল্ম কর্পোরেশনেব অধিকর্তা মিঃ কাবরা আমাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন—যেমন রিক্তা সাফল্যে তিনি শ্রীসুশীল মজুমদারকে সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম—মিঃ কাবরা যদি আপনি সত্যই আমাকে আমার ছবির জন্যে পুবস্কৃত করতে চান তবে এসব পদক দিলে আমি ভুলব না, আপনাকে আমার মনোমত কিছু দিতে হবে। তিনি জানতে চাইলে বলেছিলাম আমি চাই টেকনিশিয়ান দিয়ে একটি সংস্থা গড়ে তুলতে—এর প্রাথমিক টাকা যা লাগবে তা যদি আপনি আমাকে দেন। তিনি আমার কথার অমান্য কবেন নি। ওঁব নিজেব ভাইকে সামনে খাড়া করে আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে গডতে দেন। মিঃ মধু শীলকে নিয়ে আমি ও লক্ষ্মী-নারায়ণ কাবরা মিলে শুরু করলাম—মুভি টেকনিক কোম্পানী—পরে অবশ্য শ্রীযুত সি. সি. সাহা এতে যোগদান করেছিলেন। প্রাইমা ফিল্মস (রূপবাণীব নানেরা)-এর ডিস্ট্রিবিউটর্সে আমরা শুরু করলাম কবি জয়দেব ১৯৪১-এর শেষ। সারা ভারতবর্ষে টেকনিশিয়ান কোম্পানী এই প্রথম গড়ে উঠলো—তাই বলছিলাম যে সুখকর সংবাদ।

১৯৪২ সালে কবি জয়দেব রূপবাণী চিত্র গৃহে আত্মপ্রকাশ করে। আমার আগের ছবি অমর গীতিও এইখানেই রিলিজ হয়েছিল। এ ছবিতে আমিই জয়দেবের ভূমিকায় অভিনয় করি এছাড়া ছিলেন শ্রীনরেশ মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত রায়, জহর গাঙ্গুলী, গোকুল মুখুজ্যে, প্রমোদ গাঙ্গুলী প্রভৃতিরা

ও মেয়েদেব মধ্যে পদ্মার ভূমিকায় ছিল শ্রীমতী চিত্রা (ভুঁদি), রাণীবালা, নিভাদেবী, রেবাদেবী প্রভৃতিরা।

প্লেব্যাকে গেয়েছিলেন—শ্রীসুধীরলাল, সত্য দত্ত, আমি, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, মিনতি সরকার, গোকুল মুখার্জি ইত্যাদি। অমর গীতি ছবিতে গেয়েছিলেন—শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার ও দ্বিজেন চৌধুরী।

ক্যামেরায়—শ্রীঅজিত সেন, সাউণ্ডে—মধু শীল, সঙ্গীতে—শ্রীসুবল দাশগুপ্ত। গীতিকার, সুরকার, চিত্রনাট্যকাব ও পবিচালক—আমি। ছবিখানিতে ২৮ খানি গান মনে পড়ে।

এ ছবিখানির ভাগ্যে কলকাতার দর্শক পয়সা দেননি…কিন্তু মফঃস্বল ও গাঁয়ে এটি ছিল টাকার মিণ্ট। কারণ শিউড়ীর প্রখ্যাত একজিবিটর ভুলিবাবু—বলেছিলেন আমার ছিল টুরীং থিয়েটার। কবি জয়দেব ছবি আমার সিনেমায় এক বছর ধবে সমানে চলে—আমাকে তিনটি চিত্রগৃহের মালিক করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে ১৯৩৯ সালের শেষাশেষি কিন্তু, এর রেশ এসে ভারতবর্ষের সাধারণকে বিব্রত করে তোলে নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। কবি জয়দেব ছবিব—মুভি টেকনিকের মধ্যেও সে পলিটিক্স বিস্তার করেছিল। তাই তার পরবর্তী ছবি তাঁরা আমাব মহুয়াব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট শ্রীফণী মজুমদারকে দিযে শুরু করেছিলেন আমায় না জানিয়ে। ফণীবাবু তখন ডাক্তার ছবি কবে সবে নাম করেছেন। ফণীবাবু এসে আমায একথা জানান—যার জন্য আজও আমি ফণীবাবুকে শ্রদ্ধা করি।

যাই হোক মুভি টেকনিক যখন পলিটিক্সের কবলে তখন আমি নিজেই প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা শুরু করি।

এদিকে ১৯৩৯ সালে আমার কলকাতায় প্রত্যাবর্তনে রেডিও অফিস থেকে নৃপেনদা আমায় আহ্বান জানান বহিরাগত প্রোডিউসার হিসাবে। স্কুল ব্রডকাস্টিং-এর চার্জে তখন ছিলেন আজকের ফিল্ম ডাইরেক্টর শ্রীপ্রভাত মুখার্জি। তিনি আমার আফ্রিকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৫টি ধারাবাহিক প্রোগ্রাম করেন। নৃপেনদা জঙ্গল ফিচার হিসাবে ৩।৪টি করান এবং কবি জয়দেব নাটক ছবি হবার পূর্বেই বেতারে অভিনয় করার ভার দেন।

আফ্রিকার জঙ্গলে সাফারি করে আসার পর হিন্দুস্থান কোম্পানী আমার গান রেকর্ড করেন—কিন্তু অতি ভ্রমণে স্বরের মিষ্টত্ব হারালো আমি অনুভব করি

কাজেই স্যাম্পেল রেকর্ড শুনে তা বন্ধ করে দি। আজও সে স্যাম্পল রেকর্ড দুখানি আমারই কাছে সুরক্ষিত রয়েছে।

বহু শিল্পীকেই আমার শিক্ষকতায় রেকর্ড করিয়ে নিচ্ছিলেন। ১৯৪২ সালে শাপমুক্তির রিলিজের পর আমি রবীন মজুমদার ও রবীন চাটুজ্যেকে নিয়ে ফের মেগাফোন কোম্পানীতে যোগ দি। আমাদের সঙ্গে সুরকার শ্রীদুর্গা সেনও ছিলেন। সেই সময় রেকর্ড হলো—'আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ' ও 'মোর প্রেম গান'—সুরকার শ্রীরবীন চাটুজ্যে। শ্রীরবীন মজুমদার আরও গেয়েছিলেন—'চলে রাতের রজনীগন্ধা' ও 'তবু জাগেনিক চৈতালি'। শ্রীধীরেন মিত্র মশাই গেয়েছিলেন 'ঘুমাও ঘুমাও তুমি প্রিয়া' ও 'আবার নামিল নব বাদল নভে'—যা বাংলার ঘরে ঘরে বাজতে শুরু করে। এই কখানা গানের সুরকার দুর্গা সেন। ভবানী দাস গাইলেন বাংলা ভজন আমারই সুরে—'হে তীর্থ ধূলি প্রয়াসী' ও 'সেই বৃন্দাবন বনছায়ায়'—আধুনিক গানের প্রচেষ্টা তাঁকে দিয়ে করা হয়েছিল। 'অভিমান করো না প্রিয়া'—সুর করেছিলেন শ্রীদুর্গা সেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে যে গান মেগাফোন থেকে রবীন মজুমদার প্রমুখ কোরাস বেরিয়েছিল—তাতে রবীন ছাড়া ছিল শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা (পূর্বের শ্রীমতী মৃদুলা গুপ্তা) ও শ্রীমতি যুথিকা ঘোষ। এছাড়া শ্রীমতী ছায়া দেবী প্রভৃতির গান আমার লেখা দুর্গা সেনের সুরে হয়েছিল। কাজেই কলকাতায় ফিরে আবার আমার রেকর্ডের কাজ শুরু হয়েছে। ত্রিমুখী কর্মদক্ষতা। এই সালেই আমি হোমিওপ্যাথিতে এম-ডি ডিগ্রী পাই·· এবং পরে রেজিস্টার প্র্যাকটিশনার হই।

এদিকে আমার নিজের চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রাইমা ফিল্মের সহায়তায় গড়ে উঠতে থাকে। মেগাফোন কোম্পানীই একটি ঘর আমায় দিয়াছিলেন অফিস ও রিহার্সাল করার জন্য। রবীন মজুমদারকে দিয়ে একখানি গানের রিহার্সাল চলছিল। শ্রীমতী সুনন্দা দেবী এসে আমার এ ছবিতে কাজ করায় চুক্তিবদ্ধ হলেন—ওঁর চিত্রজগতে এই প্রথম প্রবেশ। ওঁকে আমার কাছে এনেছিলেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়।

বিশ্বযুদ্ধ তখন এগিয়ে এসেছে এশিয়ায়—ক্রমে কলকাতার আশেপাশে বোম্বিং শুরু করেছে জাপানীরা। যেদিন রবীন মজুমদারের গান টেকিং সেইদিন বোমা পড়লো হাতি বাগানের বাজারে ও আমার মাথার উপর। প্রাইমা আমার 'বিপর্যয়' ছবির অগ্রসর বন্ধ করে দিলেন। বিপর্যয় ছবি এখন সত্যিই আমার ভবিষ্যৎ

বিপর্যয়ের রূপ ধরে সামনে রুখে দাঁড়ালো। সারা কলকাতার লোক বোমার ভয়ে কলকাতা ত্যাগ করতে শুরু করলো—দলে দলে হাজারে হাজারে লাখে লাখে। এমনি বিপর্যয়ে প'ড়ে আমি সপরিবারে লাহোরের পথে পাড়ি জমালাম। ভাবলাম ফিল্মী কর্মীরা সবাই বোম্বাই দৌড়চ্ছেন, আমি একবার লাহোর গিয়ে দেখি।

লাহোর আমার কাছে নিতান্তই নতুন শহর। কাউকে চিনি না—কেবল একখানি চিঠি দীপালির মালিক শ্রীবসন্তকুমার চাটুজ্যের কাছ থেকে পেয়েছিলাম যার ভরসায় এতদূর পাড়ি দিয়েছি। ওঁর ছেলে শ্রীমান বঙ্কিম এখন লাহোরের মহেশ্বরী পিকচারের পাবলিসিটি অফিসার। স্টেশনে নেমে ধর্মশালায় মালপত্তর চাবি দিয়ে রেখে আমার স্ত্রী ও ছোট শ্যালককে সঙ্গে করে একখানি ভিক্টোরিয়ায় চড়ে মহেশ্বরী পিকচারের দরজায় পৌছলাম। গাড়িতে ওদের বসিয়ে চিঠি নিয়ে ওপরে উঠে শ্রীবঙ্কিমকে খুঁজে বার করলাম। কিন্তু আমায় দেখে বঙ্কিমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললো—এতো অফিস আর রিহার্সাল বাড়ি। এইখানেই আমরা থাকি আপনাকে এখানে কি করে তুলি। পাশের ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখছিলেন এক ভদ্রলোক হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে উঠেন—কি হে হীরেন যে। দেখলাম মিঃ বড়ুয়ার লাইট ইনচার্জ ও সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট শ্রীসমর ঘোষ। উনি বলেন করেছো কি? এখানে কি ফিল্ম কোম্পানী আছে—কোম্পানী বলতে আমরা আর পাঞ্চোলি।

—তুমি পত্রপাঠ বোম্বাই চলে যাও। ওর ঘর থেকে একটি মহিলা বার হয়ে এসে আমার পায়ে প্রণাম জানিয়ে বলেন—আমায় চিনতে পারেন নি? আমি সেই অরুণা দাস—যে আপনার মহুয়া ছবিতে ভানুমতী খেলে নেচেছিলো। তারপর মুখ বাড়িয়ে নীচে চেয়ে দ্যাখে গাড়িতে বসে একটি মহিলা ও একটি ৫।৬ বছরের ছেলে। ও জিজ্ঞেস করে—গাড়িতে কে? আপনার কেউ হন?

আমি বলি—আমার স্ত্রী—আর আমার ছোট শ্যালক।

উনি বলেন—কি সর্বনাশ—ওঁদের নীচে দাঁড় করে তুমি হীরেনদাকে লেকচার মারছো—কথা শেষ না করেই নিজেই নেমে গিয়ে আমার স্ত্রী ও শ্যালককে নিয়ে ওপরে উঠে আসেন। এসে বলেন—শুনলাম ট্রেন থেকে নেমেই সটান এখানে চলে এসছেন? আপনি এক কাজ করুন—বৌদি ও ছেলেটিকে আমি ততক্ষণ স্নান করিয়ে রাখছি—আপনি চট্ করে ধর্মশালা থেকে আপনার জিনিষপত্তর নিয়ে আসুন। আপনারা এখানেই থাকবেন পদম-মহেশ্বরী আসুন, আমি তারপর ব্যবস্থা করছি।

সে রাত্রে মিউজিক রিহার্সাল ঘরে আমরা রাত্রবাস করলাম। ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৩ সাল, শীতের অন্ত নেই অথচ শীতের দেশের পোষাক পর্যন্ত সঙ্গে আনিনি বোমার পলাতক হিসাবে।

সকালে উঠে শুনলাম পাঞ্চোলি আর্টসে—ভক্ত জয়দেবের ক্যামেরাম্যান জিং সিং, অমরগীতির আমার অ্যাসিসট্যাণ্ট শ্রী এস কে ওঝা (পরে বিখ্যাত ডাইরেক্টর হয়েছিলেন) ও আমার অমরগীতির এডিটার শ্রীসৌকত হোসেন (যিনি মিঃ এজরা মীরের অ্যাসিসট্যাণ্ট ছিলেন) এঁরা কাজ করছেন। সৌকত হোসেন এখন ডিরেক্টর। শ্রীমান ওঝার বাড়ি নিকটেই ছিল, আমি শ্রীবঙ্কিমের ডাইরেকশন অনুযায়ী ওর বাড়িতে চলে গেলাম। শ্রীওঝা আমায় সঙ্গে নিয়ে পাঞ্চোলির বিখ্যাত সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট শ্রীঈশান ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ঈশানবাবু আমার বিপর্যয়ের কথা শুনে বললেন আপনি বাড়ি গিয়ে কিছু খেয়ে আপনার লেখা যদি কোন স্ক্রিপ্ট থাকে নিয়ে—আমাদের স্টুডিওতে আসুন দেখি কি করতে পারি। ফেরার পথে শ্রীওঝা জানালো যে ঈশানবাবু বললো দিলসুখ পাঞ্চোলি কখনো ফেলতে পারবেন না। বাড়ি এসে কেবলই মনে পড়তে থাকে দু'টি কথা—একটি ঈশান ঘোষ প্রথম দর্শনে বলেছিলেন—আপনি আমায় না চিনতে পারেন কিন্তু আপনাকে আমি কেন, ফিল্ম লাইনে কে না চেনে? আর একটি কথা শ্রীওঝা বলেছিল—অমন মুষড়ে পড়ছেন কেন মিঃ বোস—সুখ কা দিন যেইসি নাহি রহা—দুখ কা দিন বা কিঁউ ঠাহের জায়েগা?

একটা টাঙ্গা করে মল রোড ধরে পাঞ্চোলি আর্ট স্টুডিওতে পদার্পণ করলাম। ঈশান ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। দারোয়ান আমায় ঘোষের অফিসে পৌছে দিল।

মিঃ দিলসুখ পাঞ্চোলির ঘরে আমায় মিঃ ঘোষ নিয়ে যখন ঢুকলেন তখন মিঃ পাঞ্চোলি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তাঁর কাছে আদ্যপান্ত পরিচয় দিয়ে মিঃ ঘোষ বললেন: ওঁর কাছে লেখা একটি বাংলা স্ক্রিপ্টও আছে যদি শুনতে চান উনি পড়ে শোনাতে পারেন আমি হিন্দীতে তা বুঝিয়ে দিতে পারবো।

মিঃ পাঞ্চোলি স্ক্রিপ্ট শোনার পর আমার কাছ থেকে আমার পরিস্থিতির কথা শুনলেন—পরে একটু ভেবে নিয়ে বললেন…যদিও আপনি, আমার আপনাকে রাখার মতামত আজই চেয়েছেন তবু আমি বলবো যে আপনাকে দুদিন আরও অপেক্ষা করতে হবে। এরজন্য অবশ্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আপনি আপনার ফেমিলি নিয়ে ওয়েস্টার্ণ হোটেলে উঠুন—যদি আপনাকে আমি না রাখতে পারি—হোটেলের যাবতীয় খরচা আমি দেবো—আর যদি রাখতে পারি, ওখানকার সব খরচা আপনার—কেমন নিশ্চয়ই এতে আপনার অসুবিধা হবে না। কাজেই দুদিন আমায় অপেক্ষা করতেই হলো—তবু সোয়াস্তি পেলাম কারণ মহেশ্বরী পিকচার্সের গলগ্রহ হয়ে ওঁদের মিউজিক রুমে অবস্থান থেকে তিনি আমায় রেহাই দিয়েছেন।

দুদিন পরে মিঃ ঘোষ আমায় খবর দিলেন যে আজ আপনাকে স্টুডিওতে ডেকেছেন মিঃ পাঞ্চোলি। আমি তাঁর কথামত স্টুডিও পৌঁছলেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—আপনাকে আপাতত ছবি দিতে পারছি না—কারণ এখন যুদ্ধের সময় ফিল্মের কোটা হয়ে গেছে···তবে আমি অপর এক নামে আরো একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছি ফিল্মের জন্যে যতদিন না তা ঘটছে ততদিন আপনি আমার সিনারিও ডিপার্টমেন্টে যোগ দিতে পারেন··· তবে আপনার ড্রামাজ্ঞান দেখে আমি আপনাকে সে ডিপার্টমেন্টের চীফ করে নিতে রাজী আছি। আপনি মাসিক পাঁচশ টাকা এখন পাবেন। ছবি দিলে অবশ্য তখন আপনার যথাযথ মূল্য দিতে পারব। আমি এককথায় রাজী হয়ে গেলাম—কারণ এই পরিস্থিতিতে এছাড়া পথ কোথায়!

তিন মাস আমাকে সিনারিও ডিপার্টমেন্টে থাকতে হয়েছিল—এখন ওঁদের শিরিফরাদ বই-এর স্ক্রিপ্ট হচ্ছে যা ডাইরেক্ট করবেন শ্রীপ্রহ্লাদ দত্ত।

একটি বাড়ির একখানা ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে থেকে কোনরকমে ৩ মাস কাটিয়ে দেবার পর উনি প্রধান পিকচার্স নামে একটি নামকরণ করে ফিল্মকোটা পেলেন। এখন থেকে ১১ হাজার ফিটের ওপর ছবি হতে পারবে না বলেই সরকারের নির্দেশ ছিল।

পাঞ্চোলি সাহেব এক কথায় ছিলেন, আনক্রাউণ্ড কিং অব লাহোর—তাঁর তিনখানি প্রেক্ষাগৃহ ছিল—ইংরাজী ছবি দেখানো হতো প্লাজায়—আর হিন্দি ছবি দেখানো হতো প্রভাত আর প্রকাশ সিনেমা হলে। পাঞ্চোলির আদ্যাক্ষরেই প্রতিটি সিনেমার নামকরণ হয়েছিল। উনি চাইতেন প্রতি সপ্তাহের ইংরেজি ছবি—ডিরেক্টর অব সিনারিও ডিপার্টমেণ্টকে দেখতেই হবে। সেই সময় প্লাজায় এলো র‍্যানডম হারভেস্ট ছবি। ছবির শেষে উনি লবিতে দাঁড়িয়ে সবার সামনে আমার হাতে ছবিখানির প্যামফ্লেট দিয়ে বলেন—

You are a Bengali Intellect—can you reproduce this picture in Hindi?

অর্থাৎ বাংলাদেশের তুমি একজন ধীমান—পারো কি এই ছবিখানির হিন্দী রূপ দিতে?

Do you know this studio was opened by your most intellectual personality.—Netaji Subhas by name?

আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ দিলে স্থির থাকতে পারি না। আমার চরিত্রগত দোষ বলুন গুণ বলুন তার পরিচয় পূর্বেই পেয়েছেন। এক্ষেত্রেও এ শুধু আমাকে চ্যালেঞ্জ করেন নি মিঃ পাঞ্চোলি, বরং সারা বাংলার বুদ্ধি-বেত্তাদের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করেছেন আমার মনে হলো। আমি 'র‍্যানডম হারভেস্ট' পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে বললুম—নিশ্চয়ই পারি তা এবং এছবির থেকে কম কিছু হবে না জানবেন। তবে আমার কাজের মাঝে আপনি যদি না নাক গলান।

'Yes I can do—may.be better than this if you don't poke your nose in my work'.

সবিস্ময়ে সবাই চেয়ে দেখছিলেন আমার দিকে। সেখানে ছিলেন—Mr. Advani যিনি জমিদার ছবি দিয়েছেন। ডিরেক্টার প্রহ্লাদ যিনি শাস্তারামের আদমী ছবির স্পেশাল এফেক্ট দিযে সারা ভারতে নাম করেছিলেন এবং এমনিতর গুণীর মাঝে একথা শুনে পাঞ্চোলি বলেন—

You shoot the picture from the beggining to sixth reel in order of your sequence.

যদি ভাল হয় আমি চুপ করেই থাকবো, আর যদি খারাপ হয়—

You are to be dictated by me in every scene of the picture. And you are to re-shoot the picture as I will dictate.

তথাস্তু বলে Challenge accept করে নিলাম। Sound Department-এ বাঙালী ঘোষ ছিলেন বটে কিন্তু, Direction-এ পাঞ্জাবী সিন্দি ব্যতীত কেউ ছিলেন না কাজেই ওখানে কাজ করার বিপত্তি পদে পদে ঘটতে থাকলো তবু মাথানীচু করে ছয় রীল যেদিন সিক্যোয়েন্স অনুযায়ী শুটিং করে এডিট করে কমপ্লিট করলাম, সেদিন একটা ঘটনা ঘটল। মিঃ পাঞ্চোলি ঠিক সেই সময় বোম্বাই চলে এসেছিলেন—সারা ইণ্ডিয়াতে ওঁদের ছিল এম্পায়ার টকিজ।

কাজেই মিঃ পাঞ্চোলিকে প্রায়ই করাচী-কলকাতা-দিল্লী এবং বোম্বাইতে যেতে হতো। সেদিন বেলা ন'টায় স্টুডিও গিয়ে ক্যামেরা অভাবে শুটিং করতে পারলাম না—কারণ ইতিমধ্যে মিঃ পাঞ্চোলি এ স্টুডিওর দু'মাইল দূরে আরও একটি স্টুডিও কিনে বসেছিলেন। সেইখানে শিরিফরাদের আর্টিস্ট টেস্টে স্টুডিওর সবকটি ক্যামেরা আটকে থাকে। সন্ধ্যা ছটায় ক্যামেরা দিয়ে মিঃ পাঞ্চোলির পি, এ, মিঃ দেশাই বলেন সুটিং শুরু করুন। আমি বলি আজ সুটিং আর হয় না। সাড়ে নয়টায় এসে সাড়ে ছয়টায় বাড়ি যাবার কথা কাজেই আজ এখন বাড়ি যাবো। মিঃ দেশাই বলেন—You must be sincere to the company at least. আমি উত্তরে বলি—

As I should be sincere to the company. So I should also be sincere to my family. is it not ?

আমি বাড়ি চলে আসি। পরের দিন সকালেই মিঃ পাঞ্চোলি লাহোরে ফিরবেন—সবাই স্টেশনে গেছেন এবং মিঃ পাঞ্চোলির পৌছানো মাত্রই আমার নামে নালিশ করা হয়ে গেছে।

স্টুডিও বেরোতে যাবো—এমন সময় মিঃ পাঞ্চোলির একটি চিঠি পেলাম, প্লিজ সি মি ইন ইওর ওয়ে টু স্টুডিও। উনি আমার শুটিং প্রোগ্রেস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম—৯টায় আমার শুটিং আছে তাই স্টুডিওতে চলেছি। উনি বললেন—আপনার বিষয়ে অনেক নালিশ শুনলাম। আমি বলি—আপনি একজন ভেটারেন লোক—স্টুডিও গসিপ বলে একটা কথা আছে নিশ্চয়ই জানেন। যাক গে স্টুডিও হলে সব কথা হবে—শুটিং-এর দেরী হয়ে যাচ্ছে আমি চললাম। আপনি স্টুডিও যাবার আগে প্লাজায় ৬ রীল এডিটকরা ছবি রেডি আছে দেখে নেবেন।

আমি শুটিং করে চলেছি—বেলা দুটার সময় মিঃ পাঞ্চোলির বড় ভাগ্নে শ্রীরামনারায়ণ (যাঁকে প্রধান পিকচারের মালিক বলে দেখিয়েছেন) এলেন প্রায় আনন্দে নাচতে নাচতে। বললেন—বোস তুনে জিৎলিয়া। ছবি দেখে পাঞ্চোলি সাহেব মহাখুশী। পাশের চামচের দলকে বলেছেন—আগে বোসের মত শট্ নিতে শেখো তারপর ওর নামে নালিশ করো।

এই ইতিহাসের পর থেকে পাঞ্চোলিতে জীবনযাত্রা সুগম হয়ে গেল। ছবিখানির নাম ছিল 'দাসী'। সারা ভারতবর্ষে ছবিখানি ২৫টি সিলভার জুবিলি সমাধান করে বেস্ট সেলিং পিকচার-এ ১৯৪৫ সালে প্রথম স্থান অধিকার

করেছিল এবং কান্স একজিবিশনে সারা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিল। তখন তো আমাদের প্রাইজ ছিল না। তখন স্বাধীন ভারত হয়নি। আমরা ব্রিটিশের দাস।

পাঞ্চোলি সাহেব আমার মাসিক মাহিনা ছাড়া ছবিখানিতে দশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দিয়েছিলেন। কলকাতায় ছবি রিলিজ করতে আসার পর খবর পাচ্ছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কেমন যেন সংঘর্ষ দিন দিন বেড়ে উঠছে। ১৯৪৬ সালেই সে সংঘর্ষ হিন্দুবধ যজ্ঞে পরিণত হলো। কাজেই আমার লাহোর যাওয়া সম্ভব হলো না। লাহোরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এর পর কলকাতাতেই আমি কাজ পেলাম যমুনাভাই মান্সটার কাছ থেকে একটি ডবল ভারসান ছবি হিন্দী 'কাজরী' বাংলায় 'বসুমাতা'। কিন্তু এই ছবি দুখানিকে শুটিং শুরুর পূর্বেই বেচে দিলেন বোম্বাই-এর একজন ভদ্রলোককে তাঁর নাম বাসুদেব সিন্হা। (আজকের শ্রী সাউণ্ড স্টুডিও বোম্বাই-এর ম্যানেজার)। কিন্তু ছবির অর্ধেক অবস্থায় বাংলা বসুমাতার হিরো শ্রীদেবী মুখার্জির হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় সে ছবি দুখানি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালে বাংলা দেশেও হিন্দু মুসলমানের মারামারি হয়। ১৯৪৭ আগস্টে স্বাধীনতা এলো। ১৯৪৮ সালে নিউথিয়েটার্সের 'শ্রীতুলসীদাস' ছবির ডাক এলো মিঃ সরকারের অনুকম্পায়। তখনও ফিল্ম কোটা ১১০০০ ফিট। শ্রীতুলসীদাসে ৩৭ খানি (গানে ও দোহার মিলে) ১১০০০ হাজার ফিটেই তৈরী হয়। ছবিখানিতে বেঙ্গল জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে খুব সম্মানিত হয়। শ্রীঅনুপম ঘটক এর সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। গীতিকার-চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ছিল আমার। ক্যামেরার কাজ করেছিলেন শ্রীঅমূল্য মুখার্জি, সঙ্গীত রেকর্ডিং-এ ছিলেন শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায়। এডিটিং-এ ছিলেন শ্রীসুবোধ রায়—সহকারী শ্রীহৃষিকেশ মুখার্জি (আজকের বিখ্যাত ডাইরেক্টর) নায়ক শ্রীগুরুদাস, নায়িকা শ্রীমতী পদ্মাবতী। এছাড়া ছিলেন শ্রীমতী নিভাননী দেবী প্রমুখ বহু স্ত্রী ও পুরুষ শিল্পীর দল। ১৯৪৯ সালে ছবিখানি চিত্রা গৃহে মুক্তি পায়। প্লে ব্যাকে গান করেছিলেন শ্রীহেমন্ত, শ্রীজগন্ময়, শ্রীঅপরেশ লাহিড়ী, শ্রীশচীন গুপ্ত, শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী মিনতি সরকার প্রভৃতি সুগায়ক ও গায়িকার দল। জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিল সঙ্গীত পরিচালক সম্পাদক ও নায়ক ও সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট।

এরপর আমি আবার বোম্বাই যাত্রা করি। ওখানে ফিল্মকার স্টুডিওতে 'ঘুঙরু' ছবি করি—এই ছবিখানিতে ছিল ৬৫টি ট্রিক ফটোগ্রাফী যা ক্যামেরা মারফতই সম্পাদিত করাই। কোন অপটিক্যাল প্রিণ্টার দরকার হয়নি। ছবিখানি ড্যানিকের 'ওয়াণ্ডার ম্যান' অবলম্বনে ভূতে মানুষে যমজ ভাইএর ছবি।

এবপর ১৯৫৫ সালে 'রামী ধোবন' ছবি তৈরী করি (চণ্ডীদাসের রামীর নামেই নামকরণ) যার সঙ্গীত ও পরিচালনা দুই-ই করি। ছবিতে নায়ক ছিলেন শ্রীঅভি ভট্টাচার্য্যি। নায়িকা শ্রীমতী কামিনী কোশল। প্লেব্যাকে ছিল হেমন্তকুমার ও গীতা দত্ত।

১৯৫৬ সালে আমি কলকাতায় চলে আসি এবং কলকাতার বাড়ি তৈরী ও ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য এখানেই আবদ্ধ হই; ১৯৫৬ সালে একতারা ছবিই আমার শেষ ডাইরেকশন। একতারার উল্লেখযোগ্য ছিল ১০০ খানি খোলে হাজার ফিট কীর্তন দানলীলা। এরপর আমি চিত্র জগতে ডকুমেণ্টারি ছবি করতাম। আর্ট পিকচার থেকে রিটায়ার করি।

১৯৪৫ সালে লাহোর থেকে ফিরলে রেকর্ড জগতে আমি পাঞ্জাবী বই 'হির' সুরে বাঙলা রচনা করি যা শ্রীহেমন্ত গেয়েছিলেন—'শুখনো শাখার পাতা ঝরে যায়। ও, প্রিয়ার প্রেমের লিপি লেখনি তরে'। 'হংসমিথুন চলে মেঘ মেদুর বরখারে' এগুলিও শ্রীহেমন্তই গেয়েছিল। এই সময় মেগাফোন কোম্পানী থেকে শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'বৃন্দাবন যাত্রী থেমে যাও'—'ওই সখি যমুনা' প্রভৃতি গান বার হয়েছিল।

রেডিও জগতেও আমি মিউজিক প্রোডিউসর হয়ে 'মেঘদূত', 'শিবরাত্রি', 'মহুয়া' গীতিনাট্য 'শোরী মিঞা' প্রভৃতি মিউজিক ফিচার করতাম। রেডিওতে পরপর আট বছর ধরে জজিয়তি করেছিলাম। এখনও তাঁরা অ্যাডভাইসরি বোর্ডের মেম্বার করে আটকে রেখেছেন। সঙ্গীত জগতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিক অব ফাইন আর্ট ডিপার্ট-এর নিমন্ত্রণে আমি স্টাডি মেম্বার একজামিনার পদে অধিষ্ঠিত আছি। গীতবিতানেরও পেপার সেটিং-এর কাজ করতে হয় প্রতি বছর।

মিউজিক আমার জীবনের এক মহান সম্পদ তাই নিয়ে আমি ভারতীয় আগম সঙ্গীতের ধারা ও দর্শন নামে বই লিখি—যার (ইংরাজি সংস্করণ) পড়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণনজি আমার বইখানি তাঁর নামে উৎসর্গ

করার অনুমতি দেন—তখন তিনি ভারতের প্রেসিডেন্টের আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর আশীর্বাদী চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছিল তা গুছিয়ে বলে—লেখার সমাপ্তি করছি। ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদ কলমে বেরিয়েছিল—"প্রখ্যাত পরিচালক ও সুরকার হীরেন্দ্র বসু সম্প্রতি 'ভারতীয় সঙ্গীতে দর্শন' নামে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে তিনি সঙ্গীতকে বিভিন্ন পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ বইটির ইংরাজী পাণ্ডুলিপি পড়ে লেখককে তাঁর প্রশংসাসূচক অভিমত জানিয়েছেন। ২রা নভেম্বর ১৯৬৩ সালের যুগান্তর 'ভারতীয় সঙ্গীতে দর্শন পটভূমিকায় প্রকাশিত করেছিলেন—হীরেন বসু শুধু চিত্র-পরিচালকই নন—তিনি সুরকার গীতিকার এবং সঙ্গীত পরিচালকও। সম্প্রতি সঙ্গীত তথ্য নিয়ে 'ভারতীয় সঙ্গীতে দর্শন' নামে একটি গবেগণামূলক বই লিখেছেন। তিনি তার বইটির পাণ্ডুলিপি রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর আশীর্বাদ ও তাঁর নামে উৎসর্গ করার অভিলাষ জানিয়েছিলেন। শ্রীবসুকে রাষ্ট্রপতি অভিনন্দন জানিয়ে গত ১৯শে অক্টোবর লিখেছেন, তিনি তা পড়েছেন এবং বইখানি গবেষণামূলক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে। তাঁর নামে বইখানি উৎসর্গিত হলে রাষ্ট্রপতির আপত্তি নেই বলেও তিনি জানিয়েছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে দর্শন গ্রন্থখানির কয়েকটি বিশিষ্ট অধ্যায় সঙ্গীত তরঙ্গ ও বর্ণবৈচিত্র্য, সঙ্গীতে জ্যোতিষ সঙ্গীতে আয়ুর্বেদ তিনি বর্ণিত করেছেন। তাছাড়া প্রতি মানুষের জীবনে সঙ্গীতের কি প্রয়োজন ও উপকারিতা তা হিন্দুদর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্র মতে বিশ্লেষ করে দেখিয়েছেন।"

———